শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস

অরুণ ঘোষ

পুরোভাষ

শিক্ষাতত্ত্বের স্নাতকস্তর ও বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরের পাঠক্রমের সাম্প্রতিক সংস্কার পরিকল্পনায় শিক্ষার সমস্যার আলোচনাকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টা যে বিজ্ঞোচিত ও সময়োপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৪ সালে নবপ্রবর্তিত পাঠক্রমের চতুর্থ পত্রে শিক্ষার সমস্যা একটা প্রধান স্থান লাভ করেছে। এ সংস্কার সত্যই অভিনন্দনীয়।

কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস, ভাবধারার বিবর্তন, পদ্ধতির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলি ঐ পত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত করায় পত্রটি অন্যায়ভাবে গুরুভারসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। শিক্ষার সমস্যা ত একাই একটি স্বতন্ত্র পত্রের দাবী করতে পারে। শিক্ষার ইতিহাস, ভাবধারার বিবর্তন, পদ্ধতির বিকাশ এগুলির প্রত্যেকটি নিয়েও এক একটি স্বতন্ত্র পত্র গঠন করা যায়। অথচ এর সব কটিকে একই পত্রে অন্তর্ভুক্ত করায় আশঙ্কা হয় এর কোনটির প্রতি ছাত্র শিক্ষক কেউই সুবিচার করতে পারবেন না। পাঠক্রম-রচয়িতারা নিজেদের করতল ভরে দেবার শুভ বাসনায় শিক্ষার্থীর কর-বিস্তারের সীমাবদ্ধতাকে ভুলে গেছেন।

গ্রন্থলেখকেরও বিপদ শিক্ষার্থীর চেয়ে কম নয়। প্রাচীন বৈদিকশিক্ষা থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার পূর্ণ ইতিহাসটি বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। তার সঙ্গে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার বিবরণ ও সমাধানের আলোচনা এবং যুগশিক্ষকগণের প্রগতিশীল ভাবধারা ও শিক্ষামূলক অবদানেরও বিশদ বিবরণ বইটিতে অঙ্গীভূত করা অপরিহার্য হয়েছে। তার ফলে বইটি আয়তনে ও বিষয়প্রাচুর্যে অস্বাভাবিকভাবে বৃহদাকার হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা বিচার করে এ সব অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া উপায় ছিল না।

২০এ, রাধানাথ মল্লিক লেন,
কলিকাতা-১২। ১৫ই মে, ১৯৬৫

অরুণ ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম পর্যায় ঃ শিক্ষার ইতিহাস

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ শিক্ষার সমস্যা

তৃতীয় পর্যায় ঃ যুগশিক্ষকগণ

এক

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার পটভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে ধর্মের প্রভাবের দ্বারাই এর স্বরূপ ও সংগঠন প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হত। ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের মৌলিক তত্ত্বগুলি একসঙ্গে সুসংবদ্ধ হয়ে ধর্মের একটি সর্বব্যাপক ধারণার সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন ভারতের ধর্মের এই পরিকল্পনাটিতে মানবজীবনের আদর্শ, আচরণ এবং অন্যান্য কার্যাদির একটি সামগ্রিক ও সর্বাত্মক ধারণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্ত্রক ছিল ধর্ম। সে যুগের সামাজিক জীবনের নিয়মকানুনেরও নির্মাতা ছিল ধর্ম। অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ও বৃত্তি-অনুসরণও ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের আধিপত্য ছিল অদ্বিতীয় এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় ধর্মই ছিল প্রধানতম শক্তি। এই সর্বজনীন ও দেশকালাতীত ধর্মের জন্যই প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ জাগতে পারেনি। তাঁদের কাছে দেশ ছিল ভৌগোলিক পরিসীমার ঊর্ধ্বে, আধ্যাত্মিক ও কৃষ্টিমূলক এক সম্পদ। শ্রদ্ধেয় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় দেশ ছিল তাঁদের সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি ছিল তাঁদের দেশ। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ঐতিহ্যসম্পন্ন নানাজাতি ভারতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পেরেছিল এবং ক্রমে ভারতের মাটিতে নিজেদের স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিল। ভারতের এই উদার ধর্মনীতি তার আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের দিগন্তকে দূর থেকে অন্তহীন সুদূরে ক্রমশ প্রসারিত করেছিল।

আধ্যাত্মিক আদর্শ

এই আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ভাবধারার সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে শিক্ষাও মুক্ত ছিল না। বরং শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ রূপটিই আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। মানব জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল এই জড়জগত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং একমাত্র শিক্ষাই ব্যক্তিকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে

সমর্থ করে। অতএব জীবনের লক্ষ্য যে মুক্তি সেই মুক্তির পন্থা হল শিক্ষা। এক কথায় বলা চলে শিক্ষাই জীবন এবং জীবনই শিক্ষা। ভারতে আগমনকারী আর্যদের প্রকৃতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল চিন্তাশীলতা। তাঁরা গভীর এবং জটিল ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে পারতেন এবং চিন্তার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করায় পরম আনন্দ পেতেন। তাঁদের এই চিন্তাপ্রিয়তাকে সাহায্য করেছিল দুটি বস্তু, একটি হল ভারতের উর্বরা, শস্যশ্যামলা প্রকৃতি যে মুক্তহস্তে তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি দান করেছিল। আর দ্বিতীয় বস্তুটি হল অগণিত নদ-নদী-পর্বত-অরণ্যমণ্ডিত ভারতের মনোরম দৃশ্যাবলী। এই অপূর্ব নৈসর্গিক পরিবেশে মানুষের চিন্তা সাধারণ ভাবেই পার্থিব জগতের তুচ্ছ চিন্তার অনেক উপরে উঠে যায়। আর্যদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। জীবনের ছোটখাট সমস্যাগুলি তাঁদের কাছে গুরুভার হয়ে দাঁড়ায় নি। জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতি মানব-অস্তিত্বের মৌলিক রহস্যগুলি তাঁদের অনুভূতি-প্রবণ মনে বিশেষ দোলা দিয়েছিল। এই জড় পদার্থের জগতে এবং পার্থিব জীবনে আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগ, কামনা-বাসনার মধ্যে তাঁরা তাঁদের সমস্যাগুলির কোন সমাধান খুঁজে না পেয়ে এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক জগতের সৃষ্টি করলেন। এই ক্ষয়শীল ও মৃত্যুবিধ্বস্ত পৃথিবীকে তাঁরা সত্য বা বাস্তব বলে মনে করলেন না। তার পরিবর্তে তারা এক সর্বব্যাপী সর্বজনীন পরম শক্তিকে একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নিলেন। এই বহুবিভক্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পার্থিব জীবন নিতান্তই মায়া বা অজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের এই আত্মা সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার একটি অংশবিশেষ, দেহের কারাগারে আবদ্ধ সেই বিরাট অগ্নিময় সত্তার একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। পরমাত্মার সঙ্গে মানব আত্মার এই মিলনে আসে জীবনের বাঞ্ছিত মুক্তি। যতদিন এই মুক্তি দেখা না দিচ্ছে ততদিন আত্মাকে দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়।

অতএব এই পার্থিব জীবনকে সমৃদ্ধ বা উন্নত করে তোলা জীবনের লক্ষ্য নয়। ধনসম্পদ আহরণ, রাজ্য জয়, সম্মান ও খ্যাতি অর্জন, কৌশল বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য আহরণ—কোনটিই মানুষকে তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। একমাত্র সেই পরমাত্মার উপলব্ধিই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য।

জীবনের লক্ষ্য : মুক্তি

এই রক্তমাংসের দেহের কারাগার থেকে আত্মাকে মুক্তি দিতে হবে। মৃত্যু এই মুক্তির পথ নয়। মৃত্যু হল আবার একটি নতুন জন্মের সূচনা মাত্র। কেননা

মৃত্যুর পর প্রাণী আর একটি নতুন দেহ পরিগ্রহ করে। মুক্তির প্রকৃত অর্থ হল দেহের বন্ধনকে অতিক্রম করে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক মিলন। ভারতীয় দর্শনের এই তত্ত্বটির গূঢ়তা সাধারণের উপলব্ধির বাইরে। দেহের অধিকারী হয়েও ব্যক্তিকে হতে হবে দেহাতীত। কিন্তু দেহ থাকতে দেহকে ভুলতে পারা সহজে সম্ভব নয়। তার পথে পরম অন্তরায় হল আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যারা প্রতিনিয়তই আমাদের দেহ সম্পর্কে আমাদিগকে সজাগ করে তোলে। এইজন্যই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়গুলিকে রিপু বা শত্রু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

দেহকে বড় করে এবং দেহের ভোগ ও তৃপ্তিকে লক্ষ্য বলে ধরে নিয়ে যে জীবন যাপন সে জীবন অন্ধকারের, সে জীবনের মুক্তি নেই। দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি পেতে হলে পার্থিব জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে। মনের অন্তঃস্থলে যেখানে আত্মার অধিবাস সেখানে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। মানুষ তখন নিজের সত্যকারের সত্তাটি খুঁজে পাবে। তার চোখের সামনে থেকে অজ্ঞানের কালো পর্দা উঠে যাবে এবং সে তখন নিজেকে সেই পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখতে পাবে।

বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে অবলুপ্ত করে ব্যক্তি যখন নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে তখন সে নিজের মধ্যে তার প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পায়। দুঃখ, অনিশ্চয়তা, আবেগ প্রভৃতির দ্বারা জর্জরিত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে তার এই অন্তর্বাসী আত্মা তার কাছে অক্ষয়, অনন্তরূপী পরম সত্তা বলে প্রতিভাত হয়। এই সত্তার সন্ধান পেলে তার মধ্যে আসে পরম শান্তি, অনন্ত আনন্দ ও শাশ্বত জ্ঞান। একেই ভারতীয় দর্শনে মুক্তি বা মোক্ষ নাম দেওয়া হয়েছে।

পদ্ধতি—তপস্

এই মুক্তিলাভের পদ্ধতি একটিই মাত্র, সেটি হল তপস্ বা তপস্যা। তপস্ যেমন জীবন যাপনের পদ্ধতি তেমনি শিক্ষারও পদ্ধতি। এই তপস্ পদ্ধতির অনুশীলন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যোগশাস্ত্র। মানসিক শৃঙ্খলা-সাধনের শাস্ত্রটিকেই যোগশাস্ত্র নাম দেওয়া হয়েছে। যোগ বলতে বোঝায় চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ। বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে এনে সেগুলিকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী করাকেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ বা যোগ বলা হয়। বস্তুজগতের সঙ্গে সংযোগ এবং

বাহ্যিক জ্ঞানকে সত্য বলে মনে করাই আত্মার বন্ধনের কারণ। সেইজন্য মুক্তির একমাত্র পথ হল বস্তুজগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা এবং অন্তর্মুখী জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া।

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য তাহলে পরিষ্কার বর্ণনা করা যেতে পারে। বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে অপসারণ করা এবং অন্তর্মুখী জ্ঞানলাভ করাই যখন মুক্তির একমাত্র পথ তখন আমাদের মনকে সেইমত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই হল শিক্ষার কাজ। ইন্দ্রিয়দমন, আত্মসংযম ও মনন বা ধ্যান হল শিক্ষার অপরিহার্য পদ্ধতি।

এই অভিনব শিক্ষাতত্ত্বের ওপর প্রাচীন ভারতের বিশেষধর্মী শিক্ষাব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল। শিক্ষক কেবলমাত্র সেখানে জ্ঞানদাতাই ছিলেন না, তিনি মুক্তিদাতাও ছিলেন। উপনয়ন পর্বের সময়ে শিক্ষার্থী গুরুর কাছে জীবনের এই পরমকাম্যের সন্ধানের আমৃত্যু-ব্রত গ্রহণ করত। শিক্ষার প্রারম্ভ তার দ্বিতীয় জন্মের সূচনা করত। পিতামাতা তাকে দিয়েছেন শারীরিক জন্ম, শিক্ষক দিতেন তার আধ্যাত্মিক জন্ম। শিক্ষার্থীর কাছেও শিক্ষা নিছক জ্ঞান অর্জনই ছিল না। পরমকাম্য মুক্তিলাভের জন্য যে উন্নত শক্তির প্রয়োজন তাই আহরণ করাই ছিল শিক্ষা। এই শক্তি নিছক উপদেশ বা পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে আসে না কিংবা কোন বই বা শাস্ত্র পাঠে অর্জন করা যায় না। এই বাঞ্ছিত শিক্ষা আসে সেই পরম সত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধনের মধ্যে দিয়ে। সেইজন্য সত্যকারের শিক্ষা অর্জন করার বস্তু নয়। সত্যকারের শিক্ষা হল সমস্ত জীবন দিয়ে একটি পরমসত্যকে উপলব্ধি করা। এইজন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে গুরুর গৃহে বাস করাটা বাধ্যতামূলক ছিল।

শিক্ষকের ক্ষেত্রেও শিক্ষার আদর্শ একই রকম ছিল। শিক্ষকতা তার কাছে কোন বৃত্তি বা অর্থকরী পন্থা ছিল না। পরমসত্তাকে উপলব্ধি করার যে জীবনব্যাপী সাধনা এটি তারই একটি অঙ্গমাত্র। তিনি যদি সত্যের সন্ধান পান, তবে অপরকেও সে সন্ধান দেওয়া তার কর্তব্যের অন্তর্গত। এই দেওয়াকে তিনি অনুগ্রহ-প্রসূত দান মনে করেন না। এটা তাঁর কাছে একটি পবিত্র কর্তব্য। বৃত্তিরূপে শিক্ষকতা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল। ব্যক্তির আত্মাকে উন্নত করে মুক্তির পথের সন্ধান দেওয়াই অধ্যাপনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। শিক্ষা ছিল শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েরই মুক্তির পথ।

দুই

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে নানাশাস্ত্রের চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের চর্চা এক প্রকার হয়নি বললেই চলে। ফলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপাদানের স্বল্পতা একটি বিরাট অন্তরায়। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাস রচনা করতে গেলে এই উপাদানস্বল্পতা আরও অধিকমাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে। তবে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিক লিখিত বিবরণী না থাকলেও নানাবিধ ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং সেগুলির উপর নির্ভর করেই আমাদের প্রধানত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়ে তুলতে হয়। খননকার্যের সাহায্যে পাওয়া নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার প্রধান সহায়ক। কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সমস্ত উপাদানের মূল্য খুব বেশী নয়। তবে তাম্রলিপি ও শিলালিপি প্রভৃতির অস্তিত্ব থেকে এই প্রমাণিত যে সেই সময়ে শিক্ষার চর্চা যে কেবল ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল তাই নয় তখনকার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতের হারও যথেষ্ট ছিল। তা না হলে সাধারণের কাছে তাম্রলিপি, শিলালিপির সাহায্যে রাজার নির্দেশ জানানোর প্রচেষ্টার কোনও সার্থকতাই থাকত না। সেই সঙ্গে একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রাচীনকালে তাম্রলিপি শিলালিপি প্রভৃতি জনশিক্ষা বিস্তারে প্রচুর সাহায্য করেছিল।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার যুগবিভাগ

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসকে আমরা তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা যুগে ভাগ করতে পারি। যথা—

১। প্রাক্-ঋকবেদ যুগ ২। ঋকবেদ যুগ বা আদিবৈদিক যুগ এবং ৩। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগ।

প্রাক-ঋকবেদ যুগ বলতে ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বের যুগটি বোঝায়।

এই যুগেও ভারতে উন্নত সভ্যতার অস্তিত্বের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু এ যুগের শিক্ষার ইতিহাস রচনার পক্ষে পর্যাপ্ত উপকরণ একান্ত দুর্লভ।

ঋক্‌বেদ যুগ বলতে আর্যসভ্যতার প্রাথমিক কালকে বোঝায়। এই সময়ে আর্যরা তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যকীর্তি ঋকবেদ রচনা করেন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতিধারার সূত্রপাত করেন।

কালক্রমে ঋকবেদের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিভিন্ন বেদের সৃষ্টি হয় এবং নানাবিধ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের সৃষ্টিতে আর্যদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময়ে শিক্ষাব্যবস্থাও ক্রমশ জটিল ও সুপরিণত হয়ে ওঠে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর অবদান সব চেয়ে বেশী বলে এটিকে সাধারণত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বলা হয়। বলা বাহুল্য এই নামটি অবশ্য ভুল কেননা সে সময়কার শিক্ষায় সকল বর্ণেরই দান সমানভাবেই ছিল এবং শিক্ষার চর্চা সমভাবেই অন্যান্য বর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ভারতে আর্যদের আগমন ও ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন ইতিহাসবিদ্ খৃষ্টপূর্ব চার পাঁচ হাজার বছর থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়কে আর্যদের আগমন কাল বলে বর্ণনা করেছেন। সমস্ত মত পরীক্ষা করে মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে আর্য সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। আর্যরা সম্ভবত একই সময়ে সকলে প্রবেশ করেন নি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন স্রোতধারার ন্যায় ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং পরবর্তী আগমনকারীর দল পূর্ববর্তীদের দক্ষিণ কিংবা পূর্ব অঞ্চলের দিকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। আর্যরা সংখ্যায় কত ছিলেন কিংবা কতটুকু অঞ্চল তাঁরা অধিকার করেছিলেন সেই মানদণ্ডে ভারতে আর্যপ্রভাবের বিচার করা চলে না। কারণ আর্য নরপতিরা শুধু ভারতের নানা অঞ্চলে রাজ্যবিস্তারই করেন নি, তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজ-বিন্যাস প্রভৃতি সবেরই রূপ দিয়েছিলেন। ভারতাগত আর্যরা গোড়ার দিকে যাযাবর ছিলেন এবং তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিহিত ছিল প্রাচীন বেদগুলির মধ্যে। এই বেদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ঋক্‌বেদ এবং এই ঋকবেদের কিছু অংশ আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বেই রচিত হয়েছিল বলে ধরা যায়। এই বেদশিক্ষা তখন শ্রুতি হিসাবে দেওয়া হত এবং তখনও বেদকে লিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। শিক্ষার্থীরা গুরুর মুখ থেকে শ্রবণ করে ও তা মনে রেখে বেদ শিক্ষা

করতেন। এইভাবে বহু শত বৎসর ধরে বেদবাণী মুখে মুখে প্রচারিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। কালক্রমে লিপিবদ্ধ হয়ে তা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে ও মানবসভ্যতার অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়রূপে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

১। প্রাক্-ঋক্‌বেদ যুগের শিক্ষা

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বৈদিক শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা আর্যদের ভারতে আগমন ও সেই সঙ্গে বেদের প্রচলন থেকেই সুরু হয়েছিল। সেজন্য প্রাক-ঋকযুগের শিক্ষা বলতে আমাদের প্রাক্-আর্য ভারতের শিক্ষাকেই বুঝতে হবে। সম্প্রতিকালে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় প্রাক্-আর্য যুগে ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় এক উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানের হিন্দু সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তা এই প্রাক্-আর্য সভ্যতা এবং আগমনকারী আর্যদের সভ্যতার সমন্বয়নের ফলেই জন্মলাভ করেছে। সেজন্য এই মিশ্রিত সভ্যতাকে এককথায় হিন্দু-আর্য বা ভারতীয় সভ্যতা আখ্যা দেওয়া উচিত। কোন সন্দেহ নেই যে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির ফলেই এই মিশ্রিত সভ্যতাই পরে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে এক সমুন্নত সুসভ্য ভারতীয় জাতির সৃষ্টি করেছিল।

সিন্ধু সভ্যতা

এই প্রাক্-আর্য বা প্রাক্-বৈদিক সিন্ধু উপত্যকার শিক্ষাব্যবস্থাও যে বেশ উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমান সিন্ধুদেশ মহেন্‌জোদড়ো ও হরাপ্পায় প্রাচীন সভ্যতার যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে সে সব পর্যবেক্ষণ করে পণ্ডিতেরা এই অনুমানই করেছেন যে, বেলুচিস্থানের পথে আগত দ্রাবিড় জাতি এবং মধ্য এশিয়ার সুমের জাতির দানে এই সভ্যতা সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রাক্-আর্য যুগের এই সভ্যতা প্রধানত এক উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত এই সভ্যতার নিদর্শনগুলিতে পুর-পরিকল্পনা এবং কারুশিল্পমূলক দক্ষতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে দ্রাবিড় সভ্যতা পরে দক্ষিণ ভারতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সেখানেও উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গেছে। ভারতে আসার পর আর্যরা প্রাক্-আর্য যুগের এই সমৃদ্ধ নগরগুলি ধ্বংস করে প্রধানত পল্লী-কেন্দ্রিকে সভ্যতার পত্তন করলেও,

পরবর্তী কালের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় তাদের বহু অবদান ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এই সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে এক লুপ্ত ভাষার বর্ণলিপি সমন্বিত শীলমোহরাদিও প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা পেয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে লিখিত লিপির উদ্ভব হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় লিখতে ও পড়তে শেখানোব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধাব কবা যায়নি বলে তাদের সভ্যতার এই দিকটির উপর আলোকপাত কবা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজও আমরা জানি না যে প্রকৃতপক্ষে কারা সেই লিপিব উদ্ভাবক এবং কিভাবে বা তার ব্যবহাব কবা হত। তাদের শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ছিল এবং শিক্ষাব উদ্দেশ্যই বা কি ছিল তাও আমাদের জানা নেই। প্রাচীন অনেক নগর-সভ্যতা মন্দির-কেন্দ্রিক ছিল, অর্থাৎ সেই নগরগুলি প্রধানত কোনও মন্দিরকে কেন্দ্র কবে গড়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র সেই সব মন্দিবেব পুরোহিতদেবই জ্ঞানবিদ্যাব চর্চায় অধিকাব ছিল এবং লিপি-পরিচয় ও লিপিলিখন তাদেব মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মহেনজোদড়োতে এইরূপ কোন কেন্দ্রীয় মন্দিরেব সন্ধান পাওয়া যায় নি। ববং নগরটি প্রধানত ব্যবসা-কেন্দ্রিক বাণিজ্য-প্রধান ছিল বলেই মনে হয়। অথচ অধিবাসীরা যে ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিল এ কথাও সত্য নয়, কারণ প্রচুর মাতৃকা মূর্তি এবং একটি শীলমোহবে বৃষারূঢ় নাগভূষণ শিবমূর্তিও পাওয়া গেছে। তাছাড়া যোগাসনে আসীন ধ্যানমগ্ন যোগীপুরুষের শীলমোহরও প্রচলিত ছিল। এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে পার্থিব উন্নতিকল্পে কৃষিকায, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারুশিল্পাদি শেখার সঙ্গে নানা বকম অধ্যাত্মতত্ত্ব, আচার-অনুষ্ঠান শেখাবাব ব্যবস্থা সেখানে ছিল। পরবর্তী কালে মন্দিবে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা কবে মূর্তিপূজা, ভক্তিবাদ, শক্তিতন্ত্র, মাতৃকাপূজা, শৈবতন্ত্র, এমন কি যোগশাস্ত্রও এই দ্রাবিড়জাতির প্রভাবেই ভারতীয় সভ্যতাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অতএব এই দ্রাবিড়জাতিই যদি সিন্ধু সভ্যতার জনক হয়, তবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সিন্ধু সভ্যতাতেও ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রাক্-বৈদিক ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এই অনুমান-নির্ভর আলোচনা কবা ছাড়া নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

২। ঋক্‌বেদ যুগ বা আদি বৈদিক শিক্ষা

আর্যদের ভারতে প্রবেশের পূর্বেই ঋকবেদের কিছু অংশ রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আনুমানিক খৃঃ ১৫০৮ বৎসর

পূর্বে ঋকবেদ রচিত হয়। এই মতের কতখানি গ্রহণযোগ্য তা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তাঁরা ঋকবেদকে পৃথিবীর মানব সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে বর্ণনা করেন। বৈদিক সূক্তের বর্ণনানুসারে মনে হয় আর্যগণ যখন সপ্ত-সিন্ধু অঞ্চলে বসবাস করতেন ঋকবেদ সেই সময়েই রচিত হয়েছিল। কারণ ঋকবেদের বিভিন্ন সূক্তে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের বৃক্ষ তরুলতাদি অরণ্যচারী প্রাণীসমূহ নদনদী এবং প্রধান প্রধান শস্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতে আর্য-অভিযানের প্রথম যুগে তাঁদের অধিকার সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে আর্যরা ক্রমে ভারতের পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠনে ভৌগোলিক প্রভাব চূড়ান্ত শক্তি না হলেও তার প্রভাব অনস্বীকার্য এবং সেজন্য প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিকতা যে ভারতের ভৌগোলিক প্রভাবের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে প্রথম আর্যবসতি স্থাপিত হয় তা বেশ উর্বর ছিল এবং প্রচুর খাদ্যশস্য অল্পায়াসে পাওয়া যেত বলে সেখানের অধিবাসীদের জীবিকার জন্য সর্বদা উদ্ব্যস্ত থাকতে হত না। তাছাড়া এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এমনই ছিল যে তা এই অঞ্চলকে বাইরের প্রভাব থেকে বহুল পরিমাণে মুক্ত করে রেখেছিল। অনায়াস জীবিকা এবং তজ্জনিত অবকাশ ও বাইরের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে মুক্ত থাকায় আর্যরা আত্মমুখী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তার ফলেই ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বে গৌরবমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের রমণীয় পরিবেশে বিমুগ্ধ আর্যদের মুগ্ধ-চিত্ততা ঋকবেদের সুললিত কাব্য-মাধুর্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের সরল ও স্বচ্ছন্দ জীবন উপকরণবহুল না হওয়ায় তাঁদের মানসিক শক্তি জীবনধারণের অপরিহার্য সামগ্রী সংগ্রহে ক্ষয় হয়ে যেত না এবং সেজন্য বহির্মুখীও হয়ে ওঠে নি। ফলে তাঁরা অন্তর্মুখী ও চিন্তাপ্রবণ হওয়ার প্রচুর অবকাশ পেয়েছিলেন এবং জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তার ফলেই হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থা একটা স্বতন্ত্র বিশেষধর্মী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্য এই অন্তর্মুখিতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক দিকটাকেও তাঁরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেননি এবং প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেজন্য সামাজিক জীবনের উপযোগী নির্দেশও প্রচুর পাওয়া যায়।

ঋষি ও পুরোহিত শিক্ষক

আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা কতকগুলি ছোট ছোট দলে

বিভক্ত ছিলেন। এই দলগুলি আবার কতকগুলি ছোট ছোট পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল। পরিবারের কর্তা হতেন পিতা এবং দলের যিনি দলপতি তিনি হতেন রাজা। এই পরিবার এবং পরিবারের দ্বারা সংগঠিত দল—এই দুয়ের উপর নির্ভর করেই আর্যদের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল। সমাজের শৃঙ্খলাসাধন ও মঙ্গলবিধানের দায়িত্ব থাকত রাজার উপর। পরিবারের শিক্ষা দীক্ষার ভার পরিবারের প্রধান বা পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ পিতৃপুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল। বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল পুরোহিত বা শিক্ষকের উপর এবং তাঁরাই কার্যত দলের সংস্কৃতির বাহক ছিলেন। এই জন্যই সে যুগের ভারতীয় আর্যদের মধ্যে পুরোহিত-শিক্ষকদেব প্রভাব খুবই প্রবল ছিল এবং ইন্দ্র অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা উপলক্ষে রচিত উপাসনার স্তোত্রাদির রচয়িতাও ছিলেন এই সব পুরোহিত শিক্ষকরাই। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির রূপক-বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তাঁদের যে অপূর্ব অধ্যাত্ম দৃষ্টি এইসব স্তোত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল তার জন্য তাঁরা ঋষি বা সত্যদ্রষ্টা নামে আখ্যাত হয়েছিলেন। এই সব ঋষির প্রজ্ঞার আলোকেই ভারতে প্রথমে শিক্ষাদীপ জলে উঠে এবং তাঁদেরই অধ্যাত্মচিন্তাব জ্যোতির্ময় আলোকপ্রভা ভারতের নদনদী পর্বতকান্তার পার হয়ে সুদূরতম ভারতবাসীর মনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

ঋষি ও শ্রুতর্ষি

বেদের যে স্তোত্রসমূহের সংগ্রহকে সংহতি বলা হয় সেইটিই হল প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য। এই সংগ্রহসমূহের মধ্যে ঋকবেদই প্রাচীনতম এবং তাতে দশটি পুস্তক কিংবা মণ্ডলে বিভক্ত ১০১৭টি স্তোত্র পাওয়া যায়। এই দশটির মধ্যে দুই থেকে সাতটি মণ্ডল হল পণ্ডিতদের মতে ঋকবেদের মূল কেন্দ্র। এক একজন প্রখ্যাতনামা ঋষি ঋকবেদের বিভিন্ন মণ্ডলের মণ্ডলাকার বলে পরিচিত হতেন। মনে হয় একটি বিশেষ স্তোত্রসংগ্রহ এক একজন বিশেষ ঋষি এবং তাঁর বংশধরদের দ্বাবা রচিত। সেদিক থেকে বিচাব করলে এইগুলিকে বংশানুক্রমে পারিবারিক সংগ্রহ হিসাবে গণ্য করা যায়। এই স্তোত্রের সংগ্রহগুলি পরিবারের মূল্যবান উত্তরাধিকার বলে মনে করা হত এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেগুলির সংরক্ষণ করা হত। যে সব ঋষি মননের দ্বারা মন্ত্রসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতেন, তাঁরা স্বরসংযোগে সেগুলিকে প্রকাশ করতেন এবং আর সকলে সেগুলি কানে শুনে মনে রাখতেন। মন্ত্রের স্রষ্টাগণই ঋষি বলে আখ্যাত

তাঁরা 'শ্রুতর্ষি' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে সত্য উপলব্ধি করে ঋষিদের মত ঋত বা সমৃদ্ধ হতে না পারলেও এই শ্রুতর্ষিগণের জন্যই বেদবাণী ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত হতে পেরেছিল। কালক্রমে এই বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে একত্রিত ও গ্রন্থিবদ্ধ করে পূর্ণাঙ্গবেদের সৃষ্টি হয়।

জাতিভেদ প্রথা ও শিক্ষা

ঋকবেদের একটি সূক্তে বর্ণভেদের উল্লেখ দেখা যায় এবং তাতে মনে হয় যে এই সময় থেকেই সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদ দেখা দিয়েছিল এবং সমাজ-জীবনও অনেক জটিল হয়ে পড়েছিল। যখন এই বেদের একত্রীকরণ শেষ হল তখন কেবলমাত্র ঋষি পরিবারেই বেদজ্ঞান আর আবদ্ধ রইল না। অন্যান্য শিক্ষাকামীদের মধ্যেও বেদশিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল।

আদি বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে প্রবর্তিত না হলেও জীবনযাত্রার মধ্যে শৃঙ্খলা আনার জন্য মানুষের গুণ অনুসারে কর্ম বা বৃত্তির বণ্টন ব্যবস্থা তখন থেকে সুরু হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য তখন বিদ্যার্জনের সুযোগ সুবিধা যোগ্যতানুসারেই লাভ করা সম্ভব ছিল। মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে ছাত্রদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হত এবং যে সব বিদ্যার্থী শাস্ত্র অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে সমর্থ ছিল তারাই 'ছাত্র' আখ্যা পেত। প্রশান্তচিত্তে তদ্‌গতভাবে অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনা করাই ছাত্রজীবনের প্রধান আদর্শ ছিল এবং এই প্রশান্তি ও স্থিরচিত্ততা আত্মসংযম বা ইন্দ্রিয়দমন ছাড়া সম্ভব ছিল না বলেই সে যুগের শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণা ছিল। সেজন্য প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য ইন্দ্রিয়-দমন ছাত্রজীবনে অবশ্য করণীয় বলে গণ্য হত এবং ছাত্রদের সমাহিত হয়ে অধ্যয়নরূপ তপস্যায় একান্তভাবে ব্রতী হবার নির্দেশ দেওয়া হত।

পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা

মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করা হত—উত্তম-প্রজ্ঞা, মধ্যম-প্রজ্ঞা এবং অল্প-প্রজ্ঞা। বেদবিদ্যালাভে সমর্থ ব্রাহ্মণগণ উত্তম-প্রজ্ঞা আখ্যালাভের অধিকারী হতেন। মধ্যম প্রজ্ঞা তার পরবর্তী স্তর বলে গণ্য হত এবং নিম্নতম স্তরে অল্প-প্রজ্ঞারা শ্রেণীভুক্ত হত। যে সব ব্যক্তি অল্প-প্রজ্ঞার স্তরভুক্ত তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সে যুগে সাধারণত অনার্যরাই অধিকতর বৃত্তিমূলক নৈপুণ্য দেখাতেন।

এই বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বেদ-বিদ্যা অর্জনকেই শিক্ষার মূলগত লক্ষ্য বলে

বেদকে তাঁরা অপৌরুষেয় বা কোন মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় এমন একটি অপার্থিব জ্ঞানের ভাণ্ডার বলে মনে করতেন। এই অপার্থিব জ্ঞানকে উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র বেদপাঠ করা মন্ত্র মুখস্থ করাকে তাঁরা প্রকৃত বিদ্যা বলতেন না। তাকে তাঁরা 'অবিদ্যা' বা 'অপরা বিদ্যা' নাম দিয়েছিলেন। আর বেদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করে আত্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হওয়াকেই তাঁরা 'পরা বিদ্যা' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলতেন এবং মনে করতেন একমাত্র এই জ্ঞানের সাহায্যেই জীবনের পরমকাম্য মুক্তি পাওয়া যায়। ঋষিরা সেইজন্য পরা বিদ্যা লাভ করে সত্যদ্রষ্টা হওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন এবং নিছক পাণ্ডিত্য অর্জন করাকে তাঁরা নিকৃষ্ট কর্ম বলে বিবেচনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে পরাবিদ্যাই ছিল বেদজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই পরাবিদ্যালাভে সকলে সমর্থ হতেন না বলে অনেকের পক্ষেই মন্ত্রবিদ্যা অর্জন করে বেদ-মন্ত্র সংরক্ষণ করাই কাম্য বলে মনে হত। বেদের স্তোত্রগুলির ধ্বনিমাধুর্য অপূর্ব এবং সেগুলি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে সুললিত কণ্ঠে পাঠের উপর এত জোর দেওয়া হত। বৈদিক ভাষার মার্জিত লালিত্য, ওজস্বিতা, ছন্দের বৈচিত্র্য, মাধুর্য প্রভৃতি পৃথিবীর বিদ্বদ্‌জনের সমাদর লাভ করেছে। বৈদিক ঋষিদের অপূর্ব রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় মন্ত্ররচনার প্রতিটি শব্দ চয়নের দক্ষতায়। বৈদিক ছন্দ সাত প্রকারের যথা—গায়ত্রী, উষ্ণীক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। এই সব ছন্দ নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করা কঠিন অভ্যাস পালন ও অনুশীলনের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষার পদ্ধতি

বৈদিক যুগে শ্রবণ ও আবৃত্তিই শিক্ষার প্রধানতম পদ্ধতি ছিল। বিপুল-সংখ্যক মন্ত্রসমূহ শ্রবণ করে মনে রাখা বার বার আবৃত্তি ছাড়া সম্ভব হত না। আবার মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি না করে বা তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য না বুঝে শুধু আবৃত্তি করাও চলে না। কিন্তু অর্থোপলব্ধি যে সময়-সাপেক্ষ এবং প্রথমেই সম্ভব নয়, তাতেও সন্দেহ নেই। সেজন্য প্রথমে আবৃত্তির উপর এত জোর দেওয়া হত। কারণ আবৃত্তির মাধ্যমে বেদের অপূর্ব কাব্যধর্মী মন্ত্রসমূহ শিক্ষার্থীকে মুগ্ধ করে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে তার হৃদয়কে স্পর্শ করবে একথাই বৈদিক ঋষিরা বিশ্বাস করতেন। এই কারণে শব্দের প্রত্যেকটি পদ প্রথমে ছন্দের সাহায্যে ছাত্ররা আবৃত্তি করত এবং পরে শব্দ ও স্তবকগুলি ছন্দ সহযোগে তারা মুখস্থ করত। গুরুর কাছে থেকে শুনে ছাত্ররা সমষ্টিগত ভাবে বেদ আবৃত্তি করতেন। সমবেত ছাত্রদের

সকলের মানসিক ক্ষমতা অবশ্য এক হত না এবং এই মানসিক ক্ষমতার তারতম্যকে জলাশয়ের পরিধি অনুসারে জলধারণের পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা হত। জলাশয় যেমন তার পরিধি অনুসারে জলধারণ করতে পারে ছাত্ররাও সেইভাবে মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বেদমন্ত্রসমূহ ধারণ করতে পারত। বৈদিক যুগেই ছাত্রদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে অধ্যয়ন এবং মিলিত শিক্ষা-প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশ্য লিখিত পুঁথি না থাকলে কেবলমাত্র শুনে এবং আবৃত্তি করে শিখতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না। পরবর্তী কালে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার পরবর্তী কালের টোলসমূহে শিক্ষক ছাত্রদের পারস্পরিক আলোচনা এবং ছাত্রদের একক প্রচেষ্টা সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। কোন্ বিবর্তনের ফলে পরবর্তী বৈদিক শিক্ষা-পদ্ধতি এই রকমটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু মনে হয় আদি বৈদিক যুগের শিক্ষাদান-প্রক্রিয়াটির ক্রমোন্নতির ফলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। আদি বৈদিক যুগে শিক্ষালাভের প্রথম দিকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা প্রচলিত থাকলেও, ছাত্রদের একক প্রচেষ্টা কখনও অস্বীকৃত হয়নি এবং চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ যে একক প্রচেষ্টা ব্যতীত সম্ভব নয় একথাও জোর দিয়ে বলা হত। সেজন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার পরবর্তী স্তরই ছিল একক প্রচেষ্টা। জ্ঞানলাভের পন্থা হিসাবে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের কথা পরবর্তী যুগে বলা হয়েছে এবং আদিবৈদিক যুগেও পাঠ্যবিষয় শ্রবণ করার পর তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার প্রচেষ্টা এবং মননের সাহায্যে তাকে অন্তরে গ্রথিত করার চেষ্টা ছাত্ররা করত। শ্রবণ অবশ্যই ছিল সমষ্টিগত প্রচেষ্টা কিন্তু গ্রহণ, ধারণ ও মনন পরবর্তী এই তিনটি স্তর ব্যক্তিগত উপলব্ধি ছাড়া সম্ভব নয় এবং ছাত্ররা একক প্রচেষ্টা ও স্বাধ্যায় ছাড়া কখনই তা লাভ করতে সক্ষম হত না। সমস্ত বেদ-বিদ্যার চরম লক্ষ্য ছিল পরাবিদ্যা এবং ব্যক্তিগত তপস্যা ছাড়া কখনও পরাবিদ্যা লাভ করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য শ্রবণের পরবর্তী স্তরগুলির প্রতিটি পর্যায়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্র গভীর চিন্তার সাহায্যে পাঠ্যবিষয়গত বিভিন্ন প্রশ্নসমূহের উত্তর পাবার চেষ্টা করত। গুরুর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জটিল বিষয়ের অর্থ উপলব্ধি করাও তখন শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ছিল।

শিক্ষার্থীর কর্তব্য

বর্তমান কালে আমরা বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বুঝি আদি বৈদিক যুগে তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়

বলতে ঋষি গৃহকেই বোঝাত। গোড়ার দিকে ঋষি-পরিবারে, পিতা থেকে পুত্রে এবং তা থেকে তার পুত্রে এইভাবে বংশানুক্রমে বৈদিক শিক্ষাধারা সঞ্চালিত হত। এক কথায় তখনকার বিদ্যালয়গুলি পরিবারভিত্তিক ছিল। এর পরে অবশ্য বেদজ্ঞ ঋষি-শিক্ষকগণের কাছে বাইরের ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের জন্য সমবেত হতেন। গুরু শিক্ষাকামী ছাত্রদের মধ্যে অধিকার-ভেদের বিচার করতেন এবং 'ছাত্র' তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপযুক্ত অধিকারী বলে প্রমাণিত হলেই তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতেন। শিষ্য হিসাবে গৃহীত হবার পর শিক্ষার্থীকে গুরুপরিবারের একজন সদস্যরূপে বাস করতে হত বহিরাগত শিক্ষার্থীর সঙ্গেও গুরুর পিতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হত। গুরু শিক্ষার্থীর নিকট পিতাস্বরূপ ছিলেন এবং শিক্ষার্থীকে গুরু পুত্রবৎ গণ্য করতেন। ছাত্রকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অধীনে দিন কাটাতে হত এবং গুরুর প্রতি তার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হত। বর্ণাশ্রম ধর্মের চতুরাশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রম ছিল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য বলতে গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষাগ্রহণের কালকে বোঝাত এবং সমগ্র ছাত্রজীবনটাই শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে কাটাতে হত। কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে শিষ্যকে গুরুগৃহে নানাবিধ গৃহকর্মাদি করতে হত এবং অনেক সময় শিষ্যকে আহারের অন্ন ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করতে হত। সাধারণত অপরিচিত আগন্তুকদের নিকট ভিক্ষা চাওয়াই নিয়ম ছিল। কিন্তু প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী নিজের আত্মীয় স্বজন এমন কি গুরুগৃহে হতেও ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারত। এতেই বোঝা যায় যে, অসহায় পরান্নজীবী ভিক্ষুক তৈরী করার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলিত করা হয় নি। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের তিরস্কার, নির্লোভ করে তোলার জন্যই এই প্রস্তুতির নিয়ম ছিল। ছাত্ররা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে প্রথমে গুরুকে কি কি পেল জানাত এবং গুরুর অনুমতি পেয়ে মৌনাবস্থায় প্রশান্তচিত্তে লালসাহীন ভাবে নিজে অন্নগ্রহণ করত। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে গুরুর যতটুকু সম্মান প্রাপ্য তাও সুনির্দিষ্ট ছিল। শিষ্যকে গুরুর সব আদেশ পালন করতে হত। তবে যে হীন কার্যে জাতিচ্যুত হতে হয় সে জাতীয় হীনকার্য শিষ্য গুরুর আদেশেও করতে বাধ্য হত না। শিষ্য কোনক্রমেই গুরুর কথার প্রতিবাদ করত না ও সর্বদাই গুরুর আসন অপেক্ষা কোন নিম্নস্থানে উপবেশন করত। প্রত্যুষে শিষ্যকে গুরুর আগেই শয্যাত্যাগ করতে হত এবং রাত্রিতে গুরু নিদ্রিত হলে তবে সে শয্যাগ্রহণ করতে পারত। গুরু কোন কথা বললে শায়িত বা আসীন অবস্থায় থাকলে তাকে উঠে

দাঁড়াতে হত এবং গুরু ডাকা মাত্রই তাকে উপনীত হতে হত। গুরু দাঁড়িয়ে থাকলে শিষ্যকে আসন ছেড়ে দাঁড়াতে হত। গুরুর সঙ্গে চললে শিষ্যকে পিছনে থাকতে হত।

গুরুরও অবশ্য শিষ্যের প্রতি অবশ্য পালনীয় অনেকগুলি কর্তব্য ছিল। গুরু শিষ্যকে পুত্রতুল্য জ্ঞান করে তাকে অকাতরে নিজলব্ধ সব জ্ঞান দান করবেন এই ছিল বিধি। তিনি তার কাছে নিজের জ্ঞানের এককণাও কখনও গোপন রাখবেন না। কঠিন বিপদ ছাড়া শিষ্যকে তিনি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষকের স্থান ছিল সুউচ্চ এবং শিক্ষার্থী তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। বৈদিক যুগে গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক ভারতীয় শিক্ষা-ঐতিহ্যের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ঋষিদের উপলব্ধিজাত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিষ্য উপযুক্ত হলে গুরুর কাছ থেকে পেত। এইভাবেই পাওয়া আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শ্রোত্রিয়গণ সযত্নে রক্ষা করে তাঁদের পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিতেন। সে যুগের প্রতিটি ঋষি এবং শ্রোত্রিয়ই সে দিক দিয়ে এক একটি চলন্ত পুস্তকাগার ছিলেন এবং এই মূল্যবান বেদ-বিদ্যার সংরক্ষক ছিলেন। বেদ ও বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ প্রথমে ছিল এক একটি ঋষি-পরিবারের নিজস্ব সম্পদ বিশেষ এবং সেজন্য সেগুলিকে এক একটি ঋষিবংশের রিক্থরূপে গণ্য করা হত। পরে ঋষিকুলের এই সম্পদলাভের জন্য বহিরাগত শিক্ষার্থীরা আসতে লাগলেন এবং ঋষিকুলের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে সমগোত্রীয় হয়ে যেতেন। ক্রমে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেদ-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছিল। আদি বৈদিক যুগে ঋষিরা চারণকবিদের মতই বেদ-বিদ্যার প্রচার করতেন এবং তার ফলেই পরবর্তীকালে বেদ-বিদ্যার এত প্রসার হয়েছিল।

৩। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থা

আদি বৈদিকযুগের শিক্ষার পর আসে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার যুগ। এই যুগের শিক্ষার সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয় শিক্ষাব্যবস্থাই বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে গুরুত্ব ও বৈচিত্র্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা অনেক বেশী উন্নত ও সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার, শিক্ষণীয় বিষয়ের আয়তন বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবসম্পদের সমৃদ্ধির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাও অতিজটিল ও সুবিপুল হয়ে উঠেছিল। এই যুগে বর্ণভেদ প্রথা সুনির্দিষ্টভাবে

প্রচলিত হয়। বৃত্তির দিক দিয়ে জনসমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করা হয়। বৃত্তি থেকে সুরু করে সামাজিক মর্যাদা, কর্তব্য, শিক্ষাদীক্ষা সবই বিভিন্ন বর্ণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণই সব রকম সামাজিক অধিকার ভোগ করত। শূদ্ররা সমাজে সর্বনিম্নস্থানীয় ছিল এবং তাদের বেদশিক্ষার কোন অধিকার ছিল না।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

উচ্চ তিনটি বর্ণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত ছিল, যদিও নানা আচার অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কম ছিল না।

সংগঠন ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মানবজীবনকে আবার চারটি স্তরে ভাগ করা হত—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এর মধ্যে ব্রহ্মচর্য হল শিক্ষাগ্রহণের কাল। কঠিন আত্মসংযম, রিপুদমন, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাহায্যে অধ্যয়ন না করলে শিক্ষাগ্রহণ সার্থক হয় না। শিক্ষা বলতে বোঝাত আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিয়ে প্রস্তুতি। এই শিক্ষালাভের পথে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য সোপান ছিল।

শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপর সব দিক দিয়ে প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হত। শিক্ষা আরম্ভের দিন থেকে সুরু করে শিক্ষা সমাপ্তি পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে এগোতে হত। এই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হল।

বিদ্যারম্ভ

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুরু করা উপলক্ষ্যে প্রথম যে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হত তাকে বিদ্যারম্ভ বা অক্ষর-স্বীকরণম্ বলে অভিহিত করা হত। বালক শিক্ষার্থী পাঁচ বৎসরে পড়লেই এই অনুষ্ঠানটি পালিত হত এবং এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুর প্রথম অক্ষর পরিচয় ঘটত। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত হাতে-খড়ি প্রথাটির সঙ্গে এই প্রথাটি তুলনীয়। সর্ববর্ণের বালকদের ক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠানটি পালিত হত।

উপনয়ন

বিদ্যারম্ভ পর্ব পালিত হবার পরমস্তকমুণ্ডন পর্ব অথবা চূড়াকর্ম অনুষ্ঠিত হত এবং তারপরই উপনয়ন পর্ব অনুষ্ঠিত হত। এই পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উপনয়ন পর্বের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ ঘটত। ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের ক্ষেত্রেই উপনয়ন পর্বটি অনুষ্ঠিত হত, তবে বর্ণভেদে অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রথায় পালিত হত। স্মৃতিশাস্ত্রকারদের মধ্যে একমাত্র বদরায়ণই শূদ্রের উপনয়নের অধিকারের কথা বলে গিয়েছেন। সাধারণত ব্রাহ্মণ বালকদের ৮ বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয় বালকদের ১১ বৎসর বয়সে এবং বৈশ্য বালকদের ১২ বৎসর বয়সে উপনয়ন হত। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ার ফলেই উপনয়ন অনুষ্ঠানের বয়সেরও পার্থক্য হয়েছিল। নির্দিষ্ট বয়সে এই সব বর্ণের বালকদের উপনয়ন না হলে তারা সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য বা ব্রতভ্রষ্ট রূপে নিন্দিত হত। এই ব্যবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষাগ্রহণকে যথেষ্ট উচ্চ মূল্য দেওয়া হত এবং বিশেষ করে উচ্চ তিন বর্ণের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একপ্রকার অপরিহার্য বলে মনে করা হত।

উপনয়নকে নিছক একটি অনুষ্ঠানমাত্র মনে করলে তার প্রকৃত তাৎপর্যটি বোঝা যাবে না। এটা বিশ্বাস করা হত যে উপনয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়াটা হল শিশুর প্রথম জন্ম এবং সে জন্ম নিছক দৈহিক জন্ম। কিন্তু উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে সে আর একটি জন্ম লাভ করে। এই জন্মটি শিশুর আধ্যাত্মিক জন্ম। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর শিক্ষালাভের প্রারম্ভ পর্যন্ত ব্যক্তি যথার্থ মানুষ রূপে বিকশিত হয় না এবং উপনয়নের পর জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করা থেকেই তার প্রকৃত মনুষ্য জন্ম সুরু হয়। সেজন্য এই অনুষ্ঠানটির নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক প্রভাবের উপর এত জোর দেওয়া হয়েছে। উপনয়ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে (উপ+নী) উপনীত করা অর্থাৎ শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে আচার্যের কাছে উপস্থাপিত করা। শিক্ষার্থী বালককে আচার্যের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে শিক্ষাগ্রহণের উপযোগী করে তোলার জন্য ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করাই হল সত্যকারের উপনয়ন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। মনু বলেছেন যে শিক্ষার্থীর মাতা হচ্ছেন সাবিত্রী এবং আচার্য হচ্ছেন তার পিতা আর আচার্য তাকে তার দেহ অপেক্ষাও শ্রেয় সেই বেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এবং তার ফলে তার অন্তঃকরণ এবং আত্মা সুপরিণতি লাভ করবে। এই সাবিত্রীর মাধ্যমে আচার্য তাকে যে জ্ঞান দেবেন তা কাল এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাকে অমৃতময় করে তুলবে। অপস্তম্ব বলেছেন যে উপনয়নের ফলে যে দ্বিতীয় জন্ম হয় তা পিতা-মাতা কর্তৃক সৃষ্ট দেহের ভূমিষ্ঠ হওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কারণ তা নিছক দেহকে পাওয়া নয়, তাতে জ্ঞানকে লাভ করা

যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা সুউচ্চ ছিল এবং শিক্ষা যে মানুষকে সুসংস্কৃত করে তার আত্মিক উন্নতি ঘটায় এটা প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন।

শিক্ষার্থীর পোষাক, দণ্ড ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী

উপনয়নের সময় শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে কতকগুলি বাহ্যিক চিহ্ন ধারণ করতে হত। এই বাহ্যিক চিহ্নগুলির মধ্যে প্রথমে আসে পোষাক, তারপর আসে তার ব্যবহার্য অন্যান্য জিনিষপত্র। এগুলির ব্রহ্মচারীর জীবনের বিশেষ পরিচায়ক ছিল। যেমন ব্রহ্মচারী উত্তমাঙ্গের পোষাক হিসাবে অজিন অর্থাৎ কৃষ্ণসারমৃগচর্ম, কিংবা সাধারণ মৃগচর্ম ব্যবহার করত। সাধারণত ব্রাহ্মণ বালকেরা কৃষ্ণমৃগচর্ম, ক্ষত্রিয় বালকেরা রুরু মৃগের চর্ম এবং বৈশ্য বালকগণ অজচর্ম ব্যবহার করত। পারস্কর সকল বর্ণের জন্যই গোচর্মের ব্যবস্থা দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের অধমাঙ্গের বসনেরও বর্ণভেদে তারতম্য হত। ব্রাহ্মণ বালক শননির্মিত বস্ত্র, ক্ষত্রিয় বালক ক্ষৌমনির্মিত বস্ত্র এবং বৈশ্য বালক ছাগপশমনির্মিত বস্ত্র পরিধান করত। বর্ণভেদে এই বস্ত্রের রংয়েরও তারতম্য হত। ব্রাহ্মণ বালকের শুভ্র ও নির্মল কার্পাস বস্ত্র মঞ্জিষ্ঠার দ্বারা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হবে। ক্ষত্রিয় বালকের ক্ষৌম বস্ত্র হরিদ্রাবর্ণ হবে এবং বৈশ্যের বস্ত্র হবে কৌশেয়। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকে দণ্ডধারণও করতে হত এবং বর্ণভেদে এই দণ্ডের দৈর্ঘ্যের তারতম্য হত। দণ্ড নির্মাণের জন্য বিভিন্ন কাঠের ব্যবহার উল্লিখিত হয়েছে, যেমন বিল্ব, অশ্বত্থ, খদির ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের দণ্ড মস্তক পর্যন্ত পৌঁছবে, ক্ষত্রিয়ের কপাল পর্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্যন্ত। কিন্তু সকলের দণ্ডই ঋজু, সুন্দর এবং অ-ভীতিকর হবে। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের মেখলা অথবা কটি-বেষ্টনী ব্যবহারের রীতি ছিল এবং বর্ণভেদে তা বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত হত। ব্রাহ্মণরা মুঞ্জতৃণ, ক্ষত্রিয়েরা জ্যা এবং বৈশ্যরা এজন্য শন ব্যবহার করত। মেখলা তিনটি সূত্রদ্বারা নির্মিত হত এবং তাতে বোঝাত যে বালক ত্রিবেদ বেষ্টিত হয়ে রক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের এই সব বাহ্য চিহ্নের গূঢ় অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল। যেমন পারস্কর বলেছেন, শিক্ষার্থী দণ্ডধারী অথবা দণ্ডী হবে যাতে করে সে দীর্ঘজীবন পায় এবং পবিত্রতা দিব্যজ্যোতি লাভ করে। অপর এক স্মৃতিকার বলেছেন যে, সত্যপথের পথিক, সত্যের অনুসন্ধানকারী শিক্ষার্থীর দণ্ড সত্যপথ পরিক্রমণের সহায়ক। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর প্রধান বাহ্যচিহ্ন রূপে যজ্ঞোপবীতকে গণ্য করা হত। এই যজ্ঞোপবীত তিনগ্রন্থ বিভিন্ন

সূত্রের দ্বারা নির্মিত হত এবং সর্বসমেত এই নয়টি সূত্র নয়জন দেবতার প্রতীক রূপে পরিগণিত হত। ব্রাহ্মণ বালক কার্পাস নির্মিত, ক্ষত্রিয় বালক শন নির্মিত, বৈশ্যবালক ছাগচর্ম নির্মিত যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করত। মস্তকে কেশ রাখা সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মস্তকমুণ্ডন কিংবা খোঁপার মত করে চুলবাঁধা, কিংবা শুধুমাত্র মস্তকে একগোছা কেশ রাখা ইত্যাদি নানা নিয়মও ছিল।

প্রবেশ ও অভিষেক

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীকে নিজের নামধাম, বংশপরিচয়, শিক্ষা সম্বন্ধে তার অনুরাগ ইত্যাদি নিয়ে কতিপয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত এবং সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর তাকে দিতে হত। শিক্ষার্থীর প্রবেশলাভের ব্যাপারে কতিপয় বাধানিষেধও ছিল, যেমন কৌশলপরায়ণ, দুষ্ট-প্রকৃতি, প্রবলরিপুতাড়িত ব্যক্তিদের শিক্ষার্থী রূপে গ্রহণ করা হত না। প্রাথমিক প্রশ্নাদি সমাধা হবার পর শিক্ষার্থীকে মন্ত্রপাঠদ্বারা অভিষিক্ত করে দেবতাদের হস্তে ন্যস্ত করা হত এবং বর্ণভেদে এই অভিষেক প্রথারও তারতম্য ঘটত। যেমন ব্রাহ্মণের উচ্চজ্ঞান লাভের জন্য, ক্ষত্রিয়ের রাজগৌরবের জন্য এবং বৈশ্যের ধনদৌলতের জন্য দেবতাদের সহায়তা প্রার্থনা করা হত। দেবতাদের নিকট যে প্রার্থনা করা হত তা হতে সে যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্যও পরিস্ফুট হত এবং এই প্রার্থনাসমূহের মধ্যে দিয়ে মানব-জীবনের ধর্মীয় এবং সাংসারিক দুই আদর্শই অভিব্যক্ত হত। শিক্ষার্থীরা দেবতাদের নিকট অন্তর্দৃষ্টি, সন্তানাদি, দীপ্তি, শক্তি ও তেজের প্রার্থনা করত। দেখা গেছে যে একটি প্রার্থনায় শিক্ষার্থী দেবতাদের নিকট দীর্ঘজীবন, সন্তান, শক্তি, ঐশ্বর্যবৃদ্ধি, সকল বেদে পারঙ্গমতা, খ্যাতি এবং আনন্দের বাঞ্ছা করছে। এ সবের পর আর একটি অনুষ্ঠান পালিত হত। সেটিকে অশ্মারোহণ বলা হত। প্রার্থনাদির পর ব্রহ্মচারীকে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড় করানো হত এবং এটি ছিল তার দৃঢ়তার প্রতীক বা ব্যঞ্জক। শিক্ষাগ্রহণে তার নিষ্ঠা ও তার অপরাজেয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই অনুষ্ঠানটি পালিত হত। আচার্য কর্তৃক শিক্ষার্থীকে শিষ্যরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করার সময় যে কথা বলে তাকে গ্রহণ করতেন তা আচার্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। আচার্য বলতেন—'তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ের অঙ্গীভূত হোক; তোমার অন্তঃকরণ আমার অন্তঃকরণের অনুসারী হোক। তোমার নিষ্ঠা আমার প্রতি একাভিমুখী হোক। তোমার চিন্তা আমাকে আশ্রয় করুক এবং তোমার শ্রদ্ধা

আমার প্রতি সমর্পিত হোক।' এরপর শিক্ষার্থীকে তিনি কতকগুলি উপদেশ দিতেন, যেমন, 'জলগ্রহণ কর। কর্তব্যনিষ্ঠ হও। দিবাভাগে নিদ্রা পরিহার কর; গুরুভক্ত হও এবং একাগ্রচিত্তে বেদ পাঠ কর।' শিক্ষার্থী এর পর তিন দিন ধরে সাবিত্রী ব্রত পালন করত। এই সময় শিক্ষার্থীকে বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করতে হত এবং সে খাদ্য ভিক্ষার দ্বারা তাকে সংগ্রহ করতে হত। প্রথমে মাতার নিকট হতে পরে ভগিনীর নিকট হতে এবং শেষে মাতৃষ্বসা ও অন্য কোন মহিলার নিকট হতে ভিক্ষা করতে হত। সাবিত্রীব্রত অনেক সময় দীর্ঘকাল স্থায়ী হত এবং এই সময় শিক্ষার্থীকে বেদশিক্ষা দেওয়া হত না এবং তাকে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্, জগতী ইত্যাদি শেখান হত। সাবিত্রীব্রত শেষ হলে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত উপনয়নব্রতের সমাপ্তি ঘটত এবং তাকে বলা হত মেধাজনন। এই অনুষ্ঠানে দেবতাদের নিকট শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর মেধাবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হত।

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য

শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীদের মধু, মাংস, অম্লজাতীয় খাদ্য, সুগন্ধযুক্ত খাদ্য ইত্যাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং সাধারণত তারা আচার্য কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যের অংশমাত্র গ্রহণ করতে পারত। দিনের চতুর্থ, ষষ্ঠ অথবা অষ্টম দণ্ডে সে নিঃশব্দে লোভ পরিত্যাগ করে তৃপ্তির সঙ্গে প্রাপ্য খাদ্য গ্রহণ করবে এই ছিল নির্দেশ। খাদ্য হল প্রাণের পোষক, এইরূপ ধ্যান করে মনু খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন শিক্ষার্থীর তাই গ্রহণ করার নিয়ম ছিল। ভিক্ষার জন্য নির্গত হওয়া ব্রহ্মচারীর একটি প্রধান কর্তব্য ছিল এবং সকাল ও সন্ধ্যায় দিনে দুবার তাকে ভিক্ষায় বেরুতে হত। সপ্তাহে অন্তত একদিন শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী ভিক্ষার জন্য বহির্গত হবে এই নির্দেশ পাওয়া যায়। নিছক ভিক্ষার জন্য ভিক্ষা না করে এই ভিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর যে মানসিক শিক্ষালাভ হয় তারই যথার্থ মূল্য দেওয়া হত। সেজন্য মনু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষাসংগ্রহকে শিক্ষার্থীর পক্ষে চৌর্যবৃত্তি বলেছেন। শিক্ষার্থী নিজের জন্য ভিক্ষা করত না এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তু সে গুরুর নিকট সমর্পণ করত। ভিক্ষাব্রত শিক্ষার্থীকে আসক্তিহীন এবং নিরহঙ্কার হতে শেখাত এবং এইজন্যই এটিকে ব্রতরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হত। ভিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থীকে অরণ্য থেকে সমিধ্ সংগ্রহ, আগুন জ্বালান, জল তোলা, ঝাঁট দিয়ে ঘরদ্বার পরিষ্কার রাখা ইত্যাদিও করতে হত। পূজার জন্য ফুল সংগ্রহ প্রভৃতি কাজও তার করণীয় ছিল। ছাত্রের দৈনন্দিন জীবন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পরিচালিত

হত। তাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে গুরুর আগেই শয্যাত্যাগ করতে হত এবং স্নানাদি সেরে পবিত্র হতে হত। স্নানের পর পবিত্রস্থানে উপবেশন করে সে প্রভাত-কালীন উপাসনা করত। আকাশে যখন তারা থাকত তখন শিক্ষার্থীর উপাসনা সুরু হত এবং সূর্য উঠলে তার উপাসনা সাঙ্গ হত। সান্ধ্য উপাসনাও সূর্য আকাশে থাকতে থাকতে সুরু করে তারা উঠলে শেষ হত। এর পর তাকে যজ্ঞকুণ্ডে সমিধ অর্পণ করতে হত। ব্রহ্মচারীর পক্ষে সুগন্ধ দ্রব্য, মাল্য, দেহরঞ্জন, পাদুকা-ব্যবহার, ছত্রধারণ, যানব্যবহার, দিবানিদ্রা ইত্যাদির বর্জন অবশ্য কর্তব্য ছিল। শিক্ষার্থীর পক্ষে নাচগান, উৎসবাদিতে যোগদান, লোকের ভীড়ে যাওয়া প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া তাকে অলস গল্পগুজব, বৃথাতর্ক, পরস্পরের নিন্দাবাদ বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হত। শিক্ষার্থী যাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি রিপুর অধীন না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে উপদেশ দেওয়া হত। আচার্যকে মান্য করা সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম শিক্ষার্থীকে পালন করতে হত। যেমন প্রভাতকালীন প্রার্থনা শেষ হবার পর আচার্যসমীপে গেলে সে আচার্যের খুব নিকটে কিংবা খুব দূরে বসবে না এবং আচার্যের সামনে কখন জোড়াসন করে বসবে না। সে পাদুকা পরিধান করে কিংবা মস্তকাবৃত অবস্থায় কখনও আচার্যের সম্মুখীন হবে না। পাঠ গ্রহণের সময় শিক্ষার্থী আচার্যের ডানদিকে অবস্থান করবে এবং পূর্বমুখী কিংবা উত্তরমুখী হয়ে বসবে। শিক্ষার্থী তার পাঠে সর্বদা একাগ্রচিত্ত থাকবে এবং কখনও অন্যমনা হবে না।

শিক্ষার কাল

সাধারণত সমস্ত বেদ আয়ত্ত করার জন্য দ্বাদশবর্ষব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন হত এবং সেইজন্য সাধারণভাবে বার বৎসর শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকতে হত। যাদের পক্ষে এত দীর্ঘকাল শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হত না একটি বিশেষ সময় উত্তীর্ণ হলে তারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে পারত। যাঁরা আজীবন শিক্ষাগ্রহণ করতেন তাঁদের নৈষ্ঠিক বলে অভিহিত করা হত। বৎসরে পাঁচ মাস শিক্ষাকাজ চলত। শিক্ষাকালে অনেক ছুটিও থাকত। নানা কারণে পাঠকার্যে বিরতি দেওয়া হত এবং আবহাওয়া বিরূপ হলে কিংবা প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটলে শিক্ষাদান স্থগিত থাকত। তাছাড়া ধর্মানুষ্ঠান, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদিতে ছুটি থাকত। প্রাচীনকালের আচার্যগণ শিক্ষাদানকে ধর্মাচরণ বলে মনে করতেন এবং সেজন্য কোনরূপ অর্থগ্রহণ করা উচিত বলে মনে করতেন না। কোন শিক্ষার্থী

আচার্যরে নিকট শিক্ষার জন্য আগমন করলে আচার্য তাঁর পরিবারে নতুন একজন সভ্য এল বলে মনে করতেন। আচার্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপিত হত না। দুইজনেই মনে করতেন যে বিদ্যার চর্চা করে উভয়েই ঋষিদের ঋণশোধ করছেন। সেজন্য কোন আচার্য অর্থগ্রহণ করলে তিনি পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছেন বলে মনে করা হত এবং উপপাতক বলে নিন্দিত হতেন। কিন্তু উপাধ্যায় বলে অভিহিত একদল অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন। শিক্ষাশেষে অবশ্য গুরুকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শিষ্যের সাধ্যমত দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।

সমাবর্তন

সমাবর্তন উৎসবের দ্বারা শিক্ষার্থীর ছাত্রাবস্থার সমাপ্তি হত। সমাবর্তনের অর্থই হচ্ছে শিক্ষার্থীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই উৎসবে এমন কতকগুলি আচার পালিত হত যার দ্বারা শিক্ষার্থীর কঠোর ব্রহ্মচর্যের অবসান সূচিত হত। শিক্ষার্থীকে এই সময়ে প্রাতঃকালে গৃহে আবদ্ধ করে রাখা হত যাতে করে তার উজ্জ্বল দ্যুতি সূর্যের আলোককে ম্লান করে না দেয়। এরপর মধ্যাহ্নে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করে স্নান সমাপন করত, চন্দনাদি প্রলেপ ব্যবহার করত। তারপর ব্রহ্মচর্য কালের সমস্ত বাহ্য চিহ্ন, দণ্ড, উত্তমাঙ্গ-অধমাঙ্গের বস্ত্র জলে নিক্ষেপ করে নব-বস্ত্র পরিধান করত এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হত। এই ব্রহ্মচর্যাবস্থার অবসানে সে স্নাতক বলে অভিহিত হত। নতুন জীবনের চিহ্নস্বরূপ নববস্ত্র দুটি কর্ণাভরণ এবং সছিদ্র চন্দন কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহার করত। স্নাতক হোম করে প্রার্থনা করত যে সে নিজে যেন যে কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতে পারে। তারপর নববস্ত্র পরিধান করে রথে কিংবা হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে সে তার অঞ্চলের পণ্ডিতদের পরিষদে উপস্থিত হত এবং তার নিজের আচার্য তাকে পরিণত পণ্ডিতরূপে তাঁদের কাছে পরিচিত করতেন।

আচার্য ও উপাধ্যায়

প্রাচীনকালের শিক্ষকদের দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হত—আচার্য ও উপাধ্যায়। আচার্য শিক্ষার জন্য অর্থগ্রহণ করতেন না এবং সেজন্য তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে যোগ্যতার বিচার করে ছাত্র নির্বাচন করতেন এবং নির্বাচিত ছাত্র তাঁর গৃহে পুত্রবৎ পরিগণিত হয়ে বাস করত। এঁদের চেয়ে নিম্নস্তরের শিক্ষক উপাধ্যায়েরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে শিক্ষা দিতেন। সেজন্য নির্বাচনের এই কঠোরতা তাঁরা

অবলম্বন করতেন না এবং ছাত্ররাও তাঁদের গৃহে বাস করত না। উপাধ্যায়রা বেদ-বেদাঙ্গ কিংবা বেদের অংশবিশেষের শিক্ষাদান করতেন।

পরিষদ

আশ্রম শিক্ষালয় ছাড়া পরিষদ নামে আর এক শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। আচার্যগৃহ কিংবা উপাধ্যায় পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের পরিষদের এই পার্থক্য ছিল যে পরিষদগুলিতে ছাত্রদের সমাবেশ ছিল না, ছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রেই এই ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরিষদ ছিল এবং স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থঘটিত কোন তর্কসাপেক্ষ বিষয় উত্থিত হলে পরিষদগুলি তার মীমাংসা করত। কোন ব্যক্তি যদি শ্রুতি, স্মৃতি, শিষ্ট ইত্যাদির মীমাংসায় পৌছতে অক্ষম হত তাহলে সে তার মীমাংসার জন্য পরিষদের আশ্রয় নিত এবং সেজন্য এই সব পরিষদে যে শাস্ত্রাদিতে অতি পারঙ্গম ব্যক্তিদের সম্মেলন ঘটত তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। মীমাংসার ব্যাপারে পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল বলে পরিষদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং পরিষদই শাস্ত্রচর্চাকে যথার্থ পথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করত তা বলা চলতে পারে। এই পরিষদে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদেরও উপস্থিত হবার অধিকার ছিল এবং এই প্রথা থেকে সে সময়ে ছাত্রদের সমাদর ও মূল্যও যে যথেষ্ট ছিল তা বোঝা যায়। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় শিক্ষার্থীদের সংক্রান্ত কোন নিয়মের আলোচনায় এই ছাত্র প্রতিনিধিরা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিষদকে সরবরাহ করতে পারত।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার পদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল পদ্ধতির দিক দিয়ে। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ মৌখিক। এমন কি তাতে লিখন পদ্ধতিরও কোন সাহায্য নেওয়া হত না। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে লিখন প্রক্রিয়া একটা বড় স্থান জুড়ে আছে। প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা মনে করতেন যে বেদের শিক্ষা দানে কোনও বাহ্যিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, বেদের কোন আরম্ভ নেই। কুমারিলের মতে বেদ মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই বিদ্যমান আছে। বেদজ্ঞকে দেখে এবং তার সান্নিধ্যে থেকে বেদ শিক্ষা করে আর একজন বেদজ্ঞ হয়। আবার তাঁর কাছ থেকে বেদ শিখে আর একজন বেদজ্ঞ

হয়। এইভাবে এক গোষ্ঠী হতে আর এক গোষ্ঠীতে বেদ সঞ্চালিত হয়। এখানে লেখার কোন স্থান বা সার্থকতা নেই, মৌখিক প্রক্রিয়াই একমাত্র প্রক্রিয়া।

বেদ শিক্ষার যখন এইটি একমাত্র পদ্ধতি তখন প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় স্মৃতির অনুশীলনের প্রচুর মূল্য দেওয়া হত এবং স্মৃতি-প্রক্রিয়ার চর্চার সাহায্যে মনে রাখার বহু বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়।

বস্তুত আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আমরা যাকে অতিশিখন বলি প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় তারই বহুল পরিমাণে সাহায্য নেওয়া হত। বহুসংখ্যক শ্লোক এবং সূত্র প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই মনে রাখতে হত এবং তার জন্য বার বার করে পড়া এবং অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তির সাহায্য নিতে হত।

স্মৃতি ক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য বহু কৃত্রিম স্মৃতি-সহায়ক কৌশলের (Mnemonic devices) আবিষ্কার করা হয়েছিল। এই কৌশলগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্য বিষয়ের শব্দগুলিকে এমন ভাবে সাজানো যার দ্বারা অতি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে বিষয়বস্তুগুলিকে মনে রাখা সম্ভব হত।

ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা পদ্ধতির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর পরম যুক্তি-নির্ভরতা। যে তত্ত্ব শিক্ষার্থীকে শেখানো হত বা যে নীতি ও মতবাদ শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করতে বলা হত সেগুলি কোনমতেই বিনা প্রতিবাদে বা অন্ধভাবে তাকে শিখতে বা গ্রহণ করতে বলা হত না। যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করে এবং শিক্ষণীয় বিষয়টির যাথার্থ্য উপলব্ধি করেই শিক্ষার্থী সমস্ত তত্ত্ব বা মতবাদ গ্রহণ করত।

একমাত্র যোগশাস্ত্রেই শিক্ষাপদ্ধতি যুক্তি-নির্ভর ছিল না। সেখানে শিক্ষার্থীকে নিছক অনুকরণের উপর নির্ভর করে যোগের অনুশাসনগুলি অনুসরণ করতে বলা হত। কিন্তু যোগ ছাড়া আর সকল শিক্ষাব্যবস্থাতেই যুক্তি-নির্ভরতাকে সব চেয়ে আগে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

বস্তুত যুক্তিবাদিতা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপদ্ধতির একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের মধ্যে মতের ভেদ ও আদর্শের বিভিন্নতা প্রচুর পরিমাণে ছিল কিন্তু কারও উপর জোর করে নিজের মতামত চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা কোথাও দেখা যায় নি। যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজের মত বা তত্ত্ব সম্বন্ধে অপরকে বিশ্বাসী করার প্রচেষ্টাই সর্বত্র দেখা যেত। গুরুও কখন শিষ্যকে নিজের বিশ্বাস বা মতবাদ অন্ধভাবে গ্রহণ করতে বলতেন না। যুক্তির সাহায্যে তার সমর্থন প্রথমে আদায় করে পরে তাকে শিক্ষা দিতেন। এইজন্যই দেখা যায় যে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় তর্কবিতর্ক, আলোচনা, যুক্তির প্রদান ও খণ্ডন ইত্যাদি শিক্ষার বহুল

প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে গুরু শিষ্যকে কোন মত বা তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন। অনেক সময় শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে গুরু শিষ্যের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন এবং তার ফলে একদিকে যেমন শিষ্যের উপলব্ধি পরিষ্কার হত তেমনই তার জ্ঞানের পরীক্ষাও হয়ে যেত। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু যেখানে প্রধানত অমূর্তধর্মী সেখানে বিতর্ক, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর প্রভৃতিই মুখ্য পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। ইউরোপে মধ্য যুগে শিক্ষাব্যবস্থা যখন মূলত ধর্মযাজকদের হাতে গিয়ে পড়ে তখন সে সময়ের শিক্ষাপদ্ধতি বিতর্ক ও আলোচনার উপরই প্রধানত নির্ভরশীল ছিল।

এই বিতর্ক ও আলোচনার একটা বড় শিক্ষামূলক দিক ছিল। গুরু শিষ্যের হাতে সত্যকে সরাসরি তৈরী অবস্থায় তুলে দিতে পাবেন না। শিষ্যকে নিজে থেকে সত্য আবিষ্কার করে নিতে হবে। আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে শিষ্যকে গুরু সাহায্য করতেন পরস্পর-বিরোধী মত ও পথের মধ্যে থেকে সত্যকারের পথ ও মতটি আবিষ্কার করে নিতে।

মুখস্থ করা, তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি যদিও প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে ছিল তবুও এগুলি পরাজ্ঞান বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করার পদ্ধতি ছিল না। এগুলি নিছক জ্ঞান আহরণ, তত্ত্বের উপলব্ধি এবং বৈদিক সূত্রাদি আয়ত্ত করার পদ্ধতি মাত্র ছিল। এর উপরে উঠতে গেলে বা প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে হলে আরও উন্নত স্তরের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হত। এই পদ্ধতিটিকে তপস্ বা ধ্যান বলা হত। সমস্ত জ্ঞানলাভের পর ব্যক্তি যখন নিজের মনকে আত্মকেন্দ্রিক করতে পারে তখনই সে এই তপস্ বা ধ্যানের সাহায্যে পরাজ্ঞান লাভ করে। এইজন্য প্রকৃত জ্ঞানলাভের পদ্ধতিরূপে তিনটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন তপসেরই নামান্তর। শিক্ষার্থী প্রথমে গুরুর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান শুনবে। তারপর সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সে গভীর চিন্তা করবে। এইটি হল মনন। তারপরের সোপানে শিক্ষার্থী সেই লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানটি তার নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে তার অন্তরস্থ পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। বাহ্যিক জগৎ থেকে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে এনে সেগুলিকে অন্তর্মুখী করা এবং পূর্ণ একাগ্রচিত্তে নিজের অভ্যন্তরস্থ পরম সত্তাকে অনুভবের চেষ্টা করাই এই স্তরের লক্ষ্য।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হত এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও জীবনের লক্ষ্যকে একই বলে গণ্য করা হত। প্রাচীন ঋষিরা দৃশ্যমান জগতকে মায়া বা অলীক বলে মনে করতেন এবং এই পার্থিব জগতের উপরে বিদ্যমান এক আধ্যাত্মিক জগতকে সত্য বলে গ্রহণ করতেন। আজকে যে জড় জগতকে আমরা বাস্তব ও অর্থপূর্ণ বলে মনে করি এবং যাকে নিয়ে আমরা নানা দিক দিয়ে ব্যাপৃত হয়ে আছি সেই জড় জগতকেই প্রাচীন ভারতের দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদেরা অনিত্য, অসার এবং অকাম্য বলে মনে করতেন। আর যে আধ্যাত্মিক জগতকে আজ আমরা অবাস্তব কল্পনা-প্রসূত এবং অর্থহীন বলে মনে করি তাকেই তাঁরা চরম কাম্য এবং একমাত্র শ্রেয় বস্তু বলে মনে করতেন। রক্ত মাংসের এই ক্ষয়ধর্মী শরীর ধ্বংসশীল এবং দুঃখ-পীড়ার আগার হওয়াতে তা তাঁদের কাছে ছিল সব দিক দিয়ে পরিত্যাজ্য। কিন্তু আত্মা চিরস্থায়ী অবিনশ্বর এবং পরম সত্তার অংশ হওয়াতে তা তাঁদের কাছে একমাত্র নিত্য ও শাশ্বত বস্তু ছিল। দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু নেই। এ জগতের জীবন শেষ হলে পরবর্তী জগতের নতুন জীবনের সুরু হয়। ইহলোকের জীবন দুঃখ, ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতায় ভরা। কিন্তু পরলোকের জীবনে আছে অন্তহীন আনন্দ, তৃপ্তি এবং পূর্ণতা। অতএব এই সম্পূর্ণ দুঃখময় জীবনের পেছনে না ঘুরে পরিপূর্ণ আনন্দ ও শান্তির জীবন লাভের চেষ্টা করাই সব দিক দিয়ে বিজ্ঞতা। আজ যে মৃত্যুকে আমরা অবাঞ্ছিত এবং দুঃখকর বলে মনে করি সেই মৃত্যুই আমাদের কাছে পরম সুখের সোপান হয়ে দাঁড়াবে যদি আমরা সৃষ্টি রহস্যের সত্যটুকু পুরোপুরি জানতে পারি। অবশ্য সমগ্র সত্যটুকু না জেনে যদি কোন অর্ধসত্য বা গৌণসত্যকে জানা যায় তাহলে জীবন ও মৃত্যুর এই সব সমস্যা সম্পর্কে পরম জ্ঞান লাভ করা যাবে না।

এই সমগ্র সত্যকে জানতে হলে সর্বব্যাপী পরম সত্তাকে জানতে হবে এবং জানতে হবে যে সেই পরম সত্তা এবং ব্যক্তি নিজে মূলত অভিন্ন। ব্যক্তি যখনই এই সত্যটির উপলব্ধির মাধ্যমে সেই পরমসত্তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করে তুলতে পারবে তখনই সে এই জড়জগতের দুঃখ, জরা, ব্যাধি, ক্ষয় এবং ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ পাবে।

(প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে এই পরম জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। এই জ্ঞানকে তারা 'পরা জ্ঞান' নাম দিয়েছিলেন। পরা জ্ঞানের

অর্থ হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—যে জ্ঞান জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু পেতে সাহায্য করে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য হল মুক্তি বা মোক্ষ। (এই মর জগতের দুঃখ, শোক, জরা ব্যর্থতা প্রভৃতি থেকে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ পেয়ে চির শান্তি এবং আনন্দের জীবনকে পাওয়ারই নাম হল মুক্তি।) নিছক বিভিন্ন বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও তথ্য আহরণ প্রভৃতি জ্ঞানের পর্যায়ে পড়লেও তাকে পরাজ্ঞান বলা চলে না। (কেননা যে জ্ঞান ব্যক্তিকে মুক্তি বা মোক্ষ দিতে পারে না, সে জ্ঞানের নাম দেওয়া হয়েছে অপরা জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে এই পরা জ্ঞান লাভে সাহায্য করা।) বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন, শাস্ত্র পঠন, নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ প্রভৃতি শিক্ষার পাঠক্রমে স্থান পেলেও শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যের দিক দিয়ে সেগুলির স্থান গৌণ। পরা জ্ঞানলাভে এগুলি সাহায্য করে মাত্র। প্রকৃত পরাজ্ঞান লাভ করবার একমাত্র পন্থা হল ধ্যান বা মনন। এই ধ্যান বা মননের মাধ্যমে সৃষ্টি-সংক্রান্ত পরম সত্যের উপলব্ধি আমাদের মধ্যে দেখা দেয় এবং আমরা সেই পরমসত্তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারি। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষকেরা এইজন্য ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ করে মনোযোগ দিতেন। কেননা ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হলে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি নিজে নিজেই দেখা দেবে। প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা ব্যক্তির মৌলিক ধর্ম, তার বৃদ্ধি এবং বিকাশের নিহিত সম্ভাবনা, তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তার বিভিন্নমুখী আবেগ ও প্রক্ষোভের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার ক্ষমতা প্রভৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিকে বিচার করতেন। ব্যক্তির প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, প্রবণতা, আবেগ প্রভৃতির অন্তরালে যে প্রকৃত সত্তাটি লুকিয়ে থাকে সেই প্রকৃত ও স্বভাবিক সত্তাটিকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার কাজ। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় ব্যক্তির সত্তাকে একটি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করা হত না। তাকে অনাদি ও অন্তহীন পরম আনন্দ ও শান্তির আধার ও সর্বময় পরম সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হত। (আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে সেই পরমসত্তাকে জানতে এবং তার সঙ্গে ব্যক্তির নিজের অভিন্নতাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করাই ছিল শিক্ষার প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। এক কথায় প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক বিকাশ।)

সমালোচনা

আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে শিক্ষার এই লক্ষ্য যতই উন্নত হোক না কেন, ব্যক্তির নিজের দিক দিয়ে এই লক্ষ্য যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথমত, এই লক্ষ্যে ব্যক্তির পার্থিব অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ছাড়াও যে ব্যক্তির বাহ্যিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে জাত একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এ সত্যটি প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা একেবারেই স্বীকার করেন নি। ফলে একমাত্র যারাই এই উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পারত তাদের কাছেই শিক্ষার সার্থকতা ছিল। আর যারা ঐ আধ্যাত্মিক স্তরে ওঠার ক্ষমতা রাখত না তাদের কাছে এই উন্নত স্তরের শিক্ষার কোন মূল্যই ছিল না।

দ্বিতীয়ত, পার্থিব অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ফলে যে সব পার্থিব গুণাবলী নিয়ে ব্যক্তি জন্মাত সেগুলিও অবহেলিত থেকে যেত। শিল্প-সৃষ্টি, সাহিত্য-প্রতিভা, সৃজনীমূলক ক্ষমতা, অঙ্কন, অভিনয়, সঙ্গীত, প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষধর্মী প্রতিভাগুলির বিকাশের কোন আয়োজন ছিল না।

তৃতীয়ত, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা ছিল ব্যক্তিমুখী। ফলে সে সময় সামাজিক সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে উঠেছিল এবং শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। গোষ্ঠিপ্রীতি, সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি যে সব গুণ যৌথ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সেগুলি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যশিক্ষায় বিকাশলাভ করতে পারে নি।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অবদান

আধুনিক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় অনেক দিক দিয়ে প্রগতিশীল ও কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ প্রগতিশীল এবং আজও সেগুলি অনুকরণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

প্রথমত, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হত। বিশ্বাস করা হত যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্মেষণ নির্ভর করে তার পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর। সেইজন্য ব্যক্তির বিকাশ যাতে কোন দিক দিয়েই বা কোন বাহ্যিক কারণের জন্য ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে যত্ন নেওয়া হত। আধুনিক যুগের শিক্ষাতেও ব্যক্তির বিকাশকেই সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল ব্যক্তিমুখী। আধুনিক যুগের মত শ্রেণীগত পঠনের ব্যবস্থা তখনও ছিল না। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গুরু এককভাবে শিক্ষা দিতেন এবং তার সামর্থ্য, প্রয়োজন, চাহিদা প্রভৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করে তাঁর

শিক্ষণ পদ্ধতিকে অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করতেন। এর ফলে প্রাচীন শিক্ষণ পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে উঠতে পেরেছিল। যদিও সে সময় একাধিক শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে পড়ানোর প্রথা প্রচলিত ছিল তবু পদ্ধতিটি পুরোপুরি ব্যক্তিমুখী ছিল। আধুনিক যুগের মত শ্রেণীগত পঠনের ব্যবস্থা তখন ছিল না। আজকাল শিক্ষাবিদেরা শ্রেণীপঠনের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সব দেশেই ব্যক্তিমুখী শিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। ডাল্টন-প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান, উইনেটকা প্ল্যান প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতিগুলি এই ব্যক্তিমুখী শিক্ষণ পদ্ধতিরই বিশেষ বিশেষ রূপমাত্র। প্রাচীন বৈদিকযুগের শিক্ষণ পদ্ধতি পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিকই ছিল।

তৃতীয়ত, প্রাচীন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা আবাসিকধর্মী ছিল। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণের সম্পূর্ণ কালটি গুরুগৃহে কাটাতে হত। আধুনিক কালের মত ডে স্কুল প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ এবিষয়ে একমত যে শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর শিক্ষায়তনেই থাকা সব দিক দিয়ে বিধেয়। তার দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। প্রাচীনকালে গুরুর নিকট-সংস্পর্শে বাস করে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সুষম বিকাশ ঘটতে পারত। আধুনিক যুগেও বিদ্যায়তনগুলিকে আবাসিক করার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

চতুর্থত, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় গুরু শিষ্যের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও প্রীতিপূর্ণ ছিল। শিক্ষার দান এবং গ্রহণকে উভয়েই পবিত্র কাজ বলে মনে করতেন এবং অধ্যাপনাকে নিছক অর্থকরী বৃত্তিরূপে শিক্ষকেরা গ্রহণ করেন নি। তার ফলে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার একদিকে ছিল স্নেহ ও সহানুভূতি, অপরদিকে ছিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আধুনিক কালে শিক্ষায় অর্থকরিতা প্রবেশ করায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কৃত্রিম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে শ্রেণীপঠন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতেই পারেন না।

পঞ্চমত, প্রাচীন শিক্ষায় নিছক জ্ঞানলাভের চেয়ে সুচরিত্র গঠন ও মানসিক উন্নয়নের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হত। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় জীবন সম্পর্কে একটা আদর্শ মূল্যায়নকে বড় করে ধরা হত এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। বর্তমানে শিক্ষায় এই আদর্শবোধ না থাকার ফলে শিক্ষা যান্ত্রিক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে।

ষষ্ঠত, প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রকৃতির সঙ্গে গভীর ও অন্তরঙ্গ সংযোগের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হত। তার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষমভাবে সম্পন্ন হতে

পারত। আধুনিক বিদ্যায়তনগুলি ইঁট কাঠের বাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে প্রাচীন যুগের আশ্রম শিক্ষার অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the major features of ancient Brahminic Education. What were its merits and demerits ?

2. Discuss the aims, methods and pattern of ancient Brahminic Education.

3. Discuss the general features of Brahminic education and state what characteristics of the system should be incorporated in our modern education.

4. Write notes on :—

Upanayana, Samavartana, Acharya, Upacharya, Parishad. Pupil-teacher relation in ancient education.

তিন

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের মাটিতে কোন নতুন বা বিজাতীয় বস্তু নয়। বরং প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থারই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। একই জননীর দুই কন্যার মত এই দুটি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর ঐক্য দেখা যাবে। হিন্দু দর্শন ও চিন্তাধারাকে ভিত্তি করেই বৌদ্ধ দর্শন ও চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ম্যাক্সমুলারের মতে বৌদ্ধধর্মকে কোন নতুন ধর্ম বলা চলে না। মানবজীবনের দার্শনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি দিকগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের মনের স্বাভাবিক পরিণতিই বৌদ্ধধর্মের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধ নিজেই ছিলেন সেই সময়কার ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বৌদ্ধ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার সঙ্গে তুলনা

হিন্দুধর্মের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে ক্রিয়াবহুলতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোরতা প্রবেশ করতে লাগল তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপে একটা বিপ্লবী চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। এই চিন্তাধারা পরে বৌদ্ধধর্মের রূপ নিয়ে নতুন একটি মতবাদের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে খুব বেশী দূর সরে যেতে পারে নি। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয় ধর্মেরই সংগঠন একই মৌলিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুধর্ম অবিনশ্বর অক্ষয় আত্মায় বিশ্বাসী, বৌদ্ধধর্মও তাই। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই দেহকে দুঃখশোকের আগার বলে মনে করে থাকে। উভয়েই বিভিন্ন জন্মের মধ্যে দিয়ে এক দেহ থেকে আর দেহে আত্মার দুঃখময় ভ্রমণের তত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং উভয়েই এই মত পোষণ করে যে এই দেহের কারাগার থেকে মুক্তিলাভই আত্মার একমাত্র কাম্য।

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়ের মতেই জন্মান্তরের মূলে আছে আমাদের পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি। এই আসক্তির ফলে আমরা এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে ঘুরে বেড়াই এবং এই আসক্তিই আমাদের সমস্ত দুঃখ বেদনার মূল। কর্মফলবাদেও বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম উভয়েই সমানভাবে বিশ্বাসী।

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েরই মতে এই পার্থিব দুঃখময় জন্মচক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুধর্মে যাকে মুক্তি বা মোক্ষ বলা হয়, বৌদ্ধধর্মে তাকে নির্বাণ বলা হয়। এই নির্বাণের সংব্যাখ্যানেই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য দেখা যায়। এই প্রধান বৈষম্যটির কথা ছেড়ে দিলে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম দুয়েব ভিত্তি, সংগঠন ও উদ্দেশ্য প্রায় একই বলা চলে।

দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়ে হিন্দুধর্মেব সঙ্গে যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রচুর মিল আছে তেমনই উভয় ধর্মের শিক্ষাব্যবস্থাও অনেক দিক দিয়ে সমধর্মী। উভয়েরই শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মমূলক ভাবধারাব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থায় জীবনকে চারটি স্তর বা আশ্রমে ভাগ করা হয়েছে, যথা, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। পরমকাম্য মুক্তির দিকে শিক্ষার্থী এই চারটি আশ্রমের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। তবে মুক্তিতে পৌঁছতে সত্যকার সাহায্য করবে সন্ন্যাস আশ্রমটি, আর তিনটি আশ্রম তার প্রস্তুতির সোপান মাত্র। বৌদ্ধধর্মে কিন্তু প্রথম তিনটি আশ্রমকে একেবারে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র চতুর্থ আশ্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে আশ্রম বলতে একটিই—সন্ন্যাস। বৌদ্ধ-শিক্ষার্থী সন্ন্যাসীরূপেই শিক্ষা-জীবন সুরু করে এবং সন্ন্যাসী রূপেই তার শিক্ষাজীবন সে শেষ করে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার এখানে বিরাট একটা পার্থক্য থাকলেও, এ পার্থক্য প্রকৃতিগত কোনও বৈষম্যের পরিচায়ক নয়। কেননা, লক্ষ্যের দিক দিয়ে উভয়েরই মধ্যে কোন সত্যকারের পার্থক্য নেই। বরং যা হিন্দুধর্মে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই আজন্ম সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শটি বৌদ্ধধর্ম পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে এবং তাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করেছে।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মস্ত একটা পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা বেদ-শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং বৌদ্ধ শিক্ষকেরাও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মত অনিবার্যভাবে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তা ছাড়া হিন্দুব শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র উচ্চ ত্রিবর্ণের ব্যক্তিরাই শিক্ষালাভের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন বর্ণ বা স্তরের জন্য বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি, বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষেরই শিক্ষায় সমানাধিকার ছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার সকলেরই ছিল। শ্রমণ হওয়াকেই জন্মজন্মান্তর চক্র থেকে নির্বাণ-লাভের শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে স্বীকার করা হত। বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রধাণত সঙ্ঘসদ্ধ ভাবে বৌদ্ধ বিহার বা মঠে বাস করতেন এবং সেইগুলিই বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সংসার-

বিমুখতা, আজীবন কৌমার্য ও সন্ন্যাসজীবনই বৌদ্ধদের কাছে আদর্শস্থানীয় ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের বিহার ও সঙ্ঘারামকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই সব সংঘে প্রবেশের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার ব্যাপারে তেমন কোন কঠিন নিয়ম-কানুন ছিল না। বিশেষ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্রীতদাস, ধনী, রাজকর্মচারী, দস্যুতাপরাধী, কারাগার-পলাতক ব্যক্তি, নপুংসক ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তি ছাড়া যে কোন লোকেরই সঙ্ঘারামে প্রবেশ করার অধিকার ছিল। নাবালক কোন শিক্ষার্থী সংঘে প্রবেশ করতে চাইলে তার পিতামাতার অনুমতি নিতে হত।

প্রব্রজ্যা

এই সঙ্ঘে প্রবেশের নিয়মাবলী বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থ বিনয় ত্রিপিটকে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্ঘে প্রবেশপ্রার্থীকে প্রথমে কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করতে হত এবং তারপর তাকে হরিদ্রা রংয়ের বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করতে হত। সে সেই উত্তরীয়ের দ্বারা একদিকের স্কন্ধ আবৃত ও অন্যদিকের স্কন্ধ অনাবৃত রাখত। বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদান অভিলাষী শিক্ষার্থীকে গৃহ পরিত্যাগ করে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বার হতে হত। গুরুর সন্ধান লাভের পর শিক্ষার্থী বিনয়সহকারে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করত এবং যোগদানে সমর্থ বলে বিবেচিত হলে তাকে উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি মানতে হত। সঙ্ঘে গৃহীত হবার প্রথম অনুষ্ঠানের পর প্রবেশপ্রার্থীকে সঙ্ঘের ভিক্ষুকদের পদবন্দনা করে পদ্মাসনে বসে যুক্তকরে বলতে হত—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। এটি ত্রিশরণ নামে পরিচিত। সঙ্ঘে প্রবেশের প্রথম স্তরকে বলা হত প্রব্রজ্যা গ্রহণ এবং আট বৎসর বয়সের কম কোন বালককে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে দেওয়া হত না। এই প্রথম প্রবেশানুষ্ঠান সমাপ্ত হলে শিক্ষার্থী বৌদ্ধ শ্রমণরূপে পরিচিত হত।

উপসম্পদা

এই প্রথম প্রবেশের পর পূর্ণ প্রবেশের জন্যও অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল। কোন শিক্ষার্থী যখন শ্রমণ জীবন অতিবাহিত করার পর পূর্ণ ভিক্ষুত্ব লাভ করত, তখন সে উপসম্পদা লাভ করেছে বলা হত এবং কুড়ি বৎসরের আগে কেউ উপসম্পদা লাভ করতে পারত না। শ্রমণ ও ভিক্ষু প্রকাশ্য সভায়

উপস্থিত হয়ে প্রশ্নাদির যথার্থ উত্তরদানে উপাধ্যায়কে তুষ্ট করতে পারলেই উপাধ্যায় শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা দান করতেন। উপসম্পদা লাভ করবার পর আরও দশ বৎসর কাটালে শিক্ষার্থী উপাধ্যায় হতে পারত। মঠে প্রবেশের পূর্বে গোড়ার দিকে যে চারমাস ধরে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করা হত, সেই পরীক্ষার কাল পরিবাস বলে পরিচিত ছিল। মঠাশ্রয়ী বৌদ্ধ ভিক্ষু সদ্ধিবিহারক বলেও অভিহিত হতেন।

শীল পালন

বৌদ্ধ ধর্মে শীলের পালন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এবং মঠাশ্রয়ী শ্রমণ ও ভিক্ষুকদের দশটি শীল পালন করতে হত। সাধারণ বৌদ্ধদের পাঁচটি শীল পালন করলেই চলত কিন্তু ভিক্ষুকে অবধারিত ভাবে দশটি শীলেরই চর্চা করতে হত—(১) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিও না। (২) প্রাণহরণ করিও না। (৩) মিথ্যা ভাষণ করিও না। (৪) মত্ততাকর পানীয় গ্রহণ করিও না। (৫) ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিও না। (৬) নৃত্যগীত করিও না। (৭) মালা-চন্দন-সুগন্ধি ব্যবহার করিও না। (৮) কোমল বিলাসশয্যায় এবং উচ্চ শয্যায় শয়ন করিও না। (৯) স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি গ্রহণ করিও না। (১০) বৈকালে আহার করিও না। প্রথম পাচটি শীল সকল বৌদ্ধেরই পালনীয় ছিল কিন্তু শেষের পাচটি শীল বিশেষভাবে ভিক্ষুদের পালন করতে হত। এছাড়া যিনি সদ্ধিবিহারক তাঁকে আরও বারোটি বিশেষ অনুজ্ঞা পালন করতে হত। উপরোক্ত শীলগুলি একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাবে যে বৌদ্ধসঙ্ঘের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে বিলাসবিহীন, উপকরণবিহীন জীবনযাপনই আদর্শ ছিল।

বিহারের শৃঙ্খলা

বৌদ্ধবিহারবাসী ভিক্ষু জীবনের আদর্শ ছিল ব্রহ্মচর্য পালন ও স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য বরণ এবং ভিক্ষুরা এই সব বিষয়ে নির্দেশসমূহ কঠোর ভাবে পালন করতেন। মঠে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ ছিল, কোন রকম শপথ গ্রহণ না করেই ভিক্ষুরা তা মেনে চলতেন। তরুণ ভিক্ষুরা প্রবীণ ভিক্ষুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। মঠবাসী ভিক্ষু কোন ব্রত ভঙ্গ করলে তার বিচারের জন্য অন্যূন দশজন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত একটি সংসদ ছিল এবং প্রয়োজন হলে এই সংসদ গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধী ভিক্ষুকে মঠ থেকে বহিষ্কৃত করে দিতে পারত। বৌদ্ধদের প্রাতিমোক্ষ

নামে একটি গ্রন্থ আছে এবং সেই গ্রন্থে মঠবাসীরা কোন্ কোন্ অবাঞ্ছিত কর্ম থেকে বিরত থাকবে তা বর্ণিত আছে। প্রতি মাসে দুবার যখন এই প্রতিমোক্ষ মঠে পঠিত হত, সেই সময় কোন ভিক্ষু অপরাধ করে থাকলে তা তিনি স্বীকার করতেন এবং সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট পন্থায় প্রায়শ্চিত্ত করতেন। গুরুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন বৌদ্ধ শিক্ষার মত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাতেও অবশ্য করণীয় ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষা শিষ্যকে গুরুর সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করতে উপদেশ দিত। বৌদ্ধশিক্ষায় কিন্তু গুরুর সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজন ছিল না বরং গুরুর কোন অন্যায় কাজ দেখলে শিক্ষার্থী শ্রমণ তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতেন। মঠবাসীদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ ভিক্ষু তাঁদেরও ভিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হলেও প্রধানত তরুণ শিক্ষার্থী শ্রমণগণ সঙ্ঘারামের যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলি করত। পক্ষান্তরে প্রবীণ ভিক্ষুগণ প্রধানত ধ্যান-ধারণা, দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এই প্রচার কাযের জন্য বৎসরের কয়েকটি মাস তাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতেন এবং বর্ষাকালে তা স্থগিত রেখে কোন মঠে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভিক্ষুগণের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট মঠে বাস করার বিধি ছিল না এবং তাঁরা স্থায়ীভাবে কোন মঠে বাসও করতেন না। যে কোন ভিক্ষুর প্রয়োজন মত যে কোন মঠে বাস করার অধিকার ছিল।

সঙ্ঘে প্রবেশ-বিধি

বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদানের অভিপ্রায়ে শিক্ষার্থীকে গৃহত্যাগ করে উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করতে হত এবং গুরুর সন্ধান পেলে শিক্ষার্থী তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিনয়-সহকারে সঙ্ঘে যোগদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করতেন। সঙ্ঘে যোগদান করার পর শিক্ষার্থী কোন প্রধান ভিক্ষুকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করত এবং তাঁর উত্তরীয় ধারণ করে তাঁকে প্রণাম করে বলত, 'প্রভু আপনি আমার উপাধ্যায় হোন।' এই ব্যাপারে প্রধান ভিক্ষু সম্মতি প্রদান করলে উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হত এবং ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাধারার মতনই প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী এই সম্পর্ক অতি মধুর এবং পিতা-পুত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হত। বিদ্যার্থী শ্রমণ সঙ্ঘে প্রবেশ করার পর দশদিন, ক্ষেত্রবিশেষে একমাস ধরে, 'উপাসক' রূপে থাকতেন এবং এই সময় তাঁকে পঞ্চশীল-পালনের উপদেশ দেওয়া হত। এই উপাসকের জীবন সমাপ্ত হলে

হতেন এবং সঙ্ঘ তাঁকে গ্রহণ করলে তাঁর শিক্ষক সঙ্ঘাচার্যগণকে প্রাথমিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করতেন। সঙ্ঘে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীকে শ্রমণ অবস্থায় বিশ বৎসরকাল সঙ্ঘে কাটাতে হত এবং সদ্ধিবিহারক বা শ্রমণের এই ছিল প্রকৃত অধ্যয়ন কাল। শ্রমণ-জীবনের সমাপ্তিতে সঙ্ঘাচার্য কর্তৃক শিক্ষার্থী শ্রমণ উপসম্পন্ন ভিক্ষু রূপে বরিত হতেন এবং এই দিনটি তাঁর জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন বলে গণ্য হত।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধ

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মতই গুরুসেবা বিদ্যার্থীর অবশ্য কর্তব্য ছিল এবং ইৎ-সিঙের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে শিক্ষকের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা বিদ্যার্থীকেই করতে হত। এমন কি তাঁর শয়ন-প্রকোষ্ঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব বিদ্যার্থীর উপরই ন্যস্ত থাকত। গুরুসেবা ও অধ্যয়নের জন্য প্রতিদিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় বিদ্যার্থী গুরুর সমীপবর্তী হতেন। গুরুও অবশ্য শিষ্যের সকল প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন এবং পীড়িত শিষ্যের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা তিনিই করতেন। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে এমন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। বৌদ্ধ শিক্ষার্থী গুরুর স্বভাব, চরিত্র ও আচরণের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং কোনরূপে তাঁর স্খলন ও পতন দেখলে তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতেন। গুরু ভ্রান্তপথে গেলে শিষ্য তাঁকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করত এবং গুরুর কোনরূপ গুরুতর স্খলন হলে শিষ্য তা সঙ্ঘকে জানিয়ে গুরুর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করত। সঙ্ঘ গুরুর কঠোর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করলে শিষ্য আবেদন করে তা লঘু করার চেষ্টা করত এবং প্রায়শ্চিত্তের শেষে গুরু যাতে সঙ্ঘে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেইজন্যও শিষ্য সচেষ্ট হত।

শিক্ষকের শ্রেণীবিভাগ

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শিক্ষকের উল্লেখ পাওয়া যায়—উপাধ্যায় ও কর্মাচার্য। উপাধ্যায়ের কর্তব্য ছিল শিক্ষার্থীকে বিদ্যাদান করা এবং কর্মাচার্যের কর্তব্য ছিল শিক্ষার্থীকে বিনয়-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষার্থী শ্রমণকে এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকদেরই সেবা করতে হত। উপাধ্যায় ও কর্মাচার্যগণ সারা জীবন ধরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন এবং তাঁরা কঠোর ব্রহ্মচর্য জীবন কাটাতেন বলে বিদ্যাদানের কাজে তাঁদের কোন

বিঘ্ন দেখা দিত না। তাছাড়া তাঁদের প্রয়োজনও এত সামান্য ছিল যে কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ তাঁদের সহজে ঘটতো না।

ইৎ-সিঙের বর্ণনানুসারে শিক্ষার্থীদের ষষ্ঠ বর্ষ থেকে বিদ্যারম্ভ হত এবং প্রথম দিকে শব্দবিদ্যা বা ব্যাকরণের উপর বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হত। পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টমবর্ষ হতে পড়ান শুরু হত। দশম বর্ষে ব্যাকরণের অধ্যাপনা আরও গভীরভাবে করা হত। পঞ্চদশ বর্ষেও পাণিনির ব্যাকরণের অধ্যাপনা চলত এবং তার সঙ্গে পতঞ্জলির মহাভাষ্য, হেতুবিদ্যা, অভিধর্ম প্রভৃতি পড়ানো হত। শিক্ষার্থী শ্রমণগণ এ ছাড়াও বিশেষ করে বিনয়সূত্র ও বৌদ্ধদর্শনাদি অধ্যয়ন করতেন। উচ্চ বিদ্যালাভেচ্ছু ছাত্রগণ নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারে প্রবেশ করে উন্নত পাঠক্রম অধ্যয়ন করতেন।

বৌদ্ধশিক্ষার উদ্দেশ্য

প্রধানত শিক্ষার্থী শ্রমণদের ধর্মাচরণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থেকেই বৌদ্ধ শিক্ষাধারা উদ্ভূত হয় এবং মঠবাসী শ্রমণদের ধর্মাচরণ ও মঠজীবনের নিয়ম ও আচরণ শিক্ষা দেওয়াই বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার আদি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এটি ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার বাহ্যিক উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ও প্রকৃত লক্ষ্য ছিল অজ্ঞতার নিরসন করে শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্বাণ লাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার এই উদ্দেশ্য বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক মতবাদ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়—বৌদ্ধধর্মে এই চারটি আর্য সত্য নামে অভিহিত হয় এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং দ্বাদশ বর্ষ সাধনার পর এই সম্বন্ধে বোধি বা প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হন। এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভের ফলে তিনি দুঃখের কারণ ও তার উপশমের উপায়-নির্ধারণে সমর্থ হয়েছিলেন। বুদ্ধের জীবনের যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়গুলি দেখা দিয়েছিল সেই অধ্যায়গুলির আদর্শে সঙ্ঘ-জীবনের সংগঠনটি পরিকল্পিত হয়েছিল। সঙ্ঘভুক্ত প্রতিটি শ্রমণের জীবনে যেন মহাভিনিষ্ক্রমণ, কৃচ্ছ্রতাবরণ ও কঠোর তপস্যা—বুদ্ধের জীবনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটত। গৃহত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগদান বা প্রব্রজ্যা, কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে শ্রমণের জীবন যাপন এবং সর্বশেষে বোধিজ্ঞান লাভ করে উপসম্পদা পাওয়া এই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি স্তর। উপসম্পন্ন ভিক্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শ্রমণ-জীবনের চরম কাম্য বলে বিবেচনা করত। ব্রাহ্মণ্যধর্মের চতুরাশ্রমের সঙ্গে সঙ্ঘভুক্ত শিক্ষার্থীর জীবনের এই অধ্যায়গুলির

প্রচুর মৌলিক মিল আছে। কারণ চতুরাশ্রমে গার্হস্থ্যের স্থান থাকলেও ব্রহ্মচর্য তার অবধারিত পূর্বগামী সোপান ছিল এবং জীবনের শেষ উদ্দেশ্য ছিল বানপ্রস্থ এবং যতির মধ্যে দিয়ে মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা। এই শেষ স্তরটির সঙ্গে উপসম্পন্ন ভিক্ষুর অর্হত্ব প্রাপ্তির তুলনা করা চলে। ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা উভয়েরই সাধনা সমগ্র জীবনব্যাপী ছিল এবং উভয়েরই আদর্শ ছিল জীবদেহ থেকে মুক্তি পাওয়া। অবশ্য সঙ্ঘশিক্ষাই বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার বিশিষ্ট অবদান এবং মহাপরিনির্বাণের পূর্বে প্রিয় শিষ্য আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছিলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে বৌদ্ধসঙ্ঘই শিক্ষার্থী শ্রমণদের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে।

লৌকিক শিক্ষা

যে দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যুকে এড়ান ইহজীবনে সম্ভব নয় ও যার মূলে রয়েছে মানুষের কামনা-বাসনা জাত অজ্ঞতা ও অবিদ্যা, তার নিরসন করে পরম নির্বাণ লাভই বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষার প্রধান বিষয় বস্তু ছিল। ফলে জাগতিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ স্থান না পেলেও, বৌদ্ধরা লোকহিতব্রতী ছিলেন বলেই কালক্রমে লৌকিক শিক্ষাও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রয়োজনের চাপেই বৌদ্ধ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা চিকিৎসা বিদ্যা, ভেষজ রসায়ন, স্থাপত্য বিদ্যাদির চর্চা করেছিলেন এবং ঐ বিদ্যাগুলির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি-সাধনেও সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের হীনযান শাখায় সাধারণ শিক্ষা ও লৌকিক শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করা হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত হয়ে পড়ার পর বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা নানা রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রমে নানা বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা ছাড়াও অন্যান্য নানা লৌকিক বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা যখন ধীরে ধীরে বহুমুখী হয়ে ওঠে তখন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রভাবেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ নানা বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুযায়ী বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মৌখিক প্রথায় শেখান ও লিখিত গ্রন্থের সাহায্যে শেখান দু'রকম রীতিরই প্রচলন ছিল। পাঞ্জাবে মৌখিক ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলে লিখিত লিপির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কণ্ঠস্থ করা ও আবৃত্তি করা এই দু'টিই শিক্ষার প্রধান পদ্ধতি ছিল এবং প্রতিদিন অধীত বিদ্যার পুনরালোচনা হত এবং তারপর নূতন জ্ঞান আহরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের কাজ অগ্রসর হত। হিউয়েনসাংয়ের বিবরণী থেকে বোঝা যায় যে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন খুব উচ্চস্তরে হই

ছিল এবং সেখানে নানা শাস্ত্র, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং প্রত্যেক বৌদ্ধসঙ্ঘের সঙ্গে দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় সংযুক্ত হতে সুরু করে—বহির্বিভাগীয় সঙ্ঘ বিদ্যালয় ও আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যালয়। বহির্বিভাগীয় সঙ্ঘ বিদ্যালয় ছিল জনসাধারণের জন্য এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও অনেকে সেখানে পাঠ গ্রহণ করতে পারত। আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘ বিদ্যালয় ছিল শুধু সঙ্ঘভুক্ত শ্রমণদের জন্য। ইৎ-সিঙও দুই শ্রেণীর ছাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। একশ্রেণীর ছাত্ররা বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগদানের অভিপ্রায়ে সর্বদা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে নিযুক্ত থাকতেন ও অন্য শ্রেণীর ছাত্ররা ব্যবহারিক জীবনের সুবিধার জন্য শুধুমাত্র লৌকিক বিষয়সমূহ অধ্যয়নে রত থাকতেন। এঁদের পক্ষে প্রব্রজ্যা গ্রহণের রীতি ছিল না এবং সঙ্ঘের কাছ থেকে তাঁরা ভরণপোষণ বা অর্থসাহায্য পেতেন না।

শরীরচর্চা

দেহকে অযথা কষ্ট দেওয়াকে বুদ্ধদেব পছন্দ করতেন না বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সুস্থ দেহের প্রয়োজনীয়তা বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত হয়েছিল ও সেজন্য ভিক্ষুদের মধ্যে ব্যায়ামের দ্বারা শরীর সুস্থ রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষায় নারীর স্থান

বৌদ্ধপ্রথায় ও জীবনদর্শনে নারীকে নির্বাণলাভের প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হত। কথিত আছে ধর্মমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও প্রধান শিষ্য আনন্দ এই দু'জনের আগ্রহাতিশয্যে বুদ্ধদেব অনিচ্ছা ও সন্দেহের সঙ্গে গৃহ ও সংসার পরিত্যাগকারিণী স্ত্রীলোককে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিষ্যাদের জন্য যে সব নিয়ম ও অনুশাসনের প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি ও নৈতিকবোধ সম্বন্ধে যে ধারণা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্যান্য নিয়মানুশাসনে দেখা যায় যে ভিক্ষুবর্গ কর্তৃক নির্দিষ্ট না হলে ভিক্ষুণীরা কোন কিছুই স্বাধীনভাবে করতে পারতেন না। তাছাড়া ভিক্ষুণীর প্রাক্‌দীক্ষা পরীক্ষার কালও ছিল দীর্ঘ দুবছর। এই সময়ের শেষে ভিক্ষুণীকে দীক্ষা দেবার প্রস্তাব ভিক্ষু সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ উভয় কর্তৃক গৃহীত হতে হবে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পারস্পরিক মেলামেশার কোন সুযোগই ছিল না। তাদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকতে হত। সঙ্ঘ কর্তৃক নির্বাচিত একজন ভিক্ষু মাসে দুবার

অন্য এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুণীদের নীতি শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। দৈনন্দিন জীবনের নিয়মানুশাসন ও কর্তব্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়ের ক্ষেত্রে একই ছিল তবে একক জীবনযাপন ভিক্ষুণীর পক্ষে একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল পরে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের পতনের সময় ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে পৃথক জীবন যাপনের কঠোর নিয়ম শিথিল হয়ে যায় এবং তার ফলে বৌদ্ধসঙ্ঘগুলি দুর্নীতিতে কলুষিত হয়ে ওঠে।

ভিক্ষুণীদের উপর এইসব কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে ভিক্ষুণীরা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অধিকতর জড়িত হয়ে পড়েন। এই কারণেই বহু ভিক্ষুণী সে সময়কার সমাজজীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছিলেন।

সঙ্ঘে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তাঁদের শিক্ষার ভার সঙ্ঘই বহন করত এবং অন্যান্য ভিক্ষুর ন্যায় ভিক্ষুণীগণও আজীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে বিনয়-ব্যবহার ও ধর্মচর্চায় কাল অতিবাহিত করতেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পেরেছিল।

বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রভাব

সঙ্ঘের প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মে ও জীবনে অপরিসীম ছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে যেমন ধর্ম ও নীতি অপেক্ষা সংঘই ছিল প্রধান শক্তি, তেমনই বৌদ্ধধর্মের পতনের মূলে সঙ্ঘই ছিল প্রধানতম কারণ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদান-কারী ভিক্ষুদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোন কিছুই থাকতে পারত না বটে কিন্তু সঙ্ঘের নিজস্ব প্রচুর সম্পত্তি থাকত এবং এই সম্পত্তি থেকেই সঙ্ঘবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় ভরণপোষণ চলত। সঙ্ঘে প্রবেশের ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধা নিষেধও ছিল না। সঙ্ঘজীবনের সংগঠন ও পরিচালনায় কঠোর তপশ্চযার অবকাশ খুব বেশী ছিল না। কিন্তু সঙ্ঘবাসীদের ক্ষেত্রে জীবনযাপনের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছিল যেমন, সঙ্ঘবাসারা পরিচ্ছন্ন বেশবাস পরিধান করবে, দেহ পরিষ্কার রাখবে ও নিয়মিত আহার করবে। বর্ষাকালে যথোপযুক্ত আশ্রয়, দ্বিপ্রাহরিক তাপের সময় বিশ্রাম ও অসুস্থতার সময় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা— এ সবেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এমন সুখকর আয়োজন যে সঙ্ঘে ছিল সেখানে যে বহু অবাঞ্ছিত অযোগ্য ও ধর্মোদ্দেশ্যবিহীন ব্যক্তির সমাবেশ ঘটবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাছাড়া কালক্রমে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সঙ্ঘব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল না এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকেও বিপন্ন-

করে তুলেছিল। যেমন বৌদ্ধপ্রথায় গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ও শিষ্যের উপর গুরুর নিয়ন্ত্রণ ব্রাহ্মণ্যপ্রথার মত গভীর বা আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেনি। বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবীণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ভিক্ষুরা কিছু বিশেষ সম্মান ও সুযোগসুবিধা পেতেন বটে কিন্তু সাধারণভাবে ভিক্ষুদের মধ্যে অন্য কোন প্রকারের স্তর বা পর্যায়জনিত বিভাগ প্রচলিত ছিল না। সঙ্ঘে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে সঙ্ঘবাসী নবীন ও প্রবীণ সকল ভিক্ষুককেই সভায় আহ্বান করা হত এবং সেই সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হত। এই সভায় প্রত্যেকেরই মত প্রকাশ ও ভোট দেবার সমান অধিকার ছিল। এক কথায় বলতে গেলে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা ছিল অনেকটা রাজতন্ত্রের মত আর বৌদ্ধ ব্যবস্থা ছিল বহুলাংশে গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন। সঙ্ঘের কায পরিচালনার ব্যাপারে বহুসংখ্যক কর্মী ও সচিব ছিলেন ঠিকই কিন্তু সেখানে কোন স্তর, পর্যায় বা উচ্চনীচের প্রশ্ন ছিল না। আবার, সঙ্ঘজীবনের বহিরঙ্গের ব্যাপার, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার সকলের হাতে থাকত বলে কারও কোন প্রভুত্বমূলক প্রভাব ছিল না। বুদ্ধদেব যখন জীবিত ছিলেন ও সঙ্ঘের নেতারূপে সঙ্ঘপরিচালনা করতেন তখন তিনিই সঙ্ঘগুলির কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে কাজ করতেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই বিভিন্ন সঙ্ঘগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার মত কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা তখন আর থাকল না। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অভাবে স্থানীয় সঙ্ঘগুলি পরস্পরবিরোধী নীতি অনুসরণ করতে সুরু করল এবং শীঘ্রই তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিল। ফলে যখন বিভিন্ন ধর্মসভায় সঙ্ঘজীবনের বিতর্কমূলক ব্যাপারগুলি ও নিয়মানুশাসনের প্রশ্ন নিয়ে কথা উঠত বা কোনরূপ মতবৈষম্যের সৃষ্টি হত তখন সেই সব বিরোধ-বিভেদের মীমাংসা করার মত সর্বজনগ্রাহ্য সমন্বয়নকারী কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না।

বৌদ্ধশিক্ষার প্রসার

বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন ভিক্ষুব্রতী শ্রমণগণ ছাড়াও বহু সাধারণ লোক সঙ্ঘারামে সত্যানুসন্ধান ও শিক্ষা-লাভের জন্য যেত। বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হওয়ার পর বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থাও খুব প্রসার লাভ করেছিল ও সময়ানুক্রম বিচার করলে দেখা যাবে যে, সম্রাট অশোকের সময় থেকে বাংলার পাল নৃপতিবৃন্দের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার ও বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির বহুল প্রচার হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মমতের উদারতা বৃদ্ধি পাওয়াতে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থাও নিজেকে

যুগোপযোগী করে নিয়েছিল। তাছাড়া মহাযান মতে শুধু নিজের নয় সর্বপ্রাণীর নির্বাণলাভই বুদ্ধদেবের কাম্য ছিল। যখন এই মহাযান মতবাদ প্রসার লাভ করে তখন বৌদ্ধধর্মে যথেষ্ট উদারতা দেখা দেয় এবং তার ফলে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা এই সময় আরও বিস্তারলাভ করে।

বৌদ্ধশিক্ষার অবদান

উপসংহারে বলা চলে যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ভারতে লুপ্ত হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় ও জীবনাদর্শের উপর তা প্রভূত প্রভাব রেখে গিয়েছে। তবে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতখানি তা বিচারের বিষয়। অনুমান করা কঠিন নয় যে বৌদ্ধ শিক্ষাসূচীর পরিসর বৃহৎ ছিল না এবং অনেকাংশে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাসূচীরই অনুরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ্যশিক্ষায় বেদের স্থান ছিল, বৌদ্ধ শিক্ষায় বেদের পরিবর্তে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সেই স্থানই পেয়েছিল। দার্শনিক বিষয় ছাড়া বৌদ্ধদের প্রধান আকর্ষণ ছিল চিকিৎসা ও ন্যায়শাস্ত্র। এ দুয়েরই উপর নানা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দিঙ্‌নাগের নাম স্মরণীয়। বৌদ্ধ শিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিনব বা চিরস্থায়ী কোন অবদান বৌদ্ধশিক্ষা রেখে যেতে পারেনি। তবে শিক্ষা-পরিকল্পনার দিক দিয়ে বৌদ্ধ শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। বৌদ্ধধর্ম যে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতিভেদ অনুসারে বর্ণবিশেষের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্বসাধারণের নিকট বৃহত্তর শিক্ষার দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল নির্বাচিত মুষ্টিমেয়ের অধিকার। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই শিক্ষাকে সর্বজনীন অধিকারের সামগ্রী করে তোলা হয়েছিল। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৌদ্ধ শিক্ষকরাই ভারতে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার মধ্যে তুলনা

বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতিরই ক্রমবিকাশের পথে একটা স্তর বিশেষ। উভয়ে একই মাতার দুইটি কন্যার মত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-শিক্ষাব্যবস্থা এ দুইই পূর্বপ্রচলিত হিন্দু চিন্তা ও জীবন ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ছিল।

আত্মা, দুঃখ, মোক্ষ, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম, জন্মান্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা উভয়

ধর্মেই প্রায় একরূপ ছিল। নিরবচ্ছিন্ন পুনর্জন্মধারা থেকে মুক্তি পাবার যে উপায় বৌদ্ধধর্ম নির্দেশ করে থাকে, তা ব্রাহ্মণ্য চিন্তায় নতুন কিছু নয়।

ধর্মসঙ্ঘ স্থাপনের প্রথাও একমাত্র বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য বা ভারতীয় ধর্মজীবনে বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ দান একথাও বলা যায় না। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—বর্ণাশ্রম পদ্ধতির শেষের এই আশ্রমদ্বয় বৌদ্ধ সন্ন্যাস প্রব্রজ্যা পরিকল্পনা থেকে তত্ত্বগতভাবে একেবারেই পৃথক নয়। তাছাড়া উভয় ধর্মে দীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারেও কোন পার্থক্য নেই। বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্য নির্দিষ্ট দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক সংযমের যে সব বিধান আছে তা হিন্দুদের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অনুশাসনগুলির বহুলাংশে অনুরূপ। বস্তুত ভিক্ষুদের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রহ্মচর্যের সমস্ত বিধানই বৌদ্ধ ধর্মে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ভিক্ষুবৃত্তি উভয় শিক্ষাব্যবস্থারই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বৌদ্ধ শ্রমণজীবনের মত ব্রহ্মচর্যেরও একটা অবশ্য পালনীয় প্রথা হল ভিক্ষা। এ ছাড়া ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাপদ্ধতি, আহার, উপবেশন, নিদ্রা, মুণ্ডন, মাল্য-গন্ধ-তৈল প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কিত হিন্দুধর্মে প্রচলিত সমস্ত বিধিই বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হয়েছিল। এমন কি বৌদ্ধদের মূলনীতি অহিংসাবাদও হিন্দুধর্মেরই সম্পদ।

উভয় ব্যবস্থাতেই ছাত্রশিক্ষকের পবিত্র সম্পর্ক ও গুরুকে সেবার উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাস করার যে প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে বৌদ্ধরা তাও গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি সন্ন্যাসিনীর প্রথাও বৌদ্ধধর্মের নতুন পরিকল্পনা নয়।

বৌদ্ধদের সমাজ-আদর্শকে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ্য সমাজ-আদর্শ থেকে পৃথক বলে মনে করেন। অনেকেরই বিশ্বাস হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই মতের সমর্থকরা কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্যটিকে অনুধাবন করেন নি। বুদ্ধ জনগণের বাহ্যিক উন্নতি বা নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অগ্রসর হয়েছিলেন—এমন কিছু ভাবা সঙ্গত হবে না। জাতিভেদ প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করার কোন উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তিনি কোন নতুন পন্থারও নির্দেশ দেন নি। মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনকে ঘিরেই তাঁর সমস্ত সমস্যা, চিন্তা ও মতবাদ সৃষ্ট হয়েছিল।

এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় ধর্মের মধ্যে কোন মূলগত দ্বন্দ্ব বা সংঘাত কল্পনা করা যায় না। তবে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম অপেক্ষা অনেক সঙ্কুচিত ক্ষেত্র ও সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ সুরু করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে প্রধানত গার্হস্থ্যধর্মী ছিল। শিক্ষকের গৃহই ছিল বিদ্যায়তন—নবীন ছাত্ররা নিজেদের গৃহ ছেড়ে শিক্ষকের গৃহে বিদ্যার্জন করতে আসত। শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহপরিবেশের বহুমুখী প্রভাব হয়ে উঠত অনিবার্য। অবশ্য এ গৃহ ছাত্রের গুরুগৃহ, তার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম স্ফুরণ-স্থল। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহের স্থান অধিকার করেছিল সঙ্ঘ। প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে তার গৃহ-সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করেই শিক্ষার সুরু করতে হত। গৃহভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় একজন মাত্র শিক্ষকই শিক্ষা দিতেন। তাই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় বৃহৎ বিদ্যায়তনের সৃষ্টি ঘটে ওঠা সম্ভব হয় না। কিন্তু বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় প্রতিটি শিক্ষকসংস্থা এক একটি বৃহৎ সঙ্ঘ পরিচালনা করছেন। গুরুগৃহে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকায় ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় শিক্ষায়তনগুলি বহু ছাত্রের সমবায়ে এই ধরনের বহুমুখী ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হয়ে ওঠে নি। শিল্পক্ষেত্রে যেমন ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের প্রত্যেকেরই গুণ ও ত্রুটি থাকে শিক্ষার ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিক্ষায়তনেরও তেমনি নিজের নিজের গুণ ও ত্রুটি দেখা যায়।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভেদও রয়েছে। বৌদ্ধরা বেদের অপৌরুষেয়তা, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিভেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধশিক্ষা বেদানুগ নয় এবং শিক্ষক যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই হতে পারেন বৌদ্ধরা তা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ-শিক্ষায় শিক্ষকত্ব অর্জন করার অধিকার সকলেরই ছিল, ফলে বৌদ্ধশিক্ষার একটা সর্বজনীন রূপ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা জনসমাজের অংশবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল প্রধানত গৃহভিত্তিক। শিক্ষকের গৃহই ছিল শিক্ষায়তন। বৌদ্ধ পদ্ধতিতে গৃহের স্থান ছিল না—বিহারই হল শিক্ষায়তন। ব্রাহ্মণ্য প্রথায় শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু বৌদ্ধব্যবস্থায় সংযুক্ত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বৃহৎ বৃহৎ শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল। ফলে সেখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্ক ব্রাহ্মণ্য প্রথার মত স্বাভাবিক ও আন্তরিক হয়ে ওঠে নি। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপ্রথা হল রাজতন্ত্রের মত আর বৌদ্ধ শিক্ষাপ্রথা গণতান্ত্রিক। সঙ্ঘের প্রস্তাবাবলী সঙ্ঘের সকল সদস্য কর্তৃক আলোচিত ও গৃহীত হত। এখানে প্রত্যেকেরই ছিল সমান অধিকার। একবার বুদ্ধদেব বলেছিলেন—'যতদিন পৃথিবীর সকলে দিব্যজীবন লাভ না করছে ততদিন আমি নির্বাণ লাভ করব না।'

সহস্র সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধদেবের এই সর্বমানবীয় আদর্শ পৃথিবীর সর্বত্র বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বহু বিদেশী এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম ক্রমে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছিল।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the salient features of the Buddhist Education system in India.

2. Institute a comparison between the Brahminic and Buddhist systems of education of ancient India.

3. Write notes on: Prabajja, Upasampada, Shramana, Bihar, Upacharya.

4. Comment on.

    (a) Pupil-Teacher relation in ancient Buddhist Education.
    (b) Discipline of the Buddhist pupils.
    (c) Women's education in the Buddhist system.
    (d) Popular education in the Buddhist system.

চার

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও বৌদ্ধশিক্ষার ব্যাপক অনুশীলনের জন্য বহু শিক্ষা কেন্দ্র গঠিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলি এত সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল যে বিংশশতাব্দীর আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেগুলির অনেক দিক দিয়ে তুলনা করা যায়। কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রের বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

ক। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় যে সমস্ত সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কালজয়ী খ্যাতি ও বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রান্তবর্তী তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনতম। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত ছিল এর ব্যাপ্তি কাল।

বিবরণ

রাজনৈতিক পরিচয়ের দিক দিয়ে ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। কিন্তু তক্ষশীলার প্রকৃত গৌরব হল তার বিশ্ববিদ্যালয়। উপনিষদ থেকেও তক্ষশীলা বিদ্যাকেন্দ্রের খ্যাতির কথা জানতে পারা যায়। তারপর মহাভারত ও বৌদ্ধজাতকে এই বিদ্যাকেন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তক্ষশীলা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে ও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। পরে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানে বৌদ্ধ বিষয়ক নানা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে।

তক্ষশীলার কৃতি ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত চিকিৎসক ও বুদ্ধদেবের অনুচর জীবক, বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি ও প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য বা চাণক্যের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই মহামানবত্রয় যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী। সুদীর্ঘ চারশতাব্দীকাল অক্ষুণ্ণ গৌরবের সঙ্গে বিরাজ করে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ইতিহাসে নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি, [illegible]

ব্যয়ভার

প্রাচীনকালে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত তক্ষশীলায় ধনী ও রাজাদের দানে অর্থস্বাচ্ছল্যের অভাব ছিল না। রাজা বা শ্রেষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় এককালীন একসহস্র মুদ্রা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হত। এ অর্থ ছাত্রদের আহার ও বেশবাস ইত্যাদির জন্যই ব্যয় করা হত। অধ্যাপকেরা নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন না। বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যে সমস্ত ছাত্ররা সমবেত হত তারা ব্যয়নির্বাহের জন্য স্ব স্ব রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ পেত। যে সব ছাত্র দিনে অধ্যাপকদের সেবা করত ও রাত্রে পাঠগ্রহণ করত তাদের কোন অর্থ দিতে হত না। পাণিনির ব্যাকরণ, বৌদ্ধজাতক, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে তক্ষশীলার সর্বভারতীয় খ্যাতির আকর্ষণে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ছাত্ররা বিদ্যার্জনের আশায় তক্ষশিলায় সমবেত হত। পাণিনি ও কৌটিল্যের বর্ণনায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি উচ্চবর্ণের সন্তানেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবার অধিকার লাভ করত। জাতকের তথ্যানুযায়ী রাজগৃহের রাজপুত্ররাও এখানে শিক্ষালাভ করতে আসত।

প্রবেশাধিকার

ষোল বৎসর বয়স না হলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। তক্ষশিলা ছিল উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপকমণ্ডলী

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের উল্লেখ আমরা করেছি কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কৃতী অধ্যাপকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত সমষ্টিগত শিক্ষাদান পদ্ধতির ঐতিহ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিশীলতার মূলে ছিল। পাণিনির বর্ণনায় দেখা যায় অধ্যাপকদের গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত। কৌটিল্যের গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে দেখা যায় যে বিভিন্ন অধ্যাপকেরা বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, যেমন শিষ্ট নামধারী অধ্যাপকেরা ছিলেন ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত, দণ্ডনীতিক নামধারী অধ্যাপকেরা ছিলেন রাজনীতিতে পণ্ডিত। পাণিনি আচার্যা উপাধ্যায়া প্রভৃতি নামের দ্বারা সম্ভবত নারী অধ্যাপকদেরই বুঝিয়েছেন।

পাঠক্রম

শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যা গ্রহণ করাই ছিল নিয়ম। অযোগ্য ছাত্রকে তক্ষশিলার

অধ্যাপকেরা বিদায় করে দিতেন। পাণিনি এদের তীর্থকাক ইত্যাদি কটু বিশেষণে ভূষিত করেছেন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা অধ্যাপনা করার পদ্ধতি এখানে প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করেন যে প্রাচীন যুগের এই পদ্ধতিই পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় 'সর্দার পোড়ো' প্রথা রূপে দেখা দিয়েছিল। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধুমাত্র ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত বিদ্যারও অনুশীলন এখানে হত বলে অনুমান করা হয়েছে।[৮] অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে রাজপুত্ররা এখানে ষোল বছর পর্যন্ত 'শিষ্ট' উপাধিধারী পণ্ডিতদের কাছে বেদ ও বিভিন্ন দর্শন শিক্ষা করতেন ও ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ রাজপুরুষদের কাছ থেকে কৃষি, বাণিজ্য, রাজধর্ম, পশুপালন প্রভৃতি বিদ্যা লাভ করতেন। এ ছাড়া তাঁদের দিনের বিভিন্ন সময়ে সমর-বিদ্যা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করতে হত। পাণিনি পাঠে জানা যায় যে এখানে ব্রাহ্মণরা যজন ও অভিনেতারা অভিনয়বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধজাতক প্রভৃতি সূত্রে জানা যায়, যানা-নির্মাণ, হিসাব নির্ণয়, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও স্থাপত্যশিক্ষাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চিকিৎসাবিদ্যাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। জীবক এখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্যই আগমন করেছিলেন। প্রাচীন তক্ষশিলায় যে বিপুল শিল্পকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তা দেখে পণ্ডিতরা বলেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এখানে তক্ষণশিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। এই শিল্পচর্চার সঙ্গে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক।

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ব্যাপক পাঠ্যতালিকা দেখা যায় তাতে এটিকে যে কোন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অধ্যাপকদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ছিল ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়োজনানুগ। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শোনা যায়, মগধের কোন এক রাজপুত্র না কি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন।

শিক্ষার পাঠক্রম নিরূপণে শিক্ষার্থীর জাতি পরিচয় বিশেষ কাজ করত বলে মনে হয় না। জানা যায় যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ব্রাহ্মণ ছাত্র ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতিতে আবৃত্তি ও উপলব্ধি উভয়েরই সমান

মর্যাদা ছিল। ছাত্ররা আবৃত্তির দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ অভ্যাস করত আর অধ্যাপকেরা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের সেগুলি উপলব্ধি করতে সাহায্য করতেন। বারবার আবৃত্তি ও উপলব্ধির সঙ্গে মূল বক্তব্য বিষয়ে নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ ছিল জ্ঞানার্জনের উপায়।

পরীক্ষা

তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধীত বিষয়ের উপর পরীক্ষা দিতে হত বলে জানা যায়। আবৃত্তি ও উপলব্ধি উভয়ই ছিল পরীক্ষার অঙ্গ। প্রশ্ন করে ছাত্রের উপলব্ধ জ্ঞানের পরিমাপ করা হত। চিকিৎসাবিদ্যার পরীক্ষায় ছাত্রের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিমাপের জন্য তাকে নানারকম প্রশ্ন করা হত। জীবককে এই রকম বহু প্রশ্ন করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

শিক্ষার ইতিহাসে ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার অবদান অনস্বীকার্য। দূর দূরান্তর থেকে ছাত্রেরা জ্ঞানার্জনের আশায় দীর্ঘকাল ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে শিক্ষার মান এখানে আদর্শস্থানীয় ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় সে সময় যেভাবে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক বিদ্যালোচনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। জীবনের সকলপ্রকার প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ছাত্রদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার যে পদ্ধতি তক্ষশিলা গ্রহণ করেছিল তা বর্তমান কালের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

খ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে শিক্ষা, গৌরব, আয়তন ও খ্যাতিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে নালন্দা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন, ধর্মচর্চা ও শিক্ষাদানের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এমন কি চীন, কোরিয়া, তিব্বত, মধ্যএশিয়া, সিংহল প্রভৃতি ভারতের বাইরের বহুদেশ থেকে দলে দলে ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতে আসত। কালক্রমে নালন্দা প্রকৃত পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান

বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় পাটনা সহরের চল্লিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে প্রাচীন রাজগৃহ (বর্তমান রাজগীর) নগরের সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামক গ্রামের কাছে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননকার্যের ফলে যে সব

সুবিশাল সৌধ, স্তূপ, জলাশয়, পথঘাট প্রভৃতির অবশেষ পাওয়া গেছে তাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশালত্ব, সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক উপাদান

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ রচনা করতে গেলে ভারতীয় ও বিদেশী উভয় জাতীয় তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তিব্বতীয় বিবরণ ও চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ ও ইৎ-সিঙএর রচনা। তাছাড়া ভারতীয় তথ্য পাওয়া যায় সমসাময়িক রাজাদের শিলালিপি, শীলমোহরের উৎকীর্ণ লিপি ও হিন্দু এবং বৌদ্ধদের রচিত নানা গ্রন্থ থেকে।

নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

নালন্দা এই নামকরণ সম্পর্কে দুটি জনশ্রুতি আছে। নাগানন্দ সরোবর থেকে নাকি এর নাম হয় নালন্দা। অপর জনশ্রুতি মতে বুদ্ধদেব নাকি এখানে অবিশ্রান্ত দান করেন এবং ন—অলম্—দা অর্থাৎ অফুরন্ত দাতা—এই নাম থেকেই নালন্দা নামের উৎপত্তি।

কথিত আছে বুদ্ধদেব নাকি এখানে এক সময় কিছুকাল বাস করেছিলেন। এ-ছাড়া বুদ্ধ শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্গলায়নের নামও নালন্দার সঙ্গে জড়িত। এই কারণে নালন্দা বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থান বলে সহজেই পরিগণিত হয়েছিল এবং এখানে একটি সঙ্ঘারাম গড়ে ওঠে। কালক্রমে এই সঙ্ঘারাম থেকে মহাবিহারের উৎপত্তি হয়েছিল। তবে অনেকে অনুমান করেন যে প্রাক্ বৌদ্ধযুগের নালন্দা ধর্মকেন্দ্র-রূপেই উদ্ভূত হয়েছিল।

সম্রাট অশোক এখানে সারিপুত্তের চৈত্যে পূজা দিয়েছিলেন ও একটি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত সম্রাট অশোকের আহুত তৃতীয় বৌদ্ধ মহা-সঙ্গতির ফলে এখানে সংস্কৃত স্থবিরবাদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে নালন্দা মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রখ্যাত হয়ে ওঠে। এখানে মহাযান বৌদ্ধভাবধারা প্রচলিত থাকলেও হীনযান মতবাদের আলোচনা ও চর্চাও হত। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারনাথের মতানুসারে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বিখ্যাত নাগার্জুনের নেতৃত্বে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নালন্দা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসেন কিন্তু তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে নালন্দার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এর পর

থেকেই নালন্দা বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ৬২৯ থেকে খ্রীষ্টীয় ৬৪৫ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করে হিউয়েন-সাঙ্ নালন্দার সমৃদ্ধির বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। বস্তুত পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী নালন্দার জীবনে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। এই সময় নালন্দা ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের কাছে অপর্যাপ্ত দান লাভ করেছে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রুত সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে।

তিব্বতীয় বিবরণানুসারে নালন্দার সুবৃহৎ উপনিবেশ ধর্মগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। উচ্চ ইঁটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ধর্মগঞ্জে ছয়টি মঠে মহাবিদ্যালয় ছিল। সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে প্রথমেই দেখা যেত বৃহৎ কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়টির অঙ্গন। এর চতুর্দিকে ছিল আটটি কক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তিনটি বৃহৎ প্রাসাদে অবস্থিত। এর মধ্যে রত্নোদধি নামে প্রাসাদটি ছিল নয়তলা। এই প্রাসাদে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত থাকত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ প্রাঙ্গনের ধারে ধারে ভিক্ষু ও উপাধ্যায়দের বাসগৃহ ছিল। তাঁরা আটটি বৃহৎ ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বসবাস করতেন। খননকার্যের ফলে এই সব কক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ভিক্ষুদের শয়নের জন্য থাকত পাথরের বেদী। এই কক্ষগুলিতে একজন বা দুজন ভিক্ষু বাস করতেন। কক্ষগুলি বিভিন্ন প্রকারের হত। সাধারণ ভিক্ষুদের জন্য বাসকক্ষ ছিল এক প্রকারের আর উচ্চশ্রেণীর ভিক্ষুদের জন্য বাসকক্ষ ছিল অন্য প্রকারের। দেওয়ালের গায়ে দুটি কুলুঙ্গি থাকত—একটা পুঁথি-পত্র আর একটা প্রদীপ রাখবার জন্য।

ব্যয়ভার

পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দানে নালন্দার ব্যয়ভার নির্বাহিত হত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্তূপ ও সৌধ এই পৃষ্ঠপোষকেরা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষক রাজগণ কর্তৃক উৎসর্গীকৃত তিনশ গ্রাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হত। পাঠরত ছাত্রদের এখানে বিনাব্যয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ দেওয়া হত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সব ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন বলে জানা যায়। হিউয়েন-সাঙ্এর সময় নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ সহস্র আর ইৎ-সিঙের সময় ছাত্রসংখ্যা তিন সহস্র। এই বিপুল ছাত্রসংখ্যার সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করতেন। আহারের জন্য সত্রের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য পৃথক পৃথক সত্র ছিল।

নালন্দায় খননকার্য চালাবার সময় প্রচুর চাল ও বহুলোকের মত রন্ধনোপযোগী চুল্লীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

পরিচালনা ও পরিশাসন

মহাবিহারের প্রধান যিনি তাঁকে বলা হত প্রধানাচার্য বা সর্বাধ্যক্ষ। তবে তিনি সাধারণত অতিবৃদ্ধ হতেন বলে কর্ম পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে করতেন উপাধ্যক্ষ কর্মদান ও উপাসক স্থবির। এছাড়া অপর দু'জন কর্মাধ্যক্ষের নাম ছিল কুলপতি ও পণ্ডিত। এখানে শাসনব্যবস্থা ছিল গণতন্ত্রভিত্তিক। পাক্ষিক প্রতিমোক্ষপাঠের দিন সাধারণ সভায় বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হত ও আলোচনার পর কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত।

প্রবেশিকা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার অর্জনের পথে জাতি ও ধর্মের কোন বাধা ছিল না। তবে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আসাই ছিল কঠিন ব্যাপার। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-পণ্ডিতরা কথা-গল্পচ্ছলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এই পরীক্ষা এতই কঠিন ছিল যে দশজনের মধ্যে সাতজন আটজনই ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হত। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে চীন তিব্বত কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত। ইৎ-সিঙের বর্ণনায় মনে হয় যে বিশ বছরের নীচে কাউকে নালন্দায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হত না।

পাঠক্রম

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ ও ইৎ-সিঙের বিবরণ থেকে নালন্দায় পঠিত বিষয় সমূহের একটা তালিকা প্রস্তুত করা যায়। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নালন্দার পাঠক্রমে স্থান লাভ করেছিল। যথা—

(১) চতুর্বেদ, (২) হীনযান শাস্ত্র, (৩) মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বসমূহ, (৪) ন্যায়শাস্ত্র, (৫) ব্যাকরণ, (৬) রসায়ন শাস্ত্র, (৭) চিকিৎসাবিদ্যা, (৮) যাদুবিদ্যা, (৯) যোগশাস্ত্র, (১০) জ্যোতিষশাস্ত্র, (১১) ব্যবহারিক শাস্ত্র, (১২) শিল্পবিদ্যা, (১৩) ধাতুবিদ্যা, (১৪) তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র।

শিক্ষাপদ্ধতি

তক্ষশিলার মত নালন্দাতেও আবৃত্তি ও উপলব্ধি উভয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হত। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা ও তার উপর বিতর্কের ব্যবস্থা ছিল।

ছাত্রদের বক্তৃতার অভ্যাসের উপরও জোর দেওয়া হত। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতেন। ইৎ-সিঙ বলেছেন যে একটা বৃহৎ হলঘর ও তিনশত কক্ষে অধ্যাপনা হত। মৌলিক প্রবন্ধ রচনা নালন্দার শিক্ষা পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

ছাত্রবা অতি প্রত্যূষে উঠে স্নান সমাপন করে নিজ নিজ উপাধ্যায়ের সেবা করে ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও সেই বিষয়ে চিন্তা করত। উদয়াস্ত দিবাভাগ আটটি অংশে বিভক্ত থাকত ও রাত্রি তিনটি যামে বিভক্ত হত। প্রথম ও তৃতীয় যামে ধর্মচর্চা হত আর মধ্যযামে ছিল নিদ্রার ব্যবস্থা।

পরীক্ষাপদ্ধতি ও গ্রন্থাগার

শিক্ষালাভের পর ছাত্রদের পরীক্ষা হত ও পরীক্ষান্তে উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল। তক্ষশিলার মত এখানেও মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন ছিল। প্রথম স্থান যিনি অধিকার করতেন তাঁর উপাধি হত কুলপতি।

তিব্বতীয় বিবরণে জানা যায় যে মহাবিহারের ধর্মগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থিত রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্নোদধি নামে তিনটি প্রাসাদে তিনটি প্রচুর গ্রন্থ-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। এগুলির মধ্যে রত্নসাগরে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল।

অধ্যাপকবৃন্দ

নালন্দার গৌরব ও গরিমার উৎস ছিলেন নালন্দার কৃতবিদ্য প্রাজ্ঞ অধ্যাপক-বৃন্দ। তাঁদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতির আকর্ষণে বহু ছাত্র নালন্দায় অধ্যয়ন করতে আসত। নালন্দার এই সব অধ্যাপকবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নালন্দার অধ্যাপকগোষ্ঠীর মধ্যে নাগার্জুন, আর্যদেব বসুবন্ধু প্রভৃতি ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও গ্রন্থকার।

একসময় নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। তিনি সমতটের এক হিন্দু রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শীলভদ্র রাজ-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন। তিব্বতীয় ত্যাঙ্গুরে শীলভদ্র রচিত আর্যভূমি ব্যাখ্যান নামে একটি গ্রন্থের অনুবাদ রক্ষিত আছে।

নালন্দার বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক চন্দ্রগোমীর জন্ম হয় বরেন্দ্রদেশে। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও তন্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি পাণিনির ভাষ্য প্রণয়ন করেন। সেটি চান্দ্র ব্যাকরণ নামে বিখ্যাত।

নালন্দার যে সব অধ্যাপক তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন

তাঁদের মধ্যে স্থিরমতি, শান্তরক্ষিত, কমলশীলের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভাকর মিত্র চীনদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই নালন্দার পতন সুরু হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ বহুদিন অব্যাহত ছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌ত-ইয়ার খিলজির আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

গ। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে যখন নালন্দার গৌরব ক্রমে মলিন হয়ে আসছিল তখন তার স্থান গ্রহণ করার জন্যে যে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে চলেছিল তার নাম বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে নালন্দার পরই হল বিক্রমশীলার স্থান।

অবস্থান

বিক্রমশীলা যে ঠিক কোন জায়গায় গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয় নি। নালন্দার মত এর কোন ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয় নি। অনেকের মতে এটি মগধের কাছে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। আবার অন্য একদলের মতে বিক্রমশীলা ভাগলপুরের নিকটবর্তী রাজমহল গিরিশ্রেণীর কলগঙ্গ শাখার অন্তর্ভুক্ত পাথরঘাটা শৈলে অবস্থিত ছিল। বিক্রমশীলার ইতিবৃত্তের জন্য আমাদের প্রধানত নির্ভর করতে হয় তিব্বতীয় বিবরণের উপর। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তারনাথের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিষ্ঠা

বাংলার পাল রাজবংশের ধর্মপালদেব এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন বলে কথিত আছে। ঐতিহাসিক তারনাথও এই মত সমর্থন করেছেন। ধর্মপাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রচুর অর্থমঞ্জুর করেন। পরবর্তী পাল রাজারাও উদারভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। তবে নালন্দার অপরিমেয় আর্থিক স্বাচ্ছল্য এর ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধসমূহ

প্রাচীর বেষ্টনীর অন্তরালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধসমূহ একটি কেন্দ্রীয় মহাবোধি মন্দিরকে ঘিরে অবস্থিত ছিল। একশ সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির, ছ'টি মহাবিদ্যালয় ও তৎসংযুক্ত উচ্চতর গবেষণার জন্য প্রকোষ্ঠ, ছ'টি অবৈতনিক

ছাত্রাবাস, বিদেশী ছাত্রদের ছাত্রাবাস ও কেন্দ্রীয় মহাকক্ষ—এই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গৃহ। তিব্বতীয় ছাত্রদের জন্য পৃথক বাসগৃহ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ছিল ছ'টি, দুটি কেন্দ্রীয় দ্বার ছাড়া চারদিকে আরও চারটি দ্বার ছিল। ছটি মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশের এই হল ছটি দ্বার। প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বারের দক্ষিণ ও বামদিকে ছিল নাগার্জুন ও অতীশ দীপঙ্করের চিত্র। দ্বারগুলি বন্ধ হয়ে যাবার পর যে সব অতিথি আসতেন তাঁদের জন্য প্রাচীরের বাইরে আবাস ছিল।

পরিচালনা

বিক্রমশীলার এই বিস্তৃত সংগঠন পরিচালনার জন্য ছ'জন সভ্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ ছিল। এই পরিষদের প্রধান ছিলেন বিহারের সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর অনুমতি ভিন্ন পরিষদ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। বিহারের নিয়ম অনেকাংশে এই সর্বাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। ছাত্রাবাসগুলি পরিচালনার ভার ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব ছিল ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের উপর। অনেকের মতে কিছুদিন নালন্দা ও বিক্রমশীলা একই সংঘের পরিচালনাধীন ছিল।

পাঠক্রম

নালন্দার মত বিক্রমশীলাতেও মহাযান বৌদ্ধমতের চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল কিন্তু হীনযান মতবাদও এখানে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এখানে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিতে সমর্থ হয়। এখানে বৌদ্ধধর্মের চারটি শাখার চারটি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সেই শাখার অভিজ্ঞ ২৭ জন করে উপাধ্যায় অর্থাৎ সবসমেত একশ আটজন উপাধ্যায় অধ্যাপনা করতেন। এছাড়া বিভিন্ন কর্মবিভাগে স্বতন্ত্র আচার্য ছিলেন। সর্বোচ্চ পদে থাকতেন অধ্যক্ষ। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া এখানে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, গুহ্যতত্ত্ব, যাদুবিদ্যা, যোগশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চাও হত। আবার কালচক্রযান পদ্ধতির সাধন পদ্ধতি অনুসারে তিথি, নক্ষত্র, রাশিচক্র গণনার জন্য গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যার চর্চা এখানে প্রাধান্য লাভ করে। এছাড়া চিত্রাঙ্কন, মূর্তিনির্মাণ ও হস্তলিপিচর্চাও বিক্রমশীলার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রবেশ ও শিক্ষাপদ্ধতি

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ সহজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টি দ্বারের কাছে ছ'জন দ্বারপণ্ডিত উপস্থিত থাকতেন। প্রবেশার্থী ছাত্রদের

দ্বারপণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা নিতে হত। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে তবেই ছাত্রকে প্রবেশ অধিকার দেওয়া হত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উভয় পদ্ধতিই অনুসৃত হত। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই বিভিন্ন সমস্যা ও পাঠ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতেন। শ্রেণীগত শিক্ষায় বক্তৃতা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। ব্যক্তিগত শিক্ষার বিকাশ বেশী হয় তান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারের ফলে। তান্ত্রিক শিক্ষায় গুরু শিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষা-পদ্ধতি

বিক্রমশীলায় পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল মৌখিক। শিক্ষালাভ করার পর ছাত্ররা 'পণ্ডিত', 'মহাপণ্ডিত', 'উপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধি লাভ করতেন। এই উপাধি দিতেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অধ্যাপকবৃন্দ

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রুতকীর্তি অধ্যাপকদের নাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদেরই আকর্ষণে বিদেশ থেকেও বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতে আসত।

তিব্বতী ঐতিহ্যমতে বিক্রমশীলার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ধর্মপালের পুরোহিত বুদ্ধ শ্রীজ্ঞান বা বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তিনি বৌদ্ধধর্মের একটি নূতন শাখার প্রবর্তন করেন ও কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। এই সময় জিনমিত্র নামে বিক্রমশীলার আর একজন আচার্য ছিলেন। বরেন্দ্রের অধিবাসী জেতারি নামে বিক্রমশীলার একজন আচার্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে এখানেই উপাধ্যায় পদে বৃত হন। তিনি ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের উপাধ্যায়। তারনাথের মতে তিনি তন্ত্র ও সূত্রের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। মহাচার্য ও মহাপণ্ডিত উপাধিধারী বিরোচন রক্ষিত বিক্রমশীলায় অধ্যাপনাকালে বহুগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে তিনি তিব্বতে যান। সম্রাট মহীপালের রাজত্বের সময়ে রত্নাকর-শান্তি, প্রজ্ঞাকরমতি, নারোপা, জ্ঞানশ্রী মিত্র প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞানশ্রী মিত্র তিব্বতে যান ও তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেন।

নারোপা ছিলেন বরেন্দ্রের অধিবাসী, বিভিন্ন আগমশাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ

অধিকার। তিনি বহু বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ওদন্তপুরীর মহাচার্য রত্নাকর শান্তি বিক্রমশীলায় এসে আচার্য জেতারির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সিংহল ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

বিক্রমশীলার অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁর খ্যাতি সর্বাধিক তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত, নাম অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশের পর তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। এমন কি তিনি সুবর্ণদ্বীপেও যান। পালসম্রাট মহীপালের আমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ও আচার্যপদে বৃত হন ও পরে অন্যান্য অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। দীপঙ্করের বিপুল খ্যাতির জন্য তিব্বতে ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হয় কিন্তু বিক্রমশীলা মহাবিহারের কথা চিন্তা করে তিনি যাত্রা স্থগিত রাখেন। অবশেষে তিব্বতরাজের আগ্রহাতিশয্যে মহাবিহারের অধ্যক্ষ ও সহকর্মীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বৃদ্ধ বয়সে তিব্বত যাত্রা করেন। ত্যাঙ্গুর ঐতিহ্যমতে তিনি প্রায় দু'শ গ্রন্থের রচয়িতা বা অনুবাদক ছিলেন। অতীশ-রচিত গ্রন্থগুলি বজ্রযান ধর্মের তত্ত্ব ও মহাযান সূত্রের উপর লিখিত। তিব্বতে ধর্মপ্রচার ও গ্রন্থ রচনা করে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেন তাতে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।

অতীশের অবস্থান কালেই বৌদ্ধধর্ম নিম্নগামী হতে সুরু করে। তাঁর প্রয়াণের পর থেকেই বিক্রমশীলার অবনতি দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও তাঁর পরে যে সব স্বনামখ্যাত অধ্যাপক বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তাঁদের মধ্যে রত্নকীর্তি, শাক্যশ্রী ভদ্র, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুবিখ্যাত ওদন্তপুরী বিহারের মত বিক্রমশীলাও সম্ভবত মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হয়। সেই সঙ্গে বিক্রমশীলার অমূল্য গ্রন্থরাজিও ভস্মীভূত হয়।

ঘ। বলভী

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বলভী মৈত্রক রাজবংশের অধীনে কাঠিয়াওয়ার অঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একটি শিক্ষায়তন হয়ে ওঠে। বলভী ক্রমশ বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার একটা কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করতে থাকে এবং কালক্রমে বলভীর রাজা দ্বিতীয়

ধ্রুব সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে ওঠে। ধ্রুব সেন ছিলেন হিউয়েন-সাঙএর সমসাময়িক। নালন্দা ও বিক্রমশীলা যেমন মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল বলভী তেমনি পশ্চিমভারতে হীনযান মতবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইৎ-সিঙএর বিবরণে দেখা যায় যে বলভী নালন্দার সমতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গণিত হয়ে উঠেছিল। এ থেকেই ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে বলভীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

নালন্দা বা বিক্রমশীলা সম্পর্কে যে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় বলভী সম্পর্কে তেমন কোন বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে হিউএন সাঙ ও ইৎ-সিঙএর বিবরণ থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এঁরা দুজনেই নালন্দায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং বলভীতে এসেছিলেন পর্যটক হিসাবে। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁদের বিবরণ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে প্রায় একশত বৌদ্ধ বিহার এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় ছ হাজার ছাত্র এখানে বিদ্যাচর্চা করত। বৌদ্ধপণ্ডিত স্থিরমতি ও গুণমতি এখানে অধ্যাপনা করতেন। ইৎ-সিঙের বিবরণী থেকে জানা যায় যে বলভী ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র এবং ছাত্ররা এখানে দুই বা ততোধিক বৎসর ধরে অধ্যয়ন করত।

কথাসরিৎসাগর পাঠে জানা যায় যে গাঙ্গেয় উপত্যকার ব্রাহ্মণ সন্তানেরাও এখানে বিদ্যার্জন করতে আসতেন। সম্ভবত এখানে নানা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রও আলোচিত হত। ধর্ম শিক্ষা ছাড়া লৌকিক ও ব্যবহারিক অন্যান্য শাস্ত্রও এখানে পঠিত হত। ইৎ-সিঙএর বিবরণানুসারে বলভীর কৃতী ছাত্ররা দেশের শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হত।

৬। সারনাথ ও অন্যান্য বিহার

বারাণসীর উপকণ্ঠে অবস্থিত সারনাথ বৌদ্ধের একটি পরমপবিত্র তীর্থ। বুদ্ধদেব এইখানে সর্বপ্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেন। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বৌদ্ধমহাবিহার একটি প্রধান ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে এই মহাবিহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকেও এর খ্যাতি অটুট ছিল। কিন্তু হীনযান সম্প্রদায়ের কেন্দ্র হওয়াতে হিউয়েন সাঙ এই মহাবিহার সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা বিবরণ রেখে যান নি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র এই মহাবিহারে অধ্যয়ন করত।

হিউয়েন-সাঙ তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহাবিহারে অধ্যয়নরত ছাত্রদের যে সংখ্যার উল্লেখ করেছেন তা থেকে এইসব মহাবিহারের অনেকগুলিকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তাঁর বিবরণে দেখা যায় যে একমাত্র বাংলা দেশেই সত্তরটি সঙ্ঘারামে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে এদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

বর্তমানে পূর্বপাকিস্থানের রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে এক বিশাল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এইটিই হল প্রাচীন সোমপুরী মহাবিহার। বিক্রমশীলার প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল এটিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধর্মপাল ত্রৈকূটক ও জগদ্দল মহাবিহারেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এ দুটিও বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানে অবস্থিত। সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিত' গ্রন্থে দেখা যায় জগদ্দল বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। জগদ্দল পাল-রাজা রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরের অংশ ছিল বলে জানা যায়। রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মহাবিহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরুগৃহাশ্রয়ী। গুরুগৃহে গিয়ে শিষ্যকে বিদ্যার্জন করতে হত। এ ব্যবস্থায় বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তেমন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা ছিল না। কারণ গুরুগৃহাশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রসংখ্যা সর্বদাই ছিল নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।

কিন্তু বৌদ্ধদেব প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বৃহৎ শিক্ষায়তনের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাও এতে পাওয়া যেত। আবার, ভারতীয় শিক্ষার গুরুশিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কও এই ব্যবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকত।

বৌদ্ধ ব্যবস্থার বৃহদায়তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থাতে ক্রমশ বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৃহৎ মঠ ও মন্দির সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয় সমূহ গড়ে ওঠে। তক্ষশীলা এই ধরনের ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার একটি বৃহদায়তন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাবে এক সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুটা দুর্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর কিছুদিন পর থেকেই বৌদ্ধধর্মের পতন হতে সুরু হয় ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমশ নিজের পুরাতন প্রতিষ্ঠা ফিরে পায়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম নিজের জন্মভূমিতেই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতক থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মঠ ও মন্দির সংলগ্ন মহাবিদ্যালয়গুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও সপ্তম ও অষ্টম শতকে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের অসংখ্য মঠ ও মন্দিরে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

এই সব বিদ্যায়তন ছিল সাধারণত অবৈতনিক। রাজা মহারাজাদের দানে এদের ব্যয় বহুলাংশে নির্বাহ হত। তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিত বিদ্যায়তনগুলিতে তীর্থযাত্রীরাও দান করতেন। এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা থাকত। এখানে ভরণপোষণ, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য ছাত্রদের কোন ব্যয় করতে হত না। জনসাধারণের দানে যে সব বিদ্যাকেন্দ্র গঠিত হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে উত্তর ভারতের কণৌজ, বারানসী, ধার, মিথিলা, নবদ্বীপ ও দক্ষিণ ভারতের মালখেদ, কল্যাণী, কাঞ্চি, নাসিক, কর্ণাটক ও তাঞ্জোর উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র রূপে বারানসীর খ্যাতি বৈদিক যুগ থেকেই। জাতকের কাহিনীগুলিতেও বিদ্যাকেন্দ্র রূপে বারানসীর খ্যাতির উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগে বারানসীর প্রতিষ্ঠা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও পরবর্তীকালে বারানসী বিদ্যাকেন্দ্র রূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের মত বহু বিদ্যাকেন্দ্র ছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মুসলমানদের ধ্বংসলীলা দক্ষিণ ভারতে কম ঘটেছিল বলে সেখানে বহুসংখ্যক বিদ্যাকেন্দ্র বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। চোল, রাষ্ট্রকূট ও পল্লব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও তৎসংলগ্ন মহাবিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন রাজবংশ যে বিদ্যাকেন্দ্রগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন সে কথা মন্দির সংলগ্নলিপি থেকে জানা যায়। এই বিদ্যাকেন্দ্রগুলি ক্রমশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল এবং সেগুলিতে নানাধরনের গবেষণাও হত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঋক্, সাম, অথর্ব, সংহিতাসমূহ, বেদান্ত, ধর্মসূত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য ছাত্রদের নির্বাচন করা হত। এ ছাড়া দক্ষিণ ভারতে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত বহু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

চতুষ্পাঠী শিক্ষা

পূর্বভারতের বিদ্যাকেন্দ্রগুলির মধ্যে নবদ্বীপ ও মিথিলার নাম করতে হয় সর্বাগ্রে। মিথিলার খ্যাতি উপনিষদের যুগ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। উপনিষদ ও মহাকাব্যের যুগে মিথিলা ছিল বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র। বৌদ্ধ প্রভাব ও প্রতিপত্তির ফলে মিথিলার গৌরব কিছুটা হ্রাস পেলেও সেন রাজাদের আমলে মিথিলা পূর্ব গৌরব ফিরে পেতে সুরু করে ও নব্যন্যায়ের চর্চায় বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে নবদ্বীপ বিদ্যাকেন্দ্র রূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল। সেনরাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী থাকাকালীন জয়দেব, ধোয়া উমাপতি ধর প্রমুখ প্রতিভাবান বিদ্বদ্‌জনের সমাবেশ এখানে হয়েছিল। মুসলমান আমলে নবদ্বীপ সংস্কৃত, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ও নব্যন্যায় চর্চার একটা একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রমে নবদ্বীপ মিথিলার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। নবদ্বীপে নব্যন্যায় চর্চার যিনি সূত্রপাত করেন তাঁর নাম বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি ছিলেন মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য। সার্বভৌমের শিষ্যদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতের অধ্যয়ন করে নবদ্বীপেই অধ্যাপনা করতেন।

নবদ্বীপের অধ্যাপকদের সহজ সরল জীবনযাত্রা ও পাণ্ডিত্য বিদেশীদেরও মুগ্ধ করেছিল। অধ্যাপকেরা বিনা বেতনে এখানে অধ্যাপনা করতেন, এমন কি অনেক সময় শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন করতেন।

বিদ্যাকেন্দ্র রূপে নবদ্বীপের খ্যাতি উনবিংশ শতকের শেষভাগেও বর্তমান ছিল। অবশেষে ইংরাজী শিক্ষার অনিবার্য আঘাতে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে ও কালক্রমে নবদ্বীপের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the following ancient educational institutions.
(a) Nalanda (b) Vikramshila (c) Taxila (d) Balavi.

2. Write an essay on the educational institutions of ancient India.

পাঁচ

মুসলমান আমলে শিক্ষা

অন্যান্য সভ্যতার মত ইসলামী সভ্যতাতেও শিক্ষার স্থান ছিল খুব উচ্চে। মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরানে শিক্ষাকে অবশ্য-কর্তব্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রাচীনকালে অধিকাংশ উন্নত মুসলিম দেশেই শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

মুসলমান শক্তি ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলে বহুকাল ধরে শাসন করলেও ভারতবর্ষ কখনই ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। এর প্রথম কারণ হল ভারতবর্ষে প্রাক্-মুসলমান যুগ থেকেই একটি অতি প্রবল জীবনশক্তিসম্পন্ন সংস্কৃতির ধারা বর্তমান ছিল। রাজশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের পক্ষে সেই সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ অবদমিত করা বা পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্র থেকে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল। তার ফলেও অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের প্রভাব ভারতবর্ষকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি।

এসব কারণে ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা প্রবর্তিত হলেও এখানে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার কোন অখণ্ড ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণই রাজানুগ্রহপুষ্ট। বিদ্যোৎসাহী নৃপতিদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় তার অগ্রগতি ঘটত। আবার কোন নৃপতির অবজ্ঞা বা প্রতিকূল কার্যকলাপে শিক্ষার গতি তেমনই ব্যাহত হত। ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও রাজানুগ্রহ লাভে বর্ধিত হত বটে কিন্তু তাদের মূল প্রোথিত ছিল বৃহত্তর জনজীবন ও কর্মধারার মধ্যে। দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সে শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। তাই রাজা ও রাজবংশের পরিবর্তনের ফলে সে শিক্ষার অগ্রগতি কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। কিন্তু মুসলিম শিক্ষার তেমন কোন মূল ভারতের মাটিতে প্রবেশ করতে পারে নি। এ শিক্ষা ভারতের প্রকৃত জনজীবন থেকে চিরকালই স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ছিল।

ভারতের মুসলমান নৃপতিরা শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার স্থাপনা ও সেগুলির পরিপোষণের ব্যাপারে তাঁদের প্রভূত উৎসাহ ছিল। কবি পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতাও তাঁরা করতেন। শুধু নৃপতিরাই নন, অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিরাও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন বলে জানা যায়।

মক্তব ও মাদ্রাসা

মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজ্যস্থাপনা ও বসবাস করতে সুরু করল তখন থেকেই প্রয়োজনানুসারে দেশের বিভিন্ন অংশে মসজিদ গড়ে উঠতে থাকে। এই মসজিদগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে শহরের বাজারে অবস্থিত ছিল সেগুলি ধর্মকেন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাকেন্দ্ররূপেও গড়ে ওঠে। মুসলিম বিদ্যাকেন্দ্র ছিল দুরকমের—মক্তব ও মাদ্রাসা। মক্তব হল প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাসা হল উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। মক্তবে কোরান পাঠ ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে কখনও কখনও অন্যান্য পাঠ, লিপিশিক্ষা ও কিছুটা গণিত শিক্ষাও দেওয়া হত। মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হত ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, সংহিতা, বিচার ও বিজ্ঞান। মাদ্রাসাগুলি ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যাচর্চার গুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়েও উন্নীত হত। মাদ্রাসায় পারসী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। তবে আরবী ভাষা মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল।

মুসলমান জগতে শিক্ষকের স্থান হল অত্যন্ত উচ্চে। বিদ্যা ও চরিত্রগুণে তাঁরা সকলের সম্মানীয় হতেন। ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার মত এখানেও ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক ও পিতা পুত্রের মত মধুর ছিল। আবার ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার অনুরূপ এখানেও বয়স্ক ও শিক্ষায় অগ্রগামী ছাত্রদের দিয়ে নিম্নস্তরের ছাত্রদের পড়ানর প্রথা ছিল।

সুলতান মামুদ

মুসলমান শক্তি ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। কিন্তু দীর্ঘকাল তারা ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। খ্রীষ্টীয় ১০০০ থেকে ১০২৬ সালের মধ্যে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষে কমপক্ষে সতেরো বার আক্রমণ পরিচালনা করেন। আক্রমণ কালে হত্যা ও উৎকট ধ্বংসলীলার মাধ্যমে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলেন। স্বদেশে তিনি বিদ্যোৎসাহী বলে পরিচিত হলেও ভারতবর্ষে তাঁর শিক্ষাধ্বংসী রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপই দেখা যায় নি।

মুহম্মদ ঘোরী ও দাস বংশ

ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন মুহম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬) তিনি ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক মন্দির ধ্বংস করেন ও সেইসব স্থানে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ক্রীতদাসদের শিক্ষা-ব্যাপারেও তাঁর পরম উৎসাহ ছিল। তাঁরই অন্যতম শিক্ষিত ক্রীতদাস কুতব-উদ্-

দীন (খ্রীঃ ১২০৬-১২১০) তাঁর পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতব একজন বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্যরসিক নৃপতি ছিলেন। অন্যান্য মুসলমান রাজাদের মত তিনিও বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। কুতবের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বখত্-ই-য়ার বিখ্যাত বিক্রমশীলা মহাবিহার ধ্বংস করেছিলেন। শোনা যায় তিনিও বহু মসজিদ ও বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। কুতবের উত্তরাধিকারী আলতামাসও (১২১০-১২৩৬) একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ও কন্যা সুলতানা রিজিয়া বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন। নাসিরউদ্-দীন (১২৪৬-১২৬৬) ও গিয়াস-উদ্-দীন বলবনও (১২৬৭-১২৮৭) বিদ্যোৎসাহী নৃপতিরূপে বিখ্যাত হয়েছেন। বিনয়ী ও ত্যাগী সম্রাট নাসিরউদ্-দীন নিজে ছিলেন পণ্ডিত। তিনি সারাজীবন গভীর আগ্রহের সঙ্গে বিদ্যাচর্চা করে গেছেন বলে জানা যায়। তাঁর রাজত্বকালে পাঞ্জাবের জলন্ধরে একটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। গিয়াস্-উদ্-দীন বলবনের রাজত্বকালে তাঁর পুত্র শাহাজাদা মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে একটা সাহিত্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে কুখ্যাত চেঙ্গিস্ খাঁর অত্যাচারে বহু পণ্ডিত পালিয়ে এসে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে, দিল্লীতে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বলবন নিজেও যথেষ্ট বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

খলজী বংশ

খলজী বংশের (১২৯০-১৩৬০) জালাল-উদ্-দীন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী নৃপতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে দিল্লীর প্রতিষ্ঠা তখন সর্বজন পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই বংশের আলা-উদ্-দীন প্রথম জীবনে ছিলেন প্রচণ্ড শিক্ষা বিদ্বেষী। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিত্তসম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি পারসী ভাষা শিখেছিলেন ও পণ্ডিতদের কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও দিল্লীর সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁরই রাজত্বকালে বিখ্যাত দার্শনিক নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমীর খসরু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন।

তুঘলক বংশ

তুঘলক বংশের (১৩২৫-১৪১৩) সক্রিয় সহযোগিতায় ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। গিয়াস-উদ্-দীন তুঘলক বিদ্যাচর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। সুবিখ্যাত মুহম্মদ বিন্ তুঘলক যেমন তাঁর অদ্ভুত কার্যকলাপ

ও ধ্বংসাত্মক খামখেয়ালীর জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন তেমনি প্রচুর খ্যাতি তিনি অর্জন করে গেছেন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী রূপে। সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ ও গণিতে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। গভীর অধ্যয়নে রত থাকতে ও বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্ক করতে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর এইসব সদ্‌গুণ ও সদিচ্ছার মূল্য অনেকটাই তাঁর অস্থিরচিত্ততা ও খামখেয়ালীর জন্য নষ্ট হয়ে যায়। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী বলপূর্বক স্থানান্তরিত করাতে দিল্লীর সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে নতুন রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে দিল্লী পণ্ডিতশূন্য হয়ে পড়ে এবং সেখানকার বিদ্যাকেন্দ্রগুলিও দারুণ আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। তিনি পুনরায় দিল্লীতে ফিরে আসেন বটে কিন্তু দিল্লীর সাংস্কৃতিক খ্যাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি।[১]

ফিরোজ তুঘলক

সুলতানী আমলে বিদ্যোৎসাহী বলে যাঁদের খ্যাতি আছে তাঁদের মধ্যে ফিরোজ তুঘলকের নাম সর্বপ্রথম লিখিত হবে। তিনি নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে অকৃপণ হস্তে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করতেন ও তাঁদের বৃত্তি ও অর্থসাহায্য দিতেন। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে বহু বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেছেন যে তিনি কমপক্ষে ত্রিশটি মসজিদসংলগ্ন মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি দিল্লীর সন্নিকটে ফিরোজাবাদ নাম দিয়ে একটা নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই রাজধানীতে তিনি যে বিদ্যাকেন্দ্রটি স্থাপিত করেছিলেন সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকরা একত্রেই বাস করতেন। সম্রাট তাঁদের বৃত্তিদান ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করতেন। অপরাপর মুসলমান নৃপতির মত তিনি ক্রীতদাসদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। জানা যায় তিনি নাকি আঠার হাজার ক্রীতদাসের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য ছিল বিভিন্ন। কাউকে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হত, কাউকে দেওয়া হত কোরান শিক্ষা আবার কাউকে বা দেওয়া হত পাণ্ডুলিপি অনুলিখনের শিক্ষা। কথিত আছে প্রসিদ্ধ সুফী সাধক ও কবি জালাল-উদ্দীন রুমি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেন।[১]

ফিরোজ তুঘলকের পর তুঘলকবংশের ইতিহাসে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। তাঁর পরবর্তী নৃপতিদের কেউই শিক্ষা সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখান নি। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন ও অবাধ ধ্বংসলীলার পর অপার

অরাজকতা, কুশাসন ও দুর্ভিক্ষের কবলে ভারতবর্ষকে ফেলে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

সৈয়দ ও লোদী বংশ

সৈয়দ ও লোদী বংশের (১৪১৪—১৫২৬) শাসনকালেও দেশে আবার শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। সৈয়দ আলাউদ্দীনের আমলে বদাওনের শিক্ষাকেন্দ্রটি উন্নতি লাভ করেছিল। সিকন্দর লোদীর আমলে আগ্রা শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

লোদী শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষে হিন্দুরা মুসলমানদের ভাষা পারস্যভাষা শিক্ষা করার ব্যাপারে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় নি। ইতপূর্বে অবশ্য হিন্দুরা কিছু কিছু পারস্য ভাষা শিখেছিল এবং দিল্লীতে দু'একটি ক্ষেত্রে রাজ্য শাসনের ব্যাপারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। কিন্তু ব্যাপকভাবে হিন্দুরা রাজকার্যে প্রবেশ করতে পারেনি। আবার, কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও পারস্যভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ক্রমশ দুই জাতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়তে থাকে ও হিন্দুরাও রাজকার্য পাবার জন্য মুসলমানদের ভাষা শিখতে সুরু করে। অনেক মুসলমানও হিন্দুদের ভাষা শিক্ষা করেছিল। লোদী শাসনের সময় থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের ভাষা ব্যাপকভাবে শিক্ষা করেছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের এই ভাষাগত আদানপ্রদানের ফলে ক্রমশ উর্দু নামক একটি মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়। উর্দু কথাটা হল তুর্কী, এর অর্থ হল শিবির।

দিল্লীর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে পাঠান নৃপতিরা যখন নিরবচ্ছিন্ন কলহে মত্ত তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় নৃপতিরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাহমনি রাজ্য

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বাহমনি রাজ্যের সুলতানরা অনেকেই বহু মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এই রাজ্যের গ্রামে গ্রামে বহুসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বাহমনির সুলতানরা শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এই কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। মুহম্মদ শা'র মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান বিদরে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নাকি কয়েক সহস্র পুঁথি রক্ষিত ছিল।[১]

বিজাপুর

বিজাপুরের সুলতানরাও শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিলেন। বিজাপুরের আদিলশাহী গ্রন্থাগারের বিশেষ সুনাম ছিল। গোলকুণ্ডার নবাব মহম্মদ কুলি কুতবশাহ চার মিনার মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। জৌনপুরের রাজধানী জৌনপুর মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মধ্যযুগে এটি মুসলমান শিক্ষা সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র বলে খ্যাত ছিল। শের শাহ জৌনপুরেই শিক্ষা লাভ করেন। মালোয়ার সুলতানরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁরা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করছিলেন বলে জানা যায়।

বাংলায় সুলতানী আমল

বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানরাও শিক্ষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তাঁরা ও তাঁদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল।

শুধু রাজারাই নন অনেক রাজকর্মচারী ও অভিজাত ব্যক্তিরাও শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী ছিলেন ও বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাকেন্দ্র অবশ্য সবগুলিই যে বৃহদাকার ছিল, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মসজিদসংলগ্ন একটি করে পাঠকেন্দ্র থাকত এবং তার তত্ত্বাবধান করতেন একজন শিক্ষক। এই সব বিদ্যাকেন্দ্রের অধিকাংশই ছিল নগরে বা সহরে। রাজা ও সম্রাটরাই ছিলেন অধিকাংশ পৃষ্ঠ-পোষক। এমনও হত যে একজন নৃপতি যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে গেলেন তাঁর উত্তরাধিকারী তার সম্পর্কে কোন উৎসাহই দেখালেন না। এইভাবে অনেক বিদ্যাকেন্দ্র বিনষ্ট হয়ে গেছল। তৈমুরের আক্রমণেও অনেক বিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও প্রাক্-মুঘল যুগে ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষার প্রসার ভালই হয়েছিল বলা যেতে পারে।

রাজসভাশ্রিত ইতিবৃত্তকারেরা অবশ্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাকেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসার বর্ণনা রেখে গেছেন। সে সব বৃত্তান্ত যথাযথ বলে ধরে নেবার কোন কারণ নেই। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে তৎকালীন ইতিবৃত্তকারেরা যাই বলুন না কেন ভারতবর্ষের মুসলিম শিক্ষা দেশের সীমান্তের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, বিদেশীদের শ্রদ্ধা বা আগ্রহ কোনদিনই তা আকৃষ্ট করতে পারে নি। কবি বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে ভারতবর্ষে কোন ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

বাবরের এই উক্তি যে সর্বাংশে সত্য তা' নয়। তবে সুলতানী আমলের অন্তিমকালে সবদিক দিয়েই যে শিক্ষার অবনতির লক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল একথা ঠিক।

মুঘল বংশ

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপয়িতা বাবর (১৫২৬-১৫৩০) নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন বটে কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি কিছুই করে যেতে পারেন নি। তাঁর পুত্র হুমায়ুন ও (১৫৩০-১৫৫৬) শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন কিন্তু তিনিও শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করে যান নি। তিনি দিল্লীতে একটি বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। হুমায়ুনকে সাময়িকভাবে বিতাড়িত করে শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫) দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জয়পুরের কাছে নবনৌলে একটি বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

আকবর

মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও গভীর অনুসন্ধিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছিল। নিজে নিরক্ষর হলেও বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানার্জনে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিমিত। ধর্মবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, অথর্ববেদ, নলদময়ন্তী উপাখ্যান, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতির অনুবাদ করিয়েছিলেন। খ্রীষ্টানদের সুসমাচারেরও তিনি অনুবাদ করিয়েছিলেন। রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে তিনি ইবাদৎ-খানা নামে একটি সভাগৃহ নির্মাণ করান। সেখানে তাঁর উপস্থিতিতে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা হত।

আকবর দিল্লী, আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রিতে বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে অন্যান্য স্থানেও নানা বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু শুধুমাত্র বিদ্যাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেই আকবর ক্ষান্ত হন নি। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায় যে আকবর সময়ের অনর্থক অপচয় না ঘটিয়ে শিক্ষাদান প্রথাকে দ্রুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ও সে সম্বন্ধে নাকি একটা পরিকল্পনাও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে তিনি হিন্দু শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণে পড়তে শেখার আগে লিখতে শেখার নিয়ম গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষার বাস্তব দিকের প্রতিও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। পরিবর্তনশীল সময়ের প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার পরিকল্পনা গঠন করার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন এবং কেউ যাতে যুগোপযোগী শিক্ষাকে উপেক্ষা না করে সেই মর্মে আদেশও তিনি দিয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাসার জন্য যে পাঠক্রম নির্ধারিত করে

ছিলেন তাতে নীতি, গণিত, কৃষিবিদ্যা, জরীপ, জ্যোতির্বিদ্যা, শাসন বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও পতঞ্জলী পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্রদেরও প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। আকবরের নির্দিষ্ট পাঠক্রমে বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষারও স্থান ছিল।

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আকবর দ্রুততার ওপর জোর দিয়েছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণ সম্পর্কে তাঁর আর একটি নির্দেশও উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর নির্দেশে বলেছিলেন যে ছাত্ররা যাতে নিজেরা পড়ে পঠিত বিষয়টি নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক ছাত্রকে এই উপলব্ধির পথে কিছুটা সাহায্য করেন মাত্র। একজন বিদেশী সমালোচক আকবরের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলেছেন যে আকবরের মতামত পাঠ করলে মনে হয় যেন আধুনিক কোন শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থে কথাগুলি লেখা রয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কে আকবরের মতবাদ ও নির্দেশ তাঁর অতিশয় প্রগতিশীল মনোভাব ও সুগভীর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরেছে। বস্তুত, মধ্যযুগে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় পালিত হয়েও আকবর যে কি করে এই প্রগতিশীল মন ও চিন্তার অধিকারী হতে পারলেন সে এক বিস্ময়ের বস্তু।

জাহাঙ্গীর

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৬) পিতার প্রতিভা ও বহুমুখিতার অধিকারী না হলেও শিল্প ও শিক্ষায় তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি বহু নতুন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন ও পুরাতনগুলির সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর আদেশে উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত এবং সেই অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হত।

শা-জাহান

শা-জাহান (১৬২৮-১৬৫৮) শিল্প ও স্থাপত্যের জগতে এক অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছেন বটে কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। তিনি দিল্লীর জুম্মা মসজিদে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। ভ্রমণকারী বোর্নিয়ে তাঁর বিবরণে শা-জাহানের আমলের শিক্ষার বিশেষ দুরবস্থার কথাই বর্ণনা করেছেন।

আওরঙ্গজীব

শা-জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো ছিলেন উদারচিত্ত, পণ্ডিত ও দার্শনিক

কিন্তু তিনি সিংহাসন লাভ করতে পারেন নি। শা-জাহানের পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন আওরঙ্গজীব (১৬৫৮-১৭০৭)। আওরঙ্গজীবের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, শাসন-ক্ষমতা মানব-চরিত্রজ্ঞান সবই ছিল, ছিলনা কেবল মানসিক উদারতা। তাঁর এই সঙ্কীর্ণ-চিত্ততাই মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। তিনি হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষাকেন্দ্র ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করার আদেশ দেন। তবে মুসলিম শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উদ্যম যথেষ্টই ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যে তিনি বহুসংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অধ্যাপকদের জন্য বেতন ও শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং পণ্ডিতদের যোগ্যতানুযায়ী তাঁদের ভূমিদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি গুজরাট ও অযোধ্যার মত অনগ্রসর প্রদেশে মুসলমান ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। গুজরাটের অনগ্রসর বোহরাদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ উৎসাহের কথা শোনা যায়। তিনি তাদের জন্য পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন এবং তাদের শিক্ষার অগ্রগতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন বলে জানা যায়। তাঁরই আমলে শিয়ালকোট শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

বোর্নিয়ের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে আওরঙ্গজীব একবার তাঁর এক প্রাক্তন শিক্ষককে তাঁকে সঙ্কীর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন বলে তিরস্কার করেন। আওরঙ্গজীবের অভিযোগ হল যে শিক্ষক তাঁকে আরবী ভাষায় ব্যাকরণের খুঁটিনাটি শিখিয়েছিলেন কিন্তু বৃহত্তর জগতের বিভিন্ন দেশের ভূগোল, শাসনব্যবস্থা, রাজাদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের পরিমাণ এবং অর্জনের বিবরণ—এ সব কিছুই তিনি শেখান নি। বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থা, তাদের রীতিনীতি, সে সব দেশের বিপ্লব ও পরিবর্তনের ধারা এর কিছুই শিক্ষক মহাশয় তাঁকে শেখান নি। তিনি অভিযোগ করেন যে শিক্ষক মহাশয় তাঁকে ধর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আচার আচরণ সবই শিখিয়েছেন কিন্তু জীবনকে সহনীয় করে তোলার মত চিন্তা ও নিজের মতামতকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার মত কোন দার্শনিক শিক্ষা বা মানুষের চরিত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য বোঝবার মত কোন গূঢ় শিক্ষা কিছুই তিনি তাঁকে দেন নি। তাছাড়া রাজার কর্তব্য, যুদ্ধবিদ্যা—এই সবও তাঁকে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কঠিন আরবী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম না করে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা প্রয়োজন ছিল।

আওরঙজীবের এই উক্তি থেকে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক মতামত সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে। আওরঙজীবের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে উপলব্ধির স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র শব্দসমষ্টির আলোচনা তাঁর কাছে মূল্য পায়নি। আকবর

যেমন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতেন, তেমনই আওরঙজীব দিতেন ইতিহাস, ভূগোল, বিভিন্ন দেশের নৃতত্ত্ব প্রভৃতি মানবিকশাস্ত্রের শিক্ষার উপর। উপরন্তু, ছাত্রের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সঙ্গে তার শিক্ষার যোগ থাক এও তিনি চাইতেন। আওরঙজীবের পর মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়ে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল বটে কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মুসলমান শিক্ষার স্বরূপ

মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ স্থান ছিল না। মেয়েরা সাত বৎসর পর্যন্ত মক্তবে পড়াশুনা করতে পারত। তবে রাজপরিবারের অনেক মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা যে ঠিক কতখানি ও কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল সে সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। বাবর ও বোর্নিয়ে ভারতে মুসলিম শিক্ষার ওপর যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে মনে হবে শিক্ষার প্রসার এদেশে বিশেষ ছিলই না। তবে তাদের বিবরণ সর্বাংশে সত্য নয়। দেশে বহুসংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দিল্লী, আগ্রা ও জৌনপুর শিক্ষাকেন্দ্র রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

অধিকাংশ মসজিদের সঙ্গে মক্তব থাকত। মক্তবে প্রধানত কোরান মুখস্থ করার শিক্ষা দেওয়া হত। সেই সঙ্গে কিছুটা লিখতে পড়তে ও হিসাব শিক্ষাও দেওয়া হত। ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা কখনও বিশেষ উচ্চস্তরে উঠতে পারে নি। মাদ্রাসাগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাকরণ ও ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। এ ছাড়া বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ, ইতিহাস ও সাহিত্যও শিক্ষা দেওয়া হত। ঐতিহাসিক রচনায় মুসলমানদের উৎসাহ হিন্দুদের তুলনায় ছিল অনেক বেশী। মুসলিম যুগে রচিত অনেকগুলি ইতিবৃত্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ফারসী ভাসা। রাজকার্যে ফারসী ছিল অত্যাবশ্যক। তাই হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই ফারসী শিক্ষার আগ্রহ দেখা যেত।

তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে হিন্দুরা মুসলিম শিক্ষার ব্যাপারে সত্যকার কোন আগ্রহ পোষণ করে নি। মুসলিম শিক্ষা ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ট মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাছাড়া মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বেরও

অনেক সময়ই কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এক সুলতান বা বাদশাহর অনুগ্রহে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী শাসকের অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং তাদের ছাত্র-সংখ্যাও ছিল অত্যল্প। তাই এগুলি সামান্য অসুবিধায় পড়লেই বিনষ্ট হয়ে যেত।

ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষা ভারতের বহুকালার্জিত সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সূত্রেই আবদ্ধ ছিল না। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠের আগ্রহ বিশেষ অর্জন করে উঠতে পারে নি। উপরন্তু বিজেতা মুসলমান রাজগণ প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উপর ধ্বংসকর আঘাত ক্রমাগত চালিয়ে এসেছেন। ফলে ভারতেব মাটির সঙ্গে মুসলিম শিক্ষাদীক্ষার কোন যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারে নি। উপরন্তু মুসলিম শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের কোন ধারাই কখনও ভারতে এসে পৌঁছয় নি। এই সব কারণে ভারতের অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার মত বা পশ্চিম-দেশীয় মুসলিম শিক্ষার মত ভারতে মুসলিম শিক্ষা কোন গৌরবময় ঐতিহ্য রেখে যেতে পারে নি।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the state of Muslim Education in India during the Pre-Mughal period.

2. Describe the spread of education in India during the days of Mughal emperors.

3. Write a brief history of the Muslim Education in India. Discuss its nature and contribution to Indian thought.

ছয়

ইংরাজ আমলে দেশীয় শিক্ষা

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে আবহমান কাল ধরে যে এক সহজ, স্বচ্ছন্দ শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সময়েও সেই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের অবহেলিত গ্রামাঞ্চলে অব্যাহত ছিল। বিদেশী শাসকেরা এই স্বতঃস্ফূর্ত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার ও প্রাণশক্তির সবটুকু খবর রাখতেন না এবং তার ব্যাপকতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। নবাগত শাসকবর্গের মধ্যে যাঁরা নিজেদের দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তাঁরা এই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অকেজো, উৎকট এবং প্রাণহীন বলে মনে করতেন ও তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে ভারতবাসীরা সকলেই মূর্খ, অশিক্ষিত ও সভ্যতাহীন বর্বর। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে এই 'অকেজো' দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করে সেখানে পাশ্চাত্য প্রথায় স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করতে হবে।

নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ রূপটি কেমন ছিল তা সঠিকভাবে জানায় প্রথম বাধা হল এই যে, এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া সত্যই দুঃসাধ্য। মোটামুটি যে একটা হিসাব সেই সময় ইংরাজ শাসকবর্গ তৈরী করেছিলেন সেটি কেবলমাত্র তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কেই ছিল এবং তাও সামগ্রিক প্রকৃতির ছিল না। তাঁদের উদ্যোগে যে হিসাব তৎকালে তৈরী হয় তাতে কেবলমাত্র মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা ও বিহারের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় এবং তাতেও আবার সব জেলাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এ-ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অরাজকতাপূর্ণ অঞ্চল সমূহের পরিসংখ্যান গৃহীত হওয়াতে সেগুলিকে ভারতবর্ষের শান্তিপূর্ণ সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ প্রতিরূপ বলা চলে না। এই সব সত্ত্বেও শিক্ষাব্রতী মিশনারী উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণী প্রস্তুত করেছিলেন সেটি অনেক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ।

হলেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং তাতে পূর্বের অন্যান্য বিবরণীর সার সংক্ষেপও দেওয়া আছে।

শ্রেণী বিভাগ

অ্যাডামের দেওয়া বিবরণী থেকে বোঝা যায় যে, সেই সময় মোটামুটি দু'শ্রেণীর দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল : প্রাথমিক বিদ্যালয়, ও উচ্চ বিদ্যালয়। অবশ্য বিদ্যালয় বলতেই বর্তমান কালের ক্লাশ-ব্যবস্থা-সমন্বিত যে স্কুলের ছবি আমাদের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে প্রাচীন দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ঠিক সেই রকম ছিল না। সেগুলি নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে পরিচালিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের এক প্রকার মাধ্যম ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও আবার দুরকম ছিল। ফার্সী ভাষা যেখানে শেখান হত, সেগুলিকে বলা হত মক্তব এবং দেশীয় ভাষা যেখানে শেখান হত সেগুলিকে বলা হত পাঠশালা।

উচ্চ বিদ্যালয়ও দুই শ্রেণীর ছিল—হিন্দুদের টোল (পশ্চিম ভারতে এগুলি পাঠশালা বলেই অভিহিত হত) এবং মুসলমানদের মাদ্রাসা। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই শিক্ষালাভের একমাত্র মাধ্যম ছিল না, কেননা গৃহেও শিক্ষাদানের যথেষ্ট বন্দোবস্ত ছিল এবং উচ্চ শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুরা বিশেষ করে স্বগৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। বাড়ীতে শিক্ষার্থীর পিতা, পিতামহ জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিংবা গৃহশিক্ষকেরা শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করতেন।

শিক্ষার হার

অ্যাডামের যে বিবরণীর কথা উল্লেখ করা হল সেই বিবরণী অনুযায়ী তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে ৪০০ জন প্রতি এইরূপ একটি দেশীয় বিদ্যালয় ছিল, এবং বাংলা ও বিহারেই এগুলির মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। এই হিসাবের উপর নির্ভর করে বলা চলে যে সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষে দেশীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় একপ্রকার ছিলই না এবং যেটুকু সামান্য শিক্ষা মেয়েরা লাভ করত তা বাড়ীতেই করত। অ্যাডামের বিবরণী অনুযায়ী গড়ে প্রতি ৩১।৩২ জন ছেলের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং এমন কোনও গ্রাম ছিল না যেখানে একেবারেই শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেদের মধ্যে গড়ে ৭%বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত। অবশ্য অঞ্চলবিশেষে এর তারতম্য হত না একথা বলা চলে না এবং কোন

কোন অঞ্চলে শতকরা ১৬ জন পর্যন্ত ছেলে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেছে বলে জানা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তৎকালে গণশিক্ষা বিস্তারের মূল প্রতিষ্ঠানই ছিল এই দেশীয় বিদ্যালয়গুলি এবং কিছুটা পড়া, কিছুটা লেখা এবং কিছুটা গণিত চর্চার মাধ্যমে এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে তাদের বাস্তব জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা হত। এই বিদ্যালয়গুলিতে যে সব ছাত্র লেখা-পড়া শিখতে আসত তারা সাধারণত স্বল্পবিত্ত জমিদার, ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন চাষীঘর থেকেই আসত। বিশেষ করে এই শ্রেণীর লোকেরাই সেই সময় লেখা-পড়া শেখবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। অবশ্য নিম্নস্তরের নমঃশূদ্র, ধোবা, বাগ্‌দী ইত্যাদি শ্রেণীর ছেলেদেরও এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ ছিল এবং তাদের এ ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধা ছিল না। প্রধানত তৎকালীন গ্রাম্য জীবনের অর্থ নৈতিক তাগিদেই এইসব বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। সেই জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের প্রশ্ন কখনই প্রকট হয়ে উঠেনি এবং তার প্রয়োজনেরও তেমন উপলব্ধি হয়নি। জানা যায় যে, বিত্তবান জমিদার এবং ধনী ব্যক্তিবা মাঝে মাঝে এইসব বিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করতে কার্পণ্য করতেন না, কিন্তু এতে করে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হত না। প্রায়ই ছাত্র ও তাদের অভি-ভাবকদের যথাসাধ্য দক্ষিণার সাহায্যেই শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত।

শিক্ষার মান

সে যুগে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যাপক ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যাপকতা সত্ত্বেও শিক্ষাদানের মান খুব উন্নত ছিলনা। উপযুক্ত যোগ্যতাবর্জিত অর্ধ শিক্ষিত একটি মাত্র শিক্ষক এক একটি পাঠশালার শিক্ষাদানের সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। যে শিক্ষাপদ্ধতি তিনি অনুসরণ করতেন তা ছিল বৈচিত্র্যহীন। তাঁর শাস্তিদান প্রায় বর্বরোচিত হয়ে উঠত। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক-গুলি মোটেই সন্তোষজনক ছিল না এবং বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপাবেও প্রায় কোন নিয়মের বালাই ছিল না। ছুটিরও কোনরূপ নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছিল না। হিসাবনিকাশের তালিম, দরখাস্ত আর চিঠিপত্র লেখার ব্যবহারিক চর্চা ইত্যাদিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হত। মন্দিরে, আটচালার নীচে বা গাছতলায় পাঠশালা বসত। এইসব সত্বেও তখন কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়দের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল

এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কও অত্যন্ত গভীর এবং অন্তরঙ্গ ছিল। বিদ্যালয়গুলি আকারে ছোট হওয়ার ফলে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়া সহজ হত। অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এবং শিক্ষার মান যথেষ্ট নীচু হলেও এই সব গুণের জন্য সেই সময়কার দেশীয় বিদ্যালয়গুলি কার্যকারিতার দিক দিয়ে বিশেষ পশ্চাদপদ ছিল না। বরং অনেক ব্যাপারে এই বিদ্যালয়গুলি জনশিক্ষার আদর্শ মাধ্যম ছিল।

শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষাকাল

তৎকালীন দেশীয় বিদ্যালয়গুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে সেগুলিতে উপকরণের প্রাচুর্য একেবারেই ছিল না। ছাপা বই তো ছিলই না, তাছাড়া শ্লেট, পেন্সিল, তালপাতা ইত্যাদিও সব সময় ব্যবহৃত হত না। স্থানীয় প্রয়োজনানুসারেই বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম নির্ধারিত হত। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি হবার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না এবং যে কোন ছাত্র বৎসরের যে কোন সময়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করে যে কোন সময় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে পারত। দুই থেকে তিন বৎসর ছিল ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের কাল।

সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পড়ো-সর্দার (monitorial) প্রথা। শ্রেণীর মধ্যে যে ছাত্রকে শিক্ষক অগ্রগামী বা শাসনক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করতেন তাকে পড়ো-সর্দার নিযুক্ত করতেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে এই পড়ো-সর্দারই অধ্যাপনা ও পরিচালনার কাজ চালাত। মাদ্রাজে বিদ্যালয়গুলিতে এই ব্যবস্থার প্রচলন দেখে আকৃষ্ট হয়ে ডাঃ বেল নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে সেখানে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

গুণ ও দোষ

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে বহু পরিবর্তন ও ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে এই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল এবং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই থেকে এর অন্তর্নিহিত অসীম প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দোষ এই ছিল যে, এতে নারীশিক্ষার কোন আয়োজন ছিল না। তাছাড়া

শিক্ষকদের অনুপযোগিতা, নিম্নস্তরের পাঠক্রম এবং বর্বরোচিত শাস্তিদান প্রথাও এই শিক্ষাব্যবস্থার দোষ বলে গণ্য করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলি ছাড়াও, উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দুদের টোল ও মুসলমানদের মাদ্রাসা ছিল। এই সব টোল ও মাদ্রাসাগুলির জন্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বদান্য ব্যক্তিরা অর্থ সাহায্য করতেন। যথার্থ শিক্ষিত জ্ঞানী ও গুণী শিক্ষকেরা এই সব টোল ও মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করতেন এবং সেজন্য কোন পারিশ্রমিক নিতেন না এবং ছাত্ররাও সেখানে বিনাবেতনে অধ্যয়ন করত। টোলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা এবং মাদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সী কিংবা আরবী ভাষা। টোলে এবং মাদ্রাসায় ঐসব ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষাদান করা হত। সাধারণত মন্দিরে কিংবা মসজিদে বিদ্যালয় বসত। অনেক সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের গৃহে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে দিতেন। উচ্চশিক্ষার জন্য কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাকাল না থাকলেও সাধারণত শিক্ষার্থীদের দশ থেকে বার বৎসর পর্যন্ত এই শিক্ষালাভ করতে হত। বাংলাদেশের নদীয়ায় অবস্থিত উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রসমূহ এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে বিদেশীরা একে 'হিন্দুদের অক্সফোর্ড' বলে প্রশংসা করে গেছেন। নবদ্বীপ, মিথিলা বিক্রমপুর, ফরিদপুরের কোটালীপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলি সংস্কৃতের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থান খুব সুনাম অর্জন করেছিল। হিন্দুদের টোলে যে সব মহাপণ্ডিত অধ্যাপকেরা অধ্যাপনা করতেন তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন বড় ছিল না। প্রধানত ধর্মীয় ও আদর্শগত কারণই তাঁদের উদ্‌বুদ্ধ করত। অধ্যাপকদের সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এই সব টোলে শিক্ষার্থীরূপে যাঁরা আসতেন তাঁদেরও অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ। উচ্চশিক্ষার এইসব কেন্দ্রে মেয়েদের এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কোন স্থানই ছিল না। মাদ্রাসাগুলি মুসলমান পরিচালিত এবং মুসলমান-প্রাধান্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ফার্সী তৎকালে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছিল সেহেতু অনেক হিন্দুও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ফার্সীভাষা শিক্ষা করতেন। এই মাদ্রাসাগুলিও অবৈতনিক ছিল।

দেশীয় শিক্ষার অবনতি

ঠিক ব্রিটিশ শাসন পত্তন হওয়ার পূর্বে, প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই যে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হল তা অবর্ণনীয় দুর্দশায় পড়েছিল। আমরা জানি যে

ইংরাজ আমলের সূত্রপাতে ভারতবর্ষ শোচনীয় অরাজকতা এবং দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। তা থেকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাও মুক্ত থাকতে পারেনি এবং তার দ্রুত অবনতি ও ক্ষয় সুরু হয়ে গিয়েছিল। (এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যে রকম স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও সর্বপরিব্যাপ্ত ছিল তাতে এটা বোঝা কঠিন নয় যে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সহানুভূতি পেলে এই আড়ম্বরহীন, আপাতসামান্য, মিতব্যয়ী, শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রামপ্রধান বিশাল ভারতবর্ষের, বিশেষ করে দারিদ্র্যতাড়িত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার অভাব পূরণ করতে পারত এবং কালক্রমে একটি সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিণত হতে পারত। আত্মগর্বী বিদেশী শাসক কর্তৃপক্ষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি যে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই চিরাচরিত, পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাটি ধ্বংস করলে তার স্থান সহজে পূরণ করা সম্ভব হবে না এবং হঠকারিতার সঙ্গে এক সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষাধারা প্রবর্তন করলেই শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হবে না। যে কোন দেশের ঐতিহ্যগত, পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই যে তার পরবর্তীকালের উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার প্রমাণ পৃথিবীর উন্নতিশীল সব দেশেই পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের বেলাতেও এ সত্যের ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ভলাণ্টারী স্কুলগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদা ইংলণ্ডের এই সব ভলাণ্টারী স্কুলগুলি ভারতবর্ষের দেশীয় বিদ্যালয়গুলির মতই যথেষ্ট দোষযুক্ত ছিল, কিন্তু সেগুলিকে একেবারে বাতিল না করে তাদেরই সুপরিকল্পিত সংস্কার ও বিস্তারের ফলেই আজ ইংল্যাণ্ডের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পেরেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও দেশীয় বিদ্যালয়গুলি নিশ্চয়ই এই ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত এবং একথা অ্যাডাম, মনরো, টমাসন, এলফিনষ্টোন ইত্যাদি বিদেশী চিন্তাবিদ্‌রা স্বীকার শুধু করেন নি, এই বিষয়ে সুবিন্যস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যন্ত তাঁরা দাখিল করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৮৩৫ সালে বেণ্টিংকের প্রস্তাব এবং ১৮৫৪ সালে শিক্ষা ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে সুপরিকল্পিতভাবে এই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করা হল।

ধ্বংসের পরিণাম

তাঁদের উচ্চপ্রশংসিত নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত প্রবর্তিত করতে গিয়ে ইংরাজ শাসকবর্গ আশানুরূপ ফল পান নি। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই হচ্ছে যে এই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংস করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের একটি অতি কার্যকরী মাধ্যমই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা লুপ্ত

হওয়ার ফলে ভারতের জন শিক্ষাক্ষেত্রে যে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই শূন্যস্থান পূরণ করা নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে আজও সম্ভব হয়নি এবং কখনও হবে কিনা সন্দেহ। এর ফলস্বরূপ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে শিক্ষা পরিস্থিতি যা ছিল, বিশ শতকের গোড়ায়ও তার বিশেষ উন্নতি ত হয়নি বরং জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষতার হার আরও বেড়ে গেছল। ইংলণ্ডের গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজী ইংরাজদের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ১৫০ বছরে ভারতবর্ষে শিক্ষার অধঃপতনই ঘটেছে। তিনি দেখান যে ইংরাজশাসনের পূর্বে ভারতে জনগণের মধ্যে সাক্ষরতার যে হার ছিল, ১৫০ বছর ইংরাজ শাসনের পরে সে হার বাড়া দূরে থাকুক তা কমে গেছে। ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা দিক দিয়ে প্রচুর অগ্রসর হয়েছে অথচ তাদের তুলনায় শাসকদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতির ফলে ভারতবর্ষ নিতান্তই অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশ থেকে গেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the indigenous system of education in the Pre-British days.

2. Describe the nature and extent of indigenous system of education in the nineteenth century.

সাত

অ্যাড্যামের বিবরণী

১৮৩৫ সালে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্কটল্যাণ্ডবাসী মিশনারী ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম অ্যাড্যামকে বাংলাদেশের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত তিন বৎসর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাডাম পর পর তিনটি শিক্ষা বিবরণী দাখিল করেন। ১৮৩৫ সালের ১লা জুলাই তিনি প্রথম বিবরণীটি দাখিল করেন। দ্বিতীয়টি দাখিল করেন ১৮৩৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এবং তৃতীয় ও সর্বশেষটি ১৮৩৮ সালের ২৮শে এপ্রিল। এই বিবরণগুলিই হল সে যুগের দেশীয় শিক্ষার পরিস্থিতি সম্পর্কে একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্যলিপি। পরবর্তীকালে স্যার হার্টগ অ্যাড্যামের বিবরণীগুলিকে ভারতের জনশিক্ষা সম্পর্কে 'সুশৃঙ্খল আদমসুমারী' বলে প্রশংসা করেন।

প্রথম বিবরণী—১৮৩৫

অ্যাড্যাম যে প্রথম বিবরণীটি দাখিল করেন সেটিকে পূর্বেকার অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের সংক্ষিপ্তসার বলা চলে। এই বিবরণীতে বলা হয়েছে যে তখন বাংলা ও বিহারে কম করে ১,০০০,০০ গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল—অর্থাৎ কিনা প্রতি ৪০০ জনের জন্য অথবা প্রতি ৬৩ জন বিদ্যালয়-যোগদানোপযোগী শিশুর জন্য একটি করে বিদ্যালয় ছিল। এই একলক্ষ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব অনেকের নিকট ভয়ানক কাল্পনিক ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। কিন্তু অ্যাড্যামের বিবরণীতে 'স্কুল' শব্দটি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝলে একে আর 'মিথ্যা কল্পনা' বলে মনে হবে না। অ্যাড্যাম 'স্কুল' বলতে আধুনিক ধরনের সুসংগঠিত স্কুলকে বোঝান নি। তৎকালে সমষ্টিগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে যত রকমের শিক্ষা দান ও শিক্ষাচর্চার আয়োজন ছিল সে সবগুলিকেই তিনি 'স্কুল' নামে অভিহিত করেছেন। এতে বাড়ীতে শিক্ষার এবং বাড়ীর বাইরে শিক্ষার সকল প্রকার আয়োজনকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অ্যাড্যাম তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে প্রায় প্রতিটি গ্রামের জন্যই একটি করে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ছিল। অ্যাড্যামের উক্তির যথার্থতা পরে সরকারী তথ্য সংগ্রহের ফলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং দেখা গিয়েছিল যে

এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১½ লক্ষ। মনরো, ওয়ার্ড, ম্যালকম প্রভৃতি ব্যক্তিরা পূর্বেই যে বিবরণীসমূহ দাখিল করেন তাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এই অনুপাতে দেশীয় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিবরণী—১৮৩৫

তাঁর দ্বিতীয় বিবরণীতে অ্যাডাম রাজসাহী জেলার নাটোর থানার সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, নাটোর থানার ৪৮৫টি গ্রামে ২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ও সেই সব বিদ্যালয়ে ২৬২ ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করত। এ ছাড়া ১৫৮৮টি পরিবারে তাদের সন্তানাদির শিক্ষার জন্য নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন ছিল। নাটোর থানা অঞ্চলে অ্যাডাম ৩৮টি সংস্কৃত টোলেরও অস্তিত্ব দেখেছিলেন এবং সেই সব টোলে ৩৯৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত।

তৃতীয় বিবরণী—১৮৩৮

তৃতীয় বিবরণীতে অ্যাডাম শিক্ষার ব্যাপকতর একটি চিত্র দেবার চেষ্টা করেন এবং এই বিবরণীতে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত এবং দক্ষিণ বিহারের শিক্ষামূলক পরিসংখ্যান সম্পূর্ণভাবে স্থানলাভ করেছে। এই বিবরণীতে অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারণ সম্পর্কে তাঁর মতামত ও প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। বিবরণীতে বলা হয়েছে যে উপরোক্ত ঐ পাঁচটি জেলায় ২,৫৬৭টি বিদ্যালয়ে ৩০,৯১৫ জন পাঠগ্রহণ করত। সাত প্রকারের বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ঐ সমস্ত জেলায় পাওয়া যায়, যথা, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, ফর্মাল আরবী ও মহিলাদের বিদ্যালয়। অবশ্য মেয়েদের জন্য মাত্র ৬টি বিদ্যালয় ছিল। ১৯৩৫ সালে স্যার ফিলিপ হার্টগ অ্যাডামের বিবরণীর সমালোচনা করে বলেন যে, যদি অ্যাডামের এই তৃতীয় বিবরণীর পরিসংখ্যান থেকে শিক্ষাদানের ঘরোয়া মাধ্যম-গুলিকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা একলক্ষের অনেক কম। হার্টগের মতে অ্যাডামের বিবরণীতে একলক্ষ বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা একটা উপকথা মাত্র। কিন্তু সেই সময়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানরূপে শিক্ষার এই ঘরোয়া মাধ্যমগুলি না ধরার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না এবং সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরলে ৪০০ জন প্রতি একটি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর উপকথা বলে মনে হবে না। ফলে অ্যাডামের বিবরণীটিও গ্রহণযোগ্য হবে। বস্তুত অ্যাডামও প্রতিটি জেলার অন্তর্গত একটি করে থানা

অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করে দৃঢ়তার সঙ্গেই একই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছেন।

লিখন-পঠনক্ষমের হার

তাঁর বিবরণীতে তৎকালীন বাংলা দেশের লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তিদের একটা হিসাবও অ্যাডাম দিয়েছেন। লিখনপঠনক্ষম বয়স্ক ব্যক্তিদের অ্যাড্যাম ছটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং তার মধ্যে যারা সর্বশেষ ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তারা শুধু নিজেদের নাম স্বাক্ষর করতে পারত। অ্যাড্যামের মতে ৬টি থানা অঞ্চলের সমগ্র বয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ৬.২% এবং কেবল মাত্র বয়স্ক পুরুষ-জনসংখ্যার ১২.৬% লিখনপঠনক্ষম ছিল। এই হিসাবের সমালোচনা করে স্যার হার্টগ লিখনপঠনক্ষম বয়স্ক ব্যক্তিদের তালিকা থেকে শুধুমাত্র নাম-স্বাক্ষরসক্ষম ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে বয়স্ক পুরুষ-জনসংখ্যার মাত্র ৯.৪৫% এবং সমগ্র বয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ৪.৬৩% লোককে লিখনপঠনক্ষম বলে স্বীকার করতে রাজী নন। হার্টগের মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা চলে যে, সকল যুগের লিখনপঠনক্ষমতার ধারণা একরকম নয়। অ্যাড্যামের যুগে ছাপান বই ও কাগজের ব্যবহার একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। তখনকার লিখনপঠনক্ষমের মান এই যুগের মাপকাঠিতে বিচার না করে অ্যাড্যামের পরিগণনাটি গ্রহণ করা মোটেই ভুল হবে না।

উচ্চ ও প্রাথমিক স্কুল

অ্যাড্যামের বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে যুগে উচ্চ ও প্রাথমিক এই দুই শ্রেণীর দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতবর্গ যে সব টোল ও মাদ্রাসায় পড়াতেন সেগুলি উচ্চ বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হত এবং গ্রাম্য শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত পাঠশালা ও মক্তবগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হত। এই উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ই শাসকসম্প্রদায়, জমিদারবর্গ, ধনী ব্যক্তি ও জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হত। অধিকাংশ-ক্ষেত্রে মন্দির, মসজিদ অথবা ধনী ব্যক্তিদের বাসভবনে এই সব বিদ্যালয় বসত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এই বিদ্যালয়গুলি খুব দৃঢ়-ভিত্তিক ছিল না এবং শিক্ষাব্যবস্থায় এদের গুরুত্বও বিশেষ ছিল না। কারণ বিদ্যালয়গুলি শৃঙ্খলাবিহীন ও অসংবদ্ধ অবস্থায় প্রাচীন আদর্শ ও মতবাদের দ্বারা পূর্ণভাবে পরিচালিত হত ও

পুরুষানুক্রমিক ধর্মীয় নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কোন ক্রমে গতানুগতিক শিক্ষাধারা চালিয়ে যেত।

প্রাথমিক শিক্ষার মান

কিন্তু হাজার ক্রটী থাকা সত্ত্বেও গণশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অবদান ছিল অনস্বীকার্য এবং ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এর শিক্ষাকার্য আবদ্ধ থাকলেও এই শিক্ষাব্যবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট মূল্য ছিল। তৎকালীন ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী শিক্ষাদানে প্রাথমিক দেশীয় শিক্ষালয়গুলি যথেষ্টই সক্ষম ছিল এবং মূলত খানিকটা লিখন, পঠন ও গণিত চর্চার মাধ্যমেই সে শিক্ষা দেওয়া হত। দেশীয় উচ্চ বিত্যালয়ের শিক্ষকদের মত প্রাথমিক বিত্যালয়ের শিক্ষকদের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য বা বিত্যাবত্তা ছিল না এবং তাঁদের বেতনও উচ্চ বিত্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় কম ছিল। বহু ক্ষেত্রেই ছাত্রদের ব্যয় ভার শিক্ষকদেরই বহন করতে হত এবং কোনরূপ নির্দিষ্ট ছাত্র-বেতনের বন্দোবস্ত ছিল না।

শিক্ষার মান

এই সব দেশীয় বিত্যালয়ের প্রায় নিজস্ব কোন বিত্যালয়-ভবন ছিল না ও কোন সুনির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকও সেখানে অনুসরণ করা হত না। সুনির্ধারিত সময়ে নিয়মিত ক্লাশ বসার পরিবর্তে পাঠের সময়সূচী স্থানীয় সামাজিক প্রয়োজনানুসারে স্থিরীকৃত হত। যে সর্দার-পড়ো ব্যবস্থাতে আকৃষ্ট হয়ে ডাঃ বেল ঐ প্রথাটি ইংল্যাণ্ডে প্রবর্তন করেন, সেটি সাধারণত বড় ধরনের বিত্যালয়েই প্রচলিত ছিল। হয় অর্থ, নয় সামগ্রীর দ্বারা শিক্ষকদের পরিশ্রমিক দেওয়া হত এবং এই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ছিল না। বিত্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি হওয়ার কোন রীতি না থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রামের বিত্যালয়ে মেয়েদের পৃথক অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। নানা ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও এই সব বিত্যালয়ে লিখন, পঠন ও গণিতের শিক্ষাদানের কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবেই চলত। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিত্যালয়গুলির স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতা ছিল বলেই তা অসংখ্য বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অসীম প্রাণশক্তি অর্জন করতে পেরেছিল।

অ্যাড্যামের সুপারিশ—১৮৩৫

অ্যাড্যাম বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষে জনশিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এই দীর্ঘকাল অবহেলিত দেশীয় বিত্যালয়গুলিকে অগ্রাহ্য না করে বরং তাদের উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে মন দিতে হবে। তিনি উপলব্ধি

করেছিলেন যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে টি'কে থাকার ক্ষমতাসম্পন্ন এইসব দেশীয় ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যথার্থ পুনরুজ্জীবন করতে পারলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সত্যকার উন্নতি হবে। সেজন্য অ্যাড্যাম তাঁর সুপারিশে এই দেশীয় বিদ্যালয়গুলির পুনরুজ্জীবনের পরামর্শ দেন এবং বলেন যে এগুলিকে উন্নত করতে পারলে শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় হবে, অর্থের সাশ্রয় হবে ও অতি অল্পসময়ে সাফল্য আসবে। এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য অ্যাড্যাম কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেন। যথা—

(১) এই পন্থায় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমেই কয়েকটি জেলা নির্বাচন করে তথাকার শিক্ষাব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী ভারতীয় ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন করতে হবে।

(৩) সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে সেজন্য প্রতি জেলায় একজন করে প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিয়োগ করতে হবে।

(৪) এই প্রধান কর্মকর্তার প্রাথমিক কর্তব্য হবে নিজ অঞ্চলের তথ্যসংগ্রহ করা, শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত ও মিলিত হওয়া, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা, পরীক্ষা পরিচালনা করা, পারিতোষিক ও পুরস্কার বিতরণ করা এবং সামগ্রিক ভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।

(৫) শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি অঞ্চলে শিক্ষণ বিদ্যালয় (Normal School) স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে প্রতি বছর ১ মাস থেকে ৩ মাস পর্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। চার বছরের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষক যাতে এই শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন সেজন্য তাঁদের সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে।

অ্যাড্যাম কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত সুপারিশগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান ও সুচিন্তিত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং এগুলি যথাযথভাবে অনুসৃত হলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবধারিতভাবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হত। কিন্তু লর্ড মেকলে ইউরোপের শিক্ষাসম্পদের তুলনায় তখনকার ভারতীয় শিক্ষাসম্পদকে এতই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে এ ধরনের পরিকল্পনার সার্থকতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নি। সেই সময়ের ভারতের বড়লাট লর্ড বেণ্টিংকও এই দেশীয় শিক্ষার পরিকল্পনার মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফলে তিনি মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী

অ্যাডামের সুচিন্তিত পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন এবং দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একেবারে বাতিল করে ইংরাজী শিক্ষার প্রচার করেন। এরপর অবশ্য ১৮৫৪ সালের শিক্ষা ডেসপ্যাচে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সংরক্ষণের কথা আর একবার উল্লেখ করা হয়েছিল এবং ১৮৮২-৮৩ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও দেশীয় বিদ্যালয়ের দুর্দশা ও তাদের ক্রমাবনতি ও ধ্বংসোন্মুখতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার নির্দেশ, পরিকল্পনা এবং শিক্ষাবিদদের সমস্ত সতর্কবাণী ও সুপারিশ শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই এই সুপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

প্রশ্নাবলী

1. What picture of the Indigenous Education in India do you get from Adam's Reports ? (B. T. 1942. 1950)

2. What were the proposals of William Adam for the reorganisation of education in Bengal ? What happened of these proposals and what were their consequences ? (B.T. 1952)

3. Give a short account of the Adam's Reports and discuss the nature of education that prevailed in Pre-British India.

আট

মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা

ক্রুসেডের পর প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে এবং তার অতুলনীয় ধনসম্পদ কাহিনী পাশ্চাত্যের অভিযানকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুরু করে। বিশেষ করে স্বর্ণময় ভারতের বিপুল বৈভবের কাহিনী ইউরোপীয় বণিকদের লোলুপতার ইন্ধন যোগায় এবং ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করার তোড়জোড় সুরু হয়ে যায়। ভাস্কো ডা গামা যখন ১৪৯৮ সালে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করলেন তার পর থেকে নানাজাতির ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যতরী ভারতের উপকূলে ভিড়তে সুরু করল। বণিকদের সঙ্গে ধর্মযাজকেরাও আসতে সুরু করলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এবং ভারতে ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার সেই থেকে হল প্রথম সুরু। সর্বপ্রথম পর্তুগীজ বণিকেরাই ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে আসেন এবং তাবপর দিনেমার, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকেরাও একের পর এক এদেশে ভিড় করতে সুরু করলেন। বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁদের অনেককে দীর্ঘকাল এবং বহুক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে এদেশে বাস কতে হত। সেজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপডার জন্য স্কুল খোলার। তা ছাড়া ইউবোপীয় বণিকদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে সব ধর্মযাজকেরা ভারতে পদার্পণ করতে সুরু করেন তাঁরাও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের অপরিহার্য উপকরণরূপে শিক্ষাবিস্তারকে গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রচার করলে দেশীয় জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে অনুপ্রাণিত করা যাবে এই ভেবে দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা সুরু হল। অনেকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাগুলি শিখলেন এবং সেই সব ভাষায় অভিধান ব্যাকরণ ইত্যাদিও লিখলেন। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরাই এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন এবং সেজন্য তাঁদেরই আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা চলতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত জেসুইট ধর্মযাজক ও প্রচারক ও সেণ্ট জেভিয়ারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে

আসেন এবং আজও ভারতের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর নাম বহন করছে। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের কৃতিত্ব পর্তুগীজদেরই। তাঁরা ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বই ছাপার জন্য ভারতবর্ষের গোয়াতে এদেশের প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপন করেন।

মিশনারী ধারা, ১৬৯৮

অন্য সমস্ত ইউরোপীয় বণিকসম্প্রদায়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করে ইংরাজ বণিকেরা যখন ভারতে প্রাধান্য লাভ করতে সুরু করল সেই সময়েই ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা এবং তৎসহ ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টও ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সুরু করলেন। ফলে ১৬৯৮ সালে কোম্পানীর সনদ আইন (Charter Act) পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার সময় পার্লামেণ্ট কর্তৃক তাতে মিশনারী সংক্রান্ত একটি ধারা সন্নিবিষ্ট হল। এই ধারাতে কোম্পানীকে নির্দেশ দেওয়া হল যে, ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদের বাণিজ্য-কর্মশালাগুলিতে ধর্মযাজক নিযুক্ত করতে হবে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে স্কুলও স্থাপন করতে হবে। কোম্পানীর হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও তাদের ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্য নিয়েই যে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মিশনারী শিক্ষার বিস্তার ও কোম্পানীর সহায়তা

এই মিশনারী ধারাটি প্রবর্তনের ফলে ভারতে মিশনারীদের শিক্ষামূলক কার্যকলাপ প্রচুর বৃদ্ধি পেতে সুরু করে এবং এরই ফলে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় জ্ঞান-প্রচার সমিতি (Society for Promoting Christian Knowledge) স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতির উদ্যোগে অনেকগুলি দাতব্য-বিদ্যালয় (Charity School) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন হচ্ছে ১৭১৫ সালে রেভারেণ্ড ষ্টিভেন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের সেণ্ট মেরিজ চ্যারিটি স্কুল। স্বনামধন্য মিশনারীদ্বয় জিগেনবাল্গ ও প্লুসৎসাউ ১৭১৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে সর্বপ্রথম শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া তামিল ভাষায় বই ছাপাবার জন্য তাঁরা একটি ছাপাখানা খোলেন ও ১৭১৭সালে মাদ্রাজে দুটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত করেন। ১৭১৯ সালে রেভারেণ্ড কোবের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে এবং ১৭২০ সালে বেলামীর প্রচেষ্টায় কলকাতায় একটি করে চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত হয়। এঁদের পর কার্নাণ্ডার ও শোয়াৎসে নামে দুজন মিশনারী শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়েছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। ১৭৪২ সালে এঁরা ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, রামনাদ প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি ইংরাজী চ্যারিটি স্কুল স্থাপন

করেছিলেন। এঁদের কাজে খুশি হয়ে মহীশূরের হায়দার আলি পর্যাপ্ত অর্থ দিয়ে এঁদের সহায়তা করেছিলেন। কায়র্নাণ্ডারের কাজে খুশি হয়ে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে ১৭৫৮ সালে কলকাতায় আমন্ত্রণ করে আনেন এবং কায়র্নাণ্ডার কলকাতায় একটি চ্যারিটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৭৮৭ সালে ডাঃ এণ্ডরুজ বেল মাদ্রাজে একটি মহিলা অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। এই চ্যারিটি স্কুলগুলি নানাভাবে কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা পেত, যেমন—

(১) স্কুলগুলির পৌনঃপুনিক খরচের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হত ;

(২) লটারীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে স্কুল চালাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হত ;

(৩) স্কুল-ভবন নির্মাণকল্পে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়া হত ;

(৪) স্কুল-ভবন মেরামতের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হত ;

(৫) স্কুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ উচ্চ সুদ হারে কোম্পানীর কাছ জমা রাখা যেত।

মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত এই সমস্ত স্কুলে প্রধানত ইংরাজীর চলন থাকলেও ভারতীয় ভাষাতেই নানা বিষয় শেখান হত। এই সকল কারণে এই স্কুলগুলি যে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ও প্রীতি স্থাপনের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্বপক্ষে থাকাতে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ও ইংরাজশাসকবর্গ প্রথম দিকে মিশনারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থসাহায্যের ব্যাপারে মুক্তহস্ত ছিলেন। ফরাসীরা পণ্ডিচেরী, মাহে, ইয়েনান ও চন্দননগরে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে কিছু কিছু ফরাসী ভাষা শেখানো হত এবং তাতে ভারতীয়দেরও শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হত। ফরাসীদের স্থাপিত পণ্ডিচেরীর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে কোন ধর্মের ছেলেরা ভর্তি হতে পারত। বিনা খরচায় তাদের খাওয়া-পরা, বই, শ্লেট কেনার বন্দোবস্ত ঐ স্কুলে ছিল এবং স্কুলটিতে পড়াশোনার মানও বেশ উন্নত ছিল।

মিশনারী ও কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষ

ভারতে পদার্পণ করে মিশনারীরা ভারতবাসীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার-আচ্ছন্ন এক অনুন্নত জাতিরূপে দেখতে পান। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ আধিপত্যের সময় ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত ছিল। ভারতবাসীদের

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের অজ্ঞতা ও মানসিক দৈন্য থেকে উদ্ধার করা মিশনারীরা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

এই ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে নিয়েই তাঁরা প্রধানত অশিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করেছিলেন এবং যাতে তারা বাইবেল পড়তে সমর্থ হয় তার জন্য তাদের সাক্ষর করে তোলা, তাদের জন্য স্কুল খোলা ও দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করা, ছাপাখানা খোলা ইত্যাদি কাজগুলি তাঁরা ধর্মপ্রচারের অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টধর্মে নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের যাতে জীবিকা-অর্জনের ব্যবস্থা হয় সেজন্য কারিগরী স্কুল খোলা ও সরকারী চাকুরী জোগাড় করে দেবার দায়িত্বও তাঁরা নিয়েছিলেন।

মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত নানাভাবে কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও কোম্পানী এদেশে শাসন ক্ষমতা অধিক পরিমাণে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারীদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব ক্রমশ কমে আসতে লাগল। এর কারণ হল যে, শাসকরূপে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোম্পানী রাজনৈতিক শান্তি বজায় রাখার দিকে বেশী মনোযোগ দিলেন এবং শাসিতের ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখা ও সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকাই যে শান্তিতে দেশশাসনের পক্ষে কার্যকরী নীতি এটা তাঁরা উপলব্ধি করলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধির চেয়ে ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত মিশনারীরা তাঁদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকার্য স্থগিত রাখতে চাইলেন না। ফলে অনিবার্য ভাবে মিশনারীদের সঙ্গে কোম্পানীর সংঘর্ষ দেখা দিল। কোম্পানী মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং যে সমস্ত সুযোগসুবিধা মিশনারীরা ভোগ করতেন সে সমস্ত থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে মিশনারীদের সমর্থক উইলবারফোর্স এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় তুললেন কিন্তু হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা সমুচিত হবে না এই সিদ্ধান্ত করে পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধেই মত দিলেন।

শ্রীরামপুর ত্রয়ী—কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ড

কোম্পানীর শাসকবর্গ দক্ষিণ ভারতে মিশনারীদের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টায় বিশেষ বাধা না দিলেও বাংলাদেশে মিশনারীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবেই বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে দেখতে পাই যে, ১৭৯৯ সালে উইলিয়াম কেরী

কলকাতায় ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টায় কোম্পানীর কাছে বাধা পেয়ে মার্সম্যান ও ওয়ার্ড নামে আর দুজন বিশিষ্ট মিশনারীর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শ্রীরামপুর তখন ওলন্দাজদের অধীনস্থ থাকায় সেখানে তাঁরা বিনা বাধায় ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত হতে পারলেন। শ্রীরামপুরে এই তিনজন মিশনারী যে সব উল্লেখযোগ্য শিক্ষামূলক কাজ করে গিয়েছেন, তার জন্য আজও তাঁরা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে "শ্রীরামপুর ত্রয়ী" (Serampore Trio) নামে অমর হয়ে আছেন। তিনজনের মধ্যে ডাঃ কেরী ছিলেন প্রচার-দক্ষ, ওয়ার্ড পুস্তক মুদ্রণ-পারদর্শী এবং মার্সম্যান অতি সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। অক্লান্তকর্মী এই ত্রয়ী ৩১টি ভারতীয় ভাষা ও উপভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করে তা মুদ্রিত করেছিলেন। তাছাড়া কয়েকখানি কলেজের পাঠ্যপুস্তকও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। ইংরাজ কোম্পানী কিন্তু তখন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মাদর্শকে আঘাত না করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবেই অভিযান চালাতে সুরু করেছিলেন। নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই ভারতীয়দের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে কাশীতে বেনারস সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তার ফলে বাংলাদেশে মিশনারী ধর্মপ্রচারকদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই ধর্মপ্রচারের কাজ চালাতে হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের সঙ্গে মিশনারীদের স্থাপিত স্কুলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিশনারীরা গোড়ার দিকে দেশীয় শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু পরে কোম্পানীর স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁরাও তাঁদের স্কুলে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপেই প্রবর্তন করেন।

গ্রান্টের মন্তব্য—১৭৯২

কোম্পানীর এই মিশনারী-বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করে, ইংলণ্ডে চার্লস গ্রাণ্ট নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক 'অবজারভেসনস' (Observations) শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তিকায় তিনি তৎকালীন ভারতীয় সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতিত অবস্থার এক শোচনীয় চিত্র অঙ্কিত করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য সেখানে অবিলম্বে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে

ভারতের শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়ন হবে। গ্রাণ্ট এ-কথাও বলেন যে ভারতবাসীকে দাস করে রাখার জন্য তাদের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত করে রাখা উচিত হবে না। অবশ্য গ্রাণ্টের এই ভারতসংক্রান্ত বিবরণী যে তাঁর প্রচণ্ড অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং তাঁর বিবরণীতে ভারতীয়দের অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার কাহিনীও সব দিক দিয়ে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ছিল। তা সত্ত্বেও গ্রাণ্টের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ ছিল না। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের কল্যাণকর উদ্দেশ্যেই তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর এই প্রচেষ্টার প্রচুর ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। কারণ ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে তাঁর এই তীব্র মন্তব্য ইংল্যাণ্ডের শাসকসমাজকে বিশেষ ভাবেই বিচলিত করেছিল। গ্রাণ্টের বক্তব্যের মূলকথা এই ছিল যে, ভারতে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্বটা সরকারেরই দায়িত্ব এবং ১৮১৩ সালে চার্টার আইন পুনপ্রবর্তিত হবার সময় দেখা গেল যে সরকার আংশিকভাবে এই নীতি মেনে নিয়েছেন।

মিণ্টোর বিবরণী—১৮১১

ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে গ্রাণ্টের মন্তব্য মিশনারীদের মনে পুনবায় আশা ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। এদিকে ভারতে ইংরাজশাসনের ভিত্তি যথেষ্ট সুদৃঢ় হওয়াতে মিশনারীদের প্রতি কোম্পানী উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে সুরু করলেন। কোম্পানীও প্রাচ্যে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে কিছু পরিমাণে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো ১৮১১ সালে একটি বিবরণী দাখিল করে তাতে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করলেন।

সনদ আইন—১৮১৩

মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে যে সন্দেহ, বাদানুবাদ ও বিরোধিতা ভারত ও ইংলণ্ডের আবহাওয়াকে আলোড়িত করেছিল প্রধানত তারই ফলস্বরূপ ১৮১৩ সালে যে সনদ আইনটি (Charter Act) পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল সেই সনদে 'ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়া হল'। এই সনদে এ কথাও উল্লেখ করা হল যে, শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই এবং 'ভারতীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তার ও সাহিত্যের উজ্জীবনের উদ্দেশ্যে' বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হল। এই সনদ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়

স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৯ সালে এঁদেরই একজনের মহানুভবতায় কলকাতায় বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫০ সালে মিশনারীদের পরিচালনাধীনে মাদ্রাজে ৭টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। তবে কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল ধীরে ধীরে যত বেশী করে দেখা দিতে লাগল, ছাত্ররাও তত মিশনারী স্কুল ছেড়ে এই সব স্কুলেই ভীড় করতে সুরু করল। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে মিশনারীরা দাবী করলেন যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের বিদায় নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মিশনারীদের দাবী

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের অপসারণের উদ্দেশ্যে মিশনারীরা কয়েকটি দাবী উত্থাপন করেন, যেমন—(ক) ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট কোন স্কুল পরিচালনা করে না এবং সেইমত কোম্পানীরও ভারতে কোন স্কুল পরিচালনা করা উচিত নয়, (খ) ইংলণ্ডে দরিদ্র বালক বালিকাদের শিক্ষার ভার চার্চ গ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষেও চার্চকে সেই দায়িত্ব নিতে দেওয়া উচিত, (গ) এই সমস্ত বিবেচনা করে কোম্পানীর উচিত যে মিশনারী পরিচালিত স্কুলগুলির উপর থেকে কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করা এবং (ঘ) মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলগুলিকে যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য দেওয়া।

উডের ডেসপ্যাচ—১৮৫৪

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত উডের ডেসপ্যাচ পাঠে মনে হয় ব্রিটিশ সরকার যেন মিশনারীদের এই সব দাবী পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছেন এবং এর দ্বারা মিশনারীদের জয়ই সূচীত হয়। অবশ্য এই ডেসপ্যাচ রচনায় ডাফের যে প্রভাব ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে শিক্ষায় ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করায় মিশনারীরা এতে পুরোপরি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭

এর পর এল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহ মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টায় একটা নতুন অন্তরায় সৃষ্টি করল। কেননা বিদ্রোহের অন্যান্য কারণের মধ্যে ভারতীয়দের ধর্মনাশের ভীতি একটা বড় কারণ ছিল। বিদ্রোহের অনেক আগে থেকেই দেশীয় জনসাধারণ, মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণের সকল চেষ্টাকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখত এবং বিদ্রোহ সুরু হবার পর সে সন্দেহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। লর্ড এলেনবারো ১৮৫৮ সালে যে ডেসপ্যাচ পাঠান, তাতেও এই অভিমতই প্রকাশ করা হয়েছিল। সিপাহী

বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের মহারাণীর বিখ্যাত ঘোষণায় ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অবিসংবাদিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হল এবং তার ফলে মিশনারীদের ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিপত্যের আশা একেবারে নির্মূল হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সরকার কর্তৃক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মিশনারী পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলিকে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তাতে মিশনারীদের কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। তাছাড়া যখন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক সমূহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পাঠ্য রূপে গৃহীত হল তখন মিশনারীদের প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকসমূহ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাতে সুরু করল। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থবণ্টন নীতি এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্কুল-ইন্সপেক্টরদের স্কুল পরিদর্শন নীতিও মিশনারীদের কাছে আপত্তিজনক বলে মনে হল এবং এতে তাঁরা বিশেষ অসন্তুষ্টও হলেন। এই সব কারণে ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচে নীতিগতভাবে যাই থাকুক না কেন, কার্যত তা মিশনারীদের কাছে মরীচিকামাত্র হয়ে রইল।

মিশনারীগণ অবশ্য এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যেমন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬০); লাহোরের ফরম্যান কলেজ (১৮৬৪); বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬৯); লক্ষ্ণৌয়ের রীড কলেজ (১৮৭৭) এবং দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজ (১৮৮২)। কিন্তু ১৮৫৮ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে সরকার কিংবা জনসমাজ কারোরই সক্রিয় সহযোগিতা এবং সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি। সর্বোপরি সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণায় এদেশে শাসন ব্যাপারে কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হলে তা মিশনারীদের ধর্মান্তকরণ প্রচেষ্টারমূলে কুঠারাঘাত করে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মিশনারীরা ভারতীয় সমাজের নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও নারী শিক্ষাতেই আত্মনিয়োগ করলেন। তার ফলে মিশনারীদের প্রচেষ্টার দ্বারাই এদেশে অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব হল। ১৮৫২ সালে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার ছিল এবং ১৮৮২ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

হাণ্টার কমিশন—১৮৮২

নানা প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও মিশনারীরা হতাশ না হয়ে তাঁদের পূর্ব মর্যাদা ফিরে পাবার জন্য ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন সুরু করলেন এবং

তাঁদের নানা দাবী উত্থাপিত করার ফলে ১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত হয়। কিন্তু কার্যত এই কমিশন যে সব সুপারিশ করলেন তাঁর ফলে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। হাণ্টার কমিশনের তদন্তের একটি প্রধান বিষয় ছিল এই যে, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের অপসরণ করা উচিত কিনা এবং করলে দেশের শিক্ষার ভার মিশনারীদের হাতে ন্যস্ত করা ঠিক হবে কিনা। অনুসন্ধান ও আলোচনার পর কমিশন যদিও স্থির করলেন যে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের ক্রম-অপসরণ নীতি গ্রহণ করা উচিত, তবুও কমিশন সুপারিশ করলেন যে, শিক্ষার দায়িত্ব মিশনারীদের হাতে তুলে না দিয়ে অন্য কোন যোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে তা ন্যস্ত করাই ঠিক হবে।

মিশনারী সম্মেলন

১৮৭২ সালে এলাহাবাদে যে মিশনারী সম্মেলন হয় তাতে অনেক মিশনারীই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে স্কুল-কলেজে পড়ানটাই মিশনারীদের প্রকৃত কাজ নয়। এর পর ১৮৮২ সালে কলকাতায় এবং ১৮৯২ সালে বোম্বাইতে মিশনারীদের যে সম্মেলন হয় সেখানেও বহু মিশনারী দৃঢ়তার সঙ্গেই ঐ জাতীয় অভিমত প্রকাশ করেন। এই সকল সম্মেলনের ফলে মিশনারীরা এর পর থেকে তাঁদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি আদর্শ স্কুল কলেজ পরিচালনার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রধানত অবহেলিত আদিবাসী, পার্বত্যজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাদানে কেন্দ্রীভূত হয়। এই সব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে সুরু করে। অবশ্য হাণ্টার কমিশনের পরেও মিশনারীদের উদ্যোগে ভারতে কয়েকটি আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন—ইন্দোরের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ (১৮৮৪), শিয়াল-কোটের মারে কলেজ (১৮৮৯); কানপুরের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ (১৮৯২) এবং রাওয়ালপিণ্ডির গর্ডন কলেজ (১৮৯৩)।

ফ্রেজার কমিশন—১৯১৯

মিশনারীরা গণশিক্ষার দিকে মনোযোগ দেবার পর ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেন। ১৯১৯ সালে রেভারেণ্ড ফ্রেজার নামে একজন মিশনারীর নেতৃত্বে এই উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী কমিশন নিযুক্ত হয়। তদন্তের পর ফ্রেজার কমিশন এই মত প্রকাশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা শোচনীয়ভাবে অপচয় ও অনুন্নয়নের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এর

প্রতিকারকল্পে কমিশন সুপারিশ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে বৃত্তিমূলক আবাসিক স্কুল স্থাপন করতে হবে এবং মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষণ ও ধর্মশিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্রেজার কমিশনের সুপারিশের কার্যকারিতা সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আজ স্বাধীন ভারতে সমস্ত মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ফ্রেজার কমিশনের সুপারিশগুলিকেই কাজে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। ১৯১৭ সালে ফ্রেজার কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র ভারতে মিশনারী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১০,৪৬১টি ; এর মধ্যে ছিল ৪২টি কলেজ, ৮৪৩টি মাধ্যমিক স্কুল, ৭৫টি ট্রেনিং স্কুল, ৯,২৫৯টি প্রাথমিক স্কুল এবং ২৪২টি অন্যান্য স্কুল। এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫,৩৩,৯৫৪ জন এবং বার্ষিক খরচ (১৯১৭ সালে) হয় ১,৩৮,০০,৪৭৫ টাকা। মিশনারীরা ফ্রেজার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে সুরু করলে দেশে অনেকগুলি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ও সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠতে পেরেছিল যদিও অর্থাভাবে সে ব্যাপারে আশানুরূপ অগ্রসর হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মিশনারীদের মধ্যে আবার অনেকে এই অভিমতও প্রকাশ করেছিলেন যে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে জনশিক্ষার প্রসার ও খৃষ্টধর্মের প্রচার করলে চার্চের অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

পিকেট কমিশন—১৯২৮

অবশ্য এ বিষয়ে মিশনারীদের মধ্যে এত পরস্পরবিরোধী অভিমত দেখা যায় যে, ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশদভাবে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে ডাঃ পিকেটের নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে আর একটি বেসরকারী কমিশন নিযুক্ত হয়। পিকেট কমিশন কর্তৃক সমাজের নিম্নস্তরে গণশিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় এবং মিশনারীরা এ ব্যাপারে পূর্ণোদ্যমে কাজে নামেন।

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার

শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপারে মিশনারীরা এই সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ফলে দেশের নানাস্থানে শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, যেমন—পাঞ্জাবের মোগা, দাক্ষিণাত্যের দোরকানল, এলাহাবাদের কৃষি কলেজ, ত্রিবাঙ্কুরের আলবায়ি কলেজ। এছাড়া হায়দ্রাবাদের মেদক ও বোম্বাইয়ের আংক্লেশ্বরেও কয়েকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

লিণ্ডসে কমিশন—১৯২৯

মিশনারীরা জনশিক্ষা বিস্তারেই শুধু সন্তুষ্ট থাকেন নি এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কেও তাঁদের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং ১৯২৯ সালে আগ্রাতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্মেলনে তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফল-স্বরূপ ডাঃ লিণ্ডসের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৯৩১ সালে প্রকাশিত লিণ্ডসে কমিশনের বিবরণীতে বলা হয় যে মিশনারীদের পরিচালিত কলেজগুলিতে প্রকৃত খ্রীষ্টীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি এবং সেগুলিতে খ্রীষ্টান ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যাও নগণ্য। এইসব ছাত্ররা দরিদ্রতার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাশ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টাই করে, জীবনের প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে তারা কোন উৎসাহ দেখায় না। কলেজের মধ্যেই যাতে যথেষ্ট গবেষণামূলক কাজ সম্পন্ন করা যায় তার আয়োজন করতে হবে। তাছাড়া ধর্মশিক্ষা দেওয়া, সম্মিলিত, সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক আয়োজন করার সম্পর্কেও কমিশন সুপারিশ করেন।

স্বাধীনতার পর

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও মিশনারীদের শিক্ষা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং বর্তমানে তাঁরা দেশের মধ্যে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার জন্য মোগা, সালেম, মেদক, আংক্লেশ্বর, দোরনাকল প্রভৃতি স্থানে তাঁদের প্রচেষ্টা অপ্রতিহত রয়েছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে গৃহীত তথ্যানুযায়ী সেই সময়ে ভারতবর্ষের ১৪,৩৪১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিশনারীদের পরিচালনাধীনে ছিল এবং সেগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১,১৮,২০০ জন এবং ঐ বৎসর শিক্ষাখাতে তাঁরা ব্যয় করেছিলেন ৩,৮২,০১,২৪১ টাকা। স্বাধীন হবার পর মিশনারীদের পরিকল্পিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা আজ স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটা বড় অঙ্গ হয়ে আছে।

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের অবদান

মিশনারীদের অবদান বহুমুখী। শিক্ষার সংগঠন থেকে সুরু করে বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সাজসরঞ্জাম সবের উপরই মিশনারীদের চিরস্থায়ী প্রভাব রয়ে গেছে। মিশনারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্লাশ,

পিরিয়ড প্রভৃতি আধুনিক কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের কোনও প্রচলন ছিল না, কারণ তখন বই ছাপাই হত না। সেজন্যই প্রধানত মিশনারীদের চেষ্টার ফলেই এদেশে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়ানো, পাঠ্যপুস্তক রচনা করা ও তা পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি প্রথার সুরু হয়। মিশনারীদের দ্বারাই রবিবারটি ছুটির দিন রূপে ধার্য হয় এবং প্রাচীন পাঠশালায় একজনমাত্র গুরুমহাশয় ও একটিমাত্র মিশ্রিত ক্লাশের পরিবর্তে একাধিক শিক্ষক ও বিভিন্ন ক্লাশ-ব্যবস্থা-সম্পন্ন বিদ্যালয় তাঁদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়। বিশেষ করে নারীশিক্ষার বিস্তার ও অনাথ বালক-বালিকাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে মিশনারীদের দান অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। মিশনারীরা এদেশে এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও তাঁরা আরেক দিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন বলা যেতে পারে। কারণ তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধর্মীয় শিক্ষাদান তুলে দেন নি তো বটেই, বরং তাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহ নেই তাঁদের ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান খ্রীষ্টধর্মকেন্দ্রিক ছিল এবং ছাত্রদের খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করানো ও খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াতেই তাঁদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ ছিল। তবু শিক্ষায় ধর্মশিক্ষার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে তাঁরা যে শিক্ষাবিদ্‌দের অবহিত করে রেখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া খুব বড় ক্লাশ না নিয়ে ছোট ছোট ছাত্রদলকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় ধারা আর একদিক দিয়ে বজায় রেখেছিলেন বলা যেতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Bring out the cnotribution of the missionaries to the development of education in nineteenth century in India.

(B. T. 1951)

2. Give a brief account of the educational activities of the Christian missionaries and the East India Company in Bengal and Madras prior to 1814. (B. A. 1956 ; B.T. 1957)

3. Describe the history of educational effort of the missionaries during the rule of East India Company in Bengal.

(B. A. 1958)

4. Give a brief account of the educational enterprises by the early Christian missionaries in India since 1835.

(B.A. 1960)

নয়

শিক্ষার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব

১৮১৩ সালের যে সনদ আইন প্রবর্তিত হয় তাতে আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের অর্থাৎ তৎকালীন ভারতশাসক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। সনদ আইনের ৪৩ ধারায় ভারতের জনশিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রয়োজনের অনুপাতে এ টাকা যে নিতান্তই সামান্য ছিল তা বলা বাহুল্য। তবুও বিদেশী শাসকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেশীয় প্রজাদের শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করে যে এই অর্থ বরাদ্দ করেন তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য ছিল। এই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা সম্পর্কে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সনদ আইনে এমন দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল যে তা প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী অর্ধশতাব্দী ধরে তা নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। সনদ আইনের অর্থবরাদ্দ ও অর্থব্যয়ের ধারাটিতে বলা হয়েছিল যে, 'বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা ভারতবর্ষের শিক্ষিত অধিবাসীদের উৎসাহদান, সাহিত্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবন এবং ভারতের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হবে।' ধারাটির উপরোক্ত ভাবানুবাদ পড়লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নি। শিক্ষার পদ্ধতি কি হবে, প্রকৃত পাঠ্যবিষয় কি হবে, কোন্ ভাষা তার মাধ্যম হবে সে সব সম্বন্ধে ধারাটিতে কোনরূপ নির্দেশই নেই। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য, শিক্ষার ভাষামাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল ও বিভিন্ন দলের মধ্যে তিক্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য নিয়ে যখন বিতর্ক দেখা দিল তখন অনেকে বললেন যে ব্রিটিশ শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে ভারতবাসীর প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞার ভাণ্ডারটিকে সুসমৃদ্ধ ও পুষ্ট করে তোলা। আবার কেউ কেউ এই মত প্রকাশ করলেন যে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার আয়োজন করাই ব্রিটিশ শাসকদের প্রধান কর্তব্য। অনেকে আবার মন্তব্য করলেন যে, ভারতবাসীদের কোম্পানীর কাজের উপযোগী করে তোলাই ব্রিটিশ শাসকদের

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে এ নিয়েও তিনটি মত গড়ে উঠল—যেমন, (১) মিশনারীদের মাধ্যমে শিক্ষাদান; (২) দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন করে তাদের মাধ্যমে শিক্ষাদান; (৩) কোম্পানীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নতুন স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষার বিস্তার কি পন্থায় হবে তা নিয়েও দুটি বিভিন্ন মত দেখা দিল—(১) একদলের মত ছিল এই যে, ভারতবর্ষের সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষিত করলেই ক্রমে শিক্ষা তাদের মধ্যে দিয়ে পরিস্রুত হয়ে সমাজের নিম্নস্তরের জনমণ্ডলীর কাছেও পৌছবে এবং এই মতকেই কেন্দ্র করে বিখ্যাত "নিম্নমুখী পরিস্রুতি মতবাদ" (Downward Filtration Theory) গড়ে উঠেছিল। প্রসিদ্ধ ইংরাজ শিক্ষাবিদ্ লর্ড মেকলে এই মতেরই পোষক ছিলেন। (২) আর এক দলের মত ছিল এই যে, কোম্পানীকেই দেশের সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব দিতে হবে। বিতর্কের এইখানেই শেষ ছিল না। শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম কি হবে তা নিয়েও প্রচণ্ড বিতণ্ডা দেখা দিয়েছিল। একদল বললেন সংস্কৃত ও আরবী ভাষাকে মাধ্যম করে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার এদেশে ঘটানো উচিত। দ্বিতীয় আর এক দলের মত হল এই যে, এই দুই প্রাচীন, অপ্রচলিত ভাষায় আধুনিক কলাবিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় এবং প্রচলিত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে তা জনসাধারণের কাছে সহজে পৌছবে। তৃতীয় আর একদল ইংরাজী ভাষাকেই ভারতের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের উপযুক্ত মাধ্যম বলে মনে করলেন। তাঁদের মতে ইংরাজীর সাহায্য ছাড়া আধুনিক প্রগতিশীল জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এই শেষের দলটি প্রকৃত প্রস্তাবে মিশনারীদের দল ছিল এবং লর্ড মেকলে এঁদের স্বপক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।

প্রাচ্য শিক্ষার বিস্তার

এই সব বাক্‌বিতণ্ডা যখন চলছে তার কিছু পরেই ১৮১৭ সালে সরকারী অর্থ-সাহায্যের আনুকূল্যে কলিকাতা পুস্তক সমিতি (Calcutta Book Society) স্থাপিত হল এবং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনেকগুলি স্কুলও স্থাপিত হল। ১৮২৩ সালে জনশিক্ষার সাধারণ সংস্থা (General Committee of Public Instruction) নামে একটি সমিতি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সনদ আইনে

বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকার যথাযথ সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব এই কমিটির হাতে দেওয়া হল। দীর্ঘ দশ বৎসরের নিষ্ক্রিয়তার পর এই প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু করা হল। উক্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ প্রথম দিকে প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা প্রাচ্য-শিক্ষার উন্নয়নেই মন দিয়েছিলেন। এই সমিতির দশজন সদস্যের মধ্যে প্রাচ্যশিক্ষার প্রসিদ্ধ অনুরাগী উইলসন ও প্রিন্সেপও ছিলেন। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে কলকাতা মাদ্রাসা ও কাশী সংস্কৃত কলেজের সংস্কারসাধন করলেন এবং ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন। এ ছাড়া আগ্রা ও দিল্লীতে তাঁরা আরও দুইটি প্রাচ্যশিক্ষার কলেজ গড়ে তুললেন এবং প্রচুর পরিমাণে আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় বই ছাপিয়ে সেগুলির প্রচার সুরু করলেন। তাঁরা অনেক ইংরাজী বইও প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করেন ও সেগুলির ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষার আন্দোলন

তাঁদের এই জাতীয় কর্মোদ্যম কিন্তু বিনা বাধায় বেশীদিন অগ্রসর হতে পারল না এবং শীঘ্রই তাঁরা প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। প্রথম বাধা এল রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন নব্যশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত ভারতবাসীর তরফ থেকে। গভর্ণর জেনারেলের কাছে লেখা এক চিঠিতে রামমোহন রায় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে গভর্ণরকে প্রগতিশীল, নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে অনুরোধ জানালেন। ইংলণ্ডের কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গও ১৮২৪ সালে সমিতিকে ভারতে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা না করে কার্যকরী শিক্ষাবিস্তারের পরামর্শ দিয়ে এক নির্দেশনামা পাঠান। সেই সময়ে এই দেশেও ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে এক ক্রমবর্ধমান জনমত গড়ে উঠেছিল। এর কারণ রূপে বলা যেতে পারে যে, প্রথমত, মিশনারীদের প্রচেষ্টা ইংরাজী ভাষাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত, রামমোহন রায় প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ স্বদেশবাসীদের ইংরাজী শেখার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য উপলব্ধি করিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, ইংরাজী ছিল শাসকগোষ্ঠীর ভাষা এবং সে ভাষা শিখলে চাকুরী পাওয়া সহজ হবে এই লোভেও অনেকে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সব নানা কারণে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন কমিটির মধ্যেও শিক্ষানীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। এই

বিরোধিতার ফলে কমিটির সদস্যরা সমান দুইভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে প্রাচ্যশিক্ষানুরাগীদের নেতা ছিলেন প্রিন্সেপ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগী দলটিতে সাধারণত কোম্পানীর তরুণ কর্মচারীরা ছিলেন। পরে এই দ্বন্দ্ব ক্রমে এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সমিতির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে পড়ল। এই সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড বেণ্টিঙ্ক। তিনি লর্ড মেকলের উপর ভার তুলে দেন এই বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য। মেকলে এই সময় বড়লাটের কার্য নির্বাহক পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁকে ১৮১৩ সালের সনদ আইনের ৪৩ ধারাটির এক আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা করে এই বিরোধের মীমাংসা করতে অনুরোধ করলেন।

মেকলের বিবরণী—১৮৩৫

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেণ্টিক কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে যে দীর্ঘ বিবরণী (মিনিট) প্রকাশ করলেন তা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক বিবরণী বলে পরিগণিত হয়। লর্ড মেকলের বিবরণীর প্রধান বক্তব্যগুলি এই ছিল যে—(১) ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হবে; (২) পুরোনো ধরনেব অকেজো দেশীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হবে; (৩) নতুন যুগের নতুন শিক্ষার উপযুক্ত স্কুল কলেজ খুলতে হবে। লর্ড মেকলে আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং তাঁর পক্ষে বোঝান সহজ হল যে, ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ৪৩ ধারায় 'সাহিত্য'-শিক্ষাসংক্রান্ত যে উক্তিটি রয়েছে তার দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যই বোঝায় ও ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তই করলেন যে ইংরাজী ভাষাকেই এদেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম করা উচিত। তিনি বিবরণীতে অভিমত প্রকাশ করলেন যে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদির চর্চা করতে হলে ইংরাজী ভাষার মাধ্যম ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহকে অনুন্নত ও প্রাণহীন বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করলেন না ও প্রচার করলেন যে ভারতীয়রা ইংরাজী ভাষার শিক্ষাব্যাপারে বিশেষ আগ্রহশীল হয়েছে। যে আরবী ও সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর দুটি প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচায়ক, সেই দুটি ভাষা এবং সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান-আহরণের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে মেকলে স্পর্ধাভরে মন্তব্য করলেন যে,

'ভারতবর্ষ এবং আরবের সমগ্র সাহিত্য-ভাণ্ডারটিও ইউরোপীয় কোন ভাল গ্রন্থাগারে সংগৃহীত মাত্র একটি সেলফে রাখা পুস্তকাবলীর পাশে সমমর্যাদায় দাঁড়াতে পারে না।' (A single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia)। এই সব কারণে মেকলে বিশেষ জোর দিয়েই বললেন যে, আরবী কিংবা সংস্কৃত যে সব বিদ্যালয়ে শেখান হয় সেগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। তাঁর মত এই ছিল যে, আরবী বা সংস্কৃতের চেয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাই ভারতীয়দের পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং তাছাড়া ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রজাবৃন্দের সংযোগরক্ষার জন্য ইংরাজ শাসকদের পক্ষে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ভারতীয় প্রচুর সংখ্যায় তৈরী করার দরকার। মেকলের মত ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এই সব ভারতীয়রা নামে ভারতীয় থাকলেও, কার্যত তাঁরা "বাদামী বর্ণের ইংরাজ" হবেন—তাঁদের রুচি মতামত, নীতিজ্ঞান সব কিছুই ইংরাজদের প্রতিরূপমাত্র হবে। জনশিক্ষার ব্যাপারে মেকলে 'নিম্নমুখী পরিস্রুতির মতবাদটি' সমর্থন করেন। এই মতবাদের বক্তব্য হল যে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা সমাজের উচ্চতম স্তরে প্রবর্তিত হবে এবং সেখান থেকে ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরে সেই শিক্ষা বিস্তৃত হবে।

প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের যুক্তি

মেকলে তাঁর বিবরণী প্রকাশের সময় প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থী উভয় দলের মতামত তুলনামূলকভাবে যাচাই করেছিলেন। ১৮১৩ সালের সনদ আইনের ভিত্তিতে প্রাচ্যপন্থীরা চেয়েছিলেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে হবে। তবে তাঁদের মতে ভারতীয়দের মনে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব থাকার জন্য সেগুলি ইংরেজী ভাষায় প্রচার না করে কোনো প্রাচ্যভাষার মাধ্যমে প্রচার করাই সমুচিত হবে। এই কারণেই 'কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' যখন মূল্যবান ইংরাজী গ্রন্থাদি সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় অনুবাদের কাজে নামলেন তখন তাঁরা তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন। প্রাচ্যপন্থীরা মনে করতেন যে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন ভারতবাসীর পক্ষে কখনও ইংরাজীর মত একটা বিদেশী ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে এবং নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। সেজন্য

তাঁদের মতে ইংরাজী ভাষা তাদের উপর চাপালে তা অসন্তোষেরই সৃষ্টি করবে।

মেকলে প্রাচ্যপন্থীদের এই যুক্তিগুলি খণ্ডন করে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের পক্ষে যে সব যুক্তি দেন সেগুলি হল এই।

প্রথমত, ১৮১৩ সালের সনদের ৪৩নং ধারাটির ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে সনদ রচয়িতারা প্রকৃতপক্ষে ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সনদে উল্লিখিত 'সাহিত্য' শব্দটির অর্থ করতে গিয়ে তিনি বললেন যে সাহিত্য বলতে এখানে কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্যকেই বোঝায়। তিনি আরও বললেন যে ঐ ধারায় উল্লিখিত দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বলতে প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত দেশীয়দের বোঝান হচ্ছে না, ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনে জ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দেরই বোঝাচ্ছে। মেকলের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল এই যে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হলে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা করতে হবে, কারণ দেশীয় বা প্রাচীন প্রাচ্যভাষায় তা করা সম্ভব নয়। ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে ভারতীয়দের বিরূপতার বিষয়ে তিনি মন্তব্য করলেন যে ভারতীয়দের নিজেদের কল্যাণের জন্যই এ জাতীয় বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে। দেশীয় বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে মেকলে বললেন যে ঐ সব পুরোনো, অকেজো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আশু বিলুপ্তিই বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য-ভাষা সম্পর্কেও তাঁর অভিমত খুব বিরূপ ছিল এবং এই ভাষা সমূহকে তিনি অকর্মণ্য, প্রাণহীন, উদ্ভট এবং অশুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছিলেন ও ইংরাজীর গুণগানে তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

বেণ্টিঙ্কের প্রস্তাব—১৮৩৫

মেকলের মিনিট নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের আর একটি ঘটনা বিস্মৃত হলে চলবে না। সেটি হচ্ছে এই যে, ঐ একই সময় ১৮৩৫ সালে অ্যাড্যাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বিবরণীটিও পেশ করেন। মেকলে যখন তাঁর প্রসিদ্ধ 'মিনিটে' পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে যুক্তি দেন সেই সময় অ্যাড্যাম তাঁর বিখ্যাত বিবরণীতে দেশীয় শিক্ষাকে পরিপুষ্ট করার পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই পরস্পরবিরোধী বিবরণীর মধ্যে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক মেকলের নির্দেশগুলিই মেনে নিয়ে ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে নীচের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলেন—

(১) ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য হচ্ছে ভারতে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যথাসম্ভব আয়োজন করা এবং যা কিছু অর্থ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে তা সব এই জন্যই ব্যয়িত হবে।

(২) দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করা না হলেও ঐ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নতুন করে আর কোন অর্থসাহায্য করা হবে না।

(৩) প্রাচ্য ভাষায় লেখা কোন পুস্তক প্রকাশের জন্যও আর কোনও সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে না।

(৪) শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চারই প্রবর্তন করতে হবে এবং তা হবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে।

অকল্যাণ্ডের মীমাংসা—১৮৩৯

বেণ্টিঙ্কের এই নীতি গ্রহণ করার পর প্রাচ্যপন্থীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যপন্থীদের দ্বন্দ্বের সাময়িক একটা মীমাংসা হলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বেব কোন মীমাংসা হয় নি। পাশ্চাত্যপন্থীরা বেণ্টিঙ্কের ব্যবস্থায় পূর্ণ সন্তুষ্টিলাভ করলেও প্রাচ্যপন্থীরা তাঁদের আন্দোলন সমানে চালিয়ে গেলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ চলেছিল ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত। ঐ সময় এদেশে বড়লাট হয়ে এসেছিলেন লর্ড অকল্যাণ্ড। তিনি শান্তিপ্রিয় ও নির্বিরোধ শাসক ছিলেন। তিনি উভয়দলকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি নতুন নতুন ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করেন। তেমনই তিনি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ৩১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেছিলেন এবং প্রাচ্য ভাষায় পুস্তকপ্রকাশের ব্যাপারেও উৎসাহ দান করেন। তাঁর এই উভয় দলের তোষণ নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বহু পুবাতন দ্বন্দ্বটির একটা মীমাংসা হয় এবং প্রাচ্যবিদ্যাপন্থীদের মধ্যে যে একটা অসন্তোষ জেগেছিল তারও নিবৃত্তি হয়।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের গুরুত্ব

ইংরাজদের আগমনের পর ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের গুরুত্ব ও তার মূল্য নিয়ে নানা অভিমত পাওয়া যায়। অনেক সময়েই এই ঘটনাটিকে অতিরঞ্জিত করে বিবৃত করা হয়ে থাকে। যথার্থ বিচারে দ্বন্দ্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। তবে এই দ্বন্দ্বের ফলেই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা সুমীমাংসিত রূপ দেখা দিয়েছিল এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল।

দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ দুটি দলই একটা বিষয়ে বিশেষ ভুল করেছিলেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভারতীয় ভাষাগুলিকে এই নব প্রবর্তিত শিক্ষার মাধ্যম করলে সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান হত। কিন্তু সেগুলিকে 'অকেজো' 'উৎকট' ইত্যাদি বলে অভিহিত করে এবং সেগুলিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চার অনুপযুক্ত বলে দূরে সরিয়ে রাখাটাই মস্ত ভুল হয়েছিল। আরবী ও সংস্কৃত ভাষা সমৃদ্ধ ও উন্নত ভাষা হলেও সে সময়ে সেগুলি প্রচলিত ভাষা ছিল না এবং সেজন্য সেগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য চাপ দিয়ে প্রাচ্যপন্থীরা ভুলই করেছিলেন। আর পাশ্চাত্যপন্থীরাও ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত মাতৃভাষাগুলিকে শিক্ষাদানের মাধ্যম বলে স্বীকার না করে তাদের উপর বিদেশী ভাষা ইংরাজীকে চাপিয়েও যথেষ্ট ভুল করেছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলের অবদান

যে মেকলে ভারতীয় ভাষাকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করে ইংরাজী ভাষাকে এদেশের শিক্ষার বাহন করেন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। ভারতবর্ষে অনেকেই তাঁকে "উন্নতির আলোকবর্তিকাবাহী" বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে আবার মনে করেন যে, তিনিই ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অশান্তির বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতাজনিত বিসদৃশ উক্তির জন্য অনেকে তাঁর সমালোচনা করে থাকেন এবং অনেকের মত এই যে, তাঁরই জন্য ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহ আজও অবহেলিত ও অনগ্রসর হয়ে আছে। এখন এই সব অভিমত নিয়ে একটু নিরপেক্ষ ও গভীর বিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে এই সব অভিমত সম্পূর্ণভাবে সত্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য মেকলেকে "উন্নতির আলোক-বর্তিকাবাহী" বলাটা নিতান্ত অতিশয়োক্তি, কারণ এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ তিনি সৃষ্টি করেননি। তাঁর পূর্বেই ভারতীয়রা নিজেদের আগ্রহেই ইংরাজী শিখতে উৎসুক হয়েছিল এবং তার সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার মূল্যই বুঝতে পেরেছিল। তাছাড়া প্রাচ্যভাষা ও ইংরাজী ভাষা সংক্রান্ত বিতর্ক মেকলের আগমনের অনেক আগেই উঠেছিল। মেকলে অবশ্য তার দ্রুত মীমাংসার ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন সন্দেহ নেই। মেকলের সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হলে সম্ভবত ঐ দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলত। ভারতীয় ভাষাসমূহকে অগ্রাহ্য করার জন্যও মেকলেকে একা দায়ী করা যায় না, কারণ মেকলে এদেশের,

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শেই ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করেছিলেন এবং তাঁরাই তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হবার উপযুক্ত নয়। বিদেশী মেকলের পক্ষে এই বিষয়ে তাঁদের মতের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। কোন্ ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে ঐ বিতর্কের সময় কোন পক্ষ থেকেই ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য জোর দাবী ওঠেনি। ১৮৩৬ সালে জনশিক্ষার সংস্থার সভাপতিরূপে মেকলে যে বিবরণ উপস্থিত করেছিলেন, তাতে তিনিই স্পষ্টই বলেছিলেন, যে "মাতৃভাষাগুলির চর্চায় উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা গভীরভাবেই সচেতন এবং ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে বেন্টিংকের ঘোষণাপত্র তা থেকে আমাদের বিরত করার চেষ্টা করেছে বলেও আমি মনে করি না। মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ধরে নিয়ে আমাদের সকল প্রচেষ্টা সেই পথেই পরিচালিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।" উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে মেকলে মাতৃভাষার দাবীকে অন্তত নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

বেন্টিংকের প্রস্তাব ও মেকলের মিনিটের ফল

মেকলে সংক্রান্ত সকল বিতর্কের মধ্যে একটি কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে প্রধানত তাঁর নীতিই পরবর্তী যুগে ভারতের শিক্ষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারিত করেছিল এবং মেকলেই ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্তন করে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন। আজ ঐতিহাসিক বিচারে একথা অনস্বীকার্য যে ইংরাজী শিক্ষা পশ্চিমের জ্ঞানভাণ্ডার ভারতবাসীর কাছে খুলে দিয়েছিল এবং তার ফলে ভারতবাসীর মধ্যে মানসিক চেতনা, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পেরেছিল। তবে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করে তিনি যেমন আমাদের একদিক দিয়ে উপকার করেছেন, তেমনই শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজী ভাষাকে প্রবর্তিত করে তিনি আমাদের প্রচুর ক্ষতিও করে গেছেন। মাতৃভাষার স্থানে এক বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়াতে নানা দিক দিয়ে শিক্ষার বিস্তার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। প্রথমত, দেশের জনসাধারণের কাছে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল এবং শিক্ষা মুষ্টিমেয় বিশেষের সৌভাগ্যের সামগ্রী হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার মাধ্যম হবার বিশেষ গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে অবহেলিত ও অনগ্রসর হয়ে রইল। মেকলের নবপ্রবর্তিত বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত হতে সুরু করলে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে লাগল। এতকাল

দেশীয় জনসমাজ যে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপকৃত হচ্ছিল তার বিলুপ্তিতে দেশময় নিরক্ষরতা ছড়িয়ে পড়ল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক বিশেষ নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার জন্য অনেকে মেকলেকে দায়ী করেন। কিন্তু এজন্য মেকলে একা সেজন্য দায়ী হতে পারেন না। কারণ বিদেশীর পদানত পরাধীন জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষোভ জাগত এবং হয়ত ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত না হলেও অন্য নানাবিধ কারণে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন দেখা দিত। আর ইংরাজী শিক্ষা যদি ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্মদাতা হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইংল্যাণ্ডবাসীমাত্রেই গৌরব বোধ করবেন। মেকলে যে স্বয়ং এরূপ একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন তা তাঁর ১৮৩৩ সালে পার্লামেণ্টে চার্টার আইন সংক্রান্ত বক্তৃতায় পরিস্ফুট। তিনি বলেছিলেন যে এও হতে পারে যে আমাদের এই ব্যবস্থায় ভারতীয় জনগণের মন প্রসারিত হতে পারে এবং আমরা আমাদের প্রজাদের উন্নততর রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য শিক্ষিত করে তুলতে পারি। যবে এমন দিনটি আসবে তবে সেদিনটি ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হবে। (It may be that the public mind of India may expand under our system, that we may educate our subjects into a capacity for better government. Whenever such a day comes, it will be the produest day in English History.)

উপরের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতবাসীদের শিক্ষামূলক ও কৃষ্টিমূলক উন্নতি হবে ভেবেই মেকলে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন এবং সেদিক দিয়ে প্রতিটি ভারতবাসী যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেণ্টিকের শিক্ষানীতি

এটা নিঃসন্দেহ যে ভারতে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্তনের ব্যাপারে মেকলেই অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে লর্ড বেণ্টিঙ্কের ভূমিকা স্মরণ করলে তাঁরও যে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রয়েছে তা স্বীকার করতে হয়। ১৮৩৫ সালে মেকলে তাঁর প্রসিদ্ধ 'মিনিটে' ইংরাজী প্রবর্তনের নির্দেশদান করার পর ঐ সালের মার্চ মাসেই লর্ড বেণ্টিংক ঐ নির্দেশগুলি মেনে নিয়েই কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবগুলি মেকলের নীতিকেই রূপদানের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়। বেণ্টিংকের শিক্ষা-নীতির বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনি অ্যাডামের সুপারিশসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মেকলের মিনিটের নির্দেশগুলি পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন। ভারতের

দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে অ্যাড্যাম ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষাকে প্রাচীন ঐতিহ্যময় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপর গড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মেকলে তদানীন্তন ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন করতেই পরামর্শ দেন। বেণ্টিঙ্ক অ্যাড্যামের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে মেকলের সুপারিশ অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেন। শিক্ষানীতি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত রায়দান এবং কার্যনির্বাহের নীতি গ্রহণের ক্ষমতা বড়লাট রূপে বেণ্টিঙ্কেরই ছিল এবং সেজন্য এই দেশে উক্ত শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে তাঁর মত স্থির করা ও নীতি গ্রহণের গুরুতর তাৎপর্য রয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Is there any justification for regarding Macaulay's Minute as infamous? Examine his ideas critically.
(B.T. 1951)

2. The Government of India put a stop to the Orientalist versus Occidentalist controversy in Education by issuing a resolution in 1835. What important decisions were embodied in that resolution? (B.T. 1955)

3. Give a critical account of the Orientalist-Occidentalist controversy in the field of Indian education during the 19th century. What was its outcome? (B.T. 1959)

4. Examine the Minute of Lord Macaulay and subsequent resolutions passed by the Government which led to the establishment of schools teaching European literature and science. (B.A. 1957)

5. Give an account of Bentinck's educational policy and evaluate the same. (B.A. 1958)

6. What led to the formulation of Bentinck's educational policy? Show how it became a precursor of new consciousness in the field of education in the nineteenth century.
(B.A. 1959)

7. What policy on education in India was laid down by Bentinck in 1835 and what changes were brought about by the enforcement of the policy ? (B. A. 1954)

8. Give a brief account of the beginning of western education in India mentioning the main agencies responsible for the same.

9. Describe Bentinck's educational policy and critically consider the same. (B. A. 1960)

10. Narrate in brief the development of western education in India. What were the obstacles in the way of its spread and how were they overcome ? (B. T. 1964)

দশ

হার্ডিঞ্জের ঘোষণা, ১৮৪৪

মেকলে ও বেণ্টিংকের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় যে অকল্যাণ্ড কিছুটা পরিবর্তন আনেন এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর পর থেকে ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেন অবধারিত ভাবে প্রচুর উদ্দীপনা দেখা দিল এবং দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটতে লাগল। ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণের উৎসাহ তখন এতই প্রবল হতে লাগল যে প্রচুর ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্যশিক্ষার পুরোনো শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন কমতে লাগল। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়গুলিতে প্রচুর ভীড় হতে সুরু হল এবং শীঘ্রই সেগুলিতে স্থানাভাব দেখা দিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা তখন এত বেড়ে গেছল যে ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিনদিনের মধ্যে সেখানে ভর্তি হবার জন্য ১২০০ আবেদনপত্র জমা হয়েছিল। বহুদূর থেকে অনেক ছাত্র ঐ কলেজে ভর্তি হবার জন্য এসে ফিরে গিয়েছিল। নতুন শিক্ষার প্রতি এই আকর্ষণ ও তা লাভের জন্য অনুপ্রেরণার ফলে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেল। দেখা গেল যে একই ক্লাশে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা পাশাপাশি বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ইংরাজী পাঠ গ্রহণ করছে। অবশ্য সর্বত্র যে নবজ্ঞানে দীক্ষিত হবার প্রেরণায় এই শিক্ষা গৃহীত হত তা মোটেই সত্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজী শিখে ভাল চাকুরী পাবার প্রত্যাশাতেই ছাত্রেরা এত ভীড় করত।

কাউন্সিল অব এডুকেশন—১৮৪২

১৮৩৫ সালের পর থেকেই যে সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৪২ সালে জেনারেল কমিটি অফ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশানের স্থানে কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪৪ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরাজী জানা লোকদের কথাই সব চেয়ে আগে বিবেচিত হবে। কাউন্সিল অব এডুকেশন ইংরাজীজানা চাকুরীতে নিয়োগের যোগ্য লোকদের বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া ও তাদের তালিকা প্রস্তুত করার ভার পেল। ফলে ইংরাজী

শিক্ষাগ্রহণ করাটা কার্যত এক অর্থকরী বৃত্তি-শিক্ষাতেই পরিণত হল। কাউন্সিলও ১০ বৎসরের মধ্যে ২৫১টি ইংরাজী স্কুলে ১৩ হাজারেরও বেশী ছাত্রের ইংরাজী শিক্ষার আয়োজন করে ফেললেন এবং এর জন্য বার্ষিক খরচ বরাদ্দ হল প্রায় লক্ষ টাকা। ইংরাজী শিক্ষার জনপ্রিয়তার জন্য হার্ডিঞ্জের শিক্ষাবিষয়ক ঘোষণাটি যে বিশেষ ভাবে দায়ী তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁর ঘোষণার নীতি অনুযায়ী চাকুরীতে ব্যক্তিনিয়োগের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা হল তার ফলে চাকুরী পাওয়াটাই ক্রমে শিক্ষাগ্রহণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমন কি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। এরই অবধারিত ফল হিসাবেই আজ আমরা উচ্চশিক্ষার মানের অস্বাভাবিক অবনতি ও শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার-সমস্যার আতিশয্য দেখতে পাচ্ছি। আজও আমরা শতাব্দীর সেই অভিশাপ বয়ে চলেছি। লর্ড হার্ডিঞ্জ অবশ্য সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ঘোষণা করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজী ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে তাকে আরও জনপ্রিয় করা। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্যই তিনি একাজ করেছিলেন। তাছাড়া তখন কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান দপ্তরের জন্য ইংরাজী জানা বহু কর্মচারীর প্রয়োজন হয়েছিল, আর এই পন্থা অবলম্বন করে অল্প খরচায় তিনি দেশীয়দের মধ্য হতে অনেক ইংরাজী জানা দক্ষ কর্মচারীও পেয়েছিলেন।

হার্ডিঞ্জের ঘোষণার ফলাফল

হার্ডিঞ্জ অবশ্য ভাবতে পারেন নি যে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি এই জাতিভেদ-ক্লিষ্ট দেশে নতুন এক জাতিভেদ প্রথার সূত্রপাত করলেন। এই নব জাতিভেদ ইংরাজী-শিক্ষিত এবং ইংরাজী-অজ্ঞ এ দুয়ের মধ্যে সৃষ্ট হল। তাছাড়া ইংরাজী শিখে সরকারী চাকুরী এবং ইউরোপীয় বণিকদের অফিসে বেসরকারী চাকুরীর মোহে নব-শিক্ষিত শ্রেণী কৃষি-বাণিজ্য, শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং স্বহস্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে হেয়জ্ঞান করে কেবলমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হতে সুরু করল। এর ফলে কালক্রমে ভারতবাসী কেবল দপ্তরসংক্রান্ত কর্মনিয়োগের প্রতি প্রলুব্ধ হতে শিখল এবং কায়িক শ্রমকে অসম্মানকর বলে মনে করল। প্রধানত এই কারণেই আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়েছে।

এগার

উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪

১৮১৩ সালের সনদ আইনের পর থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল এবং শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য নীতি ও বিভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়েছিল। এর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হল যার ফলে ঐ সব বিভিন্ন শিক্ষা-নীতির মূল্য ও কার্যকারিতা বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিল। সেজন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইন পুনরায় প্রবর্তিত করার সময় কোম্পানী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এর ফলে ১৮৫৪ সালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ শিক্ষা-নির্দেশ (Educational Despatch) প্রকাশিত হল। চার্লস উডের পরামর্শ মত এই মূল্যবান শিক্ষা নির্দেশ প্রণয়ন করা হয়েছিল বলেই তা উডের ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে শিক্ষাসংক্রান্ত যত ডেসপ্যাচ এতদিন প্রকাশিত হয়েছে এটি যে সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই এবং পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয় সব কিছুর মূলে উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব ছিল। একথা একরকম নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিগত একশ বছরেরও উপর এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছে তার ভিত্তি রচনা করেছিল এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দলিলখানি।

উদ্দেশ্য

এই ডেসপ্যাচের প্রারম্ভেই স্বীকার করা হয়েছে যে ভারতে শিক্ষাবিস্তার করা হল ইংলণ্ডের পবিত্রতম কর্তব্য। ভারতে ইংরাজদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হল যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতবাসীরা কার্যকরী শিক্ষালাভ করে এবং তা থেকে অতুল পার্থিব ও নৈতিক ফললাভ করতে পারে তার আয়োজন করা।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাষা মাধ্যম

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেই সম্পর্কে উডের ডেসপ্যাচে মেকলের সিদ্ধান্তটিই মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যদিও ডেসপ্যাচে মেকলের মত তীব্র ভাষায় প্রাচ্যশিক্ষার নিন্দা করা

হয়নি তবুও প্রাচ্য-শিক্ষাকে সেখানে মাত্র ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য দেওয়া হয়েছে ও কার্যত তাকে গুরুতরভাবে ত্রুটীপূর্ণ ঘোষণা করে পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তারই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। (এই ডেসপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে ভারতে সুষম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করতে হলে ইংরাজী ভাষা ও ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তা হতে পারে।) এ থেকে অবশ্য প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় ভাষার দাবীকে উডের ডেসপ্যাচে আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠা

ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল যে, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পাঞ্জাবে একটি করে পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হবে এবং জনশিক্ষা আধিকারিক বা ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামে একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হবেন। এই ডি-পি-আই'কে (D. P. I.) সাহায্য করার জন্য বিভাগের অধীনে যথেষ্টসংখ্যক পরিদর্শক থাকবেন। এই শিক্ষাবিভাগকে প্রতি বৎসর সরকারের নিকট বার্ষিক বিবরণী দাখিল করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়

ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় মূল্যবান প্রস্তাবটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-সংক্রান্ত। কাউন্সিল অফ এডুকেশনই ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন কিন্তু সেই প্রস্তাব তখন অগ্রাহ্য হয়। এই ডেসপ্যাচে বলা হল যে, ভারতবর্ষে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যেখানে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে সেখানে সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার মনোনীত একজন আচার্য এবং কয়েকজন ফেলো নিয়ে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে সেনেট গঠিত হবে এবং পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি-অর্পণই হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান কাজ। ডেসপ্যাচে অবশ্য আইন-শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, সংস্কৃত-চর্চা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে বিশেষ বক্তৃতাবলীর বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজন মত বিশেষ উপাধিদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, নিছক পরীক্ষাগ্রহণ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে অধ্যাপনার আয়োজন করার জন্য পরোক্ষ নির্দেশও উক্ত ডেসপ্যাচে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয় সেগুলিতে

অধ্যাপনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেগুলি প্রধানত অনুমোদনধর্মীই ছিল এবং প্রকৃত অধ্যাপনার দায়িত্ব সরকারী কলেজগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা ও ভারতীয় ভাষা-মাধ্যম

ডেসপ্যাচে মেকলের বহু বিঘোষিত 'নিম্নমুখী পরিস্রুতির' মতবাদের (Downward Filtration Theory) নিন্দা করা হয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয় করে এতদিন কলেজীয় শিক্ষার মাধ্যমে যে উচ্চশিক্ষা দিয়ে আসা হয়েছে তাতে সমাজের উচ্চস্তর থেকে আগত মুষ্টিমেয় ছাত্র মাত্র উপকৃত হয়েছে। এই ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হল যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান করে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের আয়োজন করতে হবে। টমসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে শিক্ষাকর ধার্য করে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ডেসপ্যাচে সেই পরিকল্পনাটিরও অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত অর্থসাহায্যের আয়োজন এবং ছাত্রবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থারও নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়েছিল।

গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের যে আর্থিক সমস্যা ছিল তার সমাধানকল্পে ডেসপ্যাচ সরকারী গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। সেই সব বিদ্যালয়ই এই গ্র্যান্ট-ইন-এড পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যারা—(১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাদান করতে সক্ষম, (২) যারা বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে সক্ষম, (৩) যারা সরকারী পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলবে এবং (৪) যারা ছাত্রদের নিকট থেকে যৎসামান্য বেতন গ্রহণ করবে। তবে স্পষ্টভাবে একথাও বলা হয়েছিল যে, যদি কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার আয়োজন থেকে থাকে তবে সরকারী পরিদর্শকের সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই চলবে। এই নির্দেশের পরিষ্কার অর্থ হল এই যে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল না। গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথার অন্যান্য বিশদ নিয়মকানুন প্রণয়নের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ একথা বিশ্বাস করেছিলেন যে গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে

শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত প্রথার অনুকরণেই প্রবর্তিত করা হয়েছিল এবং এতে করে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ছাত্রবৃত্তি প্রদান, বিদ্যালয়ভবন নির্মাণ প্রভৃতির জন্য সরকারী অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই নবপ্রবর্তিত সাহায্যদানের প্রথার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত বিশেষ-ভাবেই উপকৃত হয়েছিল। ব্যয়নির্বাহের সময় যখনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির অর্থভাণ্ডারে ঘাটতি দেখা দিত, তখনই এই গ্র্যান্ট-ইন-এড নীতি অনুসারে সরকারী সাহায্য পাওয়া যেত। ১৮১৩ সালের ৪৩ নং ধারায় শিক্ষাব্যয় খাতে যে বাৎসরিক একলক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছিল, তা অবশ্যই ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর ছিল। বিদেশী সরকার নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই নামমাত্র গ্রান্ট বা সাহায্য-প্রদানের মাধ্যমে ভারতের নবজাগ্রত বিরাট শিক্ষা উদ্দীপনাকে তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন। একথা বলা বাহুল্য যে সে সময়ের সবদিকের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ভারতে এই গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনকে কোন দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা সেই সব দেশেই সাফল্য লাভ করতে পারে যে সব দেশে শিক্ষা সচেতনতা যথেষ্ট মাত্রায় দেখা দিয়েছে এবং যে সব দেশের জনগণ শিক্ষার জন্য নিজেরা অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ। কিন্তু ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর ও দারিদ্র-ক্লিষ্ট দেশে গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা সফল হওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে ইংরাজ সরকার নিজের শিক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। তবে এ প্রথা প্রবর্তনের ফলে যে উপকার হয়েছিল তাকে নিতান্ত তুচ্ছ করা চলে না। অবশ্য গ্র্যান্ট-ইন-এড প্রথা চালু হবার সময় বেসরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় মিশনারীদের পরিচালিত বিদ্যালয় সংখ্যায় অনেক বেশী থাকায় তারাই প্রকৃতপক্ষে এতে উপকৃত হয়েছিল। সাধারণ দেশবাসীরা এই কথা ভেবে এই অর্থ সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন যে ইংরাজরা এর দ্বারা সম্ভবত শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য স্থায়ীভাবে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছেন।

গ্র্যান্ট-ইন-এড মোটামুটি তিন শ্রেণীর ছিল—(১) শিক্ষকরা যাতে বেতন পান সেজন্য তার কিছু অংশ সাহায্য রূপে দান (Salary Grant), (২) নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্দিষ্ট হারে সাহায্য দান (Fixed Period Grant) (৩) পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সাহায্যদান (Payment by Result Grant).

জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন তাদেরই কোনও প্রতিনিধি সেনেটে ছিল না। এক কথায় সরকারই সে সময়ের উচ্চশিক্ষাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করেছিলেন।

উডের ডেসপ্যাচের সমালোচনা

উডের ডেসপ্যাচ সম্বন্ধে একটা কথা বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে উচিত নয় যে, এ দেশে ইংরাজদের ভূমিকা ছিল প্রধানত পররাজ্য-অধিকারী, সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরই এবং এই সব শাসকদেরই একজন ছিলেন উক্ত ডেসপ্যাচের রচয়িতা। তিনি ভারতবর্ষকে প্রধানত ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং তার শিল্পজাত পণ্যের একটি বাজার রূপেই দেখেছিলেন আর সেজন্যই উডের ডেসপ্যাচ ভারতে শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করলেও তা ব্রিটেনের মজ্জাগত সদাগরী মনোভাবের সঙ্কীর্ণ প্রভাবমুক্ত ছিল না এবং তার ফলে তার মধ্যে ঔদার্য ও সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। উক্ত ডেসপ্যাচের ছত্রে ছত্রে এই মনোভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ব্রিটিশ বাণিজ্য চালাবার জন্য বহুসংখ্যক কর্মচারীর দরকার এবং কিছুটা ইংরেজী শিখিয়ে-পড়িয়ে অতি অল্পবেতনে ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই সে কর্মীদের সংগ্রহ করতে হবে : এই নীতি ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিচিত্র 'ঐতিহ্যের' সৃষ্টি করেছিল তার জের আজও মেটেনি এবং বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বহু মারাত্মক ত্রুটীর জন্য ডেসপ্যাচের এই সংকীর্ণ নীতিকে দায়ী করা চলে। ইংরাজ এ দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানা পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থাকে এমন এক সরকারী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত করেছিল যে তার ফলে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, আর অসংখ্য দপ্তর, ফাইল-সমন্বিত এক 'লাল ফিতার' আধিপত্যের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, উক্ত ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া তো দূরে থাকুক বরং তা বৃদ্ধি পায় এবং দপ্তর সংক্রান্ত নির্দেশ ও শৃঙ্খলার বোঝা এত অসহনীয় হয়ে ওঠে যে শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে সকল ত্রুটীর জন্য সরকারকে দায়ী করতে থাকেন। তাছাড়া ভারতবর্ষে যে শিক্ষাকে চিরকাল বৃহত্তর ধর্মবোধ ও সর্বজনীন জীবনাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করা হত সেই সুপ্রাচীন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে ডেসপ্যাচে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল সে শিক্ষা নিছক পুঁথি পড়ে পাশ করার চেয়ে অধিক মর্যাদা বা মূল্য পায়নি। ভারতীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে মর্যাদা দান ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা ডেসপ্যাচে স্বীকৃত হলেও কার্যত তা অবহেলিতই রয়ে গেছল। প্রকৃতপক্ষে ঐ ভাষাসমূহের যথাযথ ব্যবহার

সম্পর্কে ডেচপ্যাচে সত্যকার কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও ডেসপ্যাচে কোন কার্যকরী পরিকল্পনা স্থান পায় নি এবং শুধুমাত্র গ্র্যাণ্ট-ইন-এডের সাহায্যে অত্যন্ত উদাসীন প্রকৃতির একটা ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। এ দেশে বে-সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা তখন মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না বলে শুধুমাত্র গ্র্যাণ্ট-ইন-এডের প্রেরণায় তা ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। ফলে গ্র্যাণ্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার হয়নি আর সরকার এই নীতির অন্তরালে নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছিলেন।

উপরোক্ত সকল সমালোচনা সত্ত্বেও পরিশেষে আমরা এই কথাই বলব যে, ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি এক সুসংবদ্ধ ও সুসংহত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। লর্ড ডালহৌসির মতে এরূপ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা-পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয় নি। অনেকের মতে ১৮৫৪ সালের এই ডেসপ্যাচটিই ঊনিশ শতকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অবদান। ১৮৫৪ সালের আগে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল সবই যেন এই ডেসপ্যাচে এসে সুসমন্বিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের মূল উৎসও ছিল এই ডেসপ্যাচটি।

প্রশ্নাবলী

1. "The Despatch of 1854 is a landmark in the history of Indian Education." Comment on the statement and give a summary of the main recommendations contained in the Despatch. (B. T. 1953)

2. Give an account of Wood's Despatch of 1854 showing clearly how it tried to solve the educational problems of the day. (B. T. 1957)

3. Wood's Education Despatch is "a document of immense historical importance." Elucidate. (B. T. 1959)

4. Summarise the main recommendations in the Wood's Despatch of 1854 and state to what extent these were effective in establishing a comprehensive and co-ordinated system of education in India. (B. T. 1960)

5. Wood's Despatch has been described as the Magna Charta of Indian Education. Discuss and add your own comments. (B. T. 1964)

বার

হাণ্টার কমিশন, ১৮৮২

১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে দু'টি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনে অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রথমটি হল, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাণ্ট-ইন-এড বিতরণের ব্যবস্থা। প্রায় ৩০ বছর যাবৎ এই ব্যবস্থা কার্যকরী থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল যে শিক্ষার উন্নতি আশানুরূপ হয়নি, বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলি সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্তই অবহেলিত রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, উডের ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রত্যাহার নীতির সুপারিশ করায় মিশনারীদের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। এই কারণে মিশনারীরা এই মর্মে প্রতিবাদ জানালেন যে সরকারী কর্তৃপক্ষ উডের ডেসপ্যাচ আদৌ মেনে চলছেন না। সরকারী কর্মচারীদের মিশনারী-বিদ্বেষ, গ্রাণ্ট-ইন-এডের কঠোর নিয়মাবলী, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও স্কুল অনুমোদন সম্পর্কিত যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা তখন ইংলণ্ডে প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু করলেন এবং এসব ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধানের দাবী উত্থাপন করলেন।

আরও দেখা গেল, যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে সরকারী কলেজ ও ইংরেজী স্কুলগুলির জন্য অনেক বেশী অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ১৮৮১-৮২ সালে দেখা যায়, ২১০০০ জন ছাত্রের অধ্যাপনার জন্য রাষ্ট্রীয় কলেজগুলি ৯ লক্ষ টাকা খরচ করছে, অন্যদিকে ২০০০ জন ছাত্রের কলেজীয় শিক্ষার জন্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে খরচ হচ্ছে মাত্র ৬৫ হাজার টাকা।

এই সব নানা কারণে মিশনারীরা ইংলণ্ডে এক আন্দোলন সুরু করলেন এবং লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (পূর্বতন উইলিয়াম উড), লর্ড লরেন্স প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে জেনারেল কাউন্সিল অফ এডুকেশন (General Council of Education) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে উঠল। এদের দাবী অনুসারে ১৮৮২ সালে লর্ড রিপণ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশনে সৈয়দ মামুদ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্র-মোহন ঠাকুর, কাশীনাথ তেলং প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সদস্যরূপে গৃহীত হলেন।

কমিশনের উদ্দেশ্য

১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচে নির্ধারিত শিক্ষানীতিকে এ পর্যন্ত যে ভাবে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তার ফলাফল সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং ঐ নীতির আর কোনও উপযোগিতা আছে কিনা, সে বিষয়ে পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যেই কমিশনটি মূলত গঠিত হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্যাকে কমিশন আলোচনার পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন, কারণ সেই সময়ে এ সম্পর্কে দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছর আগেই ইংলণ্ডে ১৮৮০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে ঐ দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। তবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং কারিগরী ও ইউরোপীয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধানের কোন নির্দেশ এই কমিশনকে দেওয়া হয়নি। সরকার গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার আরও বিস্তার সাধনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যও কমিশনকে ভার দেন।

কমিশনের সুপারিশ

সরকারী শিক্ষানীতিকে এই কমিশন তীব্রভাবে সমালোচনা করে বেসরকারী স্বেচ্ছাসৃষ্ট (voluntary) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করার সুপারিশ করেন। কমিশনের সংগৃহীত তথ্য থেকে এই কথা জানা যায় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে ও মাদ্রাজে ১৮৫৪ সালের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত নীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, কুর্গ ও বেরারে এই নীতি মোটেই কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়নি এবং বাংলা, আসাম ও মধ্য প্রদেশে এই নীতি কার্যকরী করে উন্নতি বা অবনতি কিছুই লক্ষিত হয়নি। কমিশন দেখেছিলেন যে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ বেসরকারী প্রচেষ্টার উপযুক্ত মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং তাদের যথার্থ উৎসাহ দান করেননি। কমিশন তাই ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের নীতি সমর্থন করে বলেন, উন্নত রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও বিস্তারের দিকে সরকারী দপ্তরের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

নীতি ও পন্থা

এই নতুন নীতি অনুসারে কাজ করার জন্যে কমিশন দুটি পন্থার নির্দেশ করলেন: (১) সরকারী কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে আর

অগ্রসর হবেন না এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা প্রত্যাহার করবেন, (২) গ্র্যাণ্ট-ইন-এড প্রথার উন্নততর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বেসরকারী প্রচেষ্টা আরও বিস্তার লাভের সুযোগ পায়। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশনের অভিমত ছিল এই যে, সমস্ত প্রাথমিক স্কুলের ভার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কোন রকম প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থাকবে না। রাষ্ট্রীয় কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলি ক্রমে ক্রমে সুযোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সময়ে উদারভাবে গ্রাণ্ট-ইন এড নীতির মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে এবং এই সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মতই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

গ্র্যাণ্ট-ইন-এড

এর পর কমিশন বিভিন্ন গ্র্যাণ্ট ইন-এড প্রথার দোষগুণ বিশেষভাবে আলোচনার পর এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন প্রদেশ নিজের প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী গ্র্যাণ্ট-ইন-এড প্রথার যে কোন রকম সংশোধন করে নিয়ে কাজে লাগাতে পারেন।

দেশীয় শিক্ষা

কমিশন দেশীয় স্কুলগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। তাঁদের মতে এই স্কুলগুলির জীবনীশক্তি প্রচুর এবং এগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য দান করলে দেশের গণশিক্ষা সমস্যার সন্তোষজনকভাবেই সমাধান হবে। দেশীয় অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত এই দেশীয় স্কুলগুলিকে অনুমোদন করা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা, শিক্ষক নিয়োগ বা পাঠক্রম নির্ধারণ সম্পর্কে স্বাধীনতা-প্রদান ও সহানুভূতিসূচক পরিদর্শন ব্যবস্থার আয়োজনের মাধ্যমে ঐ স্কুলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনার উপর কমিশন বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এই স্কুলগুলিকেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কমিশন পরামর্শ দেন এবং শিক্ষা দপ্তরের উপর এই স্কুলগুলির তালিকা প্রণয়নের ভার অর্পণ করতে বলেন। এইভাবে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ঐতিহ্যময় দেশীয় স্কুলগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার কথাই কমিশন শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে

স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিশনের এই নির্দেশ কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করেন এবং দেশীয় স্কুলগুলি অবহেলা ও অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা

হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন যে, যে কোন জাতীয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের প্রতি সব চেয়ে সযত্ন মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সুব্যবস্থা, পাঠক্রম নির্ধারণ, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন বিবিধ সুপারিশ করেন এবং বলেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়া দরকার। এই সুপারিশের প্রায় ৩০ বছর পরে গোখেল ঠিক এই মর্মেই পুনরায় দাবী জানিয়েছিলেন। কমিশন কিছু সংখ্যক একান্ত দুঃস্থ বিদ্যার্থীকে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের পরামর্শও দিয়েছিলেন।

পরিচালনা

প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনার ব্যাপারে কমিশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি করে স্কুলবোর্ড গঠনের পরামর্শ দেন এবং বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সর্বপ্রকারে এই স্কুলবোর্ড দায়ী থাকবেন।

অর্থব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। যথা—(১) প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ অর্থকোষ সংরক্ষণের পরামর্শ দিতে হবে। (২) শিক্ষাসংক্রান্ত সকল ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার ও অধিকতর পরিমাণে দাবী থাকবে। (৩) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে।

এই সকল অর্থ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে কমিশন উপযুক্ত গুরুত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন বটে কিন্তু পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কুলে গ্রাণ্ট বিতরণের নীতি অনুসরণের পরামর্শ দিয়ে তাঁরা একটা বিরাট ভুল করেছিলেন। দেখা গেছে যে যেখানেই এই নীতি অনুসৃত হয়েছে, সেখানেই এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এই নীতির পরিবর্তে উদারতর ও অধিকতর কার্যকরী কোন নীতি কমিশনের গ্রহণ করা উচিত ছিল। পরীক্ষার ফলাফলের

ভিত্তিতে সাহায্য দানের (Payment-by-results) এই নিন্দনীয় নীতির ফলে অনিচ্ছুক শিক্ষক যন্ত্রের মত কাজ করে চলেন এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র বহন করবেন বলে কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন, তার মধ্যেও বাস্তববোধের প্রচুর অভাব ছিল। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এই বিপুল অর্থব্যয় একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই কমিশনের প্রস্তাবের কার্যকারিতা অনেকখানি হ্রাস পেতে বাধ্য হয়।

পাঠক্রম

কমিশন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পাঠক্রমকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তনশীল করতে হবে। এজন্য দেশীয় গণিত, হিসাব-নিকাশ, জমি-জরিপ, বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান এবং কৃষিবিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শিল্পকলায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্গত করারও সুপারিশ কমিশন করেছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষণের দিকেও কমিশন মনোযোগ আকর্ষণ করে মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অন্তত একটি করে শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা

হান্টার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে থেকে সরকারী প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার মাধ্যমে সুযোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারী পক্ষের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তবে যে সব জেলায় বেসরকারী প্রচেষ্টায় আদর্শ মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না, সরকারী উদ্যোগে জন-স্বার্থের খাতিরে সেখানে অন্তত একটি করে উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কমিশন স্বীকার করেন। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে বেতনহার নির্দিষ্ট করার নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করার প্রস্তাবও করা হয়।

এ কোর্স ও বি কোর্স

মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে দু'টি শ্রেণী-বিভাগ করার জন্যে কমিশন সুপারিশ করেছিলেন : যেমন (১) 'এ' কোর্স—এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের জন্য এবং (২) 'বি' কোর্স—

বাণিজ্যিক, ব্যবহারিক এবং সাহিত্য-বহির্ভূত বিষয়গুলির শিক্ষার জন্যে। বর্তমানে ভারতে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে প্রায় ৮০ বছর আগে হাণ্টার কমিশন সেই পরিকল্পনার প্রথম সূচনা করেন বলা চলে।

ভাষামাধ্যম সম্পর্কে কমিশনের অভিমত আশাপ্রদ হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ের ভাষামাধ্যমের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনাই কমিশনের বিবরণীতে নেই। তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কমিশন ইংরাজী ভাষার স্বপক্ষেই ছিলেন। নিম্নতর শিক্ষা পর্যায়েতেও ভাষামাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ না করে কেবল বলেন যে স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন স্থানীয় স্কুল পরিচালকগণ।

উচ্চশিক্ষা

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধান করার নির্দেশ কমিশনকে দেওয়া হয়নি, তবুও কমিশন উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তবে যে সমস্ত কলেজের উৎকর্ষের উপর শিক্ষামান নির্ভর করে, সেই সমস্ত কলেজগুলির পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকতে পারে বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন বলেছিলেন যে কলেজের শিক্ষক সংখ্যা, ব্যয়ের পরিমাণ, কলেজের শিক্ষাদানের উৎকর্ষ ও স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্র্যাণ্ট-ইন-এড দিতে হবে।

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু পাঠব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কমিশন আরও কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন : (১) প্রত্যেক কলেজে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের আয়োজন করতে হবে; (২) মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারে তার সুযোগসুবিধা দিতে হবে এবং (৩) বড় বড় কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে যাতে বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজন মত শিক্ষা আহরণ করার সুযোগ পেতে পারে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও কমিশন সুপারিশ করেছিলেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ ও অন্যান্য শিক্ষা

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য কমিশন যথেষ্ট পরিমাণে স্কুল পরিদর্শন ও উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন করতে বলেন। শিক্ষাদান প্রণালীর রীতিনীতি সম্পর্কে একটি পরীক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন হাণ্টার কমিশন।

মুসলমানদের দেশীয় স্কুলগুলিকে উৎসাহদান, প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি প্রদান ও বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি এবং মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ স্কুল স্থাপনা প্রভৃতির প্রস্তাব উত্থাপন করে কমিশন মুসলমানদের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন।

নারীশিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে কমিশন পরামর্শ দেন যে বেসরকারী বালিকা স্কুলগুলিকে উদারতর নীতিতে গ্র্যাণ্ট দেওয়া উচিত। মহিলা শিক্ষকদেরও বিশেষ অর্থসাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বালিকাদের প্রাথমিক স্কুলের পাঠক্রম সরল করতে হবে, মহিলা শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য পৃথক পরিদর্শন দপ্তর বসাতে হবে।

এছাড়া অনুন্নত ও আদিম শ্রেণীর অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বেতন মকুব করার কথাও কমিশন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। লিখন পঠনে অক্ষম বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দেওয়ার প্রস্তাবও হাণ্টার কমিশনের বিবরণীতে উল্লিখিত ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করায় কোন রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনরকম ধর্মবিশ্বাস বা নীতিকথার আলোচনা করা হবে না বলে কমিশন নির্দেশ দেন। তবে (১) নীতিশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে এবং তাতে মানবধর্মের মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে আলোচনা লিপিবদ্ধ থাকবে এবং (২) প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ বা কোন অধ্যাপক একটি বক্তৃতামালার মাধ্যমে মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবিকপক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

কমিশনের বৈশিষ্ট্য

হাণ্টার কমিশনের উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি অনুধাবন করলে একথা সুস্পষ্ট [illegible] ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ সালের ডেসপ্যাচ দুটির শিক্ষানীতিকেই

কমিশন পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এই কমিশন সরকারী শিক্ষা দপ্তরের উপর বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং বলেন যে এই শিক্ষা দপ্তরই স্থানীয় শিক্ষা-প্রয়োজনের পরিমাপ করবেন, স্থানীয় সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতা জাগাবেন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায় পর্যন্ত কি ভাবে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়ন ঘটান যেতে পারে সে বিষয়েও হাণ্টার কমিশন যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

ফলাফল

কেন্দ্রীয় সরকার একমাত্র ধর্ম ও নীতিশিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবটি ছাড়া হাণ্টার কমিশনের অন্য সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তার ফলাফল হল এই রকম :

(১) প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষগুলির কাছে হস্তান্তরিত হল; (২) রাষ্ট্রীয় কলেজগুলি বেসরকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তরিত না হলেও সরকার আর কোন নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে স্পষ্ট অসম্মতি জানাতে লাগলেন এবং (৩) ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচেষ্টার ব্যাপারে অভিনব সাড়া জাগলো ও শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারী আধিপত্যের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হল। কমিশনের সুপারিশের ফলে মিউনিসিপ্যাল আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন বিধিবদ্ধ হল এবং সেগুলি প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সহায়ক হল।

তবে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি সর্বত্র সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুসৃত হয়নি। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাণ্ট বিতরণের প্রথা প্রায় সর্বত্র প্রবর্তিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বহুদিনের অবহেলার ফলে দেশীয় স্কুলগুলি ক্রমশই লুপ্ত হয়ে গেল এবং যেগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করে টিঁকে ছিল সেগুলির দেশীয় প্রকৃতি আর অক্ষুন্ন রইল না।

'বি' কোর্সের ব্যবস্থা করা হলেও লোকে সেটিকে 'এ' কোর্সের চেয়ে হীনতর পাঠক্রম বলে মনে করল এবং এই কোর্সের ছুতোর কামারের কাজ শেখবার আগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে দেখা গেল না এবং অভিভাবকেরাও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন জানালেন না। ফলে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা বিফল হল এবং কিছুদিন চালানোর পরে 'বি' কোর্স ছাত্রাভাবে উঠিয়ে দেওয়া হল।

সমালোচনা

১। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিবিধ উল্লেখযোগ্য পর্যালোচনা ও প্রস্তাব করেছিলেন, তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা

করার সুপারিশ করেন নি। অবশ্য একথা ঠিক যে এই কমিশনই প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করে প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

২। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা হলেও তাঁদের ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা বা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকারপক্ষ খরচের মাত্র এক তৃতীয়াংশের বেশী কখনই দিতে রাজী হননি। স্বায়ত্তশাসন সংস্থার পরিচালকদের উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষণপ্রাপ্ত করার ব্যবস্থাও হয় নি।

৩। দেশীয় স্কুলগুলি সম্পর্কে কমিশন অনুকূল অভিমত প্রকাশ করলেও সেগুলির উন্নয়নের জন্য কোনও গঠনমূলক পরিকল্পনা তাঁরা দেন নি। বরং তাঁরা নতুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে মনোযোগী হয়েছিলেন। দেশীয় স্কুলগুলির জন্য কোনও নির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার ফলে সেগুলির বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

৪। 'বি' কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষার আয়োজন করলেও কমিশন যন্ত্র-শিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

৫। বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার যুক্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত দায়িত্ব অনভিজ্ঞ নবনিযুক্ত স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করায় উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয় এবং এর দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাবই প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Give the main recommendations of the Education Commission of 1882-83 as regards Primary Education.

2. The Indian Education Commission of 1882-83 made some definite recommendations about training of Primary teachers. What were their recommendations ?

3. Describe the recommendations of the Hunter Commission stating to what extent these had influenced the subsequent educational expansion in India.

তেরো

কার্জনের শিক্ষাসংস্কার

১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এলেন। এসেই তিনি সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের আনুপূর্বিক তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজে হাত দেবার আগে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯০১ সালে সিমলায় এক শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করলেন। শিক্ষা সম্পর্কে সর্বভারতীয় সম্মেলন সেই প্রথম এবং সে-বিষয়ে সকলের মনে গভীর আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হল। এই সম্মেলনে কার্জন সমস্ত প্রদেশের শিক্ষা ডিরেক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানালেন। দীর্ঘ ১৫ দিন আলোচনার মধ্যে এই সম্মেলনে শিক্ষাসংস্কারসংক্রান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এই সমস্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে উদ্যোগী হন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, তিনি সম্মেলনে একজনও ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানান নি। কারণ উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়দের তিনি সমগ্র দরিদ্র অশিক্ষিত ভারতীয় জাতির প্রতিনিধি বলে মনে করতেন না। শিক্ষাসংস্কারে তাঁর উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ও সততা থাকলেও এই একমাত্র কারণেই তিনি জনসাধারণের অবিশ্বাসভাজন হয়ে পড়েন এবং নতুন আত্ম-সচেতন দেশবাসী এই গোপনীয় শিক্ষাসম্মেলনটিকে জাতীয়তাবোধ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। সিমলা সম্মেলনের বিবরণীটি অপ্রকাশিত রাখার ব্যবস্থা করার ফলে দেশবাসীর এই সন্দেহ দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণীটি প্রকাশিত হলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। ফলে লর্ড কার্জন এদেশে শিক্ষা-সংস্কারের যত চেষ্টাই করুন, বারবারই সর্বত্র তাঁকে বিপুল প্রতিবাদ ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

সিমলা সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, মাধ্যমিক, শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, নারীশিক্ষা নীতিশিক্ষা এবং শিক্ষাদপ্তরের উচ্চতর পদ সৃষ্টি ও ডিরেক্টর জেনারেল নিয়োগের প্রস্তাব।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কার

লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতির পুরোভাগে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারকে স্থান দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে এই পর্যায়ের শিক্ষাসমস্যার সমাধান করাই কঠিনতম কাজ। বাস্তবিক সেই সময়ে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও এলাহাবাদে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেগুলির সঙ্গে কলেজগুলির উপযুক্ত সম্পর্ক ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধু পাঠ্যনির্দেশ ও পরীক্ষার আয়োজন করেই তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করত। স্কুল-কলেজের শিক্ষার উপর সেগুলির কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলির কোন কোনটি সুদূর ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে অবস্থিত ছিল। সমগ্র উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতার বিশেষ অভাব ছিল এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন—১৯০২

১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সুসংস্কার ও পুর্নগঠন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি এবং কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। তাছাড়া যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েরই পুরাতন গঠনধারা বর্জন করে নতুন ভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছিল ১৮৯৮ সালে। অতএব এই সকল বিবিধ কারণে এদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধনের কাজটি প্রথম গ্রহণ করে লর্ড কার্জন সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০২ সালে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশনের কাজ হল এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, ভবিষ্যৎ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবরণী রচনা করা।

কমিশনের সুপারিশ

কমিশন কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাদানের মাধ্যম রূপে পুনর্গঠিত করার বিরোধিতা করে কমিশন বলেন যে অনুমোদিত কলেজগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত থাকলে এই সংস্কার ব্যর্থ হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা

হয় এবং নিম্ন-স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদানের দায়িত্ব কলেজগুলির হাতেই রাখার প্রস্তাব করা হয়। কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর (Post Graduate) পর্যায়ের শিক্ষার জন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, গবেষণাগার এবং উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য কমিশন বিশেষ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কর্মাঞ্চল নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার দিকে কমিশন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এই কমিশন প্রস্তাব করেন যে, সেনেটের সদস্যসংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং কোনও ব্যক্তি ৫ বছরের বেশী সদস্য থাকতে পারবেন না। মোট সদস্যসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ প্রতি বছরে আসন ত্যাগ করবেন। সেনেটে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কর্মচারী ও গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বের আয়োজন রাখতে হবে। সিণ্ডিকেটের সদস্যসংখ্যা হবে ৯ থেকে ১৫ জনের মধ্যে এবং এঁরা সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

কলেজ অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করেন যে, অনুমোদন দানের পূর্বে সকল তথ্যের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং অনুমোদিত কলেজের শিক্ষাদানের উৎকর্ষ যাতে অবনতি লাভ করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একথাও সুস্পষ্টভাবে কমিশন বলেন যে, প্রত্যেক কলেজে উপযুক্ত ভাবে সংগঠিত কার্যকরী সমিতি, শিক্ষকমণ্ডলী, উপযুক্ত হোষ্টেল-ব্যবস্থা, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণের যথেষ্ট আয়োজন রাখতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন ও দাবী এবং ছাত্রদের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনুমোদিত কলেজগুলিতে ন্যূনতম বেতনহার নির্দিষ্ট করার জন্যও কমিশন সিণ্ডিকেটকে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দেন। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কলেজগুলির যদি উৎকর্ষ সাধন সম্ভব না হয়, তাহলে সেগুলিকে উচ্চ স্কুলে পরিণত করাই বাঞ্ছনীয় বলে এই কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন।

পাঠক্রমের উন্নয়ন সাধনের জন্যও কমিশন কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষার জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের প্রয়োজন নেই এবং এম-এ পর্যায়ের ইংরেজী পরীক্ষার পাঠক্রমে কিছুটা মাতৃভাষা বা কোনও প্রাচীন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন। কমিশন যদিও ভারতীয় ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, তবুও আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে

তাঁরা ভারতীয় ভাষাচর্চার সুপারিশ করেন নি। কমিশন আরও বলেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মান উন্নততর করতে হবে, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বিলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং বি-এ পর্যায়ের পাঠকাল তিন বছর ধার্য করতে হবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে নিয়মকানুন কঠোরতর করার নির্দেশও কমিশন দিয়েছিলেন।

সমালোচনা

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের কি রূপ হবে এবং সেই লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ে পৌছবার কি উপায় নির্ধারণ করা যেতে পারে, মূলত সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্যই ১৯০২ সালের কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কমিশন তাঁদের বিবরণীতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি। ফলে, ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনও মৌলিক সংস্কারসাধনে সমর্থ হয়নি। কেবলমাত্র তদানীন্তন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির কিছু পরিমাণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই এই কমিশনের অবদান স্বীকার করা যেতে পারে।

এই কমিশনের বিবরণী দাখিলের পর বৎসর ১৯০৬ সালে ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতি সম্পর্কে ঐদেশে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের মূল নীতির বিরাট পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এদেশে ১৯০২ সালের কমিশনের সুপারিশগুলি ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পূর্বপ্রচলিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল বলে ইংলণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের ধারা সম্পূর্ণ বদলে গেলেও ভারতে পুরাতন সংগঠন ধারাই বহাল রয়ে গেল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯০৪

১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তাঁদের বিবরণী পেশ করবার পরে ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হল। কমিশনের প্রায় সকল সুপারিশই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হল এবং এদেশে। কার্জনের শিক্ষানীতি কার্যকরী হতে সুরু হল।

আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিগুলি ছিল এই—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ এবং গবেষণা, গ্রন্থাগার ও ছাত্রাবাস পরিচালনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচী বিস্তৃত করা হল।

(২) সেনেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ জনের কম বা ১০০ জনের বেশী 'ফেলো' থাকবেন না এবং কোন 'ফেলো' আজীবন সদস্য থাকতে পারবেন না। তাঁদের কর্মকাল হবে ৫ বছর। ১০০ জন সদস্যদের মধ্যে ৮০ জনকেই সরকার মনোনীত করবেন।

(৩) পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ২০ জন এবং নতুন দু'টি (পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন করে নির্বাচিত 'ফেলো' নেওয়া চলবে। এইভাবে এই আইনের সাহায্যে সেনেটে নির্বাচিত 'ফেলো'র সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা করে সিণ্ডিকেটকে আইনানুগ অনুমোদন দেওয়া হল।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট অনুমোদন লিপিবদ্ধ হল এবং কলেজগুলির যাতে নিয়মিত পরিদর্শন হয় এবং অনুমোদনের পূর্বে সরকারী অনুমতি নেওয়া হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল।

(৬) সেনেট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনকে কার্যে পরিবর্তন করতে না পারলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য, এমন কি নতুন নিয়মকানুন প্রণয়নের ব্যাপারেও সরকারী কর্তৃপক্ষকে আইনসঙ্গত ক্ষমতা অর্পণ করা হল। ১৮৫৭ সালের আইনে সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাঞ্চল নির্ধারণের ক্ষমতা অর্পিত হল বড়লাটের উপর। ১৮৫৭ সালের আইনে এই বিধানটিও ছিল না, ফলে নতুন আইনটি জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করল।

সমালোচনা

দেশবাসী এই আইনের তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেন। সিমলা সম্মেলন ও ১৯০২ সালের কমিশন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে দেশবাসী ধারণা করেছিলেন যে, ইংরেজ সরকার বিদেশী শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে এদেশের উচ্চ শিক্ষার ভার অর্পণ করার ষড়যন্ত্র করছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী প্রভাব বৃদ্ধির আয়োজন করে এটিকে সরকারের অধীনস্থ একটি বিভাগে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। এই বিরোধী দলের মধ্যে গোখেল এবং কমিশনের সদস্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন।

তাছাড়া, এই আইনে গতানুগতিক ব্যবস্থার আশানুরূপ কোন সংস্কার সাধন না

করে পুরোনো সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থাকেই মূলত অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছিল। এতে সকলেই হতাশ হন। শুধু তাই নয়, সেনেটে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্বের আয়োজন করা হয়নি। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করলেও নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য এবং সকলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, সেনেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হল সেখানে ইউরোপীয় সদস্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা স্থাপন করা, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা' হয়নি। এতে শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের দিকে যথাযথ মনোযোগ না দিয়ে কলেজের অনুমোদন সংক্রান্ত কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রণয়নেই অধিকতর কুশলতা প্রদর্শন করা হয়েছিল। আরও পরিতাপের বিষয়, আইনটিকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের ব্যবস্থার দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এইসব কারণে স্বভাবতই এই আইন গণসমর্থন লাভ করতে পারেনি।

তবে এ'সত্ত্বেও এই আইন কিছু কিছু মঙ্গলকর পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছিল এবং দেশবাসী যতটা ভয় পেয়েছিল সেরকম কিছুই ঘটেনি। এই আইনের দ্বারা ইউরোপীয়দের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চলে যায় নি। এই আইনের দ্বারা সিণ্ডিকেটের আইনানুগ অনুমোদন স্বীকৃত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সেনেটের বিপুল সদস্যসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় কার্যধারাও পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট ও সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। সেনেট ও সিণ্ডিকেটের অধিবেশন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সেগুলির গ্রন্থাগারের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তন

১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সবচেয়ে বড় অবদান হল, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে শিক্ষণধর্মী করে তোলা। ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র তাদের অধীনস্থ কলেজগুলিকে অনুমোদন দানের প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেগুলিতে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ১৮৯৮ সালের আইনের বলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন-ধর্মী (affiliating) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষণধর্মী (teaching) বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষে ১৯০২ সালের কমিশন এবং ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতিই অনুসরণ করে এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার নির্দেশ

দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অধীনস্থ কলেজ-সম্বলিত এই ধরনের সঙ্ঘবদ্ধ (federal) বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের বিরুদ্ধে লণ্ডনে শীঘ্রই আবার আন্দোলন দেখা দেয় এবং ১৯১৩ সালেই সেখানে প্রচলিত সঙ্ঘবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতি পরিত্যাগ করে শিক্ষণধর্মী এককেন্দ্রিক (unitary) ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই আইনটি ১৯০৪ সালে রচিত হওয়ায় ইংলণ্ডের এই নতুন নীতিটি এতে সন্নিবদ্ধ করা যায়নি। ১৯১৩ সালের সরকারী শিক্ষানীতির ঘোষণায় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের এই নতুন নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনের পর থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টা অবাধ গতিতে বিস্তার লাভ করেছিল। তার ফলে বহুক্ষেত্রে শিক্ষার মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছিল। এমন অনেক স্কুল হয়েছিল যেগুলিতে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষাদান করা হত। তার ফলে মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যায় বহু হলেও কার্যকারিতার দিক দিয়ে তাদের মূল্য বিশেষ ছিল না। কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার এই অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার রোধ করতে সিদ্ধান্ত করলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নীতি দুটি কথায় প্রকাশ করা যায়, শিক্ষার বিস্তারের নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার মানের উন্নয়ন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ধরনের নিম্নমানের স্কুল অবাধিতভাবে স্থাপিত হয়ে চলেছিল, সে ধরনের স্কুল আর প্রতিষ্ঠা না করে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মানের উন্নতি করাই ছিল তাঁর মূল নীতি।

স্কুল অনুমোদন

মাধ্যমিক শিক্ষার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য কার্জন স্কুলগুলিতে অনুমোদন-প্রথার প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এর আগে কেবলমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত (aided) স্কুলগুলির উপরই শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ছিল এবং ১৮৮২ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষাবিভাগ এই নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। ১৯০৪ সালের কার্জন সরকারের শিক্ষা-নীতিসংক্রান্ত প্রস্তাবে (Government Resolution of Educational Policy of 1904) সেই নীতি পরিত্যাগ করে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল এবং সেই নীতি অনুসারে স্কুল অনুমোদনের সর্তাদি রচনা করা হল। এই সর্তগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের

কলেজ-অনুমোদনের সর্তাদির মতই হল এবং ঘোষণা করা হল যে একমাত্র অনুমোদিত স্কুলগুলিই গ্রাণ্ট-ইন-এডের জন্য আবেদন করতে পারবে।

তাছাড়া যে সমস্ত স্কুল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণে ইচ্ছুক হবে তা সরকারী শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন ত নিতেই হবে তাছাড়াও যে বিশ্ব-বিদ্যালয় ঐ পরীক্ষা পরিচালিত করবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনুমোদন লাভ করতে হত। ফলে স্কুলগুলির উপর দু' প্রকারের অনুমোদন-প্রথা বলবৎ হল। প্রথম, সরকারী শিক্ষাবিভাগের, দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই দ্বিবিধ অনুমোদন প্রথার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বাধাহীন প্রসার বিশেষভাবে খর্ব হয়ে গেল। তাছাড়া এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিভাগের মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্কুল পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্যও আরও অসুবিধা হত। এই যুগ্ম অনুমোদন প্রথার প্রবর্তনে সে অসুবিধা দূর হল। শিক্ষাবিভাগের অনুমোদিত স্কুলগুলি নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হল :—

১। সরকারী গ্রাণ্ট-ইন-এড লাভ ;

২। সরকারী পরীক্ষাগুলিতে ছাত্র প্রেরণ ;

৩। সরকারী ছাত্রবৃত্তিভোগী ছাত্রদের গ্রহণ।

এই নতুন নীতি অনুসারে অধিকসংখ্যক স্কুল যাতে অনুমোদন গ্রহণে উৎসাহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে অধিকতর পরিমাণে গ্রাণ্ট-ইন-এড বিতরণের সিদ্ধান্ত করা হল। অনুমোদনের সর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সযত্ন দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে পরিদর্শকমণ্ডলীও সংগঠিত হল।

যে সকল স্কুল অনুমোদন লাভের জন্য উৎসাহী হবে না সেগুলিকেও পরোক্ষ-ভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন করার উদ্দেশ্যে এই মর্মে ঘোষণা করা হল যে, অননুমোদিত স্কুলের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য স্বীকার করা হবে না এবং ঐ সার্টি-ফিকেটের ভিত্তিতে কোন অনুমোদিত স্কুলে ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। এইভাবে অননুমোদিত স্কুলগুলির মর্যাদা ও কর্মক্ষমতা দুইই বিশেষভাবে খর্ব করা হল। অনুমোদন-সর্ত যথাযথভাবে মানতে না পারার ফলে অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

অনুমোদন নীতির ফলাফল

স্কুলগুলির উপর অনুমোদন নীতির আবরণে সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মতই এই

নতুন নীতিরও তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। বেসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টা এবং জাতীয় জাগরণকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই এই সকল নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তিত হচ্ছে বলেই সাধারণ লোকেরা মনে করলেন। অসংযত বেসরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার কিছুটা নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়োজন ছিল এ কথা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের এত কঠোর ব্যবস্থায় কেউ প্রীত হন নি। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে পরবর্তীকালে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণহীনতা ও যান্ত্রিকতার ছাপ দেখা দিয়েছিল।

মাধ্যমিক স্কুলের মান উন্নয়ন

কার্জন একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রচলন করলেন তেমনি অপরদিকে প্রচলিত স্কুলগুলির শিক্ষার মানের যাতে যথেষ্ট উন্নতি হয় তার জন্যও সচেষ্ট হন। তাঁর এই নীতিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি প্রধান উপায় অবলম্বন করলেন।

(১) সরকারী উচ্চ স্কুলগুলিকে আদর্শ 'মডেল' স্কুলরূপে পরিচালনা করা হবে। কার্জন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা প্রত্যাহার নীতি সমর্থন করতেন না। তাই সিদ্ধান্ত হল, শিক্ষাক্ষেত্রের প্রত্যেক শাখায় আদর্শ সরকারী প্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে এবং প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি করে সরকারী মডেল উচ্চ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) বেসরকারী স্কুলগুলি যাতে সরকারী মডেল স্কুলের উন্নত স্তরে পৌঁছতে পারে, তার জন্যে বিপুল পরিমাণে গ্রাণ্ট-ইন-এড বিতরণের আয়োজন করা হবে। লর্ড কার্জন স্কুলের পরীক্ষার প্রতি বিশেষ মূল্য আরোপ করতে চান নি এবং তাঁর এই নীতির ফলে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়ার (Payment-by results) নীতি ক্রমশই মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে লুপ্ত হল।

(৩) মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থার দিকেও কার্জন অধিকতর মনোযোগ দিলেন। ১৯০৪ সালের শিক্ষানীতিসংক্রান্ত প্রস্তাবে তিনি নির্দেশ দিলেন যে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিকে উন্নত করে শিক্ষণপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য সরকারকে অগ্রণী হতে হবে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কার্জন শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা প্রত্যাহারের নীতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে, তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজ ক্ষুব্ধ হলেও ভবিষ্যতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল।

এছাড়া লর্ড কার্জন মাধ্যমিক পাঠক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক (vocational) বিষয় প্রবর্তনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার সমমর্যাদাসম্পন্ন একটি বৃত্তিমূলক পরীক্ষারও আয়োজন করার প্রস্তাব করেন। ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে তিনি শিক্ষা কমিশনের চেয়ে যথেষ্ট সুস্পষ্টভাবে তাঁর শিক্ষামূলক প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে শিক্ষার্থীর ১৩ বছর বয়সের আগে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের নীতি ছিল বেশ স্বতন্ত্র। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং পরিমাণগত বৃদ্ধির সংকোচন করেছিলেন। আর সেইজন্য অনুমোদন প্রথা ইত্যাদির সাহায্যে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার অনিয়ন্ত্রিত অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল উদারতম। সংখ্যাগত সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, উভয়ই ছিল লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১৮৮২ সালের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় সরকারী অর্থসাহায্যের অভাবে। কার্জন এই কারণে বিপুল পরিমাণে এককালীন (non-recurring) ও পৌনঃপুনিক (recurring) অর্থ সাহায্য বিতরণ করতে সুরু করেন। পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষগুলি প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে $\frac{2}{3}$ অংশ এবং সরকার $\frac{1}{3}$ অংশ খরচ বহন করতেন। কার্জনের নির্দেশে সরকার $\frac{1}{2}$ অংশ ব্যয়ভার বহন করতে লাগলেন। এই উদারনীতির ফলে প্রাথমিক স্কুল ও সেগুলির ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। ১৮৮১-৮২ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩,০০০ ; ১৯০১-০২ সালে হল প্রায় ৯৪,০০০ এবং ১৯১১-১২ সালে দাঁড়াল প্রায় ১,১৮,০০০এরও বেশি। ছাত্রসংখ্যাও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শিক্ষক-শিক্ষণ :

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকদের শিক্ষণকালও বর্ধিত করা প্রয়োজন।

পাঠক্রম প্রসারণ :

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের প্রসারণের প্রতিও কার্জন মনোযোগ দিয়েছিলেন। প্রাথমিক পাঠক্রমকে সরলতর করার জন্যে শিক্ষা কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন, তিনি তার সমর্থন করেননি। অপর পক্ষে, তিনি পাঠক্রমটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করেন এবং কিণ্ডারগার্টেন প্রথা, শরীরচর্চা প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, গ্রাম্যস্কুলের জন্য গ্রামের উপযোগী পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এই কারণে গ্রাম্য প্রাথমিক স্কুলের পাঠক্রমে তিনিই প্রথম কৃষিবিদ্যার প্রবর্তন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-হারের কিছু পরিবর্ধনের ব্যবস্থা করে তিনি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদানের (Payment-by-results) নীতি বর্জন করেন এবং তার পরিবর্তে উন্নততর অর্থ সাহায্যের নীতি গ্রহণ করেন। এই সমস্ত সংস্কারের ফলে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাগত মানের উন্নতি ও সংখ্যাগত বৃদ্ধি উভয়ই ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার

ভারতের বড়লাট থাকাকালীন লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সংস্কারসাধন করেছিলেন। যেমন—চারুকলা (Art) স্কুলগুলির উৎকর্ষ হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণ সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার দাবী জানান, কিন্তু কার্জন সেগুলির সংগঠনমূলক মধ্যে নানা পরিবর্তন সাধন করে সেগুলিকে সুপরিচালিত করার ব্যবস্থা করেন। কৃষিবিদ্যাশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি কৃষিবিভাগ এবং কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা মন্দির স্থাপনা করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে কৃষিবিদ্যার কলেজ স্থাপনা এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে কৃষিবিদ্যা চর্চার আয়োজন করেও তিনি এ বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের বিদেশে যাওয়ার সুবিধাদানের জন্য বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তি প্রদানের আয়োজন করেছিলেন। সরকারী স্কুলগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ করে রাখলেও কার্জন অন্যান্য স্কুলে নীতিশিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলির সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) বিভাগের প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ আইন (১৯০৪) বিধিবদ্ধ করেন। ভারতের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়নের জন্য তিনি একজন শিক্ষার আধিকারিক (Director General of Education) নিযুক্ত করেন। এটিও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার।

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের অবদান

যদিও লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতিটি সে সময় তীব্র বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল তবুও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের আন্তরিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আজ সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষাধারার সূত্রপাত ঘটে তাঁরই শাসনকালে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংবিধান পরিবর্তিত করে সেগুলির কর্মকুশলতা বাড়িয়ে তোলেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনেও তিনি প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করেন। কৃষিবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত করেন তিনিই। এছাড়া শিক্ষা-প্রসারের জন্য অর্থব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি দৃঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেন এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রত্যাহার নীতি একেবারে বর্জন করেন। ভারতীয় ভাষাগুলির যথাযথ চর্চার জন্যও লর্ড কার্জন বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন।

শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব—১৯০৪

লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতিগুলি একটি সরকারী প্রস্তাবের (Resolution on Education Policy) রূপে ১৯০৪ সালের ১১ই মার্চ প্রকাশিত করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদানের পর এই প্রস্তাবে তদানীন্তন শিক্ষা-পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয় এবং বলা হয় '৫টি গ্রামের মধ্যে ৪টিতে কোন স্কুল নেই ; প্রতি ৪ জন বালকের মধ্যে ৩ জন বিনা শিক্ষায় বড় হয় এবং ৪০ জন বালিকার মধ্যে মাত্র ১ জন স্কুলে অধ্যয়নের সুযোগ পায়।' এতে আরও বলা হয় যে, বিগত ২০ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও সেই প্রগতি সমগ্র দেশবাসীকে স্পর্শ করতে পারেনি এবং কেবলমাত্র সরকারী চাকুরীর প্রত্যাশাতেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সকলে উৎসাহী হত। এছাড়া পরীক্ষা-ব্যবস্থার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ, সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির অভাব এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহের ফলে ভারতীয় ভাষাগুলির অবহেলা প্রভৃতি বিষয়েও এই প্রস্তাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এর পর শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দোষত্রুটির কথা বিশদ ভাবে আলোচনার পর এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটিতে প্রাথমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাধারা সম্পর্কে বহু মূল্যবান নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়।

বস্তুত এই প্রস্তাবে ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ এবং ১৮৮২ সালের কমিশনের মূলনীতিগুলিকে সমর্থন করা হয়েছিল এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষগুলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া এই প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, যথোপযুক্ত সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমেই শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। অবহেলিত কারিগরী বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রটির প্রতি এই প্রস্তাবেই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট ও সার্থক মনোযোগ দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয়, প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে এই প্রস্তাব কিছুমাত্র চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেনি।

উপসংহারে এই কথা বলা চলে যে, তথ্য ও পরামর্শে সুসমৃদ্ধ এই প্রস্তাবটি ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে একটি অতুলনীয় ঐতিহাসিক দলিল। এর ভিত্তিতে লর্ড কার্জন যে অসাধারণ সংস্কার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্যে তিনি আজও স্মরণীয়। তবে এই প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ নীতিগুলি কার্যে পরিণত করতে গিয়ে তিনি যে অনমনীয়তা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ফলে গোখেলের মত বিচক্ষণ শিক্ষাবিদও তাঁকে "ভারতের শিক্ষাজগতের আওরংজেব" নামে বিদ্রূপ করেছিলেন। ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের প্রতি নিদারুণ অবহেলা ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে কাজ করলে তাঁকে নিশ্চয়ই মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ভারত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হত না।

প্রশ্নাবলী

1. Why had Lord Curzon to give a new orientation to the Government's Educational Policy? Narrate a few important features of the policy laid down in the resolution of 1904. (B. A. 1955)

2. Write notes on Curzon's Educational Policy. (B. T. 1954)

3. Discuss the recommendations of the Indian Universities Commission of 1902 stating to what extent they had influenced the subsequent reform of higher education in India.

4. Give the important provisions of the Indian Universities Act of 1904 with your comments on them.

5. Discuss the main features of the educational policy of Lord Curzon. (B. A. 1960)

চোদ্দ

প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন ও অগ্রগতি

স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে দেখা দেয় দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের সর্বমুখী প্রচেষ্টা। বিশেষ করে দেশনেতারা উপলব্ধি করলেন যে জনগণের মধ্যে যদি শিক্ষার বিস্তার না করা হয় তাহলে দেশের অগ্রগতির কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

দেড়শ বছর ইংরাজ শাসনের ফলেও ভারতের জনশিক্ষার মানের কোন দিক দিয়েই উন্নত হয় নি। গোলটেবিলের বৈঠকে গান্ধিজী এই পরিস্থিতির জন্য ইংরাজ শাসকদের অবহেলা ও উদাসীন শিক্ষানীতির তীব্রভাষায় সমালোচনা করেন। সে সময় লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৬ জন। শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থায় দেশের সকলেই ক্ষুব্ধ হন এবং ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য দেশব্যাপী একটি আন্দোলন দেখা দেয়।

লর্ড কার্জন অবশ্য এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও স্বীকার করে নেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যথেষ্ট অর্থও মঞ্জুর করেছিলেন। ১৯০৫ সালে এই উদ্দেশ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার তেমন কিছুই হয় নি। তার প্রধান কারণ ছিল দুটি। যথা—

১। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার নীতি

প্রথমত, ইংরাজ শাসনকর্তৃপক্ষের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের কোনও মূল্য ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা তাঁরা অনেক দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছিলেন। শাসন কাজ চালাবার জন্য সহায়ক কর্মীবৃন্দ এই মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত স্তর থেকে তাঁরা প্রচুর সংখ্যায় সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু জনগণকে শিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন নি। বরং তাঁদের অনেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা তাঁদের শান্তিপূর্ণ ও নিশ্চিন্ত দেশশাসনের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকাও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ ব্যয়িত হত। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মোটেই আশানুরূপ হয় নি। ভারতের নেতৃবৃন্দ সরকারের এ নীতির জন্য যথেষ্ট ক্ষুব্ধ বোধ করেন।

দ্বিতীয়ত, ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা ছাড়া অন্য উপায়ে কখনও তার বিস্তার ঘটানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার মত বিরাট দায়িত্ব তখনকার বিদেশী সরকার নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই দুই কারণে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিটি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের একান্ত বিরোধী ছিল। তার ফলে ভারতে ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন বিশেষ করে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনের রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছিল।

১৯১০ সালে প্রসিদ্ধ ভারতীয় জননেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পরে ১৯১১ সালে গোখেল আবার ঐ মর্মে আর একটি বিল উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব ও বিল দুই প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯১৯ সালে বিঠলভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলি পাশ হয়। বাংলাদেশেও ঐ সালেই সহরাঞ্চলের জন্য বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি পাশ হয়। ঐ বিল দুটি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ও দুটির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনাটি বাস্তবে পরিণত হয় নি। ভারত স্বাধীন হবার পরও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। এইটিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কার্যকরী প্রস্তাব কিছু পরিমাণে গৃহীত হয়েছে।*

---

* এই পুস্তকের 'সমস্যার ইতিহাস' পর্যায়ে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক পরিচ্ছেদটিতে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

পনের

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯১৭

১৯১৩ সালে যে সরকারী শিক্ষা প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারণ সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রত্যেক প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের কাজের সম্প্রসারণ করা উচিত এবং মফঃস্বলের কলেজগুলিকে শিক্ষাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কারণে ১৯১৩ সালের কোন প্রস্তাবই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ এবং এর গঠনমূলক নীতি ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনকে স্যাডলার কমিশন বলা হয়।

মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড

একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ছাড়া ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্য সকল স্তরের প্রতিটি বিষয় এই কমিশন পর্যালোচনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই বলেই কমিশন এ বিষয়ে আলোচনা করেন নি। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক সংস্কার সাধিত না হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্ভব নয় বলে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাগুলি আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করেন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সরিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে এই কমিশন বলেন—

(১) মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা একটি মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ডের হাতে অর্পণ করা উচিত। এই বোর্ডে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন।

(২) ডিগ্রী কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি পৃথক করে ইণ্টার-

মিডিয়েট কলেজ স্থাপনা করা উচিত। এই নতুন ধরনের কলেজে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনীয়ারিং, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকবে।

(৩) ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পাঠ শেষ করার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যাবে না।

কমিশন আশা করেছিলেন যে প্রস্তাবিত বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের গুরুভার কমে যাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে সম্ভব হবে।

প্রস্তাবিত বোর্ডটির স্বাধীন কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হয় যে বোর্ডটি হবে বেসরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও জনসাধারণের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি এতে থাকবেন।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন মন্তব্য করেন যে, এখানে কলেজ ও তাদের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এত বেশি যে, একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা করা অসম্ভব। এ সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করেন—

(১) ঢাকায় একটি শিক্ষণ-ধর্মী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করতে হবে। (১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।)

(২) কলকাতায় শিক্ষাদানের যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলিকে এমনভাবে সুসমন্বিত করতে হবে যাতে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকৃত শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে।

(৩) মফঃস্বলের কলেজগুলিকে এমন ভাবে উন্নত করতে হবে, যাতে স্থানীয় সর্বপ্রকার শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার একত্রীকরণে সেগুলি এক একটি উচ্চশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে।

পরিচালনা :

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানসংক্রান্ত বিষয়ে কলেজের শিক্ষকদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। অন্যান্য পরিচালনার ব্যাপারে সেনেট এবং সিণ্ডিকেটের পরিবর্তে যথাক্রমে একটি ব্যাপক প্রতিনিধি-মূলক কোর্ট (Court) এবং একটি ক্ষুদ্র কার্যকরী পরিষদ (Executive Council)

গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাঠক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ, ডিগ্রী মঞ্জুর প্রভৃতি শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে একটি অধিকতর ক্ষমতাশালী অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল (Academic Council) গঠনের জন্য কমিশন নির্দেশ দেন। বিবিধ ফ্যাকাল্টি, বোর্ড অব ষ্টাডিস, এবং অন্যান্য আইনানুগ (statutory) সমিতি গঠনের প্রয়োজনও উল্লিখিত হয় কমিশনের বিবরণীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপরিচালনাসংক্রান্ত নিয়মকানুন অপেক্ষাকৃত সরল করা উচিত বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন। একজন পূর্ণকালীন (whole-time) বেতনভুক্ উপাচার্য নিয়োগেরও সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষাদান :

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত দোষত্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করেন যে, সাহিত্যবিষয়ক পাঠক্রম ছাড়াও বিবিধ প্রকারের কারিগরি শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য অনার্স পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে। ব্যক্তিগত পাঠপ্রস্তুতি (tutorial) ও উৎকৃষ্ট গবেষণা পরিচালনার আয়োজন করতে হবে এবং ভারতীয় ভাষার চর্চা ও প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষণ :

শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগ (Department of Education) স্থাপন করতে হবে এবং বি-এ (পাস) ও ইণ্টারমিডিয়েট পাঠক্রমে 'শিক্ষাতত্ত্ব' নামে একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হবে। বৃত্তিমূলক (Vocational) শিক্ষা বিষয়ে কমিশন বলেন যে ব্যবহারিক জ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প বিজ্ঞান (Technology) সংক্রান্ত পাঠক্রমের প্রবর্তন করে দেশের শিল্পোন্নতির যথাযথ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। শারীর শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে ছাত্রকল্যাণ পর্ষদ এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে শারীরশিক্ষার ডিরেক্টর থাকবেন।

১৫-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিশেষ পর্দা-স্কুল সংগঠন ও নারীশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠনের কথা উল্লেখ করতেও কমিশন বিস্মৃত হননি। বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ (Inter-University Board) গঠনের পরামর্শও দেওয়া হয় কমিশনের বিবরণীতে।

সমালোচনা

মেহিউ (Mayhew) বলেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবরণীটি পরামর্শ ও তথ্যের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার এবং ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিমেয়'। বাস্তবিকই এই কমিশনের পরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় কৃষ্টি ও ভাবধারার বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে নতুন উদ্দীপনায় আদর্শস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেকগুলি প্রচেষ্টা দেখা যায়।

অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের অনুকরণে কলকাতার কলেজগুলিকে সুসংহত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টির পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিশন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার অসুবিধা ও জটিলতা সম্পর্কে কমিশন কোনও বিবেচনা করেন নি। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড গঠনের সুপারিশটি সময়োচিত না হলেও কমিশন দূরদৃষ্টি ও সুবিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্যতা প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তর থেকে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে উন্নীত করাটাও একটি প্রগতিশীল প্রস্তাব। ১৯৫২ সালের মুদালিয়র কমিশন স্যাডলার কমিশনের অনেক সুপারিশের পুনরাবৃত্তি করেন এবং বর্তমানে বহুসাধক স্কুল (Multipurpose School) এবং আধুনিক তিন বছরের ডিগ্রী-স্তরের শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা স্যাডলার কমিশনের এই মূল্যবান সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the main recommendations of the Calcutta University Commission of 1917 in the light of subsequent expansion of education in the country. (B. T. 1957)

2. Write notes on : Sadler Commission.

ষোল

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা

১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনীয়তায় অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার পুনর্গঠন এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেন। তাছাড়া এদেশের জনসংখ্যার ৮০% হল গ্রামবাসী। তাদেরও শিক্ষাদানের বিপুল সমস্যার কথা সরকারকে ভাবতে হচ্ছে।

এই বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে স্বাধীন ভারতে অনেকগুলি কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে দুটি কমিশনরে সুপারিশ বিশেষ মূল্যবান। সে দুটি হল: (১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯) এবং (২) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩)।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসোপানে বিশ্বের অন্যান্য উন্নততর দেশের পর্যায়ক্রম অনুসরণ করারই চেষ্টা করা হয়েছে। এদেশে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু এবং সুসংহত আয়োজন এখনো প্রায় নেই বললেই চলে, তবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই পর্যায়টির যথাযথ বিকাশের জন্যে ৪·১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে কিছু কিছু নার্শারী বা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে। এই স্তরটির পরে কোন রাজ্যে ৪ বছর বা কোথাও ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রে নিম্নবুনিয়াদী পাঠস্তর গ্রহণ করা হয়েছে। এর পর আসে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর। তার মধ্যে দুটি ভাগ আছে: নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। দুটিতেই ৩ থেকে ৪ বছর করে সময় লাগে। সম্প্রতি মুদালিয়র কমিশনের নির্দেশমত প্রচলিত উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে একটি বছর অতিরিক্ত যোগ করে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর প্রবর্তিত হয়েছে। প্রায় সব রাজ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট স্তর বিলুপ্ত হয়েছে এবং ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে। মোটের ওপর, এখন স্কুল শিক্ষার সময় দাঁড়িয়েছে কোথাও দশ বৎসর, কোথাও এগার। যেখানে দশ বছরের স্কুল প্রচলিত আছে সেখানে এগার বৎসরের স্কুলের সমপর্যায়ে আনার জন্য এক বৎসরের প্রি-ইউনিভার্সিটি বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়

স্তরের প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩-বছরের ডিগ্রী কোর্সের পর ২-বৎসর এম-এ, এম-এস-সি ডিগ্রীর জন্য এবং তারপর ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য আরও ২-বৎসর প্রয়োজন হয়।

এ ছাড়া বাণিজ্য, ইনজিনীয়ারিং, শিক্ষকতা, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন, কৃষি প্রভৃতি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয় শিক্ষার জন্য বহু স্কুল ও কলেজ গড়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরা ইণ্টারমিডিয়েট, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক বা ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই এই ধরনের কোন না কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষাস্তরে অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেতে পারছে। তাছাড়া বিকলাঙ্গ ও বিপথগামী ছেলেমেয়েদের জন্যও বিশেষধর্মী শিক্ষার স্কুলও গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতালাভের পর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটিকে প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সংগঠন রূপে গ্রহণ করা। গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে শিল্পভিত্তিক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

পরিশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা

স্বাধীনতার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে শিক্ষার কোন পৃথক মর্যাদা ছিল না, স্বাস্থ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনেই এর কাজ চলত। ১৯৪৭ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীদপ্তর গড়ে ওঠে। এই দপ্তরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আছে। শিক্ষানীতি ও সুব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ, কারণ সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যসরকারগুলির হাতে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তবে সর্বভারতীয় পুনর্গঠন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বৈদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, ছাত্রবৃত্তি বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত বিভিন্ন উপদেষ্টা পরিষদগুলি বিভিন্ন রাজ্যসরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীতে বিশেষ সহায়তা করে থাকে। এই উপদেষ্টা পরিষদগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে, যেমন, ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন, নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল, নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিল, নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব এডুকেশন সমগ্র দেশের শিক্ষার অগ্রগতির সদ্যসংগৃহীত তথ্যাদির সম্প্রচার করে থাকে। রাজ্যসরকারগুলি, বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ত সরাসরি প্রভূত অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। এছাড়া আরও কতকগুলি শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত আছে। যেমন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা, দিল্লী, আলিগড়, বেনারস ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিত্যালয়ের পরিচালনা। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও দলিল-সংরক্ষণ দপ্তর, সেনাবাহিনীর শিক্ষাব্যবস্থা এবং ন্যাশানাল ল্যাবরেটরীগুলি, ন্যাশানাল মিউজিয়াম, ন্যাশানাল লাইব্রেরী, ধানবাদের খনিবিত্যার স্কুল, নয়াদিল্লীর কৃষি গবেষণা মন্দির প্রভৃতির মত সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান-গুলির পরিচালনা কেন্দ্রীয় সরকারই করে থাকেন।

রাজ্য সরকারের শিক্ষাদপ্তরগুলিতে স্বাধীনতার পরে বিশেষ কোন পরিশাসনমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে কোন কোন অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডগুলির দায়িত্বই বেশি থাকে। কোন কোন রাজ্যে লোকাল বোর্ড, জনপদ সভা প্রভৃতি স্থানীয় আধা-সরকারী সংস্থাগুলি রাজ্যসরকারের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় আংশিক দায়িত্ব বহন করে থাকে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি দু'শ্রেণীর : অনুমোদিত এবং অননুমোদিত। অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ২২% সরকার, ৪০% স্থানীয় সংস্থা (মিউনি-সিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড) এবং বাকী ৩৮% বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত ঐ ৩৮% মধ্যে ৩৪% সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত. বাকি ৪% কোন সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে না।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে শিক্ষার খাতে খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৬ সালে এই খাতে অবিভক্ত ভারতে মোট ব্যয় হয় ৫৭ কোটি টাকা। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ হয় ৫৫ কোটি টাকা। ১৯৫২ সালে ১২০ কোটি টাকা, ১৯৫৫ সালে ১৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬০ সালে ২৯৮ কোটি টাকার মত শিক্ষাব্যবস্থার জন্ত খরচ হয়েছে।

১৯৬০ সালে ভারতে সকল প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪,৪২,০১৬ এবং মোট পঠনরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৪৬৩৯ লক্ষ। ঐ সালেই ৬-১১ বছরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের ৬১·১% ১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের ২১·১%, এবং ১৪-১৭ বছরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের ৯·৯% শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে যদিও নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকার মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন, উচ্চতর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যবস্থা যে নিতান্তই অপর্যাপ্ত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট ৪,৪২,০১৬ অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ—

প্রাক্-প্রাথমিক	১,৩৫১
প্রাথমিক	৩২০,৫৮৬
মাধ্যমিক	৫৬,৮৬৩
বৃত্তিমূলক ও কারিগরি	৩,৮৩৬
বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয়	৫৬,৪৩৪
চারুকলা ও বিজ্ঞান	৯৪৬
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	১৭৭
বৃত্তিমূলক কলেজ	৭২৮
গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান	৪২
শিক্ষা পর্ষৎ	১৩
বিশ্ববিদ্যালয়	৪০
	৪,৪২,০১৬

পরিশাসনের দিক দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণী বিভাগ হল নিম্নরূপ—

	প্রতিষ্ঠান	ছাত্রছাত্রী
সরকারী	৯৫,০৭০	১,০৩,০৯,১১৯
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড	১,৮৯,৬৬৩	১,৬০,৬৬,১৬০
মিউনিসিপ্যালিটি	১৩,১৭১	৩২,১৩,২৩১
বেসরকারী (সাহায্যপ্রাপ্ত)	১,২৮,৯৪৯	১,৩৬,১১,৬০৭
বেসরকারী (সাহায্যবর্জিত)	১২,৬৯০	১৪,২৮,১০৪

১৯৫৯-৬০ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য মোট ব্যয়িত হয়েছিল ২৯৭'৮০ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে কত এসেছিল তার একটা হিসাব পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

	কোটি	শতকরা
সরকারী	২০০.৬	৬৭.৪
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড	১০.৩	৩.৫
মিউনিসিপ্যাল বোর্ড	৯.৫	৩.১
ছাত্র বেতন	৫১.৮	১৭.৪
দান ও অন্যান্য	২৫.৬	৮.৬

প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করেছিল। তবুও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৩ সালে ৩৭০০০ প্রাথমিক স্কুল ও ৪৬ লক্ষ প্রাথমিক ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতে ২২৪টি শহরে ও ১০,০১০টি গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত ছিল এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর ১৯৫৩ সালে দেখা যায়, যে ৫৯৮টি সহরে এবং ২১,২৬০টি গ্রামে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পেরেছে।

সাক্ষরতার হিসাব

স্বাধীন ভারতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃতপক্ষে তা মোটেই আশানুরূপ নয়।

১৯৪১ সালে লিখনপঠনক্ষম জনসংখ্যার হার ছিল ১৪.৬%; ১৯৫১ সালে সেটি হয় ১৮.৩% এবং ১৯৫৩ সালে প্রায় ২০%।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী থেকে দেখা গেছে যে এই বছরে ভারতে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা মোট ১০,৩২,১৫,৭৮০ আর্থৎ মোট জনসংখ্যার ২৩.৭%। তার মধ্যে সাড়ে সাত কোটির উপর হল পুরুষ এবং আড়াই কোটির উপর হল নারী। মোট পুরুষ জনসংখ্যার ৩৩.৯% এবং নারী জনসংখ্যার ১২.৮% সাক্ষর পর্যায়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজ্য অনুযায়ী হিসাব ধরলে দেখা যায় যে কেরালায় সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশী ৩৮.৪%, তারপর গুজরাটে ১৯.১% তারপর মাদ্রাজে ১৭.৩%, তারপর পশ্চিমবঙ্গে ১৬.৮% এবং মহারাষ্ট্রে ১৬.৭%। কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডগুলির মধ্যে দিল্লীর সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশী ৪১.১%। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯.৪%। রাজ্যগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার সব চেয়ে কম জম্বুকাশ্মীরে ৪.২%, তারপর রাজস্থানে ৫.৭%।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৫৬ সালের হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮৮% ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে এবং এই জন্য বছরে গড়ে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ২·২৬ টাকা খরচ হচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে কলিকাতার ৫টি পল্লীতে, দার্জিলিং-এর ৮টি পল্লীতে ও ৫৭৪৫টি গ্রামে এবং ৩ লক্ষেরও বেশি ছেলেমেয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার ৩৪·৬% এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১৩ : ২ মাত্র। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের মোট সংখ্যা ২৩,০৮১ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ ও শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছে এবং এর দ্বারা শহরাঞ্চলে ৬-১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বর্তমান অগ্রগতি

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৩০% স্কুলশিক্ষা গ্রহণ করত। ১৯৫০ সালে গৃহীত জাতীয় সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি স্বীকৃত হয় এবং ক্রমশ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৫১ সালে ৬-১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৪২% (অর্থাৎ ১·৮৭ কোটি) জন প্রাথমিক স্কুলে যেত। ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫১% (অর্থাৎ ২·৪৮ কোটি) জন। ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সমগ্র দেশে ৬২·৭% (অর্থাৎ ৩·২৫ কোটি) জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পেতে থাকবে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আসাম (১৯৪৭), বোম্বাই (১৯৪৭), মধ্যভারত (১৯৪৯) ও অন্ধ্রপ্রদেশ (১৯৫২) প্রভৃতি রাজ্য নবোদ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করে। ১৯৫২ সালে ৩৯৬টি শহরে এবং ২০,২৬১টি গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৬ সালে ১,০৯৩ শহরে এবং ৩৯,২৭৬টি গ্রামে এই ব্যবস্থা প্রসারিত হয়ে পড়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্য উপজাতি

অঞ্চলে একটিও স্কুল ছিল না। সেখানে ১৯৫৩ সালের মধ্যে প্রায় ১৯০০টি স্কুল গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় মন্থর হলেও অক্ষুণ্ণ আছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অধিকতর সাফল্যলাভ করবে বলে সরকার আশ্বাস দিয়েছেন।

১৯৫০ সালের সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যেই দেশের সমস্ত শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে আনার কথা ছিল। ১৯৫০ সালে মার্চ মাসে ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ছিল ৬.৯০ কোটি এবং এর মধ্যে মাত্র ২.১০ কোটি শিশু প্রাথমিক স্কুলে পড়ত। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৩ কোটি শিশু প্রাথমিক স্কুলে যোগ দেয়, কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ বয়সের শিশু-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫০ কোটিতে দাঁড়ায়। ১৯৫৭ সালে প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষা প্যানেলের সদস্যরা এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, শিশু-সংখ্যা বৃদ্ধির এই গতি অব্যাহত থাকলে সংবিধানের নির্দেশমত কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। অতএব ঐ প্যানেল সুপারিশ করেন যে, সংবিধান অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজন করার দিকে এখন মন না দিয়ে আরও ১৫।২০ বছর সময় নেওয়া হোক এবং অনতিবিলম্বে ১৯৬৬ সালের মধ্যেই যাতে ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করা যায়, সে দিকে যত্ন নেওয়া হোক। বর্তমানে এই সুপারিশই গৃহীত হয়েছে এবং সেইমত পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি রচিত হয়েছে।

পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে ১.৯২ কোটি জন প্রাথমিক স্কুলে পড়ত। ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা ৩০.৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২.৫২ কোটিতে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা হয়েছে ৩.৩০ কোটি। আদমসুমারীর হিসাবে ১৯৬৬ সালে এই বয়সের শিশুর সংখ্যা হবে ৫.৮০ কোটি। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কি ভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে এই বয়সের সমস্ত শিশুকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় আনা যায়, সে সম্পর্কে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র দেশব্যাপী এক তথ্যানুসন্ধানী অভিযান সম্পন্ন হয়েছিল। সেই অনুসন্ধান অনুযায়ী স্থির হয়েছে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্যান্য স্কুলের সম্প্রসারণের সঙ্গে

সঙ্গে এক-শিক্ষক পরিচালিত কম খরচের ৩৮ হাজারটি স্কুলও স্থাপনা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার খাতে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হয়েছে ৮৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮৭ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হবে ২০৯ কোটি।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার

এইসঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৫০ সালে বুনিয়াদী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩২,১৮২ এবং ১৯৫১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩,৭৩০টি। ১৯৫৬ সালে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্কুল ছিল ২,৬৩,৬২৬টি, তার মধ্যে ১৪% অর্থাৎ ৩৭,৩৯৫টি ছিল বুনিয়াদী প্রকৃতির। ১৯৬০ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩,২০,৫৮৬ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭৫,৫৬৮ এবং তাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষের মত। এ থেকে দেখা যায় যে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শতকরা ২৩·৬টি ছিল বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বুনিয়াদী শিক্ষার পর্যায়ে ব্যয়ও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। ১৯৫৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় ছিল ১২·২১ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালে এই ব্যয় গিয়ে দাঁড়ায় ২৩·৯৭ কোটি টাকায়। বুনিয়াদী শিক্ষাবিস্তারের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব। এর জন্যে প্রত্যেক রাজ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। তার ফলে ১৯৫৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১,৫১,০১৯ এবং ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,৯১,৩১৩ তে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি কমিটি ও কমিশন গঠিত হয় এবং বহু বিশেষজ্ঞের মতামত সংগৃহীত হয়। এইসব মতামতের উপর ভিত্তি করে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে।

তারাচাঁদ কমিটি—১৯৪৮

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই সমগ্র দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্কারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৪৮ সালে

ডাঃ তারাচাঁদের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োজিত হয়। এই তারাচাঁদ কমিটি যে বিবরণ পেশ করেন, ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড সেটি বিবেচনা করেন এবং এই মর্মে সুপারিশ করেন—

(ক) ৫ বৎসর স্থায়ী নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা এবং তারপর ৩ বৎসর স্থায়ী উচ্চ বুনিয়াদী বা প্রাক্-মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ৪ বৎসর স্থায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় সুরু হবে,

(খ) মাধ্যমিক স্কুলগুলি বহুসাধক (multipurpose) হবে,

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা বাধ্যতামূলক হবে এবং

(ঘ) শিক্ষকদের বেতনের হার ও চাকুরীর সর্তাদি সংশোধন করতে হবে।

মুদ্রালিয়র কমিশন—১৯৫২

১৯৫২ সালে ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নীচের অতি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি লিপিবদ্ধ করেন।

(১) স্কুলের শিক্ষাকাল ১১ বছর হবে। এর মধ্যে ৮ বছর বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষা ও পরবর্তী ৩ বছর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের কালরূপে নির্ধারিত হবে।

(২) ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের বিলোপ সাধন করা হবে এবং ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাকাল ২ বছরের জায়গায় ৩ বছর করা হবে।

(৩) স্কুলশিক্ষার শেষ ৩ বছর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে বহুমুখী পাঠক্রমের আয়োজন থাকবে। এই বহুমুখী পাঠক্রম ৭টি প্রবাহে বিভক্ত হবে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থী নিজ সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী যে কোন একটি পাঠপ্রবাহ গ্রহণ করবে।

(৪) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য শক্তিশালী কমিটি নিযুক্ত করতে হবে।

(৫) স্কুলে শরীরশিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে।

(৬) বছরে অন্ততঃ ২০০ দিন স্কুলের কাজ চলবে এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৫ মিনিট স্থায়ী অন্তত ৩৫টি পিরিয়ড ধরে পড়া হবে।

(৭) সাধারণী পরীক্ষার (Public examination) ফলাফল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় শিক্ষার্থীর স্কুলে পাঠ-প্রগতির বিবরণীটি গণ্য করতে হবে।

(৮) উপযুক্ত পাঠক্রম নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীকে যথাযথ পরামর্শ দিতে হবে।

(৯) শিক্ষকদের শিক্ষণ ও বেতন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।

(১০) প্রত্যেক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে কোম্পানীর আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত হতে হবে।

(১১) উপযুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১৯৫২ সালের ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি মোটামুটিভাবে ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসংস্কারের ইতিহাসে এই কমিশনের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যাবতীয় সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে আছে এই কমিশনের সুচিন্তিত পরামর্শ। এই কমিশনের পরামর্শ মতই সমগ্র দেশে বহুসাধক মাধ্যমিক স্কুল গড়ে তোলার আয়োজন সুরু হয়েছে। এবিষয়ে সুসংহত অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে একটি স্থায়ী নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলও স্থাপিত হয়েছে।

বহুসাধক বিদ্যালয় (Multipurpose School)

মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলিকে ভিত্তি করে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রদেশে বহুসাধক বিদ্যালয় (Multipurpose School) স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১১টি ক্লাশ থাকে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। ৯ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারবে। তবে নির্বাচনী বিষয়গুলি ছাড়া পাঠক্রমে কতকগুলি কেন্দ্রীয়-বিষয় (core subjects) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা করতে হবে। এগুলির মধ্যে ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, শিল্প, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি আছে। এই বহুসাধক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থীরা সোজা তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে যোগ দিতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত এই নতুন বহুসাধক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বর্তমান রূপের একটি সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল :

'ক' বিভাগ—ভাষা

(নীচের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে একটি করে ভাষা নিতে হবে)

১। প্রথম ভাষা—বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, নেপালী ও উর্দ্দু বা একটি

অনুমোদিত ভাষা এবং প্রাথমিক হিন্দীর পাঠক্রম।

২। দ্বিতীয় ভাষা—ইংরাজী (ইংরাজী যাদের প্রথম ভাষা নয়) বা বাংলা (বাংলা যাদের প্রথম ভাষা নয়)।

৩। তৃতীয় ভাষা—হিন্দী, বাংলা, বা একটি অনুমোদিত প্রাচীন ভাষা। অনুমোদিত প্রাচীন ভাষা বলতে বোঝায় সংস্কৃত, পালি, আরবীয়, পার্শী এবং ল্যাটিন।

'খ' বিভাগ—সমাজবিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাথমিক অঙ্ক

সমাজবিজ্ঞানকে একটি ব্যাপক বিষয়রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি এর অন্তর্গত। এই বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করা। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঘটনা নিবিড়ভাবে জড়িত, সেগুলিকে কেন্দ্র করেই সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রণীত হয়েছে।

'গ' বিভাগ—একটি শিল্প

বয়ন শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, বাগান শিল্প, সীবন শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কারিগরী শিল্প প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটি।

'ঘ' বিভাগ—নির্বাচনীয় বিষয়সমূহ

এই বিষয়গুলিকে ৭টি প্রবাহে বিভক্ত করা হয়েছে: (১) মানব-বিজ্ঞানাদি (২) সাধারণ বিজ্ঞানাদি, (৩) কারিগরী বিষয়াদি, (৪) বাণিজ্যিক বিষয়াদি, (৫) কৃষি বিষয়াদি, (৬) চারুকলা ও (৭) গৃহবিজ্ঞান।

মুদালিয়র কমিশন বহুমুখী পাঠ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেছেন, তা কার্যে পরিণত করতে হলে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। তাছাড়া এর জন্য বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও দরকার। তার এখনও এদেশে যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, ৮ম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থীর রুচি ও অনুরাগ অনুসারে বহুমুখী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেকে বলে থাকেন যে, অত অল্প বয়সে শিক্ষার্থীদের পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের যোগ্যতা জন্মায় না। অপরিণত বয়সে পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের কোন ভুল হলে ডিগ্রী কোর্সে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে পাঠপ্রবাহ পরিবর্তনের আর সুযোগ থাকে না। এই কারণে ইংলণ্ডে এত অল্প বয়সে বহুসাধক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ভার্নন প্রভৃতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

বর্তমান অগ্রগতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১৯৬০-৬১ সালের মধ্যেই সারা ভারতে এই ধরনের প্রায় ৯১০টি বহুসাধক স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পাঠক্রম গ্রহণের পূর্বে যথাযথ পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে কেরিয়র-মাষ্টার কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং গতানুগতিক ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থার যথাসম্ভব সংস্কারের চেষ্টা হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে সমগ্র ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও কম, ১৯৫৬ সালে প্রায় ১১ হাজার মাধ্যমিক স্কুল গড়ে উঠতে পেরেছে। কেবলমাত্র সংখ্যাগত অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট না থেকে জাতীয় সরকার গুণগত উন্নতির জন্যে সেণ্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৪ সাল থেকে সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব টেক্সট বুক রিসার্চ নামে সংস্থাটি পাঠ্য-পুস্তকের সংস্কারসাধনের উদ্যোগী হয়ে রয়েছে। ঐ বছরেই বহুসাধক স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা দানের জন্য সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব এডুকেশনাল এণ্ড ভোকেশানাল গাইডান্স নামে আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্থা গঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে হায়দ্রাবাদে সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব ইংলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিয়ে।

মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রতিবছরই নতুন নতুন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ খোলা হচ্ছে এবং শিক্ষকদের বেতনের হারও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে ৮৮ কোটি টাকা মাত্র বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে ১ম পরিকল্পনার পূর্বে ১৪—১৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ১২.১০ লক্ষ (অর্থাৎ ৫.৩%) জন স্কুলে পড়ত। ১৯৫৬ সালে সেটি হয় ১৯.৭৯ লক্ষ (অর্থাৎ ৭.৮%) জন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শেষে ঐ বয়সের ২৯.২৯ লক্ষ (অর্থাৎ ১১.৫%) জন মাধ্যমিক স্কুলে পড়ত। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সংগৃহীত হিসাবে দেখা গিয়েছিল যে ঐ বছর ২৫.৩২ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল ১২,৪৯৫টি মাধ্যমিক স্কুলের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য এই যে এর মধ্যে ৪,৯৩১টি (অর্থাৎ ৭১.৫%) স্কুলই বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত হত। এইভাবে এগিয়ে চললে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে ১৪—১৭ বছর বয়সের ৪৬ লক্ষ

(অর্থাৎ ১৫.৬%) ছেলেমেয়েকে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭৬ সালের মধ্যে ১১—১৪ বছর বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েকে নিম্ন-মাধ্যমিক (মিডল) স্কুলে এবং ১৯৯১ সালের মধ্যে ১৪—১৭ বছর বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষাগ্রহণে সুযোগ দেওয়া সম্পূর্ণ হবে। সেই চিত্তাকর্ষক হিসাবটি এই রকম :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম
সন	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৭০-৭১	১৯৭৫-৭৬	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১
নিম্ন মাধ্যমিক (মিডল)									
১১-১৪ বছর···	১২.৮	১৬.৮	২২.৬	৩০.৬	২.২	১০০			
মাধ্যমিক									
১৪-১৭ বছর···	৫.৫	৮.১	১১.৪	১৫.৬	২০	৪০	৬০	৮০	১০০

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হবে। ৩০০টি আদর্শ বহুসাধক স্কুল ও ৪টি আঞ্চলিক আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হবে। প্রত্যেক বোর্ড অব এডুকেশনের সঙ্গে একটি ব্যুরো অব একজামিনেশন রিসার্চ গড়া হবে। দিল্লীর সেণ্টাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন নামে সংস্থাটিকে পরিবর্ধিত করে ন্যাশন্যাল সেণ্টার ফর এডুকেশানাল রিসার্চরূপে পুনর্গঠিত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে বর্তমানে তিন শ্রেণীর স্কুল রয়েছে: ১। জুনিয়র উচ্চ স্কুল (৫ম বা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী), ২। উচ্চ স্কুল (৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী) ও ৩। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল (৯ম থেকে ১১শ শ্রেণী)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র উচ্চ স্কুল ছিল ১৬১৪টি, তাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় ৫.৫০ লক্ষ এবং বার্ষিক গড়ে ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই খাতে। ঐ সময়ে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫৫৬টি, তাতে ছাত্র ছিল প্রায় ১.৫০ লক্ষ এবং বার্ষিক গড়ে খরচ হয়েছে ৪ কোটি টাকা। এই রাজ্যের স্কুলগমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের মাত্র ১৮.৫% বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণে রত আছে এবং এদের জন্যে প্রতি বছর জনপিছু গড়ে ৭৭.৩ টাকা খরচ হচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার ২৬.৪% এবং শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ : ২৫ মাত্র।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৪৮ সালে তারাচাঁদ কমিটি ও ১৯৪৯ সালে স্কুলশিক্ষা কমিটি নিয়োগ করা হয় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাসমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে। কারণ ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু আগমনের হার এমন দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, স্কুলের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ—১৯৫০

অতঃপর রাজ্যসরকার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং তদনুসারে ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সংগঠিত হয়। এই পর্ষদে ৪৪ জন সদস্য এবং প্রচুর কমিটি ছিল। যথেষ্ট পরিচালন-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পর্ষদের বিরাট আয়তনের জন্য সুষ্ঠু ও তৎপর কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। তাছাড়া এই পর্ষদের নিজস্ব পরিদর্শন দপ্তর ছিল না। এই ধরনের পর্ষদে ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা স্যাডলার কমিশনে বলা হয়েছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। নানাপ্রকার অব্যবস্থা ও অসুবিধার জন্য প্রায় ৪ বছর কাজ করার পর ১৯৫৪ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদটির তৎকালীন সংগঠনটি রাজ্যসরকার বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং বর্তমানে সরকারী প্রতিনিধিরূপে একজন এডমিনিষ্ট্রেটর সমগ্র রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন একটি সংবিধান সম্প্রতি বিধান সভায় গৃহীত হয়েছে।

দে কমিশন —১৯৫৪

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাপরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত দে কমিশন ১৯৫৪ সালে বলেন, যে এই রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলের উৎকর্ষের মান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

অনুপযুক্ত স্কুলভবন, ক্রীড়াঙ্গনের অভাব, ছাত্রবহুল শ্রেণীকক্ষ, অল্প শিক্ষিত অল্প বেতনের শিক্ষণহীন শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষোপকরণের অভাব, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রতি অবহেলা প্রভৃতি নানা প্রকার দোষত্রুটি বর্তমানে এই রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কি ভাবে পঙ্গু করে রেখেছে, সে কথা দে কমিশনের বিবরণীতে বিবৃত হয়েছে।

ডিগ্রী কোর্সের সুবিধার জন্য দে কমিশন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার সুপারিশ করেছেন এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাকাল শেষ হলে একটি সাধারণী পরীক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য রাজ্য সরকার এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করেন নি। দে কমিশন আরও বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ যখন পুনর্গঠিত হবে, তখন এটি কেবলমাত্র উপদেষ্টা পর্ষৎরূপেই কাজ করবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজ্য সরকার এই শেষের সুপারিশগুলি গ্রহণ করেছেন।

সার্জেণ্ট রিপোর্ট—১৯৬২

১৯৬২ সালে লর্ড সার্জেণ্টকে (১৯৪৪ সালের সার্জেণ্ট-রিপোর্ট খ্যাত) পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনিও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতির একাধিক নির্দেশ দেন। দে কমিশনের মত তিনিও ১২ বৎসর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। অবশ্য সরকার তাঁর এ নির্দেশ এখনও গ্রহণ করেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেকগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—পূর্বপাঞ্জাব—১৯৪৭, মহারাষ্ট্র, রুরকী ও কাশ্মীর—১৯৪৮; বরোদা, কর্ণাটক ও গুজরাট—১৯৪৯; বিহার, বিশ্বভারতী, এস, এন, ডি, টি, উইমেনস—১৯৫১; যাদবপুর—১৯৫৬; বর্ধমান—১৯৬০: ভাগলপুর—১৯৬০; কল্যাণী—১৯৬১; উত্তরবঙ্গ—১৯৬২।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন—১৯৪৮-৪৯

১৯৪৮ সালে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে গভীর

পর্যবেক্ষণের পর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ নীচে আলোচিত হল।*

কলেজ শিক্ষকদের প্রফেসর, রীডার, লেকচারার ও ইনষ্ট্রাক্টর—এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষককে ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করতে হবে। তবে প্রফেসরগণ ৬৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন।

১২ বছর স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নের পর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। যথেষ্টসংখ্যক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

সর্বশাখায় গবেষণার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাপর্যায়ে কৃষিবিদ্যার চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গ্রামীণ পরিবেশে অধিকসংখ্যক কৃষি কলেজ ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষিগবেষণাকেন্দ্র স্থাপনা করা প্রয়োজন এবং একটি কৃষিনীতি নির্ধারক-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক।

বাণিজ্য ও শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকতর প্রয়োগমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পাঠাভ্যাস করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার আরও ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রশিল্প (ইঞ্জিনীয়ারিং) ও কারিগরি বিদ্যার (টেকনোলজিকাল) শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

আইনশিক্ষাসংক্রান্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করতে হবে এবং এ বিষয়ে ৩ বছরে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট আয়োজন করতে হবে।

ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশন মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরু হওয়ার পূর্বে কয়েক মিনিট নিঃশব্দ ধ্যানাভ্যাসের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন বলেন, রাষ্ট্রভাষাকে সর্বপ্রকারে উন্নত করতে হবে এবং ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে যথাসম্ভব সত্বর একটি ভারতীয় ভাষাকে (সংস্কৃত ছাড়া) শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হবে। উচ্চতর

* এই কমিশনের বিশদ বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজী ভাষা শিখতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে অন্তত একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের আয়োজন রাখতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরচর্চা ও এন সি সি'র ব্যবস্থা থাকবে।

পুরুষদের মত নারীদেরও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়কেই বহন করতে হবে। কেবল অনুমোদনধর্মী (affiliating) বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হবে না।

বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলেজগুলির ভবন ও উপকরণের জন্য যথেষ্ট সরকারী অর্থসাহায্য দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত দশ কোটি টাকা সরকারী অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করা উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের মাধ্যমে কলেজগুলিকে অর্থ সাহায্য দিতে হবে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কমিশন সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, প্রগতিশীল ভারতের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থকরূপ দিতে হলে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অধীনে গ্রামীণ কলেজ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯৫১

১৯৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন তাঁদের দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এই আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হয় নি।

এই আইনটির দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বহুদিনের ত্রুটি দূর করা হলেও অনেক দিক দিয়ে আইনটি সন্তোষজনক হয় নি। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে যে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে পরিচালকদের ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন পাঠক্রমের অনুমোদন লাভের প্রয়োজন হলে বোর্ডস অব ষ্টাডিস, ফ্যাকালটিস, একাডেমিক কাউন্সিল, সিণ্ডিকেট ও সেনেটের কাছে সেটি উপস্থাপন করতে হয়। এতে তৎপরতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা একান্তই অসম্ভব। তাছাড়া, আইনে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উপাচার্য নিতান্তই ক্ষমতাহীন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের উৎকর্ষবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা হ্রাস ও শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির আয়োজন করা হয়েছে এবং এজন্য ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের মাধ্যমে কলেজগুলিকে অর্থসাহায্য দান করারও ব্যবস্থা সুরু হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষার ক্রমবর্ধমান দাবী মেটাবার মত আশানুরূপ হারে নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ উন্নতি দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১৯৫৬ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের ৩১টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ৩৮ হাজার শিক্ষকের অধীনে ৭ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করেছিল এবং ঐ পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে মোট ১৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে আরও ৭টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে ও ১০টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হবে। উপরোক্ত ৫৭ কোটি টাকার মধ্যে ২৩ কোটি টাকা কারিগরি বিদ্যাচর্চার জন্য, ৪.৬ কোটি টাকা কৃষিবিদ্যা চর্চার জন্য, ১০ কোটি টাকা স্বাস্থ্যবিদ্যা চর্চার জন্য এবং ২০ কোটি টাকা গবেষণার জন্য ব্যয়িত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট মোট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ (২৭ কোটি টাকা) গ্রাণ্টস কমিশনের মারফৎ বণ্টিত হবে।

স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অগ্রগতি দেখা গিয়েছে একাধিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার মধ্যে দিয়ে। সম্প্রতি (১৯৬০) পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে নবতম সংযোজন। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১টি। ১৯৫৩ সালে ছিল ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার কথা ছিল। আশার কথা, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এই লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৬২ সালের হিসাবে সমগ্র ভারতে ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৯৪৯ সালের রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মূল্যবান সুপারিশ এবং ১৯৫৬ সালে

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও উন্নতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং কার্যভার গ্রহণের দুবছরের মধ্যেই এই কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে এই কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের কলেজ শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

স্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সালে সমগ্র দেশে কলেজের সংখ্যা ছিল ৪১৪টি, ১৯৫৩ সালে হয় ৯২০টি, ১৯৫৪ সালে ৯৭৯টি, ১৯৫৫ সালে ১,০৮৭টি এবং ১৯৫৮ সালে ১,৪৪০। কলেজে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৪৮ সালে ছিল ২'২৩ লক্ষ; ১৯৫১ সালে ৩'৭৩ লক্ষ; ১৯৫৩ সালে ৪'৬৭ লক্ষ; ১৯৫৪ সালে ৫'১১ লক্ষ, ১৯৫৭ সালে ৬'৩৪ লক্ষ এবং ১৯৫৮ সালে ৭'৯৯ লক্ষ। ১৯৬০ সালে কলেজ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হবে ৯ লক্ষ ৪০র কিছু উপর অর্থাৎ ১৭—২২ বছর বয়সের জন সংখ্যার মাত্র ১'৮৭%। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে ঐ বয়সের ১৩ লক্ষ শিক্ষার্থী অর্থাৎ ২'৩৪% কলেজে পাঠগ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষার যথাযথ প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর রুরাল হায়ার এডুকেশন স্থাপিত হয়েছে। এর উদ্যোগে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৯টি রুরাল ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠেছে এবং ১৯৫৮ সালে ১টি ও ১৯৬০ সালের সূচনায় আরও একটি এই রূপ ইনষ্টিটিউট গড়ে উঠেছে। ১৯৫৫ সালের রুরাল এডুকেশন কমিটি যে সকল সুপারিশ করেন, সেই অনুযায়ী এই সকল অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে।

মহিলাদের যথাযথ উচ্চশিক্ষাদানের সুব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে একটি ন্যাশনাল কমিটি অন উইমেনস এডুকেশন সম্প্রতি নিয়োজিত হয়। ঐ কমিটি ১৯৫৯ সালে যে বিবরণী দাখিল করেছেন সেই বিবরণী অনুযায়ী তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে বয়স্কা মহিলাদের ব্যাপক শিক্ষাদানের এক সুসংহত আয়োজন সুরু হবে

এছাড়া উচ্চতর শিক্ষার দ্রুততর প্রসারের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে সান্ধ্য কলেজ, করেসপণ্ডেনস কোর্স, বহিরাগত ছাত্রদের পরীক্ষা প্রভৃতি উদ্যোগে উৎসাহ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। শারীরিক শিক্ষার প্রসারের জন্যও সরকারী আগ্রহ দেখা দিয়েছে। ১৯৫৭ সালে গোয়ালিয়রের একটি ন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর ফিজিক্যাল এডুকেশন খোলা হয়েছে। সেখানে ৩-বছরের ডিগ্রী কোর্সের

প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পাতিয়ালা কমিটির সুপারিশমত একটি সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব কোচিং প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। ১৯৬০ সালের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ড্রাইভ বা জাতীয় শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধির আন্দোলন সুরু হয়েছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সাল থেকে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসব নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পূর্বে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি নিখিল ভারত টেকনিকাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপিত হয়েছিলে। স্বাধীনতার পর সায়েন্টিফিক ম্যানপাওয়ার কমিটি দেশের কারিগরি শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত করেন। তারপর থেকেই দেশের কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে সমগ্র দেশে মাত্র ৩২টি প্রতিষ্ঠানে যন্ত্র শিল্পের কারিগরি বিদ্যালয় বা টেকনোলজির ডিগ্রী কোর্স পড়ানো হত। ১৯৫৭ সালে সে রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয়েছে ৭৫টি। এই সব প্রতিষ্ঠানে ১৯৪৭ সালে ৩ হাজারেরও কম শিক্ষার্থী পড়ত। ১৯৫৭ সালে দেখা যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ হাজার। ১৯৫৯ সালে যন্ত্রশিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয় ডিগ্রীকোর্সের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ হাজার, ১৯৬০ সালে ঐ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১০০, শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার এবং ১৯৬১ সালে যথাক্রমে ১১১ এবং ১৫,৬৯০।

১৯৪৭ সালে প্রায় ১৩০০ ইনজিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট পাশ করে বেরোয়। ১৯৫৬ সালে এই শ্রেণীর গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৪ হাজারেরও বেশি। ১৯৬০ সালে বেরোয় ৫৭০৩ জন এবং ১৯৬১ সালে ৭০২৬।

ইনজিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল বিষয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট গবেষণা ও শিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৮টা ন্যাশনাল ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতে উন্নত যন্ত্রশিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বলতে বর্তমানে চারটি। তার মধ্যে খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি হল প্রথম। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। তারপর বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কানপুর এই তিন স্থানে তিনটি সমশ্রেণীর উন্নত যন্ত্রশিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স নামক প্রতিষ্ঠানটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

নীচে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের একটি সম্পূর্ণ হিসাব দেওয়া হল :—

	ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মোট বরাদ্দের হার%
১। প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা	২০৯	৫১·২
২। মাধ্যমিক শিক্ষা	৮৮	২১·৬
৩। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা	৮২	২০·১
৪। অন্যান্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনা	২৯	৭·১
	মোট ৪০৮	১০০·০

প্রশ্নাবলী

1. Trace the development of primary education in India since independence.

2. Discuss the development of Secondary Education in India since Independence.

3. What is meant by Multipurpose School? To what extent does it differ from an ordinary high school.

4. Give an account of the present position of Secondary Education in West Bengal indicating the line of future development as recommended by the Mudaliar Commission.

5. Give an outline of the history of the reform of secondary education in Bengal in the present century.

6. Write a critique on the recent University reforms in India with particular reference to Bengal.

7. Trace the development of University Education in India since independence.

সতেরো

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৪৮

(বা রাধাকৃষ্ণণ কমিশন)

১৯৪৭ সালে বহুকাম্য স্বাধীনতা লাভের পরেই জাতীয় সরকার ভারতে উচ্চশিক্ষার সংস্কার ও বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষার মাধ্যমগুলি অসম্পূর্ণতা ও নানা ত্রুটীর জন্য সন্তোষজনক ভাবে কাজ করতে পারছিল না এবং তার ফলে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে পড়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যার অনুসন্ধান ও তাদের সমাধানের উপায় নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ১৯৪৯ সালে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশসমূহ উপস্থাপিত করেন। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে এই কমিশনটি গঠিত হয় বলে এটি রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নামেও পরিচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁদের প্রদত্ত বিবরণীতে বিশদ আলোচনা করেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। এই অভিমতের একটি সারাংশ দেওয়া হল।

অধিনায়ক সৃষ্টি

ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তব্য ও দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজনীতি, শাসন বিভাগ, বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে যথেষ্ট সংখ্যক অধিনায়ক সৃষ্টি করার দায়িত্ব পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপর। তাছাড়া সাহিত্যধর্মী, বৈজ্ঞানিক এবং বৃত্তিমূলক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়কেই করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে ভারত যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী কিন্তু সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের কোন আয়োজন নেই। তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান অনুশীলনের আয়োজনও বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে [illegible]।

চিন্তার উন্নয়ন ও গতিশীলতা

আধুনিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতার প্রকৃত মাধ্যম হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। প্রগতিশীল চিন্তাধারা, নব নব তত্ত্ব, আধুনিক যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রভৃতি যে সব বস্তুর উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত সেগুলির ধারক, বাহক ও অবদাতা হল বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান সভ্যজীবনের ধর্মই গতিশীলতা। এ গতিশীলতা আসে জ্ঞানের বিকাশ এবং চিন্তার অগ্রগতি থেকে। জ্ঞানরাজ্যে মানবমনের এই যে অভিযান বিশ্ববিদ্যালয়ই হল তার প্রধানতম মাধ্যম।

কিন্তু নিছক জ্ঞানের অগ্রগতি থেকেই সার্থক জীবন গড়ে ওঠে না। সুষ্ঠু জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করে তাদের মধ্যে একটা সুসমন্বয় আনাই জীবনকে অর্থপূর্ণ ও লক্ষ্যসম্পন্ন করে তোলাই একমাত্র উপায়।

গণতান্ত্রিক আদর্শ: সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

নিছক জ্ঞানই জীবনের কাম্য নয়। তার সঙ্গে থাকে প্রজ্ঞা, তবেই জীবন পূর্ণ হতে পারে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সার্থক ভাবে গড়ে তুলতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট সমাজদর্শন থাকা অপরিহার্য। ভারতের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সমাজকেই আদর্শ সমাজব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই গণতন্ত্র সৌধের স্তম্ভ হল চারটি—সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। সুবিচার বলতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই তিন প্রকারের সুবিচার বোঝায়। স্বাধীনতা বলতে বোঝায় চিন্তা, অভিব্যক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা। সাম্য হল সামাজিক পদমর্যাদা এবং সুযোগের সমতা। আর ব্যক্তির আত্মসম্মান এবং জাতির একতা অক্ষুণ্ণ রেখে সকলের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃভাব জাগানো হল ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্য।

গণতন্ত্রের সংব্যাখ্যানে শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রতিটি ব্যক্তির দেহ, মন এবং আভ্যন্তরীণ সত্তার পূর্ণ বিকাশ। গণতন্ত্রে শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে প্রথমে মনোযোগ দিতে হয়। দেখতে হবে যেন শিক্ষার্থী সব দিক দিয়ে সুবিচার পায়। গণতান্ত্রিক সাফল্য নির্ভর করছে সামাজিক সুবিচারের উপর যার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তি দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, পুষ্টিহীনতা এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হবে। যে স্তরেরই মানুষ হোক না কেন সে যেন সমস্ত বিভেদকারী শক্তিকে তুচ্ছ করে সকলের সঙ্গে বাস করে এবং কাজ করে বাঁচতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনই সুবিচার আসবে

যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সকল শ্রেণীর কর্মী, সমাজনেতা এবং সুবিবেচক দেশশাসক তৈরী করতে পারবে।

ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ মূল্য এবং মানবজীবনের মর্যাদা এবং মূল্য বিশ্বাসই হচ্ছে গণতন্ত্ররে ভিত্তি। গণতন্ত্রের কাছে প্রত্যিটি ব্যক্তি একক ও অতুলনীয় সত্তা এবং কোন তত্ত্ব বা উদ্দেশ্যের খাতিরে তার সেই সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না।

পূর্ণ পরিণতি

এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষার কাজ হল প্রত্যিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা-গুলিকে পূর্ণভাবে বিকাশ করা—তার বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিকে তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছতে সাহায্য করা। এই পূর্ণবিকাশ বাইরের থেকে ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জ্ঞান এবং কৌশল আহরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই এই পরিণতিতে পৌঁছয়। শিক্ষক কেবলমাত্র উৎসাহ দান এবং পরিচালনারই কাজ করেন। এই সমস্ত বিকাশই হল প্রকৃতপক্ষে স্বতঃপ্রণোদিত আত্মবিকাশ।

এই কারণেই শিক্ষাকে ক্রমবিকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ক্রমবিকাশ হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এই ক্রমবিকাশ আসে। এইজন্য জীবন মানেই অভিজ্ঞতা, জীবনই হল শিক্ষা।

মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জন্মে থাকে। কেউ চিন্তাধর্মী, কেউ প্রক্ষোভধর্মী, কেউ বা কর্মী। এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের শিক্ষা এক রকম হতে পারে না। তাদের রুচি ও প্রবণতানুযায়ী শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে এই বিভিন্নধর্মী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ত্রিবিধ শিক্ষা

তেমনই মানব অস্তিত্বকেও তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। এই তিন শ্রেণীর অস্তিত্বই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শিক্ষণীয় বিষয়কেও সেই রকম তিন ভাগে ভাগ করা যায়, বস্তু বা প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধমূলক, সমাজ বা জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধমূলক এবং আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধমূলক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ ও কারিগরি বিষয়গুলির পাঠ পড়ে প্রকৃতির পর্যায়ে। প্রকৃতিকে জানার ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করার ইচ্ছা থেকে জন্মেছে বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, মানবতত্ত্ব প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে সমাজকে জানার ইচ্ছা

থেকে। আর মানুষের নিজের অন্তর্নিহিত আশা, আদর্শ প্রভৃতিকে ব্যক্ত করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে ভাষা, সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতি। সব শেষে আসে দর্শন। দর্শন পাঠক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যতই আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী হই না কেন, যতই আমরা বৃত্তিশিক্ষায় নিপুণতা লাভ করি না কেন, দর্শনের সাহায্য ছাড়া জীবনদর্শনের গঠন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দর্শনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অতীতের মূলরূপটি জানতে পারি এবং বিভিন্ন যুগের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের লব্ধ বিভিন্নধর্মী জ্ঞান এবং শিক্ষাগুলির মধ্যে সমন্বয় আনে সাহিত্য, দর্শন ও চারুকলা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির শিক্ষার বিষয়বস্তু তিনটি—প্রকৃতি, সমাজ ও মানসমূহ। এই ত্রিবিধ শিক্ষা কিন্তু স্বতন্ত্র বা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়—এগুলি একের সঙ্গে আর একটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং অপরিহার্যভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য শিক্ষা-প্রক্রিয়ার একটি বড় লক্ষ্য হবে এই বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়গুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। এই সমন্বয় সুষ্ঠু মনের সংগঠন ও ঐক্যের জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। বিভিন্নধর্মী বিষয়গুলির মধ্যে যদি সমন্বয় না আনা হয় তাহলে মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং মানসিক সংগঠনের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলা দেখা দেবে না।

চিন্তার সম্প্রসারণ

নিছক যান্ত্রিক শিক্ষা দান করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। কতকগুলি প্রাণহীন জ্ঞান বা তথ্য মনের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়াকে শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষা হল চিন্তার প্রসারণ। শিক্ষা মনের সত্যকারের অগ্রগতি আনবে, শক্তি ও দীপ্তিতে মনকে সমৃদ্ধ করবে।

যদিও জ্ঞানের অগ্রগতি এবং শিক্ষার প্রসার বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য, তবু জনগণের ব্যক্তিগত গুণাবলীর উন্নয়ন করা এবং তাদের জীবনের মঙ্গল অনুসন্ধানে সাহায্য করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি বড় কর্তব্য। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেবলমাত্র বাহ্যিক বন্ধনমুক্তি থেকে আসে না। তা আসে ব্যক্তির মানসিক গুণাবলীর উন্নতি থেকে। যে মানুষ নিজে ভাল-মন্দ সত্য-অসত্যের মধ্যে বিচার করতে পারে এবং নিজের কাজের নৈতিক দায়িত্ব বহন করতে পারে সেই মানুষই সত্যকারের স্বাধীন। ব্যক্তির মধ্যে এই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

ব্যক্তিমাত্রকেই সমাজে বাস করতে হবে এবং সমাজের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিসাধনই

সমস্ত ব্যক্তিজীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য। কিন্তু তা'বলে নিছক সমাজের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়াই প্রগতিশীল শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। সমাজকে পরিবর্তিত করা, তাকে উন্নত করা এবং তার মধ্যে নতুনত্ব আনাও প্রকৃত শিক্ষার কর্মসূচীর একটা বড় অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিকল্পিত করতে হবে যাতে ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির উপকরণরূপে গড়ে উঠতে পারে।

সবশেষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তনশীলতা ও অভিনবত্ব থাকবে। কোন শিক্ষাসূচীই চিরকালের জন্য তৈরী করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য পাঠক্রমকে পরিবর্তন করার দরকার পড়তে পারে।

শিক্ষায় সুবিচার

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে শিক্ষার্থীদের প্রতি সব দিক দিয়ে সুবিচার করা হবে। দেখা গেছে দেশের এবং সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে বিরাট বৈষম্য বহুদিন ধরেই রয়ে গেছে। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাশ করে বেরোয় তারা নিজেদের উপযোগী বৃত্তি খুঁজে পায় না এবং সমাজের চাহিদাও মেটাতে পারে না। এর কারণ হল যে বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন কেবলমাত্র কলাশাস্ত্র এবং আইনবিদ্যার গ্রাজুয়েটই দলে দলে সৃষ্টি করে এসেছে কিন্তু সৃষ্টি করে নি যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক, পরিশাসক, চিকিৎসক, যন্ত্রশিল্পী, দক্ষ কারিগর, বৈজ্ঞানিক, গবেষক প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন বিশেষ করে মনোযোগ দেওয়া উচিত কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতি। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। উন্নত কৃষিমূলক জ্ঞানের সাহায্য পেলে ভারতের অনগ্রসর কৃষিব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে এবং জনগণের জীবনধারণের মানও উন্নত হবে। তেমনি স্বাধীন ভারতে শিল্পের অগ্রগতির ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন প্রচুর সংখ্যায় কারিগর এবং যন্ত্রশিল্পী। দেশের এই অতি-প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের।

কিন্তু কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষাই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে পারে না। এর সঙ্গে প্রয়োজন ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভার নিতে পারে এমন সব ব্যক্তি তৈরী করা। কেবলমাত্র

কর্মী, কারিগর ও দক্ষ শিল্পী তৈরী করলেই একটি জাতি গড়ে তোলা যায় না। জাতিকে সংঘবদ্ধ করতে পারে এবং অগ্রগতির পথে তাদের পরিচালিত করতে পারে তার উপযোগী নেতা গড়ে তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শিক্ষায় স্বাধীনতা

ব্যক্তির বিকাশের স্বাধীনতাই হচ্ছে গণতন্ত্রের ভিত্তি। এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা। যে সব দেশে শিক্ষাকে রাষ্ট্র অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সে সব দেশে শিক্ষা ব্যক্তির পূর্ণবিকাশের সহায়ক হতে পারে না। এইজন্য শিক্ষাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি বিশেষ করে প্রযোজ্য। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতা থাকবে না। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমস্ত সরকারী হস্তক্ষেপের বাইরে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিরও এই ধরনের স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষায় সমতা

গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সাম্য। মানুষে মানুষে কোন দিক দিয়েই বৈষম্য থাকবে না। জাতি, ধর্ম, বৃত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই সমান সুযোগ লাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় যাতে এই সমতা আসতে পারে তার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করা দরকার। যাতে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায় এবং শিক্ষা যাতে মুষ্টিমেয়ের বিশেষ অধিকার না হয়ে দাঁড়ায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কাজ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভারতের আর্থিক প্রতিবন্ধক বহু শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে থাকে। আর্থিক বা অন্য কোনরূপ প্রতিবন্ধকই যাতে উচ্চশিক্ষার সর্বজনীন প্রসারে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার ব্যবস্থা সব আগে করতে হবে।

শিক্ষায় ভ্রাতৃত্ব

উচ্চশিক্ষার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং একতার সম্পর্ক জাগিয়ে তুলতে হবে। খেলার মাঠে, ছাত্রসংসদে, পাঠাগারে, ছাত্রাবাসে, প্রভৃতি সব জায়গাতে ছাত্রেরা যাতে গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয় তার আয়োজন করা দরকার। এর জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য জাগিয়ে

তোলার একটি প্রশস্ত পন্থা হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আবাসিক করে তোলা। প্রাচীন কালের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আবাসিকধর্মী ছিল। তার ফলে তখন স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় সংহতি দেখা দিত। বর্তমানে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও আবাসিকধর্মী করে তোলা যেতে পারে। প্রত্যেক কলেজটি কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের স্থানই হবে না, কলেজের মধ্যে দিয়ে সামাজিক, বিনোদনমূলক, জ্ঞানমূলক প্রভৃতি জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলিও পুষ্টিলাভ করবে।

আন্তর্জাতীয়বাদের শিক্ষা

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে যেমন জাতীয়তাবোধ ও সামাজিক সঙ্গতি দেখা দেবে তেমনি বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবে বিশ্ববিদ্যালয়। জাতির উন্নতির জন্য জাতিগত বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেম একান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র নিছক নিজের দেশের গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষার্থীর মনকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তার দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ ও আত্মপ্রিয় হয়ে উঠবে। আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমে এসেছে। বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবিষ্কার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টি প্রভৃতি থেকে আমরা এখন মূল্যবান সাহায্য পেতে পারি এবং তাদের অবদানে আমাদের নিজেদের কৃষ্টি ও শিক্ষার ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সঞ্চালনই মানব সভ্যতার সত্যকারের অগ্রগতির পথ। আজকের মানুষকে কেবলমাত্র তার নিজের দেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। তার দেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত করতে হবে, তার জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতীয়তাবাদে পরিণত করতে হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বহুমুখী প্রচেষ্টা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরকে ফেলে দিয়েছে এবং সমস্ত জাতির মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যের সম্বন্ধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আনেস্কোর (Unesco) এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত।

বিশ্বরাষ্ট্র গঠন

মানবজাতির বহুদিনের একটি অতিপ্রিয় স্বপ্ন হল বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করা। বিভিন্ন জাতিতে, বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন গোষ্ঠীতে এবং বিভিন্ন মতবাদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

খণ্ডীকৃত মানবজাতিকে একটি একক ও অখণ্ড জাতিতে পরিণত করার পরিকল্পনা মানুষ বহুদিন ধরেই পোষণ করে এসেছে। এই বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করা বলপ্রয়োগ, কৌশল বা রাজনৈতিক বিতর্কের সাহায্যে কোনদিন সম্ভব হবে না। এর জন্য যথার্থ প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের মনের প্রস্তুতি, প্রতিটি নাগরিকের উপযুক্ত শিক্ষা। বিশ্বরাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়ে তোলার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশনের অন্যান্য নির্দেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করার পর এই কমিশন ভারতে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলির আলোচনা করেন এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নির্দেশ কয়েকটি নীচে আলোচিত হল।

শিক্ষকমণ্ডলী

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে মৌলিক তত্ত্বগুলি আহরণ করতে তাদের সক্ষম করাই হল শিক্ষকদের প্রধান কাজ। শিক্ষকমাত্রেরই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর যথেষ্ট আয়ত্ত থাকবে এবং তিনি আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন। প্রতি শিক্ষকের মধ্যেই অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা প্রবল থাকা দরকার কেননা জ্ঞানের প্রসার ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের বেতনের হার অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

শিক্ষকদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কমিশন চার শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। যথা (১) প্রফেসর, (২) রিডার, (৩) লেকচারার এবং ইনষ্ট্রাক্টর বা ফেলো। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বেতনভোগী রিসার্চ ফেলোও থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে কমিশন নিম্নহারের সুপারিশ করেন। যথা :—

প্রফেসর	...	...	টা ৯০০—৫০—১,৩৫০
রিডার	...	...	টা ৬০০—৩০—৯০০

লেকচারার	... ...	টা ৩০০—২৫—৬০০
ইনষ্ট্রাক্টর বা ফেলো	...	টা ২৫০
রিসার্চ ফেলো	...	টা ২৫০—২৫—৫০০

কলেজের ক্ষেত্রে কমিশন শিক্ষকদের বেতনের নিম্নরূপ হারের নির্দেশ দেন।

লেকচারার	... ...	টা-২০০—৪০০
সিনিয়র লেকচারার	... ...	টা-৪০০—৬০০
প্রিন্সিপ্যাল	... ...	টা-৬০০—৮০০

এছাড়া শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বাসস্থান, সুনির্দিষ্ট চাকুরী, কাজের সময় এবং ছুটির নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করার জন্যও কমিশন নির্দেশ দেন। শিক্ষকদের নিয়োগ সম্পর্কে কমিশন পরিষ্কার ভাষায় এই নির্দেশ দেন যে একমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠি ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারাই শিক্ষক নির্বাচিত করা হবে না।

শিক্ষার মান

বার বছর স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়নের পর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। প্রত্যেক প্রদেশে যথেষ্ট সংখ্যক নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর বা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর উন্নত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার পর যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারে, তার জন্য প্রচুর বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। উচ্চ স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেসার কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০০ শিক্ষার্থীর বেশি ও কোন অনুমোদিত কলেজে ১৫০০ শিক্ষার্থীর বেশি ভর্তি করা চলবে না।

গবেষণার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠক্রম ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাপর্যায়ে কৃষিবিদ্যার চর্চার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। গ্রামীণ পরিবেশে অধিক সংখ্যক কৃষি কলেজ ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি গ্রামীণ বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক স্কুল ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র রাখতে হবে এবং এগুলির পরিচালনার জন্যে স্থানীয় সম্পদ, উপাদান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনা করা প্রয়োজন। ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যধারা আরও উন্নত ও ব্যাপক হওয়া উচিত এবং এর অধীনে একটি কৃষিনীতি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। এই ইনষ্টিটিউট ভারতের কৃষিনীতি সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের অধীনে কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি অভিজ্ঞ জনমণ্ডলী সংযুক্ত থাকা দরকার।

বাণিজ্য ও শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ের বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন যে, এই সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অধিকতর পরিমাণে ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক (practical) অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পাঠাভ্যাস করতে হবে এবং পুঁথিগত অনুশীলনকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। আরও বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনে আকৃষ্ট হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া কমিশনের মতে আরও অধিক পরিমাণে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার আয়োজন করা প্রয়োজন এবং এর জন্যে যথেষ্ট উচ্চতর ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপনা করতে হবে। অন্যান্য বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারগণ কাজ শেখার জন্য সহায়তা পেতে পারেন কি না তার অনুসন্ধান করা উচিত। নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান খোলার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সেটি উপযোগী হয়। অনর্থক একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট মাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকবে।

আইনশিক্ষাসংক্রান্ত কলেজগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করতে হবে এবং এ বিষয়ে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কোন শিক্ষার্থীকে আইনশিক্ষার সময় অন্য কোনও বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স অধ্যয়ন করতে দেওয়া হবে না। আইনবিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

চিকিৎসাবিদ্যার কলেজগুলিতে ১০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হবে না এবং প্রতি শিক্ষার্থী পিছু অন্তত ১০টি রোগীর বেড নির্দিষ্ট রাখতে হবে। জনস্বাস্থ্যঘটিত ও সেবামূলক বিদ্যাচর্চার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণারও যথেষ্ট আয়োজন করতে হবে।

ধর্মমূলক শিক্ষা

ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে এই কমিশন মন্তব্য করেন যে, প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরু হওয়ার পূর্বে কয়েক মিনিট নিঃশব্দ ধ্যানচর্চার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের জীবনী আলোচনার আয়োজন থাকবে। দ্বিতীয় বর্ষে বিশ্বের ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু সর্বজনীন অংশ আলোচনা করা হবে এবং তৃতীয় বর্ষে ধর্ম-দর্শনের মূল সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে।

শিক্ষার মাধ্যম

বিভিন্ন উৎস থেকে যে সব শব্দ ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ করেছে সেগুলিকে বজায় রেখে এবং নতুন নতুন উৎস থেকে নতুন নতুন শব্দ চয়ন করে রাষ্ট্রভাষাকে সব দিক দিয়ে উন্নত করতে হবে। আন্তর্জাতিক যন্ত্রশিল্পমূলক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলির ভারতীয় বানান এবং উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যত শীঘ্র সম্ভব ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ছাড়া কোন ভারতীয় ভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে তিনটি ভাষা শিখলেই চলবে, যথা, আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরাজী ভাষা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা বা রাষ্ট্র ভাষাকে মাধ্যম করা উচিত। রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির উদ্দেশ্যে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক শব্দমালা তৈরীর জন্য বিজ্ঞানী এবং ভাষাবিদদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যসরকার মাধ্যমিক ডিগ্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য উচ্চবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়াতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশন নীচের মূল্যবান সুপারিশগুলি করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর শিক্ষামূলক অভীক্ষার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাতে সেগুলি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন। এজন্য শিক্ষাদপ্তর এক বা দুজন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করবেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই একজন স্থায়ী এবং পূর্ণকালীন পরীক্ষক সংস্থা (Board of

Examiners) নিযুক্ত করবেন। তাছাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শিক্ষামূলক অভীক্ষা তৈরী করতে হবে।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির দোষ দূর করার জন্য কমিশন নির্দেশ দেন যে সরকারের পরিশাসনমূলক কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাগবে না। সাধারণত স্কুলে ক্লাশের কাজের জন্য কোন স্বতন্ত্রভাবে নম্বর দেওয়া হয় না। কমিশনের মতে সারা বছরে শিক্ষা অর্জনের সময় যে সমস্ত কাজ শিক্ষার্থীকে সম্পন্ন করতে হয় তার জন্য ঐ বিষয়ের নির্দিষ্ট মার্কসের এক তৃতীয়াংশ দেওয়া উচিত। প্রথম ডিগ্রীর আয়ুষ্কাল হবে তিন বছর। তিন বছরের ডিগ্রীকোর্সে একের বেশী পরীক্ষা থাকা উচিত নয়। পাঠক্রমের কোন কোন অংশের জন্য অনেকগুলি সাময়িক পরীক্ষার অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। কোন বিষয়ে কেউ পাঁচ বছর অধ্যাপনা না করলে তিনি সে বিষয়ের পরীক্ষক হতে পারবেন না। রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি এবং মার্কস দেবার সময় ব্যক্তিগত প্রভাব দূর করার উপায় আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের মান যাতে মোটামুটি একই রকম হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কমিশনের মতে ৭০% বা তার বেশী মার্কস পেলে প্রথম শ্রেণী, ৫৫% থেকে ৬৯% পেলে দ্বিতীয় শ্রেণী আর অন্তত ৪০% পেলে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে মনে করা হবে। ডিগ্রীস্তরে এবং অন্যান্য উচ্চ পরীক্ষায় গ্রেস মার্ক দেওয়ার প্রথা বন্ধ করতে হবে। ভাইভা ভোসি বা মৌখিক পরীক্ষা কেবলমাত্র স্নাতোকোত্তর বৃত্তিমূলক ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

শিক্ষার্থীদের কল্যাণকর আয়োজন

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে কোনরকম বাদবিচার না করে সম্পূর্ণ যোগ্যতার বিচার করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে হবে। সমস্ত শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময় এবং বছরে অন্তত একবার করে বিনা ব্যয়ে শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের জন্য হাসপাতাল এবং চিকিৎসাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যপরীক্ষকেরা নিয়মিতভাবে বিদ্যায়তনের বাড়ী, ছাত্রাবাস, খাবার ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি পরিদর্শন করবেন। যথাসম্ভব অল্পমূল্যে শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশে অন্তত একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে এবং শারীরশিক্ষার আধিকারিকেরা সেখানেই শিক্ষালাভ করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ই

দু'বছরের জন্য শারীরশিক্ষা নিতে হবে। প্রত্যেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এন-সি-সি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই এন-সি-সি'র সাজসরঞ্জাম, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি শিক্ষাদপ্তরকে সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য বাসস্থান, হস্টেল এবং যৌথ কাজকর্মের একটা নির্দিষ্ট মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হবে এবং সেই মানের যথাযথ অনুসরণই কলেজগুলিকে অনুমোদন দেবার অপরিহার্য সর্ত বলে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে হবে, অথচ আদর্শ রাষ্ট্রশাসনের প্রতি যাতে তারা আকৃষ্ট হয় তার জন্য ছাত্রদের হাতে বিদ্যায়তনের শাসনভার আংশিকভাবে তুলে দিতে হবে।

প্রতি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীন অফ স্টুডেন্টসের একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রকল্যাণের জন্য একটি উপদেষ্টা সংস্থা স্থাপন করতে হবে।

নারী শিক্ষা

মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, যে সব পুরুষদের জন্য স্থাপিত কলেজে মেয়েরা যোগদান করে সেই সব কলেজে মেয়েদের সুখসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ কোন দিক দিয়েই যেন ক্ষুণ্ণ না হয় বরং বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। শিক্ষার ব্যাপারে যাতে মেয়েরা তাদের উপযোগী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষামূলক নির্দেশদানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। মেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে একদিক দিয়ে সমাজের উপযোগী নাগরিক এবং অপর দিক দিয়ে আদর্শ নারী হয়ে গড়ে উঠতে পারে তার উপযোগী শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য।

পরিচালনা।

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়কেই বহন করতে হবে। কেবল অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হবে না। সরকারী কলেজগুলিকে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত (Constituent) কলেজ রূপে উন্নীত করা হবে। প্রত্যেক অনুমোদিত কলেজ এমন ভাবে সুসংগঠিত হবে যেন পরে সেগুলি এককেন্দ্রিক (Unitary) ও পরে সঙ্ঘবদ্ধ (Federative) বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে থাকবেন নীচের কর্মী এবং সংগঠনগুলি। যথা—

১। পরিদর্শক : প্রধান রাজ্যপাল (Visitor : Governor-General); ২। আচার্য : রাজ্যপাল (Chancellor : Governor); ৩। উপাচার্য (Vice-chancellor)। ইনি পূর্ণকালীন কর্মীরূপে কাজ করবেন ; ৪। সেনেট বা কোর্ট ; ৫। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা সিণ্ডিকেট ; ৬। একাডেমিক কাউন্সিল ; ৭। বিভিন্ন ফ্যাকালটিগুলি ; ৮। বোর্ডস্ অব ষ্টাডিজ ; ৯। ফিনান্স কমিটি এবং ১০। সিলেকসন কমিটি সমূহ।

অর্থব্যবস্থা

অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হল যে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থসরবরাহ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র স্বীকার করে নেবে। গৃহ সাজসরঞ্জাম এবং পৌনঃপুনিক খরচাগুলির জন্য বেসরকারী কলেজগুলিকে রাষ্ট্র অর্থসাহায্য দেবে। এই কমিশনের নির্দেশ-গুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রাষ্ট্র অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দেবে। আগামী পাঁচবছরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্য সরকার অতিরিক্ত আরও দশকোটি টাকা বরাদ্দ করবেন। অর্থসাহায্য বিতরণের জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন স্থাপন করতে হবে।

বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কলেজগুলির ভবন ও উপকরণের জন্য যথেষ্ট সরকারী অর্থসাহায্য দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে জনসাধারণ যাতে অধিকতর অর্থসাহায্য দিতে পারেন তার জন্য প্রয়োজন মত আয়কর আইনের সংশোধন করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার

এর পর রাধাকৃষ্ণন কমিশন বেনারস, আলিগড়, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, মহীশূর, পাটনা, ওসমানিয়া (হায়দ্রাবাদ) লক্ষ্নৌ, নাগপুর, অন্ধ্র, আগ্রা, আন্নামালাই, ত্রিবাঙ্কুর, উৎকল, সগর, রাজপুতানা, পূর্ব পাঞ্জাব, গৌহাটি, পুণা ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমালোচনা ও সংস্কারের সুপারিশ করেন।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা সম্পর্কে কমিশন বলেন, প্রথমে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির সনদ (Charter) প্রদান করা হবে। পরে অস্থায়ী (Provisional) পর্যায় উত্তীর্ণ হলে স্থায়ী সনদ মঞ্জুর করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অস্থায়ী সনদ ও পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য দেওয়ার জন্য কমিশন সুপারিশ করেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষণ ও গবেষণা অনুষ্ঠানের দিকে যত্নবান হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়

কমিশন বুঝেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার যে আয়োজন আমাদের দেশে রয়েছে তার দ্বারা কেবলমাত্র সহরবাসী শিক্ষার্থীদেরই উপকার হবে। কিন্তু গ্রামে যে সব ছেলেমেয়ে বাস করে এবং যাদের সহরে এসে পড়ার সুযোগ বা সামর্থ্য হয় না তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) নামে নতুন এক শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন।

যারা গ্রামে বাস করবে তাদের উচ্চশিক্ষা এবং সহরবাসীদের উচ্চশিক্ষার মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকবে। সহরের সমাজজীবন এবং গ্রামের সমাজজীবনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। শিল্প, বৃত্তি, জীবনযাপনের মান প্রভৃতির দিক দিয়ে সহর এবং গ্রাম উভয়েরই স্বাতন্ত্র্য আছে। এইজন্য গ্রামের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সহরের উচ্চশিক্ষায় কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রশিল্পমূলক, শিক্ষাই প্রধান স্থান লাভ করে থাকে। কিন্তু গ্রামের উচ্চ-শিক্ষায় গ্রামোন্নয়ন, জনশিক্ষার বিস্তার, কৃষি, সমাজগত সংহতি ইত্যাদি সম্পর্কিত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অতএব গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়, পাঠক্রম, পদ্ধতি সবেরই গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। কমিশনের মতে গ্রামীণ শিক্ষার নিম্নলিখিত স্তরগুলি থাকবে। যথা—

(১) আট বছরের উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষাস্তর

(২) তিন বছরের কলেজ শিক্ষাস্তর

(৩) দু বছরের এম-এ শিক্ষাস্তর

সমালোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশনের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশগুলি স্বাধীন ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিশন উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন গুরুতর সমস্যাগুলির ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে অনেকগুলি সুচিন্তিত নির্দেশও দিয়েছেন। উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব ও লক্ষ্য সম্পর্কে কমিশনের পর্যবেক্ষণটি কালোপযোগী ও প্রগতিশীল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষণের মান ও পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশগুলি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিশাসন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের হাতে যৌথ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাবটি কমিশনের দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কেমলমাত্র উচ্চস্তরের জ্ঞান বিতরণেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য অধিনায়ক গড়ে তোলাও যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত এই কথাটি কমিশন বিশেষ জোর দিয়ে বলে গেছেন। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানমূলক শিক্ষার উপরই বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপ করত। অন্যান্য পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা সেগুলিতে একপ্রকার অবহেলিতই থাকত। কমিশন নির্দেশ দেন যে সাহিত্যমূলক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা দেবার দায়িত্বই যে কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই তা নয়, এই উচ্চশিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেশকে অভাব, রোগ, অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার উপর জোর দিলেও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে তাঁরা অবহেলা করেন নি এবং যে সব প্রাচীন ভাবধারার সত্যকারের মূল্য আছে সেগুলিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও উচ্চশিক্ষায় দার্শনিক, সাহিত্যমূলক ও চারুকলামূলক শিক্ষা যে অপরিহার্য একথাও কমিশন স্পষ্ট করে বলেছেন। আমেরিকার ট্রুম্যান কমিশনও উচ্চশিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব করে কমিশন যথেষ্ট প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সুবিচার, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এই চারটি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর উচ্চশিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে, এই নির্দেশের দ্বারা কমিশন উচ্চশিক্ষার একটি নতুন সংব্যাখ্যান আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল থেকে গেছে। প্রথমত, উচ্চশিক্ষার ভাষামাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেন নি। অথচ এটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর সমস্যা। এ সম্বন্ধে কমিশন সুস্পষ্ট কিছু না বলার ফলে এই সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাবটি প্রগতিশীল হলেও কমিশন এ সম্পর্কে কোন বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা দেন নি। গ্রামীণ জীবনের উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তনের যে স্বপ্ন কমিশন দেখেছিলেন কর্মোপযোগী পরিকল্পনার অভাবে সেটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯৫১

১৯৪৯ সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন তাঁদের দীর্ঘ বিবরণীটি প্রকাশ করেন এবং ঐ বিবরণীর নির্দেশ অনুসারে ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে কমিশনের অনেক সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে যে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই আইনে কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হয়নি, সেগুলি নীচে উল্লিখিত হল।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সুপারিশ করেছিলেন যে ভারতের রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পরিদর্শক (Visitor) থাকবেন। ১৯৫১ সালের আইনে সে রকম কোন বিধি নেই।

কমিশন পরামর্শ দেন যে, চ্যান্সেলর সিণ্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যকে ভাইস-চ্যান্সেলব নির্বাচিত করবেন। আইনে বলা হয় যে সিণ্ডিকেট তিনজন সদস্যের নাম চ্যান্সেলরের কাছে উপস্থাপিত করবেন এবং চ্যান্সেলর তাঁদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করবেন।

কমিশন চেয়েছিলেন, ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যকাল ৬ বছরের বেশি হবে না এবং তিনি পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। ১৯৫১ সালের আইনে কাযকাল নির্ধারিত হয়েছে ৪ বছর, কিন্তু পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে কোন বাধার আরোপ করা হয় নি।

সেনেটের সদস্য সংখ্যা ১২০ জনের বেশি হবে না, এই ছিল কমিশনের অভিমত। কিন্তু আইনে সে বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, ফলে বর্তমানে সেনেটের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন।

কমিশনের মতে সিণ্ডিকেটের সদস্যদেব মধ্যে একজন হাইকোর্টের মনোনীত, একজন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মনোনীত এবং তিনজন চ্যান্সেলরের মনোনীত সদস্য থাকবেন। আইনে এরকম কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

যে সব রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে গ্রাণ্টস কমিশনের অনুরূপ একটি করে গ্রাণ্টস বণ্টন কমিটি (Grants Allocation Committee) স্থাপনের জন্য কমিশন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটিও ১৯৫১ সালের আইনে মেনে নেওয়া হয়নি।

এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে যে সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের সুব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোন পাঠক্রমের অনুমোদন লাভের প্রয়োজন হলে বোর্ডস অব স্টাডিজ, ফ্যাকাল্টিজ, একাডেমিক কাউন্সিল, সিণ্ডিকেট ও সেনেটের কাছে সেটি উপস্থাপিত করতে হয়। এতে তৎপরতার সঙ্গে কর্ম সুসম্পন্ন করা একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া আইনে এমন কতকগুলি ধারা আছে, যেগুলির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলর নিতান্তই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে ভাইস-চ্যান্সেলরকে একজন সাধারণ সভ্যরূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়নি এই আইনে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the major recommendations of Indian University Education Commission of 1948. How far were these recommendations incorporated in the Calcutta University Act of 1951.

2. Discuss the aim of University Education as delineated by the Indian University Commission.

আঠারো

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২
(বা মুদালিয়র কমিশন)

১৯৪৮ সালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নিযুক্ত হয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের উদ্দেশ্যে। ঐ কমিশন বলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি অবহেলিত রয়েছে বলে উচ্চতর শিক্ষাসংস্কার অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং পরিষদের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫২ সালে ডক্টর লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাপ্রাপ্তগণই যেমন একদিকে প্রাথমিক শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন তেমনই তাঁরাই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রূপে যোগদান করেন। সেজন্য উচ্চ শিক্ষার উন্নতির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করা প্রথমে প্রয়োজন এবং সেই সংস্কার-সাধনের ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান ও পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে এই কমিশনটি গঠিত হয়। তদানীন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণবিভাগের অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু কমিশনের সদস্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। কমিশনের নয়জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ সদস্য ছিলেন। এই কমিশন ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কাজ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার কতকগুলি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ করেন। সেগুলি হল এই।

১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা নিতান্তই গতানুগতিক এবং বৈচিত্র্যহীন। পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের কোন প্রকৃত সংযোগ নেই এবং ফলে শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনের উপযোগী কোন যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। তার জ্ঞান নিতান্ত পুঁথিগত হয়েই থাকে। কমিশনের মতে যতক্ষণ না শিক্ষার্থীর শিক্ষা এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে ততক্ষণ মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারবে না।

২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় তা নিতান্তই পুরাতন এবং সংকীর্ণ। আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির এখনও প্রচলন হয়নি।

ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং শিক্ষার্থীর বহুমুখী চাহিদা এবং বিভিন্ন শক্তিগুলির কোন তৃপ্তিই হয় না। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্রেরই উপযোগী হয়ে আছে। সংকীর্ণ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে শিক্ষার্থীর চরিত্র যথাযথভাবে বিকশিত হয় না এবং ব্যক্তিসত্তার সংগঠনও ব্যাহত হয়। পুঁথিগত শিক্ষা কখনও প্রয়োগধর্মী হয় না।

৩। প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার উপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং অন্যান্য ভাষাগুলি নিতান্তই অবহেলিত থাকে। যে সব শিক্ষার্থী ইংরাজী ভাষায় তেমন পারদর্শিতা দেখাতে পারে না তারা মাধ্যমিক শিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ থেকেই যায়।

৪। স্কুলগুলিতে অত্যধিক ছাত্রসংখ্যা হওয়ায় সেখানে নিয়মশৃঙ্খলার একান্ত অভাব দেখা যায়। এই সংখ্যাধিক্যের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদাহীনতার জন্য তাঁদের পক্ষে নৈপুণ্যের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না।

৫। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে পরীক্ষাপদ্ধতির প্রচলন আছে তা নানা ত্রুটিতে জর্জরিত। পরীক্ষাপদ্ধতির এইসব ত্রুটির জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাটাই ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে।

৬। উপরের ত্রুটিগুলি ছাড়াও বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষায় আরও কতকগুলি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করা যায়। যথা, শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের উদাসীনতা, গতানুগতিক পাঠক্রম, যান্ত্রিক ও প্রাণহীন শিক্ষাপরিকল্পনা, প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব, অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। এই সব নানা কারণে আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা এত পশ্চাদ্‌পদ হয়ে আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটির উল্লেখ করে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

বহু শিক্ষাতত্ত্বের বই এবং কমিটি-কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্যের বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ প্রয়োজন এবং আদর্শের দিক দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথম, স্বাধীনতা লাভের পর ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নবগঠিত গণতন্ত্রের আদর্শ নাগরিকরূপে যাতে প্রতিটি ভারতবাসী গড়ে উঠতে পারে তার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষাকে। দ্বিতীয়, ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ

হলেও প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র। তার জন্য দেশের উৎপাদনের যোগ্যতা এবং দক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশব্যাপী দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষার সুযোগ সকলে সমানভাবে পায় না। অতএব তার জন্যও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারসাধন করতে হবে।

গণতন্ত্রের যোগ্য নাগরিক হতে হলে কতকগুলি জ্ঞানমূলক, সামাজিক ও নৈতিক গুণ থাকা অপরিহার্য। এগুলি নাগরিককে অর্জন করতে সাহায্য করবে মাধ্যমিক শিক্ষা। গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ হল পরিচ্ছন্ন চিন্তা এবং নতুন ভাবধাবা গ্রহণের ক্ষমতা। তারপর আসে উপলব্ধির ক্ষমতা এবং ভাবধারার সমন্বয়। চিন্তার স্বচ্ছতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হল বাচন এবং লিখনের স্পষ্টতা। এই গুণগুলি গণতন্ত্রের স্বাধীন আলোচনা ও চিন্তার শান্তিপূর্ণ আদান-প্রদানের জন্য অপরিহার্য।

প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা এবং মূল্যে বিশ্বাসের উপরই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এর জন্য যাতে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ পেয়ে গড়ে উঠতে পারে এবং তার মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা দেখা গণতান্ত্রিক শিক্ষার একটি বড় লক্ষ্য। ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সমাজের মঙ্গল এই দুইএর জন্যই ব্যক্তি আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে শিখবে। এইজন্য তাকে যে কটি অপরিহার্য গুণ আহরণ করতে হবে সেগুলি হল শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতা, সামাজিক সচেতনতা এবং সহনশীলতা। সত্যকার দেশপ্রেম ব্যক্তির মধ্যে জাগিয়ে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বড় লক্ষ্য।

সত্যকারের দেশপ্রেমের মধ্যে তিনটি বস্তু থাকা একান্ত প্রয়োজন। যথা, দেশের সামাজিক এবং কৃষ্টিমূলক সম্পদের মূল্য উপলব্ধি করা, নিজেদের দোষত্রুটি দুর্বলতাকে জানতে শেখা এবং দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা। মাধ্যমিক শিক্ষার বিত্যালয়গুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশভক্তির এই ত্রিবিধ ধারণার সৃষ্টি করবে।

আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির দিক দিয়ে বড় প্রয়োজন হল আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎপাদনমূলক এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা বাড়ানো। এর জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্ত প্রকার কাজের মর্যাদাবোধের সৃষ্টি করতে হবে। এই মনোভাবের সঙ্গে দরকার কারিগরি এবং যন্ত্রমূলক শিল্পে দক্ষতা সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষা, যাতে দেশের শিল্পমূলক উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে এমন সুশিক্ষিত কর্মী।যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে এবং বিভিন্ন আগ্রহ ও

শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষার তৃতীয় কাজ হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত সৃজনীশক্তির উৎসগুলিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। তার ফলে তারা তাদের কৃষ্টিমূলক উত্তরাধিকারের মূল্য বুঝতে পারবে এবং নতুন নতুন বস্তুর সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনে শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ শক্তির ভাণ্ডারটিকে কাজে লাগাবার কোন চেষ্টাই ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনের সময় আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি যেন একদিকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর এবং অপরদিকে উচ্চশিক্ষার স্তরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকে। গণতন্ত্রের নেতৃত্ব করার উপযোগী ব্যক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব হল বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু সু-নেতা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে থাকে মাধ্যমিক শিক্ষা। সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্পমূলক এবং কৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে যে সব আগামী দিনের নেতা তাদের অবশ্যই থাকবে সামাজিক সমস্যা উপলব্ধির ক্ষমতা এবং উন্নত যন্ত্রশিল্পের যোগ্যতা। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ দিন দিন প্রসারলাভ করে চলেছে এবং সে সবের উপযোগী শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী গঠন করার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষারই।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশাবলী

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে কমিশন নীচের নির্দেশগুলি দেন।

১। সংগঠন

১। স্তরবিন্যাস—মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি স্তর থাকবে। যথা—

(ক) প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা সমাপ্তির পর নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর—তিন বছর।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর—চার বছর।

২। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাস্তরের সঙ্গে এই নতুন সংগঠনের সঙ্গতি-সাধন করতে হবে। দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করা হবে। যতদিন সমস্ত স্কুল ঐভাবে উন্নীত না হবে, ততদিন দুরকম শিক্ষাস্তরই প্রচলিত থাকবে। দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়ে বেরোবে তাদের জন্যে এক বছরের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রি-ইউনিভার্সিটি শিক্ষাস্তরের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। ইন্টারমিডিয়েট কোর্স বিলুপ্ত করতে হবে এবং পুরানো দশমশ্রেণীর

মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে অতিরিক্ত একবছর সংযুক্ত করে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষান্তর গঠিত হবে এবং তারপর তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তিত হবে।

৪। বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ধরনের স্কুলের সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরি বিদ্যালয় সংযুক্ত থাকবে। তাছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে পৃথক কারিগরি শিক্ষা-পরিষদ গঠিত করতে হবে।

৫। মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষার আয়োজন থাকবে।

৬। বিশেষ ধরনের স্কুলে অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের আয়োজন থাকবে।

২। পাঠক্রম

১। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে থাকবে—১। ভাষা, ২। সমাজ-শিক্ষা, ৩। সাধারণ বিজ্ঞান, ৪। গণিত, ৫। সঙ্গীত ও চিত্রকলা এবং ৬। শরীর চর্চা।

২। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমটি এইরূপ হবে—(ক) আবশ্যিক বিষয়রূপে থাকবে—ভাষা, সাধারণবিজ্ঞান, সামাজিক শিক্ষা, গণিত ও একটি হস্তশিল্প। (খ) বহুসাধক পাঠক্রমের মধ্যে সাতটি পাঠপ্রবাহ থাকবে, যথা মানবতামূলক তত্ত্ব, বিজ্ঞান, কারিগরি বিষয়, বাণিজ্য বিষয়, কৃষিবিদ্যা বিষয়, চারুকলা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। এই সাতটি পাঠপ্রবাহের মধ্যে থেকে যে কোন একটি প্রবাহ শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হবে। এই বহুমুখী পাঠক্রম উচ্চমাধ্যমিক স্তরের দ্বিতীয় বছর থেকে প্রবর্তিত করা হবে।

৩। পাঠ্যপুস্তক

উন্নত ধরনের যথেষ্টসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক যাতে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়, তার জন্য একটি শক্তিশালী পাঠ্যপুস্তক সমিতি গঠন করা দরকার। বিভিন্ন বিষয়ের একাধিক পাঠ্যগ্রন্থ থাকা উচিত। প্রয়োজন হলে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে যুগোপযোগী করে পরিবর্তন করতে হবে।

৪। শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষাদান পদ্ধতির গতানুগতিকতা বর্জন করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রগতিশীল সমাজধারার উপযোগী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৫। ভাষা শিক্ষা

১। মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষা-মাধ্যম করতে হবে।

২। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দী বা ইংরাজী ভাষা শেখান দরকার।

৩। মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্তত আরও একটি ভাষা উচ্চ অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শেখান প্রয়োজন।

৬। চারিত্রিক শিক্ষা

১। স্কুলে ছাত্রদের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শৃঙ্খলাবোধের চেতনা জাগাতে হবে।

২। দলগত খেলাধূলা প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

৩। ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে না।

৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু আয়োজন করতে হবে।

৭। পরিচালনার ব্যবস্থা

ছাত্রদের জীবন-গঠনে যথাযথ পথনির্দেশ করতে পারেন এমন অভিজ্ঞ পরামর্শ-দাতা (যেমন, কেরিয়ার মাষ্টার) নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়মিত শারীরশিক্ষার আয়োজন করতে হবে এবং তার জন্য একটি সর্বভারতীয় শারীর-শিক্ষা-শিক্ষণ সংস্থা স্থাপন করার প্রয়োজন।

৯। পরীক্ষা ব্যবস্থা

১। বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার (Public Examination) ব্যবস্থাকে ফলপ্রদ করার উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা (Internal Examination) ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। রচনাধর্মী (essay-type) প্রশ্নের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয়মুখী (objective type) প্রশ্নের প্রবর্তন করা দরকার।

২। ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি মনোযোগ দেবার উদ্দেশ্যে স্কুল-রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। শিক্ষার্থীর সাফল্যের চরম ফলাফল নির্ণয়ে এই রেকর্ডের তথ্যাদিও বিবেচনা করা হবে।

৩। আভ্যন্তরীণ ও বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফল ও স্কুল-রেকর্ডের পরিমাপগুলি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ না করে-প্রতীকমূলক পরিমাপের দ্বারা প্রকাশ করা ভাল। যেমন :—A—খুব ভাল, B—ভাল, C—মাঝামাঝি ইত্যাদি।

৪। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে একটি মাত্র বহিরনুষ্ঠিত বা সাধারণ পরীক্ষা (Public Examination) নেওয়া হবে।

৫। কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০। **শিক্ষকের উন্নতিবিধান :**

১। শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যাপারে সমস্ত শ্রেণীর স্কুলেই সমান নীতি অনুসরণ করা উচিত।

২। শিক্ষকদের পরীক্ষাধীন কাল হবে এক বছরের।

৩। শিক্ষকদের বেতন জীবনধারণের মানের উপযোগী হবে এবং সেই অনুসারে বেতন নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হবে।

৪। শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে পেন্সন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বীমার প্রবর্তন করা হবে।

৫। শিক্ষকদের কার্যকালীন বয়সের সীমা ৬০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা উচিত।

৬। শিক্ষকদের সন্তানসন্ততি বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পাবে।

৭। শিক্ষকেরা বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

৮। গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ করা উচিত।

৯। মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণদের জন্য দু বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে এবং স্নাতকদের জন্য এক বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজন হলে স্নাতকদেরও দু বছরের শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

১০। শিক্ষণ গ্রহণকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে ও পরীক্ষার জন্য কোনও বেতন দানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। শিক্ষণ গ্রহণকালে শিক্ষক পূর্ণ বেতন পাবেন।

১১। তিন বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে শিক্ষার স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যোগ দেওয়া যাবে।

১২। শিক্ষিকাদের শিক্ষণকাল সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়ে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩। শিক্ষকদের জন্যে রিফ্রেসার কোস ও সর্ট ইনটেনসিভ কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

১১। পরিচালন ও আভ্যন্তরিণ ব্যবস্থা

১। বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে ছাত্র প্রতি ১০ বর্গফুট স্থান থাকবে।

২। প্রতি শ্রেণীতে ৩০।৪০ জন ছাত্র থাকবে এবং স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৫০০ থেকে ৭৫০ থাকবে।

৩। বছরের ২০০ দিন স্কুলের কাজ হবে এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৫ মিনিটের ৩৫টি পিরিয়ড থাকবে।

গ্রীষ্মকালে দু মাস এবং অন্য দু'টি ছুটি ১৫ দিন হিসেবে থাকবে।

৪। রেজেষ্ট্রীকৃত পরিচালক সমিতি থাকবে। প্রধান শিক্ষক এই সমিতির সদস্য থাকবেন।

৫। মাধ্যমিক শিক্ষার সর্ববিধ অবস্থার পর্যালোচনা ও প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ গঠিত হবে। রাজ্য শিক্ষা-আধিকারিক তার সভাপতি হবেন। পরিষদের সদস্য সংখ্যা অনধিক ২৫ হবে।

১২। আর্থিক ব্যবস্থা

১। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়কেই অর্থ সাহায্য করতে হবে।

২। স্কুলভবন ও জমির ওপর কোন কর ধার্য করা হবে না।

৩। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার জন্যে 'শিল্প-শিক্ষাকর' প্রবর্তন করা চলবে।

কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন এবং সেই মত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০০ বহুসাধক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে, বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্যে ৩০০ স্কুলে অর্থসাহায্য দিয়েছেন, ২০০০ স্কুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থসাহায্য দিয়েছেন এবং আরও ২০০০ স্কুলে হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষকদের শিক্ষণ-দানের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

সমালোচনা

কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ সমর্থন লাভ করেনি। বহুসাধক স্কুল প্রতিষ্ঠা বিরাট ব্যয়বহুল এবং তার জন্য সরকারী অর্থকোষই

একমাত্র উদ্যোগী হতে পারে। ফলে এই প্রচেষ্টায় সাধারণের সহযোগিতা আশা করা চলে না। এই বিপুল অর্থব্যয়ে দেশের সর্বত্র বহুসাধক স্কুল গঠনে বহু বছর লাগবে এবং ততদিন দেশের প্রকৃত শিক্ষাসংস্কার সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে। এই বিবেচনা করে প্রচলিত স্কুলগুলির উন্নতিসাধনে মনোযোগী হওয়াই সঙ্গত হত বলে অনেকে মনে করেন। শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতার জন্য গৃহ-শিক্ষকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বিষয়ে কমিশন যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন হন নি। নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলগুলির সঙ্গে উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলের উপযুক্ত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা যেত। কিন্তু কমিশন সেদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের সংগঠন সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশ প্রগতিশীল নয়। তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎটি নিছক উপদেষ্টা সংস্থা রূপে কাজ করবে, তার কোন সত্যকারের কার্যনির্বাহের ক্ষমতা থাকবে না। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে সরকারের করায়ত্ত হয়ে পড়বে। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে তার অভিনবত্ব ও পরিবর্তনশীলতা লোপ পাবে এবং শিক্ষা যান্ত্রিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠবে। বস্তুত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ অনুসারেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের সংবিধান গৃহীত হয়েছে। অথচ আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে মাধ্যমিক শিক্ষা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত না হয় তার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

কমিশন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাব্যবস্থার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র এর দ্বারাই শিক্ষার উন্নতি ঠিকমত পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার এক নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছে। ভারত সরকার কিছুটা পরিবর্তন করে এই কমিশনের বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে এই কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ীই ভারতের বহু প্রদেশের ইণ্টারমিডিয়েট স্তরটি বিলুপ্ত করে ১১ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

উনিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন (১৮১৩—১৯৪৭)

ভারতে প্রচলিত বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় ব্রিটিশ আমলে। এই ব্যবস্থাটির পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিপোষণ সমস্তই করেন ব্রিটিশ শাসকগণ নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বিদেশী মিশনারীরা অবশ্য এর প্রথম বীজ বপন করেন ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। মিশনারীগণ প্রথমে বহু প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও প্রথম প্রথম এ বিষয়ে তাঁদের প্রচুর উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ১৭৬৫ সালে যখন কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে, তখন থেকে ব্রিটিশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেন এবং মিশনারীদের সক্রিয় সাহায্যদান বন্ধ করে দেন। তার পরিবর্তে কোম্পানী দেশীয় জনগণকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার চর্চার জন্য স্কুল স্থাপনা সুরু করেন। এর ফলে মিশনারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ইংলণ্ডে আন্দোলন সুরু করেন এবং চার্লস গ্রাণ্টের প্রচেষ্টায় ১৮১৩ সালে ইংলণ্ডের পার্লমেণ্ট কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদত্ত সনদে একটি মিশনারী ধারা সন্নিবদ্ধ হয়। এই ধারার দ্বারা মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হয় এবং ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য দ্বন্দ্ব

কিন্তু সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি না থাকার জন্য ঐ টাকা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় নি এবং ১০ বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর ১৮২৩ সালে একটি জনশিক্ষার সাধারণ সমিতি (General Committee for Public Instruction) গঠন করে তার হাতে এই অর্থ ব্যয়ের ভার অর্পণ করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই কমিটির অন্তর্গত প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থক ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমর্থক সদস্যদের মধ্যে এমন বিতর্কের সূত্রপাত হয় যে কমিটির পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না।

মেকলের মিনিট—১৮৩৫

১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিকের আমন্ত্রণে মেকলে এই বিতর্কের মীমাংসার ভার নেন এবং তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' প্রকাশিত হয়। এই মিনিটটি পরবর্তী শতাব্দীর ভারতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই

মিনিটের নির্দেশ অনুসারেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী-ভাষা শিক্ষার মাধ্যম-রূপে গৃহীত হয়। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত বিস্তার শুরু হয়। বিভিন্ন জেলায় সরকারী স্কুল স্থাপিত হতে থাকে এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা সহজেই সরকারী চাকুরী সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। দেশের উন্নতির কথা বিবেচনা করে রাজা রামমোহন রায়ের মত শিক্ষিত ভারতীয়রাও ইংরাজী শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জও ঘোষণা করলেন যে ইংরাজী জানা লোকেরাই সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবেন। ১৮৫৩ সালে বাংলা ও বিহারে ৩১টি সরকারী ইংরাজী স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

উডের ডেসপ্যাচ—১৮৫৪

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি অনুসরণ করে নানারূপ সংস্কার সাধনের সার্থক প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রাদেশিক শিক্ষাবোর্ড ও কাউন্সিলগুলি লুপ্ত করে সেখানে জনশিক্ষা বিভাগ (Department of Public Instruction) স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে জনশিক্ষা আধিকারিক (D. P. I.) নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া স্কুল পরিদর্শনের সুব্যবস্থা করে ও গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তন করেও এই ডেসপ্যাচ মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সুবিধা করে দেয়। ১৮৫৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪৭ ; ১৮৭১ সালে হয় ১৩৩ এবং ১৮৮২ সালে দাঁড়ায় ২০৯। গ্রান্টব্যবস্থার প্রেরণায় বহু ভারতীয় ব্যক্তি নিজেদের প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হলে।

এই ডেসপ্যাচের পরামর্শ মত ১৮৫৭ সালে যখন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন মাধ্যমিক স্কুলগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুক্ষীগত হয় এবং স্বাধীনভাবে কোনও শিক্ষাসূচী অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের প্রাথমিক প্রস্তুতি ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার তখন আর কোন মূল্যই রইল না।

হাণ্টার কমিশন—১৮৮২

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা প্রত্যাহারের জন্য উডের ডেসপ্যাচে পরামর্শ দেওয়া হয় কিন্তু এই নির্দেশ বাস্তবে অনুসরণ করা হয়নি। তাছাড়া মিশনারীদের প্রতি সরকারী বিরাগের জন্যে ইংলণ্ডে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

এই দু'টি কারণে মিশনারীরা লণ্ডনে আন্দোলন স্থরু করেন এবং তাঁদের দাবী অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনও উডের ডেসপ্যাচে অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা প্রত্যাহারের নীতির সমর্থন করেন এবং গ্রাণ্ট-প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে কমিশন মিশনারীদের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ না করে স্থযোগ্য বেসরকারী কর্তৃপক্ষের উপর তা ন্যস্ত করার স্থপারিশ করেন। এছাড়া উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য 'এ'-কোর্স ও কারিগরি ও বাণিজ্য-বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য 'বি'-কোর্স নামে দু'ধরনের পাঠক্রম প্রবর্তনের পরামর্শ এই কমিশন দেন। এইভাবে হাণ্টার কমিশনই বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত দেন। হাণ্টার কমিশনের এই প্রগতিশীল নির্দেশটি কিন্তু তখন জনপ্রিয় হয়নি। কারণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ তখন এতই গভীর ছিল যে, কারিগরি শিক্ষার উপযোগিতা কেউ উপলব্ধি করেনি।

কার্জনের শিক্ষাসংস্কার

গ্রাণ্ট প্রথার মাধ্যমে বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮২ সালের মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ঘটে, কিন্তু তার যথাযথ সংহতি সাধিত হয়নি। ১৯০১ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন সিমলাতে এক শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ১৯০২ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত এক সরকারী প্রস্তাবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিকৃষ্ট মানের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সংখ্যাগত সম্প্রসারণের চেয়ে গুণগত মানোন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সকল সাহায্যপ্রার্থী স্কুলের ক্ষেত্রে সরকারী অনুমোদন লাভ করা বাধ্যতামূলক করেন। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের স্থপারিশের ফলে মাধ্যমিক স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় প্রত্যেক স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করাও বাধ্যতামূলক হল। এই নীতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং ভারতীয়দের ধারণা হল যে, ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনাকে বিনষ্ট করার জন্যই এই সরকারী নিয়ন্ত্রণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কার্জনের এই নীতির ফলে বেসরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা ব্যাহত হলেও মাধ্যমিক স্কুলের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা-বৃদ্ধি কমে আসে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে কোন কোন প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ গঠিত হয়। তবে কার্জনের শিক্ষা নীতির ফলে স্কুলভবন নির্মাণ

ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল পরিদর্শন ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মধ্যমরূপে স্বীকার করা হয়েছিল।

স্যাডলার কমিশন—১৯১৭

মাধ্যমিক শিক্ষা বিবর্তনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনের নিয়োগ। এই কমিশন বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার উন্নতির জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কমিশন সুপারিশ করেন যে, (১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষার মধ্যবর্তী পার্থক্য রেখা নির্ণয় করবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নয়; (২) এর জন্য পৃথক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং (৩) হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য পৃথক শিক্ষা পর্ষৎ সংগঠিত হবে। এই কমিশন বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন ও ভারতীয় ভাষাগুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। এই সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তারলাভ ঘটে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ, শিক্ষকদের বেতন-হার, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি।

১৯১৯ সালে শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এসত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ অর্থব্যবস্থার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার কোনও উন্নতি হয়নি। তবে বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং মাতৃভাষা প্রায় সর্বত্রই শিক্ষার মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

হার্টগ কমিটি—১৯২৯

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে এবং ক্লাশ প্রমোশনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উদারতা ও শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে বৃত্তিমূলক বিষয় অধ্যয়নের অভাব থাকার ফলে বহু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। কমিটি এজন্য বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এছাড়া হার্টগ কমিটি উন্নততর শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এই সময় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে শিক্ষার মান নিকৃষ্টতর হতে থাকে এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পায়।

সপ্রু কমিটি—১৯৩৪

দেশব্যাপী বেকার সমস্যার কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালে সপ্রু কমিটি নিযুক্ত হয়, তার বিবরণীতে বলা হয় যে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও ডিগ্রীলাভের জন্যই প্রস্তুত করে মাত্র, জীবনের সত্যকার কোন বৃত্তির প্রস্তুতি এর দ্বারা হয় না। এইজন্য কমিটি সুপারিশ করেন যে, (ক) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে, (খ) ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ের বিলোপ সাধন করতে হবে, (গ) মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাকাল এক বছর করে বৃদ্ধি করতে হবে এবং (ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষাকাল মোট ৬ বছর হবে। এই ৬ বছরকে ৩ বছর করে দুভাগে ভাগ করে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যায় নির্ধারিত হবে। প্রথম তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের শেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন থাকবে।

১৯৩৫ সালে ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং নানারকম রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হয়, ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার স্থান সম্পর্কে পরামর্শের জন্য 'উড-এ্যাবট বিবরণী' প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষায় সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পাঠক্রম প্রবর্তন করা উচিত। এই সুপারিশের ফলে 'পলিটেকনিক' নামে এক নতুন ধরনের কারিগরি স্কুল গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরি, বাণিজ্যবিষয়ক ও কৃষিবিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

সার্জেণ্ট রিপোর্ট—১৯৪৪

১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ যুদ্ধোত্তর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীটি সার্জেণ্ট রিপোর্ট নামে সুপরিচিত। এতে সুপারিশ করা হয়:—(ক) ৬—১৪ বছরের সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সামঞ্জস্য সাধন করতে হবে (খ) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীর ১১ বছর বয়সে সুরু হবে এবং ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাকাল চলবে (গ) শিক্ষাপর্যায়ে একাডেমিক ও টেকনিক্যাল, এই দু'শ্রেণীর পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

স্বাধীনতা লাভের পর—১৯৪৭

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তনের বিবরণ স্বাধীন ভারতের শিক্ষা পর্যায়ের ১৫০—১৭০ পাতায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

1. What are the major recommendations of the Secondary Education Commission regarding the reform of Secondary Education in India? How far have they been put to practice?

2. Describe the defects of traditional secondary education as depicted by the Secondary Education Commission, 1952. What should be the aim of secondary education in India?

3. What attempts were made in the second half of the nineteenth century for the reform of secondary education and with what success? (B.T. 1951)

4. Trace broadly the history of the reform of secondary education in Bengal in the first half of the twentieth century. (B. T. 1952)

5. Give a short account of the development of the secondary education in India from its inception.

কুড়ি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিবর্তন (১৮৫৪-১৯৪৭)

১৮৪৫ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশনের এক প্রস্তাবে কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা হয়, কিন্তু নানা কারণে তা গৃহীত হয়নি। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের অনুসরণে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল একটি সেনেট ও একটি সিণ্ডিকেটের হাতে। প্রকৃতপক্ষে এই নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষা গ্রহণও ডিগ্রী প্রদান ছাড়া আর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। ১৮৮২ সালে লাহোরে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়, তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের আয়োজন করা হয়। ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই সময়ে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার বিশেষ মূল্য ছিল বলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে জনসাধারণ খুব আগ্রহশীল হয়ে ওঠে এবং কলেজগুলির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ১৭৯টি কলেজ গড়ে ওঠে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯০৪

লর্ড কার্জনের সময় ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে যে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনমূলক সংস্কার সাধিত হওয়ায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইজন্য ১৯০২ সালের কমিশন সুপারিশ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী করে তুলতে হবে, সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের সদস্যসংখ্যা কমাতে হবে এবং কলেজগুলিকে নির্দিষ্ট উৎকর্ষ-মান অনুসরণ করতে হবে। এই কমিশনের পরামর্শমত ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। এর ফলে সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের সদস্যসংখ্যা কমে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সুষ্ঠুতর হয়। কলেজগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয় এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও তার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন

প্রভৃতি মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। এই ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষার নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লুপ্ত হতে থাকে। ১৯০২ সালের কমিশন ও ১৯০৪ সালের আইন সম্পর্কে এই বইয়ের তেরো অধ্যায়ের ১৩১-১৪৩ পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন—১৯১৭

এর পর ১৯১৭ সালে ডাঃ স্যাডলারের নেতৃত্বে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নিযুক্ত হয়। এই কমিশন সুপারিশ করেন যে, (১) মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড স্থাপন ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; (২) ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করলে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার অর্জন করা যাবে; (৩) শিক্ষকশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৪) ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। স্যাডলার কমিশনের বিশদ বিবরণ এই বইয়ের ১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন

স্যাডলার কমিশনের বিবরণী প্রকাশের পর নানা প্রদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী ৩০ বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। যথা—

আলিগড়, রেঙ্গুন ও লক্ষ্ণৌ—১৯২০; ঢাকা—১৯২১; দিল্লী—১৯২২; নাগপুর—১৯২৩; অন্ধ্র ও আগ্রা—১৯২৬, আন্নামালাই—১৯২৯; ত্রিবাঙ্কুর—১৯৩৭; উৎকল—১৯৪৩; সিন্দ, রাজপুতনা, সৌগর ও গৌহাটি—১৯৪৭।

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংহতিসাধনের উদ্দেশ্যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষৎ স্থাপিত হল। বহু প্রদেশে মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক পর্ষৎ সংগঠিত হল।

১৯৪৪ সালের সার্জেণ্ট রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সুসংবদ্ধ নীতি অনুসরণে সহায়তা করার জন্য ১৯৪৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশনের কাজ সুরু হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর—১৯৪৭

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে জাতীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেন। বিশদ বিবরণের জন্য স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পর্যায়ের ১৫০—১৭০ পাতা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্নাবলী

Describe the development of University Education in India during the British rule.

2. Give a short account of the inception of universities in India and its subsequent development till independence.

একুশ

নারীশিক্ষার বিবর্তন ও সমস্যা

একজন শিক্ষাবিদ্ মন্তব্য করেন যে ভারতে নারীশিক্ষা কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ধরে অগ্রসর হয়নি। এটি নিজে নিজেই সংঘটিত হয়েছে। কথাটি খুবই সত্য।

ব্রিটিশ আমলের প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা প্রসারের দিকে মোটেই মন দেন নি। কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কর্মচারী তৈরী করার জন্যই কোম্পানী থেকে যা কিছু শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মেয়েরা কর্মচারী হতে পারবে না বলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা ভাবার দরকারও মনে করা হয়নি। অ্যাড্যামের বিবরণীতেও দেখতে পাই যে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতি ৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪জন নারী অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসারণের প্রতি দেশের পুরুষসমাজও বিশেষ রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁরা মেয়েদের জন্য অতি প্রাথমিক স্তরের ঘরোয়া লেখাপড়ার আয়োজন করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৮১৩ সালে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর হয়, তা থেকে এক কপর্দ্দকও নারীশিক্ষার জন্য খরচ করা হয়নি। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচের পর নারীশিক্ষায় আংশিকভাবে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হতে দেখা যায়।

মিশনারী প্রচেষ্টা

আধুনিক বিস্তালয়ের মাধ্যমে এ দেশের মেয়েদের যথাযথ শিক্ষার আয়োজন মিশনারীরাই প্রথম স্থরু করেন। ১৮১৮ সালে চুঁচুড়াতে রেভারেণ্ড মে প্রথম মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন। স্কুলটি অবশ্য বেশিদিন চলেনি। ১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব আর একটি মেয়েদের স্কুল খোলেন। মেয়েদের স্কুল তৈরীর কাজ মেয়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, একথা বুঝতে পেরে মিশনারীরা ১৮২০ সালে ইংরাজ মহিলাদের নিয়ে ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি গড়ে তোলেন। এই সংস্থার প্রচেষ্টায় কলকাতার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার কার্যকলাপের কথা শোনা যায়। এই সংস্থাটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন

স্কুল সোসাইটির তরফ থেকে মিস কুক (পরে মিসেস উইলসন) নামে এক মহিলা শিক্ষাবিদকে ১৮২১ সালে এদেশে পাঠান হয়। উইলসনের আন্তরিক চেষ্টায় এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির অর্থানুকূল্যে এক বছরের মধ্যেই কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৮টি মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। এসব স্কুলে লেখা, পড়া, বানান শেখান, ভূগোল ও সূচীশিল্প শেখান হত।

১৮২৪ সালে লেডী আমহার্ষ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় লেডীজ সোসাইটির ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন নামে আর একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নারীশিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে। চার্চ মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত সমস্ত মেয়েদের স্কুলগুলির পরিচালনার ভার এই নতুন সোসাইটির হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। উইলসনের প্রচেষ্টায় কলকাতার জনৈক ধনী ব্যক্তি রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য সংগৃহীত হল এবং ১৮২৬ সালে কলকাতায় সেন্ট্রাল স্কুল নামে মেয়েদের জন্যে একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকাদের শিক্ষণেরও আয়োজন ছিল।

এই সময়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে কিছু কিছু মেয়েদের স্কুল, দুঃস্থ পিতৃমাতৃহীন মেয়েদের জন্যে অনাথ আশ্রম বা বোর্ডিং গড়ে উঠেছিল। মাদ্রাজেও চার্চ মিশনারী সোসাইটির চেষ্টায় ১৮২১ সালে প্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫০ সালে ঐ প্রদেশে মিশনারী পরিচালিত ৭টি মেয়েদের স্কুল ছিল বলে জানা যায়। বোম্বাইতে আমেরিকান মিশনারীদের উদ্যোগে ১৮২৪ সালে প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু হয় এবং পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে আরো একটি মেয়েদের স্কুল সেখানে তাঁরা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ঐ অঞ্চলেই ১৮২৯-৩০ সালে উইলসন দম্পতির প্রচেষ্টায় এবং স্কটিশচার্চ সোসাইটির অর্থানুকূল্যে ৩টি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। এই দুটি সংস্থা ছাড়া চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮২৬ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ৫।৬টি মেয়েদের স্কুল খোলেন।

তবে এই সব মিশনারী পরিচালিত মেয়েদের স্কুলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের পড়তে পাঠান হত না এবং তাদের জন্য বাংলা দেশ, বোম্বাই প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেসরকারী স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে কিছু কিছু মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালে আহমেদাবাদের রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদের ২০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে দুটি মেয়েদের স্কুল সেখানে স্থাপিত

হয়। বোম্বাইতে অধ্যাপক পত্তনের তত্ত্বাবধানে ষ্টুডেন্টস লিটারারি এণ্ড সায়েন্টিফিক সোসাইটির পরিচালনাধীনে ৯টি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৪৯ সালে কলিকাতার বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের নারী শিক্ষা বিস্তারের নবযুগ সূচিত হয়। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন নামে এক মহানুভব ইংরাজের ১০ হাজার পাউণ্ড অর্থসাহায্যের ফলে এই প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল।

সরকারী প্রচেষ্টা

এদেশে নারী সমাজের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারী উদাসীন মনোভাবের প্রথম পরিবর্তন আনেন লর্ড বেন্টিংক। তিনি কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। লর্ড ড্যালহৌসী নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী অর্থ সাহায্য দাবী করেন। এ দুজনের প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হল এবং বেসরকারী স্কুলগুলিকে সরকারী গ্রাণ্ট দেবার ব্যবস্থা হল। নবনিযুক্ত শিক্ষাবিভাগ এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এ সত্বেও নারীশিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ দ্রুততা লাভ করতে পারেনি, কারণ মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যক্ষ পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ তখনও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তাছাড়া ভারতের সাধারণ পুরুষসমাজও নারীশিক্ষার নতুন ব্যবস্থাটিকে ভালো চোখে দেখেনি।

অবশ্য নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সরকারী চেষ্টা যে একেবারে হয়নি, তা নয়। ১৮৫৭ সাল নাগাদ আগ্রা, মথুরা মৈনপুরী (উত্তর প্রদেশ) প্রভৃতি স্থানে উৎসাহী স্কুল ইন্সপেক্টরদের অনুপ্রেরণায় কয়েকটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়ে স্কুল-ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে ১০টি মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নারী শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে এই সময়ে বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজ ও বোম্বায়ের পার্শীসমাজের উদ্যোগে নারী শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন বাড়তে থাকে। ১৮৭১ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে মেয়েদের জন্য ১৩৪টি মাধ্যমিক স্কুল ও ১,৭৯০ প্রাথমিক স্কুল ছিল। বেথুন স্কুলে ১৮৭৮ সালে মেয়েদের কলেজ সুরু হয়। ১৮৭৬ সালে পালামকোটাতে শারা টাকার (Sarah Tucker) কলেজ স্থাপিত হয়। পুণাতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি গড়ে ওঠে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারীদের প্রবেশাধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। ১৮৫৭ সালে বোম্বাই এবং কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনীরা পরীক্ষা দেবার অনুমতি চাইলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ১৮৮৩ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই নিষেধ প্রত্যাহার করেন।

১৮৮২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে সে সময় বিভিন্ন স্কুলে ১,২৭,০৬৬ জন মেয়ে পড়ত এবং তার মধ্যে ১,২৪,৪৯১ জনই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রী। অর্থাৎ তদানীন্তন নারীশিক্ষার ৯৭·৬% ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই সীমাবদ্ধ। এ থেকে বোঝা যায় যে সেই সময়ে জনসাধারণ মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপযোগিতাটুকু বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, যদিও উচ্চতর নারীশিক্ষার প্রতি তাঁদের বিরূপ মনোভাব তখনও তীব্র ছিল। মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ, মেয়েদের উপযোগী পৃথক পাঠক্রমের অভাব, স্কুলে নারীশিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণেও প্রাথমিক পর্যায়ের পরে মেয়েদের স্কুলে যোগ দিতে দেখা যেত না।

১৮৮২ সালের হিসাবে আরও জানা যায় যে, ঐ সময়ে সমগ্র ভারতে একটি মাত্র মেয়েদের কলেজ ছিল—সেটি কলকাতার বেথুন কলেজ এবং তাতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ জন। সমগ্র ভারতে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ২,০৫৪ জন। তবে এই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং ৫১৫ জন শিক্ষিকা এই সব কলেজে শিক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। তবে এই সব শিক্ষণ কলেজগুলি সবই মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হত বলে ধর্মসচেতন ভারতীয় নারীদের অনেকেরই শিক্ষণ গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এসব কলেজে যোগ দিতেন না। অথচ সরকারী উদ্যোগেও নারী শিক্ষণের কোন কলেজ তখনও স্থাপিত হয়নি। ১৮৬৬ সালে মিস মেরী কার্পেণ্টার নামে এক মহানুভব ইংরেজ মহিলা রাজা রামমোহনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশে আসেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাবেই ভারতে নারীশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। তিনি তাই প্রথমেই তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লরেন্সকে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন এবং সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়ে কাজে নামলেন। মিস কার্পেণ্টারকে এইজন্য এদেশের শিক্ষিকা-শিক্ষণ কলেজ-ব্যবস্থার পুরোধা বলা চলে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন—১৮৮২

১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশন নারী শিক্ষার সকল বিষয়েই আলোচনা করেন, এবং স্বেচ্ছাধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সাধনের পরামর্শ দেন। এই

কমিশন স্কুলে মেয়েদের যোগদান বাধ্যতামূলক করতে বলেন নি বা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণেরও পরামর্শ দেন নি। অথচ স্বেচ্ছাসৃষ্ট নারীশিক্ষার প্রচেষ্টাগুলিকে যথোপযুক্ত সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেন নি। মোটের উপর, হাণ্টার কমিশন ভারতবর্ষে দ্রুত নারীশিক্ষা বিস্তারের অনুকূল কোনও পরামর্শই দিতে সক্ষম হন নি। ফলে ১৮৮৩ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত নারীশিক্ষা শম্বুকগতিতে অগ্রসর হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দী

১৯০২ সালে কলেজ-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২৬৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ইতিমধ্যে প্রগতিশীল মনোভাব গ্রহণ করেছিল, কারণ দেশের শিক্ষিত সমাজ উচ্চতর নারীশিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করতে সুরু করেছিলেন। মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ স্থাপনের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯০২ সালে মেয়েদের কলেজ ছিল ১২টি—এর মধ্যে ৩টি মাদ্রাজে, ৩টি বাংলা দেশে এবং ৬টি ছিল যুক্তপ্রদেশে। ১৮৮২ সালে মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২০,০৫৪ এবং ১৯০২ সালে হয় ৪১,৫৮২ জন। এ অগ্রগতি যে যথেষ্ট আশাপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি সমাজসংস্কারকদের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করে ১২ বছর নির্ধারিত হওয়ায় মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের অনেক সুবিধা হয়েছিল। এই সময়ে মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুল ছিল ৪৬৭টি এবং প্রাথমিক স্কুল ৫,৬২৮টি। ১৮৮২ সালে মেয়েদের প্রাথমিক স্কুলে ১,২৪,৪৯১ জন ছাত্রী পড়ত; ১৯০২ সালে এদের সংখ্যা হয় ৩,৪৮,৫১০ জন এবং এই পর্যায়ে সহশিক্ষাব্যবস্থার প্রতি আগের মত জনসাধারণের বিরূপ মনোভাব দেখা যায় নি। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপযোগী পৃথক পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের দাবী শোনা যেতে লাগল।

১৯০২ সালে নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজনও কিছু কিছু হয়েছিল। তবে শিক্ষিকা শিক্ষণের আয়োজনটাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে সমগ্র ভারতে ২,৮০৭ জন নারী বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১,৪২২ জনই ছিলেন শিক্ষিকা শিক্ষণ কলেজের ছাত্রী। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষকতা বৃত্তির পরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল

নার্সিং, ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার বৃত্তি। দেশের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে বহু হাসপাতাল গড়ে উঠতে থাকার ফলে এই বৃত্তিগুলিতে নারীশিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও আগ্রহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ সব অগ্রগতি সত্ত্বেও একথা বলা চলে না যে ১৯০২ সালে ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার পরিস্থিতি আশানুরূপ ছিল। কারণ দেখা যায় যে ১৮৮৭ সালে দেশের স্কুল-গমনোপযোগী মেয়েদের মাত্র ১'৫৮% স্কুলে পড়ত এবং ১৯০২ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২'৪৯% মাত্র। নারী জনসংখ্যার ০'৯% ছিলেন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। তবে একথা ঠিক যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারীশিক্ষার যে অবস্থা ছিল, তার তুলনায় এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

১৯০২ সালের পর থেকে এ বিষয়ে অগ্রগতি দ্রুততর হয়। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ অধিকতর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত, স্কুল পরিদর্শিকা নিয়োগ, ছাত্রীদের লোভনীয় পুরস্কার প্রদান, বেতন মকুব, শিক্ষিকাপদে যোগদানে নারীদের উৎসাহিত করা প্রভৃতি বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার ফলে এই অগ্রগতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ১৯০৪ সালে বেনারসে অ্যানী বেশান্তের উদ্যোগে সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে দিল্লীতে সর্বপ্রথম মহিলাদের চিকিৎসাতত্ত্ব শিক্ষার জন্য লেডী হার্ডিঞ্জ কলেজ খোলা হয়। মেয়েদের জন্য স্কুল-কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ ছাত্রীই কিন্তু বেশিদিন লেখাপড়া চালাতে পারত না।

নারীশিক্ষার জন্য পৃথক পাঠক্রমের দাবী মেটাবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক কার্ভে ১৯১৬ সালে পুণাতে ইণ্ডিয়ান উইমেন্‌স্ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেন। এর পরে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির এক বিশেষ যুগ আসে। এই সময়ে দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা দেখা দেয়। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে এবং দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারার প্রভাবে দেশের সর্বত্রই নারী-প্রগতির উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীসমাজের অধিকতর স্বাধীনতার যে আন্দোলন চলছিল, তারও প্রভাব এদেশে পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৭ সালে অ্যানী বেশান্তের উদ্যোগে উইমেন্‌স্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ সালে প্রথম নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের অধিবেশন বসে।

হার্টগ কমিটি

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি নারী শিক্ষার সুসংহতি সাধনের দিকে শিক্ষা-বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করে সুপারিশ করেন যে, নারীশিক্ষার প্রকৃত সুব্যবস্থার দায়িত্ব বহন করবার জন্য প্রতি অঞ্চলে একজন সুযোগ্যা মহিলা কর্মচারী নিয়োগ করা উচিত, বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমিটিতে নারী প্রতিনিধি থাকা দরকার, মেয়েদের স্কুলের জন্যে পরিদর্শিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, মেয়েদের বৃত্তি-মূলক শিক্ষার আয়োজন বাড়াতে হবে, গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

এ সকল কারণে ১৯১৭ সালের পর থেকে ভারতে নারীশিক্ষার অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা যায় এবং ১৯৪৭ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে নারীশিক্ষার জন্য ১৭,৪৮৫ টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সেগুলিতে ৩২,৯৪,২৪৮ জন ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করত বলে জানা যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর—১৯৪৭

স্বাধীনতা লাভের পর এই অগ্রগতি স্বভাবতই নতুন উদ্যম লাভ করে এবং দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে নারীশিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হয় ১৬,৯৫১টি। এগুলির মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫,৫০,৫০৩ জন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দেশ বিভাগের ফলে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে গেলেও ছাত্রীসংখ্যা মোটেই কমেনি। ১৯৫৫ সালে নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা হয় ২৩,০৮৮টি এবং ছাত্রীসংখ্যা ৮২,৪৮,২৪৮ জন। এখন মেয়েরা স্কুল-কলেজে আগের চেয়ে অনেক দীর্ঘকাল ধরে পড়ছে এবং প্রতি বছরেই সকল পর্যায়ে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে সমগ্র স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের একটি হিসাব এখানে দেওয়া হল, এ থেকে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

পরীক্ষা	১৯৫০	১৯৫৫
এম. এ/এম. এস. সি	৬৪০	১,৮২৪
বি. এ/বি. এস. সি	৪,৬৯৪	৯,৩৩১
বৃত্তিমূলক ডিগ্রী	১,১৬৯	৩,৫৪৭
ম্যাট্রিকুলেশন[১]	২৫,৭২১	৬৩,১৪৬

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন—১৯৪৮

১৯৪৮ সালে রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে নিযুক্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবার নির্দেশ দেন। তাঁরা বলেন যে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ কোন দিক দিয়ে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, শিক্ষার ব্যাপারে তারা যেন তাদের উপযোগী পাঠস্তর অনুসরণ করতে পারে এবং প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েরা যেন একদিকে আদর্শ নারী অপর দিকে আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে উঠতে পারে।

এই সব নির্দেশের ফলে বর্তমানে মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষার স্তরে মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী পাঠক্রম বহু স্থানে প্রবর্তন করা হয়েছে। নব পরিকল্পিত বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে চারুকলা (Fine Arts), গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science) প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেয়েদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে স্নাতকস্তরেও সমাজ বিজ্ঞান (Social Science) ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ্য করা হয়েছে। দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজ, কলকাতার বিহারীলাল কলেজ, বিরলা জহরী দেবী গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কলেজে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের উপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া মেয়েদের নানা শিক্ষণমূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা ত আছেই। বর্তমানে ডাক্তারী, আইন, ইঞ্জিনীয়ারীং, যন্ত্রবিদ্যা পূর্তবিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষার সর্বস্তরেই পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে।

নারীশিক্ষার সমস্যা

এখনও নানা রকম সমস্যার মধ্যে দিয়েই ভারতের নারীশিক্ষা প্রসারের কাজ এগিয়ে চলেছে। নীচে বর্তমানে নারীশিক্ষার কয়েকটি প্রধান প্রধান সমস্যার উল্লেখ করা হল।

১। সমস্যাগুলির আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের কথা। প্রাচীন ভারতে নারীসমাজের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের বিরুদ্ধে যে দৃঢ় মতবাদ গড়ে উঠেছিল আজকের সমাজ বহুশতাব্দীর সেই সংস্কারের প্রভাব থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। আজও অনেকে মনে করেন, নারীসমাজ উচ্চশিক্ষিত হলে তাদের মন স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অবনতি ঘটাতে পারে। এই রক্ষণশীল মতবাদ নারীশিক্ষাবিস্তারের প্রতি পদেই বাধার সৃষ্টি করেছে।

২। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক সম্প্রদায় মনে করেন যে মেয়েদের জীবনধর্ম যখন

গার্হস্থ্য কর্তব্য প্রতিপালন, তখন তাদের উচ্চশিক্ষিত করার সার্থকতা থাকতে পারে না। এমন কি গার্হস্থ্য বিষয় শিক্ষার জন্যে স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এসব শিক্ষা ঘরের প্রাচীনাদের কাছে হাতেকলমে গ্রহণ করাটাই বাস্তব উপায় এবং তাতে অযথা সময় ও অর্থব্যয় হয় না। যে শিক্ষা ঘরেই শেখা যায়, তার জন্যে স্কুল কলেজের আয়োজনকে তাঁরা অনাবশ্যক মনে করেন। অল্প কিছু গণিতবিদ্যা এবং লিখতে পড়তে শেখার বেশি শিক্ষাগ্রহণের দরকার মেয়েদের নেই মনে করে তাদের অধিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব বহন করতে অধিকাংশ অভিভাবক উৎসাহী হন না।

৩। নারীপ্রগতির প্রতি প্রতিকূল মনোভাব নারীশিক্ষার বিস্তারের প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীশিক্ষা প্রসারের অনুকূল অবস্থা হল নারীপ্রগতির প্রতি সমাজের সহানুভূতি। এই মনোভাব একমাত্র সহরাঞ্চলেই দেখা যায়, গ্রামের লোকেরা এখনও পুরনো আদর্শপন্থী। তাঁরা নারীপ্রগতিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। ফলে সহরাঞ্চলে নারীশিক্ষা বিস্তার যতখানি সহজ, গ্রামাঞ্চলে তেমন নয়।

৪। সরকারী ঔদাসীন্য ও অর্থ সাহায্যের অপ্রাচুর্য নারীশিক্ষার আর একটি বড় সমস্যা। যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী অর্থ সাহায্য পরিবেশিত হয় এবং তার দ্বারা মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে বেতন, পাঠ্যপুস্তক, সরঞ্জাম, স্কুলভবন প্রভৃতি বিষয়ে অভিভাবকদের অর্থব্যয়ের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি যথেষ্ট দ্রুততা লাভ করবে। বর্তমানে অপর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য নারীশিক্ষার সমস্যা সমাধানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫। অনুপযোগী পাঠক্রমও নারীশিক্ষার বড় একটি প্রতিবন্ধক। মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করতে হলে মেয়েদের উপযুক্ত বিশেষ ধরনের পাঠক্রমের আয়োজন করতে হবে। নারীমনের সুকোমল বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ এবং তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের পাঠক্রমে বিশেষ কতকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আশার কথা, আধুনিক বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের পাঠক্রম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

৬। সুশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাবও নারীশিক্ষার প্রসারে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঠক্রমে মেয়েদের উপযোগী যে সব বিষয় অধ্যয়নের আয়োজন থাকবে, সেগুলির অধ্যাপনার জন্য সুশিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট শিক্ষিকারও বিশেষ প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, আজকালও সুশিক্ষিতা শিক্ষিকার বিশেষ অভাব

দেখা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত সক্ষম শিক্ষিকার অভাবে অল্পশিক্ষিতা শিক্ষিকাদের উপরে বহু ক্ষেত্রেই মেয়েদের প্রারম্ভিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে।

এই সব সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা চলেছে এবং সেই প্রচেষ্টা সফল হলে ভারতের নারীশিক্ষার যে অগ্রগতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রশ্নাবলী

1. Give a brief account of the development of women's education in India.

2. Describe the problems of womens' education in India and its development in independent India.

বাইশ

বয়স্কশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার বিবর্তন

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার পর থেকে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে পরিচিত হয়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের উপর। গণতান্ত্রিক দেশের শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব জনসাধারণকেই বহন করতে হয়। বর্তমানে ভারতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই ভোটাধিকার আছে। সেইজন্য দেশে আজ প্রয়োজন শিক্ষিত ও সুস্থ-চিন্তাসম্পন্ন নাগরিকের। এমন নাগরিক চাই যাঁরা যথার্থ চিন্তা করে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা করবেন।

এই সুস্থ চিন্তাধারা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা কেবলমাত্র সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত কতকগুলি লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে সকলেরই অধিকার সমান। অত্যন্ত সাধারণ লোকেরও অধিকার সেখানে উচ্চতম পদাভিষিক্ত ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। সে জন্য সকলের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমানভাবে প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক নাগরিককে তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে গড়ে তুলতে হবে। অপরের চিন্তা বা পরামর্শ শুনে সে যাতে বিভ্রান্তির পথে অগ্রসর না হয় সেটা সর্বপ্রথম দেখতে হবে। প্রত্যেককে যথাযথ চিন্তা করে তার নিজস্ব কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ না করে কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা দেশের স্বার্থেরপরিপন্থী হবে। বৃটিশ শাসকেরা ভারতের জনশিক্ষার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেন নি, কেননা দেশের সত্যকার উন্নতি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। এর ফলে বিরাট সংখ্যক লোক অশিক্ষিত রয়ে গেছে। ১৯৩১ সালের লোক গণনায় দেখা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষে অশিক্ষিত পুরুষের হার শতকরা ৭৭, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের হার আরও বেশী, ৯৭। ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্টে দেখা যায় যে নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা হল ৯ কোটি ৫০ লক্ষ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং দেশের সর্বাঙ্গীন প্রগতি ও উন্নতির

জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ জনমতের সহায়তা ছাড়া কোন পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না। আর সুস্থ জনমতের সৃষ্টি করতে হলে চাই শিক্ষিত জনসাধারণ। সুতরাং বয়স্কশিক্ষা আজ জাতীয় প্রয়োজনীয়তার রূপ নিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের অন্তত কিছুটা শিক্ষা পেতেই হবে। সেইজন্যই জনশিক্ষা হল সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রের নিজস্ব দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক জীবনধারায় অভ্যস্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হয়ে উঠতে পারে।

বয়স্ক শিক্ষা ও রাষ্ট্রের কর্তব্য

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে রাষ্ট্রকে দ্বিমুখী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে যে সব প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ নিরক্ষর হয়ে আছে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছয় থেকে অন্তত চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকার বাধ্যতামূলক শিক্ষার আয়োজন করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এদের নিয়ে নতুন সমস্যার উদ্ভব না হয়। যদি শিশুর পিতামাতা নিজেরাই কিছুটা শিক্ষা লাভ করেন তাহলে তাঁরা সন্তানদের শিক্ষাদানের মূল্য বুঝতে পারবেন। ফলে সর্বজনীন শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে। দেখা গেছে যে শিক্ষার বিস্তার অভিভাবকদের অসহযোগিতাই হল সব চেয়ে বড় অসুবিধা। পিতামাতারা যদি স্বেচ্ছায় তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে সুরু করেন তবে এই বাধা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। এইজন্য বয়স্কশিক্ষা প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থামাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রও বয়স্কশিক্ষা ছাড়া চলতেই পারে না। এই কারণে একজন চিন্তাবিদ্ বলেছেন যে বয়স্কশিক্ষা হল গণতন্ত্রের প্রকৃত সন্তান। লেনিনও বলেছিলেন যে নিরক্ষরতা দূর করাটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটি ছাড়া রাজনীতির কথা বলাই চলে না। সুতরাং, এই সমস্যাটির গুরুত্ব ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সমস্ত সরকারকেই উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের জাতীয় সরকারের যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সমাধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কেবলমাত্র আলোচনা বা ভাল ভাল প্রস্তাব গ্রহণ করে সত্যকার অগ্রগতি হবে না। সমস্যাটির ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয়ই গুরুতর চিন্তার বিষয়। এটিকে সম্পূর্ণরূপে সমাধান করতে হলে একে রাষ্ট্রের কর্মসূচীতে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হবে এবং যেখানে যেটুকু আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব তার সবটুকু সংগ্রহ করে অগ্রসর হতে হবে। এই প্রসঙ্গে সোবিয়েৎ রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। সেখানে

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশের একটা বড় অংশ জুড়ে নিরক্ষরতার সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। সাক্ষরতার হার এমন কি শতকরা একজনও ছিল না। কিন্তু সে দেশের সরকার এই সমস্যার সমাধানে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে মাত্র পনেরো বৎসরে বহুলাংশে দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের সরকার ও জনসাধারণের উচিত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিরক্ষরতার নিরসনে অগ্রসর হওয়া।

বয়স্ক শিক্ষা বা সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য

সমস্ত দেশের বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য এক নয়। দেশের স্বাতন্ত্র্য, অবস্থাবৈষম্য প্রয়োজন এবং বয়স্কশিক্ষা ঘটিত নানা সমস্যার প্রকৃতি ও তার ব্যাপ্তি অনুধাবন করে সে দেশের বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে। উদাহরণস্বরূপ ডেনমার্কের কথা বলা যেতে পারে। সেখানে বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা, তাদের মধ্যে সামাজিকতার বোধ গড়ে তোলা ও তাদের সঙ্গীত, চিত্র, নৃত্য প্রভৃতি চারুকলায় আগ্রহশীল করে তোলা। রাশিয়াতেও প্রথম দিকে বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিছক নিরক্ষরতা দূর করা। ভারতে বয়স্কশিক্ষার যে কোন পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দূর করাটাই ভারতের বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্যের একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন— বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য হল পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করতে হবে এমনভাবে যেন জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে উন্নত করে তুলতে পারে। এর সাহায্যে সে উন্নত ধরনের শিল্পকর্ম ও উৎপাদনের প্রক্রিয়া শিখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারবে। এর দ্বারা সে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মকানুনও শিখবে এবং ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে সেগুলির প্রয়োগের দ্বারা তার পারিবারিক জীবনকে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারবে। সবশেষে, এই শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে নাগরিকতাবোধের সৃষ্টি করে তাকে বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে যাতে সে শান্তি ও প্রগতির পথে চলতে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারে।

নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে যে কোন শিক্ষাপরিকল্পনায় লিখন-পঠন ও গণিতের প্রাথমিক শিক্ষা একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকবে সে বিষয়ে

সন্দেহ নেই। কিন্তু এইগুলিকেই একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা ভাবাটা অযৌক্তিক হবে। আজকের দিনে বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব দেখা দিয়েছে এবং ভারতের মত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে এর একটা বিশেষ অর্থ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতের বয়স্কশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে মোটামুটি শিক্ষিত করে তাদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলা এবং জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় করা। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা সম্ভব :—

(ক) নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষর করা।

(খ) অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি করা।

(গ) ব্যক্তির নিজের দিক দিয়ে এবং একটি বিরাট জাতির অংশরূপে তার মধ্যে নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে কার্যকরী ধারণা সৃষ্টি করা।

ভারতে বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাস

ব্রিটিশ শাসনের সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত ভারতবর্ষে বয়স্কশিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে সরকার কোনই উদ্যোগ প্রদর্শন করেন নি। বাংলা, বরোদা, মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে অবশ্য কাজ কিছুটা হয়েছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী ভারতীয়দের উপর যখন কিছু শাসনক্ষমতা অর্পিত হল তখন বয়স্ক-শিক্ষার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। সে সময়কার ব্রিটিশ সরকার এদিকে কিছু কিছ দৃষ্টি দিতে সুরু করলেন। নীচে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতির একটি বিবরণী দেওয়া হল।

১। ১৯২০-২৭ : বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রীবর্গ সমস্যাটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তা করেন এবং এর যাতে সমাধান করা যায় সেই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। পাঞ্জাবে ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে বয়স্ক শিক্ষার জন্ত ৬৩০টি বিদ্যালয় ছিল। ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৩,৭৮৪। বাংলা, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর ও বোম্বাই প্রদেশেও এই সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে বয়স্ক শিক্ষার জন্ত ১১,২০৩টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

২। ১৯২৭-৩৭ : এই সময়ে বিভিন্ন কারণে দেশের সর্বত্র বয়স্ক শিক্ষার অবনতি ঘটতে থাকে। এই সময়ে আর্থিক অনটনও চরম হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখা দেয়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৪,৪১৪ ; ১৯৩৭ সালে কমে হয় মাত্র ৫,০০০। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শুধুমাত্র বোম্বাই প্রদেশ বাদে দেশের সর্বত্র বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে কমে যায়।

৩। **১৯৩৭-৪২ :** ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার গঠিত হল এবং ভারতীয় মন্ত্রীরা সমস্যাটির প্রতি মনোযোগ দেন। বিভিন্ন প্রদেশের বয়স্ক শিক্ষা পর্ষৎ গঠিত হল। এগুলির মধ্যে বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা পর্ষৎ ও দিল্লী বয়স্ক শিক্ষা সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়টির ছিলেন স্যর সুলেমান। চক্রবর্তী রাজা-গোপালচারী, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মত ব্যক্তিরা এই সমস্যাটির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করতে লাগলেন। ডাঃ ল্যানস্ব্যাক নামে একজন আমেরিকান মিশনারী ফিলিপাইনে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯৩৫, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার ভারতবর্ষে আসেন ও তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। এই সময় সরকার বয়স্ক শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে নিলেন। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বয়স্ক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,২৮৭; সেই সংখ্যা ১৯৪০-৪১ সালে বেড়ে হয় ৬,৪০৭।

৪। **১৯৪২-৪৭ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি আবার কমে আসে এবং ৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে হয় ৫,৯৩৮।

সার্জেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪৪

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে সার্জেন্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল নীচে সেগুলির সারমর্ম দেওয়া হল।

১। বয়স্কশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে নিরক্ষরতা দূর করা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যারা কেবল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন তাদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা অনুসারে যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বয়স্ক শিক্ষাকে তারই পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার সমস্যাটি ২০ বছরের মধ্যে সমাধান করতে হবে।

৩। এর জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও ব্যক্তিগতভাবে কেহ এ পথে অগ্রসর হলে তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

৪। নির্দিষ্ট ২০ বৎসরে এই উদ্দেশ্যে তিন কোটির মত টাকা ব্যয়িত হবে।

উপরের নির্দেশগুলি সময়োপযোগী হলেও অর্থাভাববশত এগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় নি।

স্বাধীনতার পর—সমাজশিক্ষা

৫। **১৯৪৭-৫৪ :** স্বাধীন ভারতে বয়স্কশিক্ষার সমস্যাটি পুনরায় অগ্রাধিকার পেতে লাগল। এখন থেকে বয়স্ক শিক্ষাকে নতুন ও ব্যাপক অর্থে নেওয়া হল এবং এর নাম দেওয়া হল 'সমাজ শিক্ষা।' এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যও বদলে গেল। প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণকে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করাই এর উদ্দেশ্যে রইল না, বয়স্ক ব্যক্তিরা যাতে তাদের নাগরিকতা সম্পর্কে সচেতন হয় ও তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সেগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও পালন করতে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থা করাই হল এখন বয়স্কশিক্ষা বা সমাজ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে তাদের খানিকটা বৃত্তিগত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করা হল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি বার দফা কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। সেগুলি হল এই—

১। গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিকে গ্রামবাসীদের নির্দেশ ও উপদেশ দান, সেবাকার্য, ক্রীড়া ও বিনোদনের কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা হবে।

২। শিশু, যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য পৃথক সময়ের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। সপ্তাহের কয়েকটি দিন বালিকা ও স্ত্রীলোকদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকবে।

৪। বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক প্রোজেকটার ও লাউডস্পিকার সম্বলিত মোটরগাড়ী বিদ্যালয়গুলির কাজে ব্যবহার করার আয়োজন করা হয়েছে। এগুলির সাহায্যে চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠনে চিত্রপ্রদর্শন করা ও রেকর্ডে বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা হবে। অন্তত সপ্তাহে একবার করে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ধরনের চিত্রপ্রদর্শনের আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। বিদ্যালয়গুলিতে রেডিও সেট রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদ্যালয়গামী শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষা ও প্রচার মন্ত্রণালয় প্রায় ১৪০টি সেট ইতিমধ্যেই বিতরণ করেছেন এবং যথাসম্ভব শীঘ্র আরও বিতরণ করা হবে।

৬। বিদ্যালয়ে সাধারণের বোধগম্য নাটক মঞ্চস্থ করা হবে এবং শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

৭। জাতীয় ও দলগত সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে।

৮। যে অঞ্চলের পক্ষে যে শিল্প উপযোগী সেই অঞ্চলে সেই শিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। গ্রামবাসীদের সামাজিক স্বাস্থ্য, কৃষিপদ্ধতি, কুটীর শিল্প ও সমবায় পদ্ধতির সাধারণ নিয়মগুলি শিক্ষা দেবার জন্য স্বাস্থ্য, কৃষি ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় যথাযোগ্য ফিল্ম ও স্লাইড প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করতে হবে। সমাজ শিক্ষার কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য গঠনমূলক কাজে আগ্রহশীল সামাজিক সংস্থাসমূহের সাহায্য ও সহযোগিতা সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

১১। সঙ্ঘবদ্ধ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। মাঝে মাঝে প্রদর্শনী, মেলা, প্রমোদভ্রমণ প্রভৃতির আয়োজন করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন—১৯৪৯

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোকগত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সমাজ-শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

১। এই সম্মেলন সমাজ-শিক্ষার খাতে সরকারের এক কোটী টাকা ব্যয়ের প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এর মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকা প্রদেশ সমূহের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। কোনও প্রদেশের প্রাপ্য টাকা সেই প্রদেশে কত নিরক্ষর আছে তার উপর নির্ভর করবে। বাকী দশ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন।

২। প্রত্যেক প্রদেশ তার সমাজ শিক্ষার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে জমা দেবে।

৩। শিক্ষাদানের উপাদানরূপে সংগ্রহশালার মূল্য পরীক্ষা করে দেখা হবে।

৪। সমাজ শিক্ষার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের নিযুক্ত করার যে প্রস্তাব এসেছে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৫। বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত যে সব তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া আছে সেগুলি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬। সরকার শিক্ষাদানে ইন্দ্রিয়সহায়ক সাজসরঞ্জামাদি (audio-visual aids) সরবরাহ করবেন এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করবেন।

কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার ফলে রাজ্যগুলি অধিকতর উদ্যমের সঙ্গে এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছে। উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, ও আজমীড়ে সমাজ শিক্ষার প্রভূত উন্নতি দেখা গেছে।

সমাজশিক্ষার পাঠক্রম

রাশিয়ার মত ভারতবর্ষেও বয়স্কশিক্ষার পাঠক্রমে ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত সঙ্গীত, অঙ্কনবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং কৃষি ও বাণিজ্যবিদ্যার মত বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিখতে ও পড়তে শেখানোর ব্যবস্থাকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। বয়স্কশিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ হল যে লিখন, পঠন ও গণিতের শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত বিদ্যাও কিছুটা শেখান হবে এবং সেই সঙ্গে পৌরনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্যবিদ্যার শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে ইন্দ্রিয়সহায়ক সাজসরঞ্জাম গ্রন্থাগার, সঙ্গীত নাট্যানুষ্ঠান, লোকনৃত্যানুষ্ঠান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজশিক্ষাকে যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক ও কার্যকরী করার চেষ্টা চলছে।

সমাজ শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

১। যদি সমাজশিক্ষার সমস্যাটির সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে হয় তাহলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়কে আরও বেশী তৎপর ও মনোযোগী হয়ে উঠতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এদিকে আরও দৃষ্টি দিতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অবিলম্বে অবৈতনিক সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। জন-শিক্ষার যে পরিকল্পনাকে জাতীয় সরকার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। এই খাতে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। সুপরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হয়ে যাতে ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সমস্ত বালক বালিকা বিনা-বেতনে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পায় তার আয়োজন অবিলম্বে করতে হবে।

এই কাজটা সম্পন্ন করতে পারলে সমস্যা থাকবে কেবলমাত্র নিরক্ষর বয়স্কদের নয়ে।

২। এই বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পনার রূপায়নের পথে অন্যতম বাধা হচ্ছে এ সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কদের ইচ্ছা ও উদ্যোগের অভাব। অধিকাংশ বয়স্ক নিরক্ষরদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এর পরে নৈশ বিদ্যালয়ে যোগ দেবার আগ্রহ ও ইচ্ছা আর তাদের থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে সময়ও পাওয়া যায় না। প্রচার ও আন্দোলনের দ্বারা এই আগ্রহের অভাব দূর করতে হবে। সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য একবার উপলব্ধি করলে বয়স্করা তখন নিজেরাই বিদ্যালয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করবে।

৩। সমাজ শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বস্তুত সমাজ শিক্ষার অক্ষরগত পর্যায় ও ব্যাপকতর উদ্দেশ্য উভয় দিক দিয়েই বয়স্কদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাবে সমাজশিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বয়স্কদের শিক্ষায় আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে ও তাদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন বহু-সংখ্যক পুস্তিকা, পত্রিকা, সংবাদপত্র, দেওয়ালপত্র, প্রভৃতি সুসজ্জিত পঠনীয় সামগ্রী অবিলম্বে প্রস্তুত ও প্রচার করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন লেখকরা যাতে পুস্তিকা ও পত্রিকার আকারে বয়স্কদের পঠনীয় বিষয়গুলি প্রকাশ করেন সে জন্য তাঁদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে। দৈনিক সংবাদপত্র, বয়স্কদের পাঠ্যগ্রন্থাদি, শিক্ষকদের নির্দেশ-পুস্তক এবং সর্বোপরি ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, কৃষি ও বিশ্বের অন্যান্য সংবাদ সম্বলিত পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকা—নবশিক্ষিতদের জন্য এ সমস্তরই ব্যবস্থা রাখতে হবে। বর্তমানে যাতে বয়স্কদের উপযোগী বিভিন্ন স্তরের বই লেখা হয় সেজন্য ভারত সরকার লেখক ও প্রকাশকদের পুরস্কার দেবার আয়োজন করেছেন।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the progress of adult education in India. Why is it described as social education ?

2. Discuss the importance of adult education in a country like India. What are the problems of adult education in present India ?

তেইশ

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমলে রামমোহন ও মেকলের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় যে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল পরবর্তী কালে সেই শিক্ষাব্যবস্থাটিকেই ভারতবাসী উন্নত ও কাম্য শিক্ষাব্যবস্থা মনে করে সাগ্রহে ও কৃতজ্ঞ অন্তরে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই দেশের শিক্ষিত চিন্তাবিদদের কাছে ভারতে প্রচলিত এই পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট সংকীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল এবং অনেকেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করতে লাগলেন। দেশের নেতাদের কাছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা নানা কারণে নিতান্তই ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছিত বোধ হতে লাগল। শুধু ভারতীয় নেতারাই নন, অনেক পাশ্চাত্য মনীষীও এই ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি দেখিয়ে দিতে লাগলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার অ্যাণ্টনি ম্যাকডোনেল এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০-৯২) তাঁর ভাষণে এই শিক্ষাব্যবস্থার সহস্র ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও মৌলিক গবেষণা এবং কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই প্রস্তাবকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি পূর্বাভাষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। শিক্ষা সমস্যার এই সব দিকগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও 'ডন' পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও আলোচনা করেন।

সতীশচন্দ্র তাঁর এক প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখালেন যে রাজনৈতিক দিক থেকে এ শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর প্রবর্তকদেরও উদ্দেশ্য সফল হয় নি। আবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দ্বারা কোন প্রকার বৃত্তিমূলক সুযোগ সুবিধাও অর্জন করা যায় না। ভ্যালেণ্টাইন চিরল-ও বিস্তারিত আলোচনা করে এই মতই সমর্থন

করেছিলেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে এর একটা মূলগত দুর্বলতা উদ্ঘাটন করে বলেছিলেন যে ছাত্রদের প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে এ শিক্ষার কোন যোগই নেই। সতীশচন্দ্রও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অভিযোগ করেন যে বিদেশী শিক্ষার ফলে একটি ছাত্রও আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মনির্ভরশীল, ত্যাগশীল ও দেশপ্রেমিক মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে নি। এই শিক্ষা অতিরিক্ত সাহিত্যধর্মী। এই অনুপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমালোচনা ও নিন্দার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের মতে জাতীয় চরিত্র গঠন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এর কোন মূল্যই নেই।

বিদেশী চিন্তাবিদেরাও স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিদেশী আদর্শে গঠিত ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এ্যানি বেশান্ত ইংলণ্ড ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাস শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিজস্ব প্রতিভার বিকাশের জন্য ছাত্রদের স্বদেশের ইতিহাস শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জর্জ বার্ডউড ডন-সম্পাদক সতীশচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে ভারতে উচ্চ শিক্ষার ভার ভারতীয়দের নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতি জোর না দিয়ে সমস্ত প্রচেষ্টাই ইংরাজী সাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত হচ্ছে। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ভারতকে ইউরোপের দ্বারস্থ হতে হবে, কিন্তু ভারতের নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন প্রভৃতিকে পরিহার করা কিছুতেই উচিত হবে না। এগুলিকেও উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে।

বার্ডউডের সুচিন্তিত মতামত ভারতীয়দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেটা বহুলাংশে বার্ডউডের প্রদর্শিত পথেই গঠিত হয়েছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার ডন পত্রিকায় ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন।

ভারতের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারার যে কোন সম্পর্কই নেই, এটা ভারতীয় চিন্তাবিদ্দেরও বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল। সতীশচন্দ্র তাঁর ডন পত্রিকায় তুলনা করে লিখেছিলেন :—ভারতীয় চিন্তাধারায় মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক বিকাশই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। তাই ভারতীয় শিক্ষায়

মূল ভিত্তি ছিল আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করা। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা ইত্যাদি। জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এই ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় চরিত্র বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। আবার এই শিক্ষা খাঁটি পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে যে সংযুক্ত তাও নয়। এর প্রকৃত রূপ না প্রাচ্য, না পাশ্চাত্য। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জাতীয় উন্নতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে ও উচ্চতর পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে ভাবজগতে আদানপ্রদান ও মিলনের পথ উন্মুক্ত করবে—এ শিক্ষাব্যবস্থায় তার কোন স্থানই নেই। ভারতবর্ষে ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা কোন মহৎ উদ্দেশ্যই সাধন করেনি। উপরন্তু এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই হয়ে যায় সঙ্কীর্ণ এবং চাকুরী বা সরকারী অনুগ্রহ ছাড়া তাদের অন্য লক্ষ্য থাকে না।

যুবশিক্ষা পরিষদ—১৮৯১

শিক্ষাবিষয়ে এই অসন্তোষ শুধুমাত্র সমালোচনা ও নিন্দাতেই সীমাবদ্ধ রইল না, নানা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ পেল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে বিসলে সাহেবের সভাপতিত্বে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'যুবগণের উচ্চশিক্ষা পরিষৎ' (Society for the Higher Training of Young Men) স্থাপিত হল। এই সংস্থা অবশ্য পরে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সংস্থাটি শিক্ষাব্যবস্থার মূলগত গলদগুলি দূর করতে বা ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সমাজসেবার ইচ্ছা ও আগ্রহের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়নি।

ভাগবৎ চতুষ্পাঠী—১৮৯৫

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সতীশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য ভবানীপুর অঞ্চলে ভাগবৎ চতুষ্পাঠী স্থাপিত করলেন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন আদর্শানুযায়ী ছাত্রদের জীবন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা। অবশ্য সেই সঙ্গে দেশের প্রয়োজনানুসারে যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়াও এর একটা উদ্দেশ্য ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপিত করে ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপোষক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এইভাবে লেখা ও কাজের মধ্যে দিয়ে যখন ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে তখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) ও লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের অগ্রগতি ও ক্রমবিস্তারের পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অন্যতম সদস্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে স্বকীয় মত প্রকাশ করে শিক্ষাকে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কমিশনের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে শুধুমাত্র শিক্ষার মান উন্নত করলেই চলবে না, শিক্ষার ভিত্তিকেও প্রশস্ত করতে হবে।

ডন সোসাইটি—১৯০২

কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পেলে দেশের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ উত্থিত হল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হতে লাগল। সতীশচন্দ্র এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার ও ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগানোর জন্য ডন সমিতি স্থাপন করলেন। এই ডন সমিতিই (১৯০২-১৯০৭) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯০৪

সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করালেন। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। কয়েকজন বিখ্যাত ইউরোপীয় চিন্তাবিদও এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল—প্রথমত, এতে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে গেল এবং শিক্ষা বিস্তারের পথে দুরপনেয় বাধার সৃষ্টি করা হল।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা কারিগরি কোন ক্ষেত্রেই ছাত্রদের সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জনের কোন ব্যবস্থাই এই আইনে ছিল না। উপরন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজীতে পাশের নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষায় অধিকতর ছাত্রের অসাফল্যের ব্যবস্থা করা হল।

তৃতীয়ত, এর ফলে অর্ধশিক্ষিত তরুণের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলবে এবং তারা সমাজের পক্ষে হয় অপ্রয়োজনীয় নয় বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

চতুর্থত, বিরাট সংখ্যক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে ছাত্রের অভাবেই বেসরকারী কলেজগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

বঙ্গভঙ্গ—১৯০৫

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন যখন বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করলেন তখন সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ আত্মপ্রকাশ করল। এই বয়কট আন্দোলনের অঙ্গ রূপে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। এম-এ, পি-আর-এস'র পরীক্ষার্থী কয়েকজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বয়কট করলেন। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিল। তাঁরা এই প্রতিবাদ আন্দোলনের একেবারে পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

বয়কট আন্দোলন ও কার্লাইল সার্কুলার

দেশের এই বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য ও আন্দোলন দমন করবার জন্য সরকার নানা নির্যাতনমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। ছাত্র সমাজকে দমন করবার জন্য তৎকালীন বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী কার্লাইল সাহেব সমস্ত জেলা শাসকদের কাছে এক গোপন নির্দেশনামা পাঠালেন। এর নাম কার্লাইল সার্কুলার। এই নির্দেশনামায় ছাত্রদের রাজনৈতিক সভায় বিশেষ করে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হল এবং জানান হল যে দেশের শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে তাদের কঠোর দণ্ডবিধান করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি দেশবাসীর আত্মসম্মান ও জাতীয়তাবোধের উপর দৃঢ়ভাবে আঘাত করল। এটিকে সকলে 'ক্ষতিকর ও অপমানজনক দলিল' আখ্যা দিলেন এবং এটিকেই উপলক্ষ্য করে দেশের সমস্ত শক্তি যেন একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে গর্জন করে উঠল।

ইতিমধ্যে বয়কট আন্দোলনের ফলে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে একটি দাঙ্গা হয় এবং কয়েকজন ছাত্র তাতে অংশ গ্রহণ করে। তৎকালীন জনশিক্ষা আধিকারিক পেডলার ঐ সব কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে নোটিশ দিয়ে কেন ঐ সব ছাত্রদের কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হবে না, তার কারণ জানতে চাইলেন।

কার্লাইলের এই নির্দেশনামার পর পেডলারের পত্র যেন বিক্ষোভ-বহ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল।

এই সময় স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাবী প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এই মনোভাব প্রথম প্রকাশ পেল টেলিগ্রাফ পত্রিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের একটি পত্রে। ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

বিজ্ঞপ্তি-বিরোধী সমিতি

ছাত্রবিক্ষোভ যখন ধীরে ধীরে ব্যাপক রূপ লাভ করছে তখন রংপুরে একটি ঘটনায় এই অসন্তোষ একটি গঠনমূলক পথে প্রবাহিত হবার সুযোগলাভ করল। রংপুরের জেলা শাসকের গোপন নির্দেশে রংপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের এক নোটিশ দিয়ে বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন এবং জানালেন যে আদেশভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। এই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা স্কুলের ও কারিগরি স্কুলের ছাত্ররা অবিলম্বে আদেশ অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক সভায় যোগদান করল। কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ছাত্রদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা জরিমানা করলেন এবং জরিমানা না দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যোগদান নিষিদ্ধ করে দিলেন। অভিভাবকেরা জরিমানা দিতে অস্বীকার করলেন। সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হল এবং একটি বিজ্ঞপ্তি-বিরোধী- সমিতি গঠিত হল। নব গঠিত এই সমিতির প্রতিনিধিরা রংপুরে এসে উপস্থিত হলেন। রংপুরে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিজ্ঞপ্তি-বিরোধী-সমিতির যুক্ত উদ্যোগে সাধারণ কারিগরি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। রংপুরের জনসাধারণ ভারতের নতুন ইতিহাসের সূচনা করলেন।

শিক্ষা সম্মেলন—১৯০৫

এদিকে মাদারিপুর (ফরিদপুর), ঢাকা, বর্ধমান, হুগলী, রাণীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা), বানারিপড়া (বরিশাল) সর্বত্র ছাত্র নির্যাতন চলতে লাগল। দেশের নেতারা প্রথমাবধিই ছাত্রদের প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন এবং সভাসমিতি ও নানাবিধ প্রকাশনের মাধ্যমে সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই-সময় বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য আন্দোলন ব্যাপক-রূপে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শ্রীআশুতোষ চৌধুরী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের কাছে

গঠনমূলকভাবে ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে পরিচালিত করবার জন্য আহ্বান জানান। শ্রীচৌধুরীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জাতীয় নিয়ন্ত্রণেও জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগবি শিক্ষা দেবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপন করবার প্রস্তাব গৃহীত হল। এই পরিষৎ গঠনের জন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ ও ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা দান করলেন। এই উদ্দেশ্যে আরও দান সংগৃহীত হল। দেশের এই জাতীয়-শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পরিচালিত ডন সমিতি ও ডন পত্রিকাব ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় শিক্ষার আগ্রহকে যথাযথ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান স্মরণীয়। বস্তুত তিনিই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ—১৯০৬

শিক্ষাসম্মেলনের প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য প্রথমে একটি সাময়িক শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হয়। দেশের বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও শিক্ষা নায়কবৃন্দ এ সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন। অবশেষে এ সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা রচিত হল ও শিক্ষা সম্মেলনেব প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হল। বিরানব্বই জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পবিষৎ ১৯০৬ সালের ১২ই মার্চ গঠিত হল। পরিষদের উদ্দেশ্য হল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং জাতীয় আদর্শে ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

পরিষদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে বলা হল সাধারণত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে, তবে ইংরাজী অবশ্য পাঠ্য থাকবে। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে মাতৃভাবায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শরীর চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হবে ও ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা এবং ছাত্রদের মনে দেশপ্রেম ও সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য প্রত্যেককে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হবে। স্বদেশের সঙ্গে ছাত্রদের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে এবং তাদের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এর সঙ্গে মনের বিস্তৃতি ঘটাবার জন্য প্রাচ্যদেশের শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

ছাত্রদের বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া হবে। দেশের ব্যবহারিক উন্নতি ও প্রয়োজনের জন্য যে ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। কারও ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত না দিয়ে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কঠোর ভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে।

বঙ্গীয় কারিগরি শিক্ষালয়

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হল বটে, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় কার্যক্রম নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দিল। এ সম্পর্কে চরমপন্থীদল বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট ও সর্বস্তরে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মধ্যপন্থীরা কেবলমাত্র কারিগরি শিক্ষার জাতীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। প্রথম দলের পুরোভাগে ছিলেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবোধ মল্লিক ও ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। দ্বিতীয় দলের পুরোভাগে ছিলেন তারকনাথ পালিত, মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নীল রতন সরকার ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হলে এই দুই দল পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। মধ্যপন্থীরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন পরিষৎ (Society for the Promotion of Technical Education) নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করলেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠান বিপরীত মতবাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও দুটি একেবারে বিচ্ছিন্ন সংস্থা ছিল না। রাসবিহারী ঘোষ উভয় সংস্থারই সভাপতি ছিলেন এবং অনেকে উভয় সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কারিগরি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পরিচালিত বিদ্যালয়টির নাম হল বঙ্গীয় কারিগরি শিক্ষালয় (Bengal Technical Institute)

বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়

জাতীয় পরিষদের প্রথম কাজ হল বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয় স্থাপন করা। ১৪ই আগষ্ট টাউনহলে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন হয়। ১৫ই আগষ্ট থেকে বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটি ভাড়া বাড়ীতে জাতীয় কলেজ ও স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রধান কর্মসচিব হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলেজটির তিনটি বিভাগ ছিল : কলা বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগ ও কারিগরি বিভাগ।

সুযোগ্য ও সুদক্ষ শিক্ষকদের অধ্যাপনায় জাতীয় পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কলেজ ও স্কুলের অগ্রগতি অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলল। কলেজটির বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১। কলা বিভাগ

কলা বিভাগের পাঠ্য বিষয় ছিল : ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য। শুধুমাত্র লিখন পঠনই নয়, বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রদের মনে বিদ্যাচর্চা ও পঠিত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিও এর উদ্দেশ্য ছিল। কলেজের পাঠক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক তৎকালে পাওয়া যেত না। সে জন্য ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই অসুবিধা ছিল প্রচুর। তাই শিক্ষকবৃন্দ কলেজে অধ্যাপনা করেই ক্ষান্ত থাকতেন না। তাঁরা উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য মৌলিক গবেষণাতেও ব্যাপৃত থাকতেন। বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চা এই বিভাগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই কলেজের অধ্যাপকদেরই প্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের নিয়মিত চর্চা সুরু হয়ে যায়।

২। বিজ্ঞান বিভাগ

ছাত্রদের জীবনে ও কর্মে নতুন নতুন গঠনমূলক বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেবার জন্যই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞান বিভাগকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই তিনটি অংশ হল—প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জীবতত্ত্বমূলক। বৈজ্ঞানিক বিভাগে শিক্ষা দেওয়া হত তিনটি পর্যায়ে, তত্ত্বমূলক (Theoretical), প্রয়োগমূলক (Experimental) ও উৎপাদনমূলক (Manufacturing)।

কলেজের প্রাকৃতিক বিভাগটি বিশেষ উন্নত হয়ে উঠেছিল। এর পরীক্ষাগার ছিল প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির দ্বারা সমৃদ্ধ। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক জগদিন্দ্রনাথ রায়। পদার্থবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে তিনি বিদেশে সম্মান লাভ করেছিলেন। কলেজের রাসায়নিক ও জীবতত্ত্বমূলক বিভাগ দুটিও ছিল সুগঠিত।

৩। কারিগরি বিভাগ

কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হত দ্বিবিধ উপায়ে। তত্ত্বমূলক ও 'প্রয়োগমূলক শিক্ষার মাধ্যমে। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে

ক্লাশেপড়ান ও তত্ত্বমূলক শিক্ষা দেওয়া হত। প্রয়োগমূলক শিক্ষা দেওয়া হত কলেজের কাঠের কাজ, লোহার কাজ, ঢালাইয়ের কাজ, যন্ত্রপাতি চালানোর গবেষণাগারে। এ বিভাগের প্রত্যেক ছাত্রকেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ক্লাশ করতে হত ও গবেষণাগারের কাজে যোগদান করতে হত। যন্ত্রপাতিমূলক অঙ্কনও পরিষদের সপ্তম মান পর্যন্ত কারিগরি বিভাগের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উৎপাদনমূলক বিভাগ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্থাপিত হয় এবং কর্মীদের সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিচালনায় এটি দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। কলেজের এই বিভাগে প্রস্তুত জিনিষপত্র অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বহু সংস্থা কলেজের ছাত্রদের দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত করিয়ে নিতে থাকে।

দেশে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টির জন্য কলেজের গবেষণাগার ও যন্ত্র-ঘরে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির কয়েকটি প্রদর্শনী কলেজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। এই প্রদর্শনীতে ১০৮টি বস্তু প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীটি সর্বস্তরের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। এমন কি ষ্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যানের মত ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকাগুলি পর্যন্ত প্রদর্শনীর সুখ্যাতি করেছিল। এছাড়া বিশিষ্ট বিদেশীরাও এর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। এই প্রদর্শনীটিও দেশী-বিদেশী দর্শকমহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে বঙ্গীয় পাঠাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে জাতীয় কলেজ আর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয়

রংপুরের জাতীয় বিদ্যালয় হল বাংলা দেশের সর্বপ্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। এর পরে স্থাপিত হয় ঢাকার জাতীয় বিদ্যালয়টি। এ দু'টি ছাড়া বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় যে সব জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেগুলি সবই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শের অনুসরণে গঠিত। কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিত স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল: রংপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, মাঝপাড়া, খুলনা, শ্রীহট্ট, মালদহ, যশোহর, শান্তিপুর, নোয়াখালি, জলপাইগুড়ি ও কামারগ্রাম। এ সবগুলিই ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রথম দশটি

ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং অর্থ-সাহায্যপ্রাপ্ত। এগুলি ছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়া, আরও অনেকগুলি জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলার বাইরে জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় শিক্ষার আদর্শ শুধুমাত্র বাংলা দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বাংলার বাইরে জাতীয় শিক্ষার প্রধান সমর্থক ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক ও লালা লাজপৎ রায়। ক্রমশ এই আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জেলা সম্মেলনের মাধ্যমে এই আন্দোলন বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দুটি মাধ্যমিক ও অনেকগুলি প্রাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় দুটির প্রথমটি হল তেলিগাঁও-ধাভাধার সমর্থ (পুণা জেলা) বিদ্যালয় আর দ্বিতীয়টি হল পুণার মহারাষ্ট্র বিদ্যালয়।

অন্ধ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদ—১৯০৯

বাংলার জাতীয় শিক্ষাপরিষদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্ধ্রদেশের মসলিপট্টমে অন্ধ্রজাতীয় বিত্তাপরিষৎ গঠিত হল। এঁদের প্রচেষ্টায় অন্ধ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও অন্ধ্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে রাজমহেন্দ্রীতে মাধ্যমিক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা নামে মসলিপট্টমে একটা আদর্শ জাতীয় কলেজ স্থাপিত হল।

বেরার প্রদেশের এওমেল জেলার সদরে এওমেল জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উত্তর প্রদেশেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এই প্রদেশের প্রথম জাতীয় বিত্তালয় স্থাপিত হয় এলাহাবাদে। এর নাম হল অযোধ্যানাথ জাতীয় উচ্চ বিত্তালয়।

বিশেষ বক্তৃতা ও বিশিষ্ট দর্শক

ক্লাশের নিয়মিত বক্তৃতা ছাড়া ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কলেজে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হত। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে

কলেজে বক্তৃতা করে যেতেন। এ ছাড়া দেশী বিদেশী কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও নেতা কলেজ পরিদর্শন করে এর উচ্চ প্রশংসা করেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উন্নতি লাভ করে বিরাট প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ও বাংলার বাইরেও তার কর্মসূচী বিস্তৃত হয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন সমিতি জনগণের মনে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আর কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন সমিতির উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষা দেওয়া। উদ্দেশ্যের এই পার্থক্য নিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি কাজ করে চলছিল। অবশেষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এ দুটি একত্রে মিলিত হয়ে যায়। সর্ত হল এই যে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের নাম হবে বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ (Bengal National College) এবং প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের নাম হবে বঙ্গীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠান (Bengal Technical Institute)। এই দুটি বিভাগ জাতীয় পরিষদের অধীনে দুটি পৃথক সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে।

ডন পত্রিকা, ১৮৯৭—১৯১৩

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার অঙ্গ হিসাবে ধর্ম ও দর্শনের নবতর আলোচনা সুরু হয়। তারই অন্যতম মুখপত্র হিসাবে ডন পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। প্রথমে ডন ছিল ভাগবৎ চতুষ্পাঠীর মুখপত্র। ক্রমে সেটি হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র। ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও তার শেষজীবন পর্যন্ত প্রাণকেন্দ্র হয়েছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উদ্দেশ্য ছিল, ডনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম ও দর্শন আলোচনার মাধ্যম রূপে গড়ে তোলা। জাতীয়তা ও বিশ্বমানবিকতার সমন্বয়ে এর এক নতুন আদর্শ স্থাপন করা।

ডনের বিবর্তনের ইতিহাসকে তিনটি বিশিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে ১৮৯৭-১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডন পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রকাশিত হত। ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করা ছিল এর কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ। এই পর্যায়ে এ সমস্ত ছাড়া বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীও প্রকাশিত হয়েছিল।

ডন ক্রমে ক্রমে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সুনাম প্রতিষ্ঠা করে

নেয়। বাংলা সরকার সমস্ত সরকারী কলেজের জন্য নিয়মিত ডন ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলে ডন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং সমসাময়িক চিন্তাধারার ওপর ডনের প্রভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়—ভারতের অন্যান্য অংশে ও ভারতের বাইরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও জার্মানিতে ডন পত্রিকা প্রচার লাভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯০৪—১৯০৭) ডন সোসাইটির মুখপত্র রূপে ডন প্রকাশিত হতে থাকে। ভাগবৎ চতুষ্পাঠী তখন উঠে যায়। এই পর্যায়ে ডন সোসাইটির শিক্ষা-আন্দোলনের মুখপত্র ছিল ডন। এ পর্যায়ে পত্রিকার আদর্শ ছিল যে দেশকে ভালবাসতে হলে দেশকে জানতে হবে। এই সময় পত্রিকাটির তিনটি বিভাগ ছিল, যথা ইণ্ডিয়ানা, টপিকস্ ফর ডিসকাসান ও শিক্ষার্থী পর্যায়।

ইণ্ডিয়ানা অংশে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও তাদের অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। এই অংশে ভারততত্ত্ব সম্পর্কে অনেক অমূল্য রচনাবলী প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশ টপিকস্ ফর ডিসকাসানে প্রকাশিত আরজনৈতিক জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হত। পাঠকদের মতামতও এই সঙ্গে স্থান লাভ করত। পরবর্তীকালে এই অংশে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হত। তবে এজন্য সম্পাদক দায়ী থাকতেন না। তৃতীয় অংশ অর্থাৎ শিক্ষার্থী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নানা আলোচনা প্রকাশিত হত।

পত্রিকার তৃতীয় পর্যায়ে (১৯০৭-১৯১৩) ডন সোসাইটির আর অস্তিত্ব ছিল না। এই সময় ডন পত্রিকা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপত্ররূপে দেখা দিল। এবং স্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর আন্দোলনের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ডন সোসাইটি—১৯০২-১৯০৭

জাগ্রত জাতীয়তাবোধই ছিল ডন সোসাইটির মূল ভিত্তি। তাই ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করে তাদের দেশের কর্মীরূপে গড়ে তোলাই ছিল ডন সোসাইটির আদর্শ।

ডন সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্র গঠন করা। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে তাদের আত্ম-সচেতন করে তোলা।

ডন সোসাইটি অবস্থিত ছিল মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের গৃহে। এর স্থায়ী সাভাপতি ছিলেন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। কর্ম-সচিব ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ডন সোসাইটিতে সপ্তাহে দুটি ক্লাশ হত, একটির নাম ছিল সাধারণ শিক্ষণ ক্লাশ আর দ্বিতীয়টির নাম ছিল নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষণ ক্লাশ। ছাত্রদের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হত এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হত। এই আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্বাধীন স্ফূরণ ও স্বাধীন চিন্তাধারার জন্ম সম্ভব হত। সোসাইটির আলাপ সভাটিও একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। এই সভায় ছাত্ররা ছাড়া বহিরাগত ব্যক্তিরাও অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। তাছাড়া সোসাইটিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হত এবং ছাত্ররা তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনা করত।

পরবর্তীকালে সোসাইটির কারিগরি বিভাগের পত্তন করা হলে আদি বিভাগটির নাম হয় সাধারণ বিভাগ। সোসাইটির কারিগরি বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিল্পসমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করা ও সে সম্পর্কে গঠনমূলক কাজের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারিত করা ও তাদের দেশকর্মী করে গড়ে তোলা সোসাইটির প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। তাই যখন দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলনের জোয়ার এল তখন ডন সোসাইটির সদস্যেরা এই আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগদান করলেন। ডন সোসাইটির প্রভাব দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ডন সোসাইটি বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের পীঠস্থানে পরিণত হল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব

স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে সত্যকারের দেশপ্রেম জাগাতে হলে তাদের বিদেশী ছাঁচে গড়া এবং বিদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষা দিলে চলবে না। এ সত্যের উপলব্ধিই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। দেশনায়কেরা বুঝলেন যে জাতির শিক্ষাকে জাতির নিজস্ব আদর্শ, কৃষ্টি ও ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল যত না গভীর হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এর পরোক্ষ ফল। প্রচলিত সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা ও সংস্কারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং কারিগরি শিক্ষার বিস্তারের পরিকল্পনা এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন থেকেই প্রসূত হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রেরণাতেই পরবর্তী যুগে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠল। বহু জাতীয় নেতা এবং দেশপ্রেমিক মনীষী জাতীয়তাধর্মী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুললেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংগঠন ও আদর্শের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য থাকলেও অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও নীতির দিক দিয়ে এগুলির মধ্যে প্রচুর মিল ছিল।

এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য আশ্রম। ভারতের নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাধর্মী ভাবধারাকে শিক্ষায় রূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে পরে পাঠভবন এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের সেই শিক্ষা প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতী নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে।

জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার আর একটি শাখারূপে দেখা দেয় আর্যপ্রতিনিধি সভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল। বৃন্দাবন এবং হরিদ্বারে দুটি গুরুকুল স্থাপিত হয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শে গুরুশিষ্যের প্রীতিময় সম্পর্কের উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আশ্রম জীবনের আধ্যাত্মিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা গড়ে তোলাই গুরুকুল শিক্ষার লক্ষ্য।

এই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে ব্রতী হন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার পরিকল্পনা গঠন করেন। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রচেষ্টা ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে।

গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটিকেও এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বর্ণনা করা যায়। এই শিক্ষাপরিকল্পনাটিও জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত জীবনযাপন, ভারতের নিজস্ব কৃষ্টি ও ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর শিক্ষাব্যবস্থাটি পরি-

কল্পিত। এই শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষাকেই একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে এবং ইংরাজী শিক্ষাকে একেবারে বাদই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই শিক্ষাব্যবস্থাটি ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সংগঠন রূপে গ্রহণ করেছেন।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পরোক্ষ ফল বলে বর্ণনা করা যায়। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাতে হলে তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সর্বপ্রথমে প্রয়োজন—এই সত্যের উপলব্ধিই গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ জননেতাদের বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন সুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৯—১৯২০ সালে বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল কারিগরি ও যন্ত্রমূলক শিল্পশিক্ষার অগ্রগতি। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রচেষ্টায় যাদবপুরে যে কারিগরি ও যন্ত্রশিল্পের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় সেটি স্বাধীনতালাভের পর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গঠিত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ জাতীয় নেতা ডাঃ জাকীর হোসেনের প্রতিষ্ঠিত জামিয়া মিলিয়া নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই আর একটি অবদান। ভারতের মুসলিম আদর্শ ও ঐতিহ্যের অনুকরণে জাকীর হোসেন এই মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রটি গঠন করেন। বর্তমানে এটিও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আন্দোলনটি জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন থেকেই প্রসূত। এই আন্দোলনের ফলেই আজ ভারতে মাধ্যমিক ও স্নাতকস্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। এমন কি বর্তমানে উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তরেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার চেষ্টা চলছে।

এ ছাড়াও জাতীয় শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ আরও অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে গঠিত হয়। সবগুলিরই আদর্শ ছিল ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য ও চিন্তাধারায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা। পরবর্তীকালে অবশ্য এই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে আসে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও আদর্শের আবেদন শিক্ষাব্রতীদের কাছে একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি। তার ফলে

স্বাধীনতা লাভের পর সর্ববিধ শিক্ষাপ্রচেষ্টায় ভারতের নিজস্ব ও ঐতিহ্য ও ভাবধারা সগৌরব স্থান লাভ করেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the national movement in Education in India. (B. T. 1964, 1966)

2. Describe the origin, development and activities of the National Education Council.

এক

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

ভারতে ইংরাজশাসনে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস দেড়শত বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন অবহেলা ও বিশৃঙ্খলার কাহিনী। এই সুদীর্ঘ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান ও প্রসার সব দিক দিয়ে তীব্র সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি স্বাধীন ভারতে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা এখনও সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষার এই অসন্তোষজনক ইতিহাসের কারণ হল কতকগুলি সমস্যা ও প্রতিবন্ধক। আমরা নীচে সেগুলির আলোচনা করব।

১। **অর্থের অভাব :** প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলোর উপর অর্পিত হলেও তাতে সত্যকার প্রাথমিক শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নি। তার প্রধান কারণ হল যে এই স্থানীয় সংস্থাগুলিকে অর্থ সরবরাহের কোন সুব্যবস্থা করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ছাড়া এই গুরুদায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষে বহন করা দুষ্কর। রাজ্য সরকারেরা সাধারণত মৌখিক সহানুভূতির বেশী অগ্রসর হননি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যও খুব কমই পাওয়া গেছে। এই অবস্থায় স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সত্যকারের কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় সংস্থাগুলি চিরকালই অবহেলিত ও অনাদৃত হয়ে কাটিয়েছে এবং যা অর্থসাহায্য পেয়ে এসেছে তা নিতান্তই নগণ্য ও প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপর্যাপ্ত।

বৃটিশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার নীতিও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির পক্ষে কম ক্ষতিকর হয়নি। তখন সরকারের দৃষ্টি প্রধানত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে উপরের স্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই নীচের স্তর স্বভাবত তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করবে। তাঁরা তাঁদের এই নীতিকে 'নিম্নগামী পরিস্রুতির মতবাদ' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এ তত্ত্বটি যে একান্ত ভুল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার

শিক্ষক সম্বলিত অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তির মুখে। নিম্নলিখিত তালিকাটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

এক-শিক্ষক-সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়

বৎসর	বিদ্যালয়
১৯৫০-৫১	৬৪,৮৪১
১৯৫১-৫২	৭১,৩৬২
১৯৫২-৫৩	৭৫,২১৪
১৯৫৩-৫৪	৮৬,০৩১
১৯৫৪-৫৫	১০১,৩৪২
১৯৫৫-৫৬	১১১,২২০
১৯৫৭-৫৮	১,২৩,২৪৮

সবশেষ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে দেশের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ৪১·৩ শতাংশ হল এক শিক্ষক সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে একজন মাত্র শিক্ষক সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা হল মোট ছাত্রসংখ্যার ১৮·০%।

৩। **অনুপযোগী পাঠক্রম:** প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠক্রম প্রকৃতপক্ষে নীরস ও সংকীর্ণ। এই পাঠক্রম যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে এটি প্রধানত হয়ে পড়েছে সাহিত্যধর্মী এবং এই পাঠক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্রই রচিত হতে পারে নি। ভারতের শতকরা ৮০ ভাল লোক গ্রামে বাস করে অথচ এই পাঠক্রমে গ্রামময় ভারতের কোন সমস্তা এপর্যন্ত স্থান লাভ করেনি। শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রধানত পুঁথিগত ও তত্ত্বগত এবং শিক্ষা এত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক প্রকৃতির যে অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন আস্থা বা উৎসাহের সৃষ্টি হতে পারে নি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হবে সক্রিয়তা-ভিত্তিক এবং শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার অনুকূল ও উপযোগী। এই স্তরে শিশু তার জীবনের প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে। সেদিক দিয়ে প্রচলিত পাঠক্রম একেবারে হতাশাব্যঞ্জক। সামান্য কতকগুলি তত্ত্বমূলক জ্ঞানদান ছাড়া এই পাঠক্রমে অন্য কোন শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন নেই। সাম্প্রতিককালে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তরভুক্ত করায় এই দোষ অনেকাংশে দূর হলেও পাঠক্রম যে আদর্শস্থানীয় হয়েছে একথা বলা

চলে না। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এ বিষয়ে কিছুটা মনোযোগী হয়েছেন এবং প্রাথমিক স্তরের শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষায় সক্রিয়তা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন।

৪। **অপচয় (Wastage) :** শিশু প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষ পর্যায়ে পৌঁছবার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেলে তাকে অপচয় বলে অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করা পর্যন্ত শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাখাটা একান্ত প্রয়োজন, কেননা মধ্যপথে পাঠগ্রহণ ছাড়লে যতটুকু পাঠগ্রহণ করা হয়েছে তা নিরর্থক ও নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অপচয় এখনও প্রভূত পরিমাণে হয়ে থাকে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশকারী প্রতি একশত জন ছাত্রের মধ্যে ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ষাটজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েছিল, ১৯৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে একান্নজন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েছিল এবং ১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র তেতাল্লিশ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছিল। অপচয়ের প্রধান কারণ হল একজন মাত্র শিক্ষক সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও [illegible]ক দিয়ে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা। বিদ্যালয়ের ভাঙ্গা ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র সাজসরঞ্জামের অভাব, এবং সর্বোপরি নীরস ও অবসন্নকর পরিবেশ শিশুর মনে শিক্ষার প্রতি কোন আকর্ষণই সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে শিশুর মনে বিদ্যালয় পরিত্যাগে কোন বাধা অনুভূত হয় না। নিরক্ষরতা দূর কবতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষার কোন মূল্যই থাকে না এবং দেখা গেছে যে কমপক্ষে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করলে স্থায়ীভাবে অক্ষরজ্ঞান জন্মায় না। আমাদের দেশে এই শিক্ষাগত অপচয় এত বেশী যে শতকরা ৫৭ ভাগ ছাত্রই চার বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে উঠতে পারে না এবং তার ফলে এই ৫৭ ভাগ ছাত্রের নিরক্ষরতা পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। এদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বা শ্রম কিছুরই কোন মূল্য থাকে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে ব্যয়িত অর্থের অধিকাংশই এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা নিষ্ফল হয়ে পড়ে এবং বিদ্যালয়গুলি অক্ষম ও অযোগ্য হয়ে ওঠে। এই অপচয় বন্ধ না হলে আমাদের দেশে কোন প্রকারের শিক্ষা সংস্কারই সফল হয়ে উঠতে পারবে না।

৫। **অনুন্নয়ন (Stagnation) :** পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার দরুণ একই ক্লাশে একাধিক বছর পড়ে থাকার নামই অনুন্নয়ন। অনুন্নয়ন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুতর ত্রুটি। বোম্বাই বাদে সমগ্র ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রত্যেক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ফল পরের পাতায় তালিকায় দেওয়া হল।

প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে শ্রেণীগত উন্নয়নের হার

শ্রেণী	গড়ে পাশের হার ১৯২৭-২৮ থেকে ১৯৩৫-৩৬	গড়ে পাশের হার ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৪৪-৪৫
১ম	৪৮·০২	৫১·৮৩
২য়	৬৯·০৯	৬৮·৯১
৩য়	৬৫·৪৫	৬৮·৮৭
৪র্থ	৬৬·৩০	৭০·১৭
৫ম	৫৯·৪৭	৬৫·৭০

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে প্রতি বৎসর শতকরা আনুমানিক ৩০ থেকে ৫০ জন ছাত্র পুরোন ক্লাশে আটকে থাকে। প্রথম শ্রেণীর অবস্থাটাই সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক। প্রতি বৎসর প্রায় অর্ধেক ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে আটক থাকে।

অনুন্নয়ন ছাত্র ও অভিভাবক উভয়ের পক্ষেই বিশেষভাবে ক্ষতিকর। এতে অর্থ, সময় ও শক্তি সমস্ত কিছুরই অপব্যয় ঘটে থাকে। অনুন্নয়নের ফলে প্রচুর পরিমাণে অপচয়ও ঘটে থাকে ·কারণ ক্রমাগত অনুন্নয়ন ঘটতে থাকলে বহু ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার সুযোগ জীবনের মত শেষ হয়ে যায় বা বিরক্ত হয়ে শিক্ষার্থীও লেখাপড়া ছেড়ে দিতে পারে। বিদ্যালয়গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলা কিন্তু অনুন্নয়নের ফলে এই উদ্দেশ্য অর্ধেকের উপরই ব্যর্থ হয়ে যায়।

স্বাধীন ভারতেও এই অনুন্নয়ন দূর করার বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি এবং গতানুগতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় অনুন্নয়নের হার প্রায় একই রকম আছে। শিক্ষার মানকে উন্নত করা, শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের অন্যান্য প্রতিবন্ধক দূর করা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে অনুন্নয়নের হার কমবে না।

৬। **স্কুলবাড়ী, সাজসরঞ্জাম, স্থান, পাঠ্যপুস্তক:** প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহসমস্যা একটা প্রধান সমস্যা। বিদ্যালয়ের জন্য নির্মিত বাড়ী বা সরকারের ও স্থানীয় সংস্থার নিজস্ব বাড়ী খুবই কম। প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠরত ছাত্রদের মাত্র শতকরা ত্রিশ ভাগ এই রকম বাড়ীতে জায়গা পেতে পারে।

এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়গুলি ভাড়া করা বা বিনা ভাড়ায় পাওয়া বাড়ীতে অবস্থিত। এই সমস্ত বাড়ীগুলির বেশীর ভাগই অস্বাস্থ্যকর এবং সেখানে আলো বা হাওয়া কোনটাই উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। এক কথায় বিদ্যালয়ের পক্ষে এই গৃহগুলি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পশ্চিমবাংলার গ্রামের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতিতে বসে থাকে। দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হয় গ্রামের চৌপালে অবস্থিত, নয় একটি গাছের নীচে বসে। মহীশূরের ১০,৪৭৪টি বিদ্যালয়ের ৫,১৮০টি চতরাম ও চাবাদীগুলিতে এবং রাজস্থানের বহুসংখ্যক বিদ্যালয় মন্দির ও ধর্মশালায় বসে থাকে।

৭। **ত্রুটীপূর্ণ পরিশাসন:** দেখা গেছে, অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ পরিশাসনের ভার স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত। রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব পালন করেন না। অধিকাংশ স্থানীয় সংস্থাই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করে না। কতক ক্ষেত্রে এই সব সংস্থার এই গুরু দায়িত্ব বহন করাব ক্ষমতাই নেই—এই সব কারণে স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার খুব একটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, শিক্ষাকর ধার্য করবার দায়িত্বও স্থানীয় সংস্থার উপর দেওয়া আছে বটে কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের কথা ভেবে এবং জনসাধারণের বিরক্তি সৃষ্টির ভয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা নূতন কর বসাতে সব সময় সাহসী হন না। এমন কি যে সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি।

সম্প্রতি বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনটিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করবার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অগ্রণী হয়েছেন। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার জন্য ৬৮৭,৪২১টি নোটিশ এবং অনুপস্থিত ছাত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হবার জন্য ২৪০,৪৫০টি আদেশপত্র অভিভাবকদের কাছে পাঠান হয়েছে। বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করবার ও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হবার অপরাধে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ধরনের অপরাধের জন্য যথাক্রমে ৩৯,৫১৪ ও ৫৭,১৪৬ জন দণ্ডিত হয়েছে। আদেশ অমান্য করবার অপরাধে ২৩,২৬৯ টাকা জরিমানা-স্বরূপ আদায় করা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রয়োগ করবার জন্য ৯৮১ জন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন।

কিন্তু স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সর্বদা সম্ভব হয় না। স্থানীয় সংস্থার নির্বাচিত সদস্যরা অভিভাবকদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

অবলম্বন করে জনপ্রিয়তা হারাতে চান না। বাধ্যতামূলক আইনগুলি সাধারণভাবে গোখেলের বিলের অনুসারে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে প্রস্তুত হয়েছিল। আজকে সাধারণ অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হলেও এ আইনগুলি অপরিবর্তিতই আছে। ফলে বর্তমানের সমস্যার কোন সমাধান এই বিলগুলি থেকে পাওয়া যায় না। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ঠিকমত যোগ দিচ্ছে কিনা দেখাব জন্য উপস্থিতি আধিকারিক (Attendance Officer) নিযুক্ত হয়েছেন কিন্তু তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে জনসাধারণের সমস্যা ও সুবিধা-অসুবিধাগুলি বিবেচনা করেন না। এই সব কর্মচারীরা সাধাবণত তাঁদের কাজ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও শিক্ষাবর্জিত। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় তাঁদের সংখ্যাও খুব কম। স্থানীয় সংস্থাগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে একেবারেই অনিচ্ছুক এবং দণ্ড দিলেও অতি সহজেই দণ্ড মকুব করা হয়ে থাকে। বাধ্যতামূলক আইনে আইনভঙ্গকাবীদের বিচার কবার ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, ফলে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলিতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এমন কোন তত্ত্বাবধান আধিকারিক ব্যবস্থা নেই যিনি প্রাথমিক শিক্ষাব প্রসারের তত্ত্বাবধান করতে ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য কবতে পারেন। এই অসুবিধাগুলি বিবেচনা কবে সার্জেণ্ট বিপোর্টে বলা হয়েছিল যে প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলির হাত থেকে শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করবেন এবং কেবলমাত্র যে সব ক্ষেত্রে সরকার স্থানীয় সংস্থাগুলিকে পরিবর্ধিত দায়িত্ব বহন করবার উপযোগী বলে বিবেচনা করবেন সে সব ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা স্থানীয় সংস্থার হাতে রেখে দিতে পারেন।

উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ পরিদর্শক ও পরিদর্শিকার অভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজও সুশৃঙ্খলভাবে চলে না। গড়ে প্রত্যেক পরিদর্শককে বছরে একশ'র বেশী বিদ্যালয় পবিদর্শন করতে হয়। বস্তুত এত অল্পসংখ্যক কর্মচারী দিয়ে পরিশাসন বা পরিদর্শন কোনটাই সুষ্ঠুভাবে ঘটে উঠতে পারে না।

৮। সরকারী অবহেলা: প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকারী অবহেলা বৃটিশ আমলে অত্যন্ত প্রকট ছিল। তা ছাড়া বৃটিশ শাসনে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ভ্রান্ত নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যেটুকু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতেন কেবল সেটুকু দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই কারণে কোম্পানীর আমলে প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চশিক্ষার উপরই বেশী জোর দেওয়া হত। আর্থিক ও প্রশাসনিক কারণে

বৃটিশ সরকার বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী হন নি বা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কোনরকম উদ্যোগ দেখান নি। এ ব্যাপারে সরকার বরাবরই মৌখিক সহানুভূতিমাত্র দেখিয়ে এসেছেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত হার্টগ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার তাঁর নীতির কিছুটা পরিবর্তন করেন। এই নীতি অনুসারে যোগ্যতা-সম্পন্ন বিদ্যালয়গুলিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করা আর অযোগ্য বলে বিবেচিত বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হল। এর ফলে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গিয়েছিল। নীচের তালিকাটি দেখলে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা (বৃটিশ ভারত)

	১৯৩৭-৩৮	১৯৪১-৪২	১৯৪৬-৪৭
বিদ্যালয়	১৮৯,৬০১	১৮১,৯৬৮	১৭২,৬৬৩
ছাত্রসংখ্যা	১০,৫১৬,৩৫৩	১২,০১৮,৭২৬	১৩,০৩৬,৬৬৫

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক ছিল নিরক্ষর। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে রাজ্যগুলি দশ বৎসরের মধ্যে চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হয় নি। এখন যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আগামী বিশ বছরের মধ্যে যে এ লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হবে এমন কোন আশা দেখা যাচ্ছে না।

এই ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সরকারের আদর্শগত অবাস্তব নীতিই এর জন্য প্রধানত দায়ী। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং রাজ্যসরকারেরাও প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হয়ে অনেক রাষ্ট্রই এখন পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছেন। অর্থনৈতিক সংকটে এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। সরকারও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে অবিলম্বে দেশের সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। এতেই বোঝা যায় যে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা কমই করা হয়েছে।

সুপরিকল্পনার অভাব শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই উপলব্ধি করা যায়। কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করা হয় এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন অপ্রয়োজনের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয় না। ফলে কোথাও বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে একটিও বিদ্যালয় নেই আবার কোথাও হয়তো একই সঙ্গে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হবার ফলে ভয়াবহ প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। বহু ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কম। এমন কি বিদ্যালয়েব অতি নিকটে যারা বাস করে তাদেরও অনেকেই বিদ্যালয় সম্বন্ধে কোন উৎসাহ অনুভব করে না।

৯। অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় অন্তরায়: বাল্যবিবাহ ভারতের সুপ্রাচীন প্রথা এবং কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই প্রথার ফলে বহু বালক-বালিকা স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হত। যদিও এই প্রথা এখন আইন দ্বারা লোপ কবা হয়েছে, তবুও বহু অঞ্চলে এখনো এ প্রথা শিশুশিক্ষার অন্তরায় হয়ে রয়েছে। অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লোকে কোন উৎসাহই বোধ করত না। আজ যে ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা ১২·৮ ভাগ স্ত্রীলোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না এটি তার অন্যতম কাবণ। তবে এ মনোভাব ধীরে ধীবে দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে।

১০। জাতিভেদ প্রথা: প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারেব অন্যতম অন্তরায় হল সুকঠিন জাতিভেদ প্রথা যা আজও শিথিল হয়ে ওঠে নি। উচ্চবর্ণের বহুলোক আছেন যাঁরা নিজেদেব সন্তানদের তথাকথিত নিম্নবর্ণেব সন্তানদের সঙ্গে একই স্কুলে শিক্ষাগ্রহণে রত দেখতে চান না। হরিজন বা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের শিক্ষার প্রতিও কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। গান্ধিজীর আগ্রহ ও নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতা দূর কবার প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। আজ হবিজনদের অধিকার সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তবু পর্বত ও অবণ্যবাসী, দরিদ্র আদিবাসী, ও পার্বত্যজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তাব করা আজও সম্ভবপর হয়নি। এদের কথিত ভাষার বর্ণমালা নেই বা কোন সাহিত্য নেই। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে লোকগণনায় দেখা গেছে যে ভারতের তপশীল জাতিসমূহের লোকসংখ্যা হ'ল ১৯,১১৬,৪৮৯। অথচ এদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয় নি।

১১। প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি: ভাবতবর্ষ নিঃসন্দেহে গ্রামপ্রধান। তাই ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাও প্রধানত গ্রামীণ সমস্যা, কিন্তু বৃটিশ আমলের নগবকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম ও তার সমস্যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিতই রয়ে গিয়েছিল।

গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করার প্রতিবন্ধক অনেক। বিদ্যালয়গুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র, আর্থিক সংকটে জর্জরিত এবং পরস্পর বিছিন্ন। তাছাড়া সেগুলির পরিদর্শনে যাওয়ারও অসুবিধা প্রচুর। শিক্ষকদের চাকুরীর সর্ত কোন দিকদিয়েই আকর্ষণীয় নয়। সর্বোপরি, ছাত্রদের নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত উপস্থিতি সর্বদা ঘটে ওঠে না।

দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, জনবসতি ও পরিবহনব্যবস্থা এ ব্যাপারে বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অঞ্চলে এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে তার ফলে শিক্ষাবিস্তারের সকল প্রকার আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল রয়েছে ২৮০,১৫৯ বর্গমাইল অর্থাৎ দেশের সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলের ২২'১১ শতাংশই জঙ্গল। এর সঙ্গে রয়েছে পর্বতাঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলগুলি। অতীতে এ সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের কোন চেষ্টাই হয় নি। নেফার একটি অঞ্চলে ৩০ হাজার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগে একটিমাত্র বিদ্যালয়ও ছিল না।

ভারতের বহু অঞ্চলে গ্রামগুলি জনবিরল। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুসারে দেশের মোট ৫,৫৮,০৮৯ গ্রামের মধ্যে ৩,৮০,০২০টি গ্রামের লোকসংখ্যা ৫০০ জনেরও কম। যখন গ্রামের লোকসংখ্যা ৫০০ জনেরও কম হয়, তখন সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্কুল স্থাপনা অর্থনৈতিক কারণে সফল হতে পারে না। এ ছাড়া পরিবহন ব্যবস্থা এতই অপর্যাপ্ত যে স্কুলে শিশুরা নিয়মিত যোগ দিতে পারে না। বড় বড় জনাকীর্ণ শহরগুলিতে পরিস্থিতি ঠিক এর বিপরীত। সেখানকার স্কুলগুলি ছাত্রসমাগমে পরিপূর্ণ এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান দাবী-পূরণে একান্ত অক্ষম।

১২। শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অসুবিধা : শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলিও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে প্রভূত বাধার সৃষ্টি করেছে। দুই তৃতীয়াংশ গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। যেখানে বিদ্যালয় আছে সেখানেও শিক্ষণপ্রাপ্ত কি শিক্ষণবর্জিত উভয় প্রকার শিক্ষকেরই একান্ত অভাব। এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয় হল একজন শিক্ষক-সম্বলিত বিদ্যালয়। এ ছাড়া আছে ত্রুটিযুক্ত ও জীবনের সম্পর্কবিহীন পাঠক্রম, অবাস্তব শিক্ষণ পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও গৃহের অভাব।

প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা পাঁচভাগেরও কম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অনেক শিক্ষক শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। অনেকে আবার [illegible]

শিক্ষক আছেন কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই হয় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষণবর্জিত বা শুধুমাত্র সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁরা কোন প্রকারের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ লাভ না করেই যে কোন উপায়ে একটি শিক্ষকতার নিদর্শন পত্র সংগ্রহ করেছেন।

১৩। **অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবহেলা:** নিজের সন্তানকে শিক্ষাদানের উপযোগিতা এখনও অনেক অভিভাবক উপলব্ধি করেন না। কোন কোন অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে রীতিমত আশঙ্কা বোধ করেন। শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার পথে দুরূহ বাধা হল বয়স্ক জনমণ্ডলীর এক বিরাট অংশের নিরক্ষরতা। অথচ বয়স্ক শিক্ষাদানেরও কোনও ব্যাপক আয়োজন করা এখনো সম্ভব হয়নি। শিশু নিজ-গৃহে যে নিরক্ষরতার পরিবেশে প্রতিপালিত হতে থাকে, কিছুটা শিক্ষাগ্রহণ সত্ত্বেও সেই পরিবেশই তাকে আবার নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে ফেলে।

১৪। **অভিভাবকদের দারিদ্র্য:** বহুক্ষেত্রে সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর ব্যয়ভার বহন করতে, বই খাতা কিনে দিতে এবং অন্যান্য আয়োজন করতে অভিভাবকেরা গভীর আর্থিক দৈন্য বোধ করে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের উপায়

শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের চরম ঔদাসীন্যই শিক্ষার অগ্রগতির পথে সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। ভারতের উন্নয়নের যে বহুমুখী পরিকল্পনা আমাদের সরকার গ্রহণ করেছেন তাতে শিক্ষাকে নিতান্ত গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। মোট ব্যয়ের অল্প পরিমাণই শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। এই সব করণে শিক্ষার অগ্রগতি সাধারণভাবেই বেশ মন্থর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান ভারতের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেটাবার মত শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

১। সরকারী তৎপরতা

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে সর্বপ্রথম যে বস্তুটির প্রয়োজন সেটি হল সরকারী তৎপরতা। আধুনিক যুগে এটি সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি রাষ্ট্রের। প্রাথমিক শিক্ষা হল জনগণের শিক্ষা। জনগণকে একটি ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়াটা সরকারের অবশ্য করণীয় কর্মসূচীর অন্তর্গত। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াটা রাষ্ট্রের অবশ্য

কর্তব্য। কেননা জনগণের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে গণতন্ত্রের সাফল্য। অতএব যে রাষ্ট্র গণতন্ত্রের আদর্শে সংগঠিত তার ক্ষেত্রে জনসাধারণের শিক্ষায় অবহেলা গুরুতর কর্তব্যচ্যুতির দৃষ্টান্তস্বরূপ।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার জন্য সরকারী ঔদাসীন্য প্রধানত দায়ী। ভারতের সংবিধানের ৪৫ নং সর্ত অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারতের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে সরকার এ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। এর কারণ হল যে বর্তমানে ভারত সরকার দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষার বিস্তারকে শিল্প, বাণিজ্য, যন্ত্র উৎপাদন ইত্যাদির প্রসারের মত অপরিহার্য বলে মনে করেন না। তাঁদের অভিমত অনুযায়ী জনগণের শিক্ষা আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে পারে।

কিন্তু এ ধারণা যে নিতান্তই ভুল তার প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসেই পাওয়া যায়। যে কোন জাতির সত্যকারের স্থায়ী উন্নতি তখনই হয়েছে যখনই দেশের জনসাধারণের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। বস্তুত দেশবাসীর মধ্যে সংহতি ও মনোবল সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র সর্বজনীন শিক্ষা। এই কারণেই ইংলণ্ডে জাতীয় শিক্ষার বড় বড় আইনগুলি পাশ হয়েছে তখনই যখন ইংলণ্ডের অধিবাসীদের উপর দিয়ে যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে।

অতএব প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্যতাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং আর সকল জাতীয় প্রয়োজনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হবে।

২। সুচিন্তিত পরিকল্পনা

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা হবে দু' প্রকারের—মানমূলক উন্নয়ন ও পরিমাণগত সম্প্রসারণ। অর্থাৎ একদিকে যেমন প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নতিসাধন করতে হবে, তেমনি অপর দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যাতে প্রয়োজনমত সংখ্যাতেও বাড়ে তার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টাগুলি নিতান্তই অসংহত এবং কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা-সম্মত নয়। সমস্ত প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার।

৩। পরিশাসন-ব্যবস্থার সংস্কার

প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ পরিশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলির হাতে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি ব্যবহার করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ ক্ষমতাগুলি কর্তব্যের স্তরে উন্নীত না করার ফলে সেগুলির ব্যবহার স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তাছাড়া শিক্ষা অধিকার ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলির মধ্যে পরিশাসনমূলক সমন্বয় না থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী কিছু করা সম্ভব হয় না।

৪। পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও অনেক বেশী অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। সব দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় অনুপাতের দিক দিয়ে তার চেয়ে অনেক কম ব্যয় করা হয় আমাদের দেশে।

৫। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক বৃত্তির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে হলে শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা দান, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদির একান্ত প্রয়োজন।

৬। শিক্ষক-শিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন। সে সব প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই কাজে নিযুক্ত সেগুলি সংখ্যাতেও যেমন অপ্রচুর তেমনিই কার্যকারিতার দিক দিয়েও নিতান্ত অনুপযোগী। স্কুলবাড়ী, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির উন্নয়ন সাধনও প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য অপরিহার্য।

৭। শিক্ষার সচেতনতার উন্মেষণ

প্রাথমিক শিক্ষার নানা সামাজিক বাধাবিঘ্ন দূর করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, প্রচারকার্য ইত্যাদির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

৮। বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন

সবশেষে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত আইন প্রণয়ন। যতদিন প্রাথমিক শিক্ষা পিতামাতা অভিভাবকদের ইচ্ছানির্ভর থাকবে

ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হবে না। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে তোলার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করা, প্রচুর সংখ্যায় স্কুল খোলা এবং উপযুক্ত শিক্ষক যথেষ্ট সংখ্যায় সংগ্রহ করা। আমাদের পরিশাসকেরা প্রথম থেকেই এবিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র সমস্যা-কণ্টকিত হয়ে উঠেছে।

৯। জনসাধারণের সহায়তা

সবশেষে আসে জনসাধারণেব সক্রিয় সহযোগিতা। ভারত একটি বিবাট মহাদেশ, কোটি কোটি লোকের এখানে অধিবাস। ইংরাজেরা যখন এদেশ ছেড়ে যায় তখন বলতে গেলে মুষ্টিমেয় অংশ বাদ দিয়ে প্রায় সমগ্র জনসমাজকেই নিরক্ষর করে রেখে গেছল। এ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াটা যে একটা অতি বিরাট কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জনশিক্ষাব দায়িত্ব সরকাবের হলেও জনসাধারণ যদি এবিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে না আসেন তাহলে কেবলমাত্র সরকারের পক্ষে এত বড় কাজটি সুসম্পন্ন করা একান্ত দুরূহ হয়ে উঠবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the major problems of primary education? How can they be solved?

2. What do you understand by wastage and stagnation? How do they affect the progress of primary education in India?

দুই

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি

প্রাচীন রাষ্ট্রে শিক্ষা নাগরিকদের ইচ্ছাধীন ছিল। শিক্ষা নেওয়া না নেওয়া ব্যক্তির রুচি, পছন্দ বা আগ্রহের উপর নির্ভর করত। রাষ্ট্রের তরফ থেকেও নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেননা তখনকার রাষ্ট্র একনায়কদের দ্বারাই শাসিত হত এবং নাগরিকদের রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার কোন আয়োজন ছিল না। ফলে নাগরিকরা অশিক্ষিত হলেও রাষ্ট্রের কোন অসুবিধা হত না। তা ছাড়া চিন্তা এবং ভাবসম্পদেরও যথেষ্ট সমৃদ্ধি তখনও দেখা দেয়নি। এখনকার মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্লাবিত হয়ে ওঠেনি। এই সব কারণে শিক্ষা গ্রহণ সকলের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। বিশেষ আদর্শ ও মনোভাব সম্পন্ন মুষ্টিমেয়ই শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

কিন্তু রাষ্ট্রের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক জীবন যাত্রা প্রবর্তিত হলে জনসাধারণের ক্ষেত্রেও শিক্ষাগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে যে সব রাষ্ট্রে নাগরিকদের পরিশাসনে অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করতে হত সেখানে নাগরিকদের শিক্ষিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তার ফলে দেশে সুসংগঠিত প্রাথমিক শিক্ষা বলে কিছুই ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের পর ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনায়কেরা উপলব্ধি করলেন যে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন নির্বাহ করতে হলে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা একান্ত দরকার। এই থেকেই জন্মলাভ করে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনটি এবং সেই একই চিন্তাধারা থেকে পরে প্রস্তুত হয় প্রসিদ্ধ ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন। এই আইনটির দ্বারা বর্তমানে ইংলণ্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার শিক্ষাকেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা

ভারতে ইংরাজ শাসনের সময় বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কোনরূপ প্রচেষ্টা হয়নি। বরং ইংরাজ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কর

বিরোধীই ছিলেন। তার ফলে ভারতে দীর্ঘ ইংরাজ রাজত্বকালে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের কোনরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নি।

ভারতে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত টোল (উত্তর ভারতে), পাঠশালা, মক্তব প্রভৃতির মাধ্যমে। ইংরাজী প্রথায় প্রথম শিক্ষা দিতে সুরু করেন মিশনারীরা। ১৮৩৫ সালে মিশনারী শিক্ষক উইলিয়াম অ্যাডামকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সংরক্ষণের স্বপক্ষে মত দেন এবং প্রতি গ্রামে যাতে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তত একটি করে বিদ্যালয় খোলা হয় তার জন্য আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেন। অ্যাডামের এই প্রস্তাবকে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সর্বপ্রথম প্রস্তাব বলা যায়। ১৮৫২ সালে বোম্বাই প্রদেশের রেভিনিউ সার্ভে কমিশনার ক্যাপ্টেন উইংগেট কৃষিজীবী ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেবার জন্য কর আদায়ের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৮ সালে গুজরাটের শিক্ষা পরিদর্শক টি, সি, হোপ প্রতি অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ৮৮৪ সালে ব্রোচের সহ শিক্ষা-পরিদর্শক শ্রীশাস্ত্রী তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে াধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন।

ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ সুরু হলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা দেশের নেতারা উপলব্ধি করলেন। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক নেতারা বুঝলেন যে দেশকে স্বাধীন করতে হলে জনসাধারণকে প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণকে শিক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে সুরু করলেন। বোম্বাইতে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এবং স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন সুরু করলেন। এই আন্দোলনকেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম সুসংগঠিত আন্দোলন বলা যেতে পারে। তাঁদের আন্দোলনের চাপে বোম্বাই সরকার ১৯০৬ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কমিটি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধেই তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বরোদায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা

কিন্তু ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যে এই সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ১৮৯৩ সালে বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত

আম্রেলিতালুক নামে একটি জায়গায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং পরে ১৯০৬ সালে তাঁর সমগ্র রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করেন। বরোদার এই মহারাজা যে সে সময়ে যথেষ্ট প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

গোখেলের বিল—১৯১১

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন ভারতের প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেল। ১৯১০ সালে রাজকীয় আইন সভায় এ সম্বন্ধে তিনি প্রথম একটি প্রস্তাব আনেন। ১৯১১ সালে তিনি ঐ সভাতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি বিল উপস্থাপিত করেন। এই বিলটির মোট বক্তব্যগুলি হল এই—

১। যে সব অঞ্চলে স্কুলগামী বয়সের ছেলেমেয়েদের (অর্থাৎ ৬ থেকে ১০ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের) বিশেষ একটি শতাংশ শিক্ষা গ্রহণ করে সে সব অঞ্চলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

২। এই বিশেষ শতাংশের বিচার করবেন অবশ্য শিক্ষাবিভাগ।

৩। কোন অঞ্চলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তিত হবে কিনা তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

৪। শিক্ষার্থীদের যোগদানের শতাংশ নির্ধারণ এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন ভাইসরয় এবং গভর্নর উভয়েরই সমর্থনের উপর নির্ভর করবে।

৫। এই অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভারের ⅔ অংশ বহন করবেন সরকার এবং ⅓ অংশ স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ।

৬। মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বিলটির সর্তাদি অত্যন্ত শিথিল প্রকৃতির এবং এর দ্বারা সরকারের উপর তেমন কোন গুরুদায়িত্ব চাপাবার প্রস্তাব করা হয়নি। কিন্তু তা সত্বেও এবং ভারতীয় নেতাদের যথেষ্ট সমর্থন থাকলেও ৩৮—১৩ ভোটে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

গোখেল যদিও তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভারত এবং ইংলণ্ড উভয় দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৯১১ সালে ভারতের জন্য আণ্ডার সেক্রেটারী অফ স্টেটস্ ভারতবাসীর শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগ দেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন।

এর পরে প্রথম মহাযুদ্ধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ শেষে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কার সাধিত হয়। ১৯১৯ সালে ভারত সরকারের আইন পাশ হয় এবং এই প্রথম ভারতীয়দের হাতে শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার রাজ্য-সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। এর ফলে রাজ্যমন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের শিক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি চলে আসে।

এদিকে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমশ প্রবলতর হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতারা জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৯১৮ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হতে সুরু করল। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এইগুলিই প্রথম আইন।

বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষা আইন—১৯১৮

বিঠলভাইয়ের প্রচেষ্টায় বোম্বাইয়ে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। ১৯১৭ সালে তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক আইনসভায় ঐ রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলগুলিতে (বোম্বাই সহর ছাড়া) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলটি গোখেলের বিলেরই অনুরূপ ছিল। গোখেল তাঁর বিলেতে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ সরকারকে বহন করবার প্রস্তাব করে-ছিলেন কিন্তু প্যাটেলের বিলে সরকারের উপর তেমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় নি। ১৯১৮ সালে এই বিলটি আইনে পরিণত হয়। এটি প্যাটেল আইন নামে পরিচিত।

অন্যান্য প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন

বোম্বাই প্রদেশের দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হল। এই আইনগুলি সবই প্যাটেলের আইনের অনুসরণে রচিত হয়েছিল, যদিও বিভিন্ন প্রদেশে নিজস্ব প্রয়োজনানুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কোন প্রদেশে আইনটি সমগ্র রাজ্যের উপর বিস্তৃত ছিল আবার কোথাও কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলগুলিতে আইনটি প্রযোজ্য ছিল। এই আইনে কোন কোন রাজ্যে ছেলেমেয়ে উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আবার কোন রাজ্যে কেবলমাত্র ছেলেদের জন্যই আইন তৈরী হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিভিন্ন সময়ে পাশ হয়। পাঞ্জাব,

উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই চারটি প্রদেশে ১৯১৭ সালে আইন পাশ হয়। বোম্বাই সহর এবং মধ্যপ্রদেশে পাশ হয় ১৯২০ সালে, আসাম ও উত্তরপ্রদেশের অঞ্চলে পাশ হয় ১৯২৬ সালে। বাংলাদেশে গ্রাম্য অঞ্চলের জন্য আইন পাশ হয় ১৯৩০ সালে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা আইন—১৯১৯

১৯১৯ সালে বিধিবদ্ধ বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের মূল ধারাগুলি নীচে বর্ণিত হল।

১। প্রথমত এই আইনটি সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির উপর প্রযোজ্য। তবে বাংলা সরকার যে কোনও ইউনিয়নকেই এই আইনের অধীনস্থ করতে পারেন।

২। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যে বা সরকার-নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ অঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিকে সরকারের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিশদ বিবরণী পেশ করতে হবে। যথা (ক) ৬-১০ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের সংখ্যা (খ) কর্মরত প্রাথমিক স্কুলগুলির স্থান সঙ্কুলান, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্র-উপস্থিতি; (গ) ৬-১০ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে স্কুলের স্থান সঙ্কুলান, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষা-উপকরণের প্রয়োজন; (ঘ) প্রাথমিক শিক্ষায় মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান ব্যয়ের পরিমাণ ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ কতটা বাড়বে; (ঙ) বর্তমান আয়ের পরিমাণ ও প্রস্তাবিত শিক্ষা-করের সম্ভাব্য পরিমাণ এবং (চ) সরকারী অর্থসাহায্যের আনুমানিক প্রয়োজন ও পরিমাণ।

৩। মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনারগণ যদি নিজ অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলে সরকারী অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারেন।

৪। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ একটি স্কুল কমিটি গঠন করবেন এবং এই কমিটিকে গঠন বিধি, সদস্য সংখ্যা, কর্তব্য নির্ধারণ ও স্কুলের ছেলেদের উপস্থিতিসংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন করে সরকারী অনুমোদন লাভ করতে হবে।

৫। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে না। কোনও অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষিত হলে কোন অভিভাবক যদি বেতন

দানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তবে সেই অভিভাবকের সন্তানকে কোনও অনুমোদিত প্রাথমিক স্কুলে বিনা বেতনে বা সুবিধাজনক বেতনে ভর্তি করার জন্য স্কুল কমিটি বিবেচনা করবেন।

৬। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও কোনও মিউনিসিপ্যালিটির অর্থাগম পর্যাপ্ত না হলে, কমিশনারগণ নিজ অঞ্চলে সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষাকর ধার্য করতে পারবেন। যে পরিমাণ মোট অর্থ শিক্ষাব্যয়ের জন্য প্রয়োজন, তা থেকে সরকারী সাহায্য, স্কুল বেতন ও জনসাধারণের দান আদায়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে তার উপর কর আদায় ও অনাদায়ী ক্ষতির ব্যয় বাবদ ১০% যোগ করে মোট শিক্ষাকরের পরিমাণ ও হার নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে সরকার বিশদ নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার মোটেই আশানুরূপ হয় নি। বিশেষ করে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি একরকম বন্ধ ছিল বললেও চলে।

১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির একটা হিসাব দেওয়া হল—

বৎসর	মিউনিসিপ্যাল ও সহর অঞ্চলে	গ্রাম্য অঞ্চলে
১৯২১-১৯২২	৮	—
১৯২৬-১৯২৭	১১৪	১,৫৭১
১৯৩১-১৯৩২	১৫৩	৩,৩৯২
১৯৩৬-১৯৩৭	১৬৭	৩,০৩৪

উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালে সমগ্র ভারতে মাত্র ১৬৭টি মিউনিসিপ্যাল ও সহর অঞ্চলে এবং ৩০৩৪টি গ্রাম অঞ্চলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। তখনকার এই অনগ্রসরতার কারণ অবশ্য অনেকগুলি ছিল। প্রথমত, আইনগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময় সমগ্র পৃথিবীতেই আর্থিক অবনতি দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়ত, হার্টগ কমিটির রিপোর্টে ১৯২৯ সালে শিক্ষার প্রসারের চেয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা কেবল ছেলেদের ক্ষেত্রে ২২৯টি সহরে এবং ১০০১৭টি গ্রামে এবং

ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে ১০টি সহরে এবং ১৪০৪টি গ্রামে প্রবর্তিত হয়েছিল।

যদিও এই প্রাথমিক শিক্ষার আইনটিতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল তবু চট্টগ্রাম ও কলকাতা ছাড়া আর সমস্ত স্থানে আইনটির প্রয়োগ করা হয়নি, কারণ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষগুলির উপর। কিন্তু আইনে তাঁদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি বলে তাঁরা এ বিষয়ে কোন তৎপরতা দেখান নি। তবে দীর্ঘ ৪০ বছরের সংগ্রামের পর জনশিক্ষার দাবী সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য করার সূচকরূপে এই আইনটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আইনটির সংশোধন—১৯২১

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯১৯ সালে বিধিবদ্ধ হয় এবং সেই বছরেই বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনটিও বিধিবদ্ধ হয়। এর ফলে ১৯২১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইনটির সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, যাতে গ্রামাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আয়োজন করা যায়। ১৯১৯ সালের আইনে কেবলমাত্র ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের আইন প্রণয়ন ও ১৯২১ সালে তার সংশোধন সত্ত্বেও ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ ছেলেমেয়েদের স্কুলে যোগদানের বাধ্যতামূলক বিধিব্যবস্থা কিছুই করা হয়নি এবং এই বিরাট দায়িত্বের অনুপাতে যথেষ্ট অর্থ সরবরাহের আয়োজনও ছিল না। স্কুলগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও শিক্ষকদের যথোপযুক্ত বেতন দানের কোনরকম ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়নি। এইসব ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে আবার নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিল।

বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন—১৯৩০

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক আইনটির ত্রুটিগুলির দূরীকরণ, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-হারের উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালে আর একটি বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯২৬ সাল থেকেই এই আইন সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা হচ্ছিল এবং বিবিধ পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে আইনটি পাশ হয়। প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের যাবতীয় ক্ষমতা সেই জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এই আইনে। আইনটির মূল ধারাগুলি পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত হল।

১। কলকাতা এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে আইন প্রণয়নের দশ বছরের মধ্যে ৬—১১ বছর বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নততর আয়োজন করতে হবে।

২। প্রাথমিক স্কুলগুলির তত্ত্বাবধান ও অর্থসাহায্য বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা স্কুলবোর্ড গঠন করতে হবে। এই বোর্ডে জেলা শাসক, জেলা পরিদর্শক, শিক্ষক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত হবেন। বেসরকারী সদস্যরা থাকবেন সংখ্যাগুরু। এই বোর্ড জেলা অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার সমগ্র দায়িত্ব বহন করবেন, শিক্ষক নিয়োগ করবেন, বেতন ধার্য ও দান করবেন, স্কুল অনুমোদন করবেন, গ্রাণ্ট ও ছাত্রবৃত্তি মঞ্জুর করবেন এবং শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের আয়োজন করবেন।

৩। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য শিক্ষাকর (Education Cess) ধার্য করা হবে। গ্রামের কৃষকেরা তাঁদের উপার্জনের টাকা প্রতি ৩$\frac{1}{2}$ পয়সা এবং জমিদারগণ তাঁদের আয়ের টাকা প্রতি ১$\frac{1}{2}$ পয়সা করে শিক্ষাকর দেবেন। এছাড়া অন্যান্য স্তরের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদেরও শিক্ষাকরের হার নির্ণয়ের ভার জেলা শাসকের উপর দেওয়া হবে।

৪। জেলা বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সরকার কোনও অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে পারেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের কোনও বেতন লাগবে না। কোনও ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলক শিক্ষাগ্রহণে অব্যাহতি দানের ক্ষমতা থাকবে একমাত্র জেলা বোর্ডের।

৫। স্কুলপাঠ্যের সঙ্গে ধর্মশিক্ষার আয়োজন করা চলবে।

৬। জেলা স্কুলবোর্ডগুলির নিয়ন্ত্রণ ও বাধ্যতামূলক প্রথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠিত হবে। এতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর (D. P. I.) হিন্দু, মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও সরকারী মনোনীত সদস্যরা থাকবেন।

প্রাথমিক আইনগুলির ত্রুটি

এই প্রাথমিক শিক্ষার আইনগুলি গঠনের দ্বারা ভারতের বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা অগ্রগতি হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বিশাল ভারতের বিরাট প্রয়োজন অনুযায়ী এ অগ্রগতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সমস্ত প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অগ্রগতি এত মন্থর কেন? প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পথে যে সব চিরন্তন প্রতিবন্ধক রয়ে গেছে সেগুলি ছাড়াও এই আইনগুলির অসম্পূর্ণতা ও গুরুতর ত্রুটিগুলিই এই অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। সেগুলি হল এই—

১। আইনগুলিতে কোথাও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতেই হবে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করাটা ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন এবং তাঁরা কেউই স্বেচ্ছায় এত বড় দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট মাথা পেতে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

২। বাধ্যতামূলক করতে গেলে শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। তার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার কোন সুব্যবস্থা আইনে করা হয়নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই বিরাট আর্থিক দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না।

৩। যদিও শিক্ষাকর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছিল তবু শিক্ষাকর ধার্য করা, আদায় করা ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশে শিক্ষাকর ধার্য করাটাও সে সময়ে আইন বিরুদ্ধ ছিল।

৪। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা গেলেও পুরোপুরি অবৈতনিক করা সম্ভব ছিল না।

৫। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার গুরুভার অপরিণত দুর্বল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা দায়িত্বমুক্ত হয়েছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলির প্রচুর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও এগুলির সংস্কারের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হলেও নানা কারণে সে চেষ্টা সফল হয়নি।

১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হন এবং একটি নতুন পশ্চিম বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করেন। এই আইনটি ১৯১৯ সালের পুরোনো আইনের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে উন্নত এবং পুরোনো আইনটির দোষ ত্রুটিগুলির এতে আংশিকভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা হয়েছে। পরের পাতায় এই আইনটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন—১৯৬৩

১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন নামে যে আইনটি পাশ হয়েছে তার প্রধান প্রধান সর্তগুলি এই—

১। এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন বলে পরিচিত। এটি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে।

২। ৬ বৎসর বয়সের কম নয় এবং ১১ বৎসর বয়সের বেশী নয় এমন প্রতিটি ছেলে বা মেয়ে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।

৩। এই আইনটি কার্যকরী হবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রাজ্যসরকারকে নীচের বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত করবেন।

(ক) মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ছেলেমেয়ের সংখ্যা।

(খ) স্কুলে আসনের সংখ্যা।

(গ) শিক্ষকের প্রয়োজন।

(ঘ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপনের সময় এবং পন্থা।

(ঙ) মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক যত ব্যয় হবে।

(চ) বর্তমান আয়।

(ছ) শিক্ষাকর সহ যা অর্থ পাওয়া যাবে।

(জ) সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য কমিশনারগণ নিজের নিজের এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রবর্তনের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করেন।

৪। এই বিবরণীটি পর্যালোচনা করে এবং অর্থ সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে রাজ্য সরকার তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারী একজন প্রশাসন আধিকারিক (Administrative Officer) নিযুক্ত করতে পারেন।

৬। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করবার জন্য কমিশনার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী একটি স্কুল কমিটি গঠন করতে পারেন।

৭। যে যে অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলকরূপে ঘোষণা করা হয়েছে সে সে অঞ্চলের অধিবাসী প্রতিটি শিশুর (৬ থেকে ১১ বৎসর

বয়সের মধ্যে) অভিভাবকের কর্তব্য হল কোন অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিশুকে পাঠান। অবশ্য অভিভাবক এই কর্তব্য থেকে মুক্তি পেতে পারেন যদি শিশুটির যোগদান না করার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকে। যেমন—অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব, অসুস্থতা বা পঙ্গুতা, শিশু যদি অন্য কোন সন্তোষজনক পন্থায় লেখাপড়া শেখে এবং শিশু যদি ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে থাকে।

৮। স্কুল কমিটির অনুমতি ছাড়া ৬ থেকে ১১ বৎসরের কোন শিশুকে কেহ কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন না। যদি কাজে লাগানোর জন্য শিশুটির স্কুলে যোগদানের অসুবিধা হয় তাহলে নিয়োগকারীর কুড়ি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

৯। শিশুর স্কুলে যোগদানের জন্য যাতে স্কুল কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারেন, কমিশনারগণ রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে সেই মত আইন প্রবর্তন করতে পারেন।

১০। যদি কোন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের বর্তমান সঙ্গতি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে তাঁরা রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে ঐ অঞ্চলে শিক্ষাকর ধার্য করতে পারেন।

১১। ঐ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির বাৎসরিক মূল্যের শতকরা দু'ভাগের বেশী এই শিক্ষাকর হবে না। তবে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে করের হার বিভিন্ন হতে পারে।

১২। কমিশনারগণের পরিচালিত প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ-পরিদর্শক বা কোন কর্মচারীর দ্বারা পরিদর্শিত হতে পারে।

১৯৬৩'র প্রাথমিক শিক্ষা আইনটির ত্রুটি

নতুন ১৯৬৩'র আইনের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য আগের চেয়ে সুব্যবস্থা করা হলেও এর অসম্পূর্ণতা অনেক। প্রথমত, মাত্র ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ বৎসর বয়সের উপরে যে সব ছেলেমেয়ে তাদের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় নি। এর ফলে জনসাধারণের শিক্ষার মান খুবই নীচু থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাকরের সাহায্যে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে শিক্ষাকর ধার্য করার ক্ষমতা দেওয়াতে শিক্ষাকরের হার প্রয়োজন

অনুরূপ হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য বাকী ব্যয়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। এই আইনটি শহর অঞ্চলেব জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় শিক্ষাকরের হার আরও বাড়ান চলতে পাবত।

তৃতীয়ত, আইনটি কেবল মাত্র সহর অঞ্চলের জন্যই রচিত। গ্রাম অঞ্চলের বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থা এতে করা হয় নি। তাছাড়া অভিভাবক ও পিতামাতাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য করার ব্যবস্থাটি সন্তোষজনক নয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রতিবন্ধক

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তাবের প্রতিবন্ধকগুলির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক বলতে নীচের বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। **সরকারী অবহেলা**—প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্রের অপরাপর কর্তব্যের মধ্যে জনসাধারণকে শিক্ষিত করা আধুনিক যে কোন সভ্য রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্গত। এইজন্য সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রেই প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করে তোলা হয়েছে। আমাদের সংবিধানের ৪৫নং সর্ত অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ভারত সরকারকে অন্যান্য পরিকল্পনাব চাপে এই সিদ্ধান্তটি বাতিল করতে হয়েছে। বর্তমানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনেব কোন সর্বভারতীয় পরিকল্পনা নেই। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের পথে সরকারের ঔদাসীন্যই বড বাধা। দেখা যাচ্ছে যে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারেব অপরিহার্যতাকে সরকার স্বীকার করেন না। নীতি হিসাবে এটি যে নিতান্তই ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

২। **সুপরিকল্পনার অভাব**—বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যতটুকু প্রচেষ্টা করা হচ্ছে তা নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অপরিকল্পিত প্রকৃতির। শিক্ষার মত একটি সর্বভারতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবভিত্তিক কার্যকরী কোন পরিকল্পনা আজও পর্যন্ত তৈরী হয়ে উঠে নি।

৩। **অর্থাভাব**—ভারতের কোটি কোটি শিশুকে শিক্ষাদান করতে হলে

প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের সমস্যাও অসংখ্য এবং সেগুলির সমাধানের জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। ভারত সরকারের মতে অন্যান্য পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানোর জন্যে শিক্ষার খাতে অর্থব্যয় করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। গত দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্যে প্রথমে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় পরে ভারত সরকার তা কমিয়ে দিতে বাধ্য হন। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থাভাবের প্রকৃত কারণ হল যে আমাদের পরিশাসকেরা অন্যান্য প্রয়োজনকে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের এই ধারণা যতদিন না বদলাবে ততদিন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাভাব ঘুচবে না।

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থসরবরাহের দ্বিতীয় উৎস হল জনসাধারণের উপর ধার্য শিক্ষাকর। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষাকর শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের একটি বড় উপকরণ। জনসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষাকর সংগ্রহ করতে হলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাকর সংগ্রহের জন্য তেমন কোন সুনির্দিষ্ট আইন তৈরী করা হয়নি।

৪। বাধ্যতামূলক আইনের অভাব—প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে তার জন্য উপযুক্ত আইন তৈরী করতে হবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পিতামাতারা যাতে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হন আইনের সাহায্যে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সব দেশেই ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন এমন পিতামাতা বহু আছেন। বিশেষ করে ভারতের মত শিক্ষাহীন দেশে বহু পিতামাতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। বরং শিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতামাতা অনেক আছেন। তাছাড়া অনেক স্থানে ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করে পিতামাতাদের অর্থ সাহায্য করে থাকে। বাড়ীর কাজে ছেলেমেয়েদের সাহায্যেরও অনেক দাম আছে। এই সব কারণে অনেক পিতামাতাই স্বেচ্ছায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে রাজী হন না। এদের জন্য বাধ্যতামূলক যোগদানের আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই আইন ভঙ্গ করলে শাস্তিদানের প্রথাও অবলম্বন করতে হবে। শুধু তাই নয়, সত্যই ছেলেমেয়েরা স্কুলে যোগ দিল কিনা তা দেখার জন্য পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলগামী বয়সের ছেলেমেয়েদের কেউ যাতে শ্রমে নিয়োগ করতে না পারে তার জন্য কার্যকরী শিশু-শ্রমের আইন পাশ করতে হবে।

৫। দুর্বল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনের পরিকল্পনায়

স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত ভার সব সময়েই স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের হাতে দিতে হবে। কেননা এত বৃহৎ এবং ব্যাপক একটি আয়োজন কোন কেন্দ্রগত সংগঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বর্তমানে যে সব স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলির উপর শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে সেগুলি নানা দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলির সংগঠনের মধ্যে যেমন প্রচুর অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তেমনি সেগুলির উপর প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্বেরও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাদের উপর কর্তব্যের ভার দেওয়া হয়েছে প্রচুর কিন্তু সেই কর্তব্যকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার কোন বাস্তব-ভিত্তিক আয়োজন করা হয় নি। তার ফলে ইচ্ছা থাকলেও এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্রিটিশ আমলে স্থানীয় কর্তৃ-পক্ষগুলিকে এইভাবে সংগঠিত করার মূলে ছিল সরকারের শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব-মুক্ত হবার প্রচেষ্টা। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন ভারতে এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে নূতন ভাবে সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন।

৬। **শিক্ষক সমস্যা**—প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে হলে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তেমনি প্রচুর সংখ্যক শিক্ষকেরও প্রয়োজন। সুশিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া কার্যকরী প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু বর্তমানে ভারতে উপযুক্ত শিক্ষকের একান্তই অভাব। শিক্ষকদের অল্প বেতন এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য শিক্ষাবৃত্তি মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তার ফলে মেধাবী ছেলে-মেয়েরা এই বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তাছাড়া শিক্ষকগণের শিক্ষণের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় সুযোগ্য শিক্ষক পাওয়া একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরের প্রতিবন্ধকগুলি ছাড়াও ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে আরও কয়েকটি চিরন্তন বাধা আছে সেগুলি হল—

৭। **জাতিভেদ প্রথা।**

৮। **প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি।**

৯। **অভিভাবকদের অজ্ঞতা।**

১০। **সামাজিক ও ধর্মীয় অন্তরায়।**

এই প্রতিবন্ধকগুলি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্যা সমাধানের উপায়

উপরের আলোচনা থেকে বর্তমানে ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যা করণীয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১। সরকারকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনাকে তাঁদের কার্যস্থচীর সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।

২। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার একটি স্থনির্দিষ্ট ও স্থচিন্তিত পরিকল্পনা গঠন করতে হবে।

৩। পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। সমস্ত রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রবর্তন করতে হবে।

৫। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে হবে।

৬। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের অন্যান্য স্থখ-স্থবিধা দিতে হবে।

৭। জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা প্রভৃতি প্রগতি-পরিপন্থী মনোভাব জনসাধারণের মধ্য থেকে দূর করতে হবে।

৮। অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short history of the movement for compulsory primary education in India.

2. Give an account of the Primary Education Acts passed in different periods. How far are they successful ?

3. What are the obstacles in the way of introducing compulsory primary education in India.

4. Give the main provisions of West Bengal Urban Primary Education Act, 1963. In what ways are they improvement over the previous Acts ?

তিন

মাধ্যমিক শিক্ষার স্বরূপ

সাধারণভাবে মানুষের সমগ্র শিক্ষাকালকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা। এর মধ্যে প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দাবী সবচেয়ে প্রথম। কেননা প্রাথমিক শিক্ষা হল জনসাধারণের শিক্ষা—সভ্যজীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য ন্যূনতম শিক্ষা।

কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান সব চেয়ে উপরে। কারণ, মাধ্যমিক শিক্ষা হল দক্ষতা ও কার্যকারিতার শিক্ষা। সভ্য ও ভদ্রজীবনের জন্য অপরিহার্য ও ন্যূনতম যোগ্যতাটুকু মাত্র দেয় প্রাথমিক শিক্ষা কিন্তু সত্য নাগরিক-জীবনের প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলি পালন করতে হলে যে বিশেষধর্মী যোগ্যতার প্রয়োজন তা পাওয়া যায় মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে। যে কোন আধুনিক সমাজের বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ কাজের বোঝা যারা বহন করে তারা এই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকেই আসে। অফিস, কারখানা, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ প্রভৃতিতে সাধারণ কর্মী ও শিল্পীর দল মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকেই প্রস্তুত। এইজন্য যে সমাজে মাধ্যমিক শিক্ষা যত ব্যাপক সে সমাজে সাধারণ কাজের মানও তত উঁচু। যাঁরা উচ্চ শিক্ষালাভ করে বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে উন্নীত হন তাঁরাও এই মাধ্যমিকশিক্ষার স্তর থেকেই নির্বাচিত হন। এক কথায় মাধ্যমিক শিক্ষাই হল সমাজের শিক্ষাসংগঠনের মেরুদণ্ড, নাগরিকজীবনের যোগ্যতা ও কর্মশীলতার ভিত্তি।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য

পৃথিবীর সবদেশেই এতদিন মাধ্যমিক শিক্ষা—হয় প্রাথমিক শিক্ষা, নয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও কাজ সম্পর্কে কেউই তেমন সচেতন ছিলেন না। ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই প্রসারিত বা প্রলম্বিত স্তর বলে বিবেচিত হত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়েই অতিরিক্ত কয়েক বছর মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হত। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার নিছক সোপান বা পূর্বস্তর বলে বর্ণনা করা হত। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার যেমন কোন নিজস্ব অস্তিত্ব ছিল না,

তেমনই তার কোন স্বতন্ত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করা ছাড়া এর অন্য কোন সার্থকতাও ছিল না।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মাধ্যমিক শিক্ষার এক নতুন সংব্যাখ্যান দেওয়া হল। প্রাথমিক ও উচ্চ, এই উভয় শিক্ষাস্তর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থারূপে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা করা হল। ব্যক্তির শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্তা-গঠনের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হল মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। ফলে আধুনিক শিক্ষানীতির সংব্যাখ্যানে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখন সম্পূর্ণ নতুন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য পর্যালোচনা করলে আমরা আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য বলতে নীচের বিষয়গুলির উল্লেখ করতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে সভ্যজীবন যাপনের অপরিহার্য কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে সাহায্য করা, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত বিকাশমূলক সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণতায় পৌঁছতে সমর্থ করা। প্রত্যেক শিশুই বৃদ্ধি বা বিকাশের কতকগুলি অবিকশিত শক্তি নিয়ে জন্মায়। সেগুলির যথাযথ বিকাশ করতে পারলে তার মধ্যে দেখা দেয় বাঞ্ছিত যোগ্যতা। বর্তমান পৃথিবীতে সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা একটি জটিল স্তরে পৌঁছেছে। এখানে সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কতকগুলি বিশেষ যোগ্যতা আহরণ করতে হবে। এই সব যোগ্যতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মঙ্গলই আনে না, সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য এগুলি অপরিহার্য।

এদিক দিয়ে এককথায় মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর সর্বতোমুখী বৃদ্ধিকে সাহায্য করে তাকে সর্বাঙ্গীণ যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করে তোলা।

শিক্ষার্থীর এই বৃদ্ধিকে চারটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। যথা—(১) মানসিক বা জ্ঞানমূলক উন্নয়ন (২) কৃষ্টিমূলক এবং সমাজমূলক উন্নয়ন (৩) শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং (৪) অর্থ নৈতিক যোগ্যতা অর্জন।

আবার এই চার প্রকারের বৃদ্ধি তিনটি বিভিন্ন গতিপথ ধরে এগোতে পারে। যেমন—(১) শিক্ষার্থীর নিজস্ব ব্যক্তিগত দিক (২) শিক্ষার্থীর অতিনিকট সংগঠনগুলির (যেমন পরিবার, বন্ধুগোষ্ঠী, বিদ্যালয়সমাজ ইত্যাদির) দিক এবং (৩) শিক্ষার্থীর দূরবর্তী সংগঠনগুলির (যেমন রাষ্ট্র, রাজনৈতিক সংগঠন, বিশ্বসমাজ প্রভৃতির) দিক।

শিক্ষার্থীর এই চার রকমের বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তাদের প্রত্যেকটির ত্রিবিধ

গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলির সন্ধান পাই। যথা—

১। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক ও বিচারমূলক দিকগুলির পূর্ণবিকাশ করে তার আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করা।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে নিছক প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা হয়, তার মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধনের কোন চেষ্টা করা হয় না। কিন্তু তার মানসিক শক্তির যথা সম্ভব বিকাশ করা, তার অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধিকে পরিণত করে তোলা এবং তার নিজের অন্তরস্থ সত্তাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই সম্ভব হয়ে থাকে। বিবিধ জ্ঞানের আহরণ, চিন্তাশক্তির ব্যাপক ব্যবহার, ভাবের আদানপ্রদান, সৃজনমূলক প্রয়াস, নানাবিধ সমস্যার সমাধান প্রভৃতি এই লক্ষ্যে পৌছবার মাধ্যমবিশেষ।

২। শিক্ষার্থীকে তার পরিপার্শ্বস্থ সমাজের যোগ্য সদস্যরূপে এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সমর্থ করা।

শিক্ষার্থীর পরিপার্শ্বস্থ সমাজ বলতে বোঝায় তার নিজস্ব পরিবার প্রতিবেশীমণ্ডলী, বন্ধুগোষ্ঠী, বিদ্যালয়সমাজ, ক্লাব, সঙ্ঘ ইত্যাদি। শিশুকে বড় হয়ে এই সমাজেরই একজন যোগ্য সদস্য হয়ে বাস করতে হবে। এজন্য তাকে আহরণ করতে হবে সুনাগরিকতার গুণাবলী। তার সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি তার কর্তব্যগুলি পালন করতে তাকে শিখতে হবে এবং সমাজের একজন রূপে তার দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শ অধিকাংশ রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার্থীকেও এই গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক রূপে তাকে গড়ে উঠতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে এই লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ করে। দলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য, বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান, বিদ্যালয়ের পরিচালন, সামাজিক সম্মেলন প্রভৃতি নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এই লক্ষ্যে পৌছয়।

৩। শিক্ষার্থীর কৃষ্টিমূলক ও সামাজিক দিকের পূর্ণ বিকাশ ও সমুন্নয়নে সাহায্য করা।

শিক্ষার্থীর সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দিকটির পূর্ণ বিকাশ তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু গঠনের জন্য অপরিহার্য। তার বাইরের জগতের সঙ্গে সুষম সঙ্গতিবিধানের জন্য তার সামাজিক সচেতনতার পরিপুষ্টি ও কৃষ্টিমূলক উপলব্ধির পরিণতি অত্যাবশ্যক। বহির্জগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা, সুনাগরিকতার গুণাবলী অর্জন করা, নৈতিক মানের প্রয়োগ করতে শেখা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বাস্তবে প্রয়োগ করা, সৌন্দর্যমূলক ও চারুকলামূলক রস উপলব্ধি করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃষ্টিমূলক ও সামাজিক দিকগুলি সুবিকশিত ও সুসমন্বিত হয়ে ওঠে।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের সুগঠন ও সংরক্ষণে সাহায্য করা।

শিক্ষার্থীর মানসিক, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দিকের পর আসে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষার্থীর সব রকম শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা, সম্মিলিত উদ্যোগ, খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৫। বৃত্তি-পরিচিতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক যোগ্যতা আহরণে সাহায্য করা।

শিক্ষার্থীকে অর্থনৈতিক যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। নিজের সামর্থ্য, চাহিদা এবং সুযোগ অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করে শিক্ষার্থী যাতে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে তার ব্যবস্থা করা মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যসূচীর অন্তর্গত।

৬। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কৃষ্টিমূলক ও জ্ঞানমূলক দিক দিয়ে সঙ্গতিবিধানে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলা।

নিজস্ব পরিবার, বিদ্যালয় ও প্রতিবেশীর সমাজের বাইরে শিক্ষার্থীর যে বৃহত্তর সমাজ আছে সেই সমাজের একজন উপযুক্ত সদস্য হয়ে তাকে গড়ে উঠতে হবে। বৃহত্তর সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বসমাজ প্রভৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্কটি উপলব্ধি করা এবং

কৃষ্টিমূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৃহৎ সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যে গণতন্ত্রের আদর্শ তার নিজের জীবনে কার্যকরী করতে সে শিখেছে সেই আদর্শকে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে প্রতিফলিত করে তার মূল্য ও গুরুত্ব আরও ভাল করে শিক্ষার্থীকে উপলব্ধি করতে হবে।

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা

বর্তমানে ভারত অনুন্নত দেশের পর্যায়ে পড়ে। শিল্প ও বাণিজ্য, উৎপাদন, সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়েই ভারত বেশ অনগ্রসর। ভারতের উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রচুর সংখ্যায় কর্মী, শিল্পী, সমাজসেবী, কারিগর ইত্যাদি। এর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দরকার। কিন্তু ভারতের অন্যান্য শিক্ষাস্তরের মতই মাধ্যমিক শিক্ষাও নানা জটিল সমস্যায় জর্জরিত।

আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠনটি পুরোপুরি বৃটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রসিদ্ধ বিবরণীর ফলে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম হয়। ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাটি গড়া হলেও বহু গুরুতর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা এর পরিকল্পনায় রয়ে গেছে। তার প্রথম কারণ ছিল যে সে সময়ে বৃটিশ শাসকেরা তাঁদের রাজ্য-শাসনের নিছক যন্ত্ররূপে কাজ করতে পারে এমন কেরাণী ও কর্মচারীর দল তৈরী করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের সেই উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয় তার উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষারই প্রবর্তন করেছিলেন।

ভারত স্বাধীন হলে দেশনায়কেরা মাধ্যমিক শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা-গুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—

(১) পরিশাসনমূলক	(৪) পাঠক্রমমূলক
(২) সংগঠনমূলক	(৫) শিক্ষকসংক্রান্ত
(৩) অর্থনৈতিক	(৬) বিবিধ

১। পরিশাসনমূলক সমস্যা

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসনমূলক সমস্যাগুলিকে আবার কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা (ক) নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, (খ) সুপরিকল্পনার অভাব, (গ) ত্রুটিপূর্ণ পরিশাসন ব্যবস্থা এবং (ঘ) পরিদর্শনের সুব্যবস্থার অভাব।

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসনের নীতি নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কারও কারও মতে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার ও নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত রাষ্ট্রের হাতে। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীরা আসে এই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে। অতএব এই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা দরকার। কিন্তু অপর পক্ষে আর একদল শিক্ষাবিদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে। কেননা সরকারের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার থাকলে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তনশীলতা ও নতুনত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে না এবং শীঘ্রই সেটি যান্ত্রিক ও কৃত্রিম হয়ে উঠবে। এইজন্য ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার জনগণ-পরিচালিত স্থানীয় সংস্থাগুলির হাতেই ন্যস্ত আছে।

ভারতেও এই সমস্যাটি কম জটিল নয়। এখানেও বিভিন্ন রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসন প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পরে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গঠিত হয়। প্রথমে এই পর্ষৎটি জনসাধারণের নির্বাচিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের দ্বারা গঠিত ছিল এবং সরকারের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। কিন্তু নানা কারণের জন্য এই পর্ষৎটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বর্তমানে নতুন আইনের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিতে মনস্থ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্ত সকলেই সমর্থন করেন না। আধুনিক শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বাধীনতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষার মত এত ব্যাপক ও বিশাল শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার। কিন্তু ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার তেমন কোন স্থায়ী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দেখা যায় না। তার ফলে আজও মাধ্যমিক শিক্ষার সুসংহত ও সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব হয় নি।

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষার পরিশাসন ব্যবস্থাতেও প্রচুর ত্রুটি দেখা যায়। ব্রিটিশ আমলে পরিশাসনের যে কাঠামোটি গড়া হয়েছিল আজও সেই কাঠামোটিই অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। অথচ কাঠামোটি সুষ্ঠু পরিশাসনের অনুকূল নয়। ভারতের কোন রাষ্ট্রেই বিদ্যালয় পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত নিয়মাবলী নেই। সরকারী শিক্ষা দপ্তর ও মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালক সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্কও কোথাও সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নয়। স্থানীয় পরিচালকমণ্ডলীগুলির সংগঠনের নিয়মাবলীও প্রগতিশীল নয়।

অনেক ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ন্ত্রকের পরিশাসনে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠছে।

(ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিশাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিদর্শন ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং অনুপযোগীও। যথেষ্ট সংখ্যক সুশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

২। সংগঠনমূলক সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংগঠনের সমস্যাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যবিষয়গুলি নানা বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে। সকল ছেলেমেয়ের পক্ষে একই রকমের পাঠক্রম উপযোগী হয় না। সেই জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে কতকগুলি স্বতন্ত্র পাঠপ্রবাহ বা পাঠ্য ধারায় বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এই বিভিন্ন পাঠপ্রবাহে শিক্ষা দেবার দু'রকম ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। প্রথম হল বিভিন্ন পাঠ প্রবাহের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির স্কুল গঠন করা। এই ব্যবস্থাটি ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে। সেখানে গ্রামার স্কুল, মডার্ন স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুল এই তিন ধরনের স্কুলে তিনটি মুখ্য পাঠপ্রবাহ পড়ান হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল, একই স্কুলে বিভিন্ন পাঠপ্রবাহ পড়ান হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থী তার পছন্দমত পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করতে পারে। আমেরিকায় এই ধরনের বহুসাধক বা বহুমুখী বিদ্যালয় প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও এই ধরনের বিদ্যালয় সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। বহুসাধক বিদ্যালয়ের উপকারিতা থাকলেও এগুলির সমস্যাও কম নয়। এগুলির জন্য প্রশস্ত গৃহ, প্রচুর সাজসরঞ্জাম, বহু শিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সবশেষে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ভারতের মত অর্থ-সংকটগ্রস্ত দরিদ্র দেশে এই ধরনের বিদ্যালয় প্রবর্তন করা বিজ্ঞোচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন।

তাছাড়া বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির সংগঠনমূলক আর একটি সমস্যা বিশেষ গুরুতর। বর্তমান ব্যবস্থায় অষ্টম শ্রেণীর শেষেই শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক পাঠস্তর বেছে নিতে হয় এবং সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে এই বৃত্তিমূলক পাঠধারাটিই অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে বুদ্ধি, আগ্রহ, বিবেচনা ইত্যাদির দিক দিয়ে শিক্ষার্থী নিতান্তই অপরিণত থাকে। এই বয়সেই তাকে তার ভবিষ্যৎ পাঠপ্রবাহ ও বৃত্তি নির্বাচন করতে বলাটা মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। অথচ

একবার একটা পাঠক্রম নির্বাচন করে নিলে ভবিষ্যতে তার কোনও পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। সাধারণত পিতামাতার পছন্দ, চাকুরির সুবিধা, সামাজিক মূল্য ইত্যাদির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ পাঠপ্রবাহ ও বৃত্তির নির্বাচন করে থাকে এবং এই নির্বাচন সব সময় যে তার প্রকৃত শক্তি ও প্রবণতার উপযোগী হয় না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৩। অর্থনৈতিক সমস্যা

শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিশেষ ব্যয়বহুল। উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় গৃহ, উন্মুক্ত স্থান, পরীক্ষাগার, পাঠাগার, শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রভৃতি প্রয়োজনের অনুরূপ না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে উঠবে। তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে কেবল মাত্র মুষ্টিমেয়ের অধিকারেই সীমাবদ্ধ নেই। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাও এখন সকলের অধিকারের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভারতে ব্যাপকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রথমত, মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যাও যথেষ্ট সংখ্যায় বাড়াতে হবে। ভারতের ক্রমবর্ধমান স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে হলে বহু নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এর জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির সুপরিচালনার জন্য তাদের যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিতে হবে। সাধারণত মাধ্যমিক বিদ্যালয় আয়ের উৎস দুটি, এক—সরকারী অর্থসাহায্য, দুই—ছাত্রদের বেতন, জনসাধারণের দান ইত্যাদি। এর মধ্যে ছাত্রদের বেতন বা অন্য উপায়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সেজন্য সরকারের উদার অর্থসাহায্য অপরিহার্য। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী অর্থ সাহায্যের যে নীতি অনুসরণ করা হয় তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট খাতে খরচা করার পর বছরের হিসাবে যে টাকার ঘাটতি পড়ে সেইটি সরকার বিদ্যালয়গুলিকে দিয়ে থাকেন। একে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা বলা হয়। যে সব অঞ্চলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা তেমন উন্নত নয় এবং শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণ যেখানে খুব উৎসাহী নয় সে সব অঞ্চলে গ্রাণ্ট-ইন-এড

প্রথা বিদ্যালয়গুলির উন্নতির পথে বিঘ্ন হয়েই দাঁড়ায়। গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার মধ্যে ব্যয় নির্বাহের কোন স্বাধীনতা থাকে না এবং কোন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক দায়িত্ব এড়াবার জন্যই ব্রিটিশ আমলে এই গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার প্রচলন করা হয়েছিল। বর্তমান স্বাধীন ভারতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিচার করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যের আরও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করা উচিত।

৪। পাঠক্রমমূলক সমস্যা

পাঠক্রমের সমস্যা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। পাঠক্রম সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত না হলে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যর্থ হবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও কৌশলের আহরণের দিকে যেমন দৃষ্টি দিতে হয় তেমনি শিক্ষার্থীর সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক ও নৈতিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের প্রতিও সযত্ন মনোযোগ দিতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমটিকে যে বহুমুখী করতে হবে এ বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবৈজ্ঞানিকরা একমত। বিভিন্ন মানসিক শক্তি ও আগ্রহ সম্পন্ন বিভিন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদার উপযোগী করে পাঠক্রমকে গড়ে তুলতে হলে পাঠক্রমটিতে যত বিভিন্নধর্মী বিষয় ও কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা যাবে ততই ভাল। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠক্রমটিতে এতদিন কোন বিভিন্নতার স্থান ছিল না। বর্তমানে নবপ্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছে। যদিও এই নতুন পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবু এর দ্বারা পাঠক্রমের এই গুরুতর সমস্যাটির যে কিছুটা সমাধান হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পাঠক্রমের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে এটিকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলা। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সমগ্র পাঠক্রমটি সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখান উচিত। কিন্তু এই ধরনের কর্মকেন্দ্রিক পাঠ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যথেষ্ট শক্ত। আমাদের নব প্রবর্তিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক শিল্পকার্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এটিকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলা চলে না।

এছাড়াও পাঠক্রমের আরও অনেক সমস্যা আছে। অর্থাভাব, উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামের অভাব, যথোচিত পরিকল্পনার অভাব, অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি কারণে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের বহু সমস্যা অসমাধিত রয়ে আছে।

৫। শিক্ষক-সংক্রান্ত সমস্যা

শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকের গুণ ও দক্ষতার উপর। সেজন্য শিক্ষাঘটিত নানা সমস্যা মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা এবং শিক্ষক সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিক্ষকদের সমস্যা বহুবিধ। প্রথমত, তাঁদের বেতনের হার অত্যন্ত শোচনীয়, দ্বিতীয়ত, অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা যে সব সুখ-সুবিধা ভোগ করেন শিক্ষকেরা সেই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তৃতীয়ত, সমাজে শিক্ষকদের স্বাভাবিক পদমর্যাদা অত্যন্ত নীচু। চতুর্থত, শিক্ষকবৃত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত আইনকানুন নেই। এসব কারণে সুযোগ্য ব্যক্তিরা শিক্ষকবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হন না এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় পর্যাপ্তসংখ্যক সুশিক্ষক পাওয়া যায় না।

শিক্ষকদের শিক্ষণের সমস্যাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যকরী হতে পারে না বিশেষ করে আধুনিক বহুসাধক বিদ্যালয়-গুলিতে যে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছে তার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের দরকার। কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের চেয়ে নিতান্তই কম। তার কারণ হল প্রথমত, শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই রাজী হন। দ্বিতীয়ত, দেশের শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা মোটেই আশানুরূপ নয়। বর্তমানে যে কয়টি শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি প্রয়োজনীয় শিক্ষক সরবরাহে সমর্থ নয়। শিক্ষক শিক্ষণের প্রচলিত পাঠক্রমগুলিও নিতান্ত প্রাচীনপন্থী ও কার্যকরী শিক্ষাদানে সমর্থ নয়। এগুলিরও সংস্কার প্রয়োজন। তৃতীয়ত, শিক্ষণকামী শিক্ষকদের অর্থসাহায্যের আশানুরূপ ব্যবস্থা নেই।

৬। অন্যান্য সমস্যা

উপরে বর্ণিত কারণগুলি ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকরূপে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উল্লেখ করা যায়। যথা—

(ক) সরকারী উদাসীনতার নীতি।

(খ) জনসাধারণের শিক্ষাচেতনার অভাব।

(গ) অভিভাবকদের দারিদ্র্য, ইত্যাদি।

(ক) ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ হল সরকারী ঔদাসীন্য। শিক্ষার উন্নয়নে ভারত সরকারের নিশ্চেষ্টতা ও অবহেলার নীতি

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সবচেয়ে আগে দরকার। আমাদের সরকার এই সত্যটি উপলব্ধি করেন না। সমস্ত আধুনিক প্রগতিশীল দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের দ্বিপ্রাহরিক আহার, বই, যাতায়াতের ব্যয় এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদও দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে থাকে কিন্তু ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা দূরে থাকুক প্রাথমিক শিক্ষাকেই সর্বজনীন ও অবৈতনিক করা এখনও সম্ভব হয় নি। শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের এই উদাসীনতার নীতি জাতির অগ্রগতিকে পশ্চাদ্‌মুখীই করে তুলেছে।

(খ) ভারতের সাধারণ জনগণই শিক্ষাবর্জিত। তার ফলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সচেতন নন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা এইজন্য তাঁরা উপলব্ধি করেন না।

(গ) ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয় নি। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষা যথেষ্ট ব্যয়বহুল শিক্ষা। স্কুলের বেতন, বই, খাতা, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম, যাতায়াতের ব্যয়ভার ইত্যাদি মিলিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর পেছনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে হয়। ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য সুবিদিত। ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্যের অভাবে অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের বহুক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে পারেন না। যতদিন না অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত ভারতেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হচ্ছে ততদিন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব নয়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature and significance of Secondary Education. What are the chief aims and objectives of Secondary Education ?

Ans. (পৃঃ ৩১—পৃঃ ৩৪)

2. Give a short account of the major problems of Secondary Education in India. How can they be solved ?

Ans. (পৃঃ ৩৫—পৃঃ ৪১)

চার

বহুসাধক বিদ্যালয় (Multipurpose School)

ভারতে এতদিন ধরে প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগঠনটি অসংখ্য ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত ছিল। তার ফলে তার দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হত না। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরা কোন কার্যকরী বৃত্তি অনুসরণ করতে পারত না। ফলে দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। এই গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ফলে দেখা দিয়েছে আধুনিক বহুসাধক বিদ্যালয়গুলি।

গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন

ভারতে বিদ্যালয়-শিক্ষাব আয়ুষ্কাল এতদিন দশবর্ষব্যাপী ছিল—প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। তার মধ্যে প্রথম চার বা পাঁচ বৎসরের শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা বলে ধবা হত। বাকী পাঁচ বা ছয় বছরের শিক্ষাকালকে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা হত।

এই মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠক্রম সর্বত্র একই প্রকৃতির ছিল। তার মধ্যে কোন-রকম বিভিন্নতা বা বহুমুখিতা ছিল না। সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে নীচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হত। যথা (১) ইংরাজী (২) মাতৃভাষা (৩) সংস্কৃত (৪) হিন্দী (রাষ্ট্রভাষা বলে গৃহীত হবার পর থেকে) (৫) ইতিহাস (৬) ভূগোল (৭) গণিত (৮) বিজ্ঞান (৯) পৌরনীতি। মেয়েদের ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়াও কোন কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

এই দশম শ্রেণীর বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছেলেমেয়েদের কলেজে অন্তঃমধ্যীয় পাঠস্তর (ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স) দু'বছরের জন্য পড়তে হত এবং এই স্তর থেকে পাশ করে, তারা স্নাতক-স্তরে পড়ার যোগ্যতা লাভ করত। এই গতানুগতিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে আন্দোলন চলে আসছে এবং সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আধুনিক বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির সৃষ্টি হয়েছে।

বহুসাধক বিদ্যালয়ের ইতিহাস

গতানুগতিক একমুখী বিত্থালয়গুলি যে বিভিন্ন রুচি ও শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে সমর্থ নয় একথা বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা বহু আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই ধরনের বিত্থালয়গুলি থেকে যে সব ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করে বেরোত তারা লেখাপড়ার কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারত না। ফলে লেখনীজীবী কেরাণীর চাকরী ছাড়া আর কোন কাজে এদের নিযুক্ত করা সম্ভব হত না। এইজন্য শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল।

হাণ্টার কমিশন—১৮৮২

১৮৮২ সালে হাণ্টারের সভাপতিত্বে যে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনটি বসে তাঁরাই প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্নতা আনার প্রস্তাব করেন। এই কমিশনটি মাধ্যমিক বিত্থালয়ের দুটি ভিন্ন প্রকৃতির পাঠক্রম প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। প্রথমটিকে 'এ' কোর্স নাম দেওয়া হয়। এই স্তরটি পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী পাঠস্তর। এই স্তরের পাঠশেষে উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিত্থালয়ে প্রবেশ করা যাবে। দ্বিতীয় স্তরটিকে 'বি' কোর্স নামে দেওয়া হয়। এই স্তরটি সাহিত্যবর্জিত পাঠস্তর ছিল। এই স্তরে বাণিজ্যমূলক, কারিগরি ও অন্যান্য বিষয় পড়ানোর প্রস্তাব করা হয়।

কমিশনের এই প্রস্তাব মত মাধ্যমিক বিত্থালয়ে দুটি ভিন্নধর্মী পাঠস্তরের প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি সে সময় মোটেই জনপ্রিয়তা লাভ করে নি এবং কিছুদিন পরেই এই পাঠস্তরটি বন্ধ করে দিতে হয়।

কার্জনের নির্দেশ—১৯০৪

বিংশ শতাব্দীতে লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষার এই একমুখিতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠস্তরে ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন।

স্যাডলার কমিশন—১৯১৭

১৯১৭ সালে স্যাডলারের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় কমিশন বসে। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড স্থাপন, ডিগ্রী স্তর থেকে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরকে পৃথকীকরণ এবং তিন বছরের ডিগ্রীপাঠস্তর প্রবর্তনের নির্দেশ দেন।

এই প্রস্তাব তিনটি অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিকেই তখন বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় নি।

হার্টগ কমিটি—১৯২৯

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিও মাধ্যমিক শিক্ষার একমুখিতার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতি বৎসর অসাফল্যের বিরাট হারের কারণ দেখাতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন আয়োজন নেই সেইহেতু প্রতিবৎসর এত বেশী সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে থাকে। এই কমিটির মতে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করাই এই গলদ দূর করার প্রধান উপায়।

সপ্রু কমিটি—১৯৩৫

১৯৩৫ সালে সপ্রু কমিটি ভারতের বেকার সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে একই কথা বলেন। তাঁদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা নিছক সাহিত্যধর্মী হওয়ার জন্যই শিক্ষিত যুবকেরা শিল্প বাণিজ্য, কারখানা প্রভৃতিতে চাকরী পাচ্ছে না। সেইজন্য এই কমিটি নীচের উপায়গুলি অবলম্বনের নির্দেশ দেন।

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করতে হবে। (খ) ইণ্টারমিডিয়েট পাঠস্তরকে বিলুপ্ত করতে হবে। (গ) ডিগ্রী স্তর এবং মাধ্যমিক স্তর উভয়েরই স্থিতিকাল এক বছর করে বাড়াতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ তিন বছরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

উড এ্যাবট রিপোর্ট—১৯৩৭

১৯৩৭ সালে উড ও এ্যাবট নামে দুজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে ভারতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁদের বক্তব্যটি উড এ্যাবট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টটিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পাঠক্রম প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়।

সার্জেন্ট রিপোর্ট—১৯৪৪

১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের শিক্ষাবিবরণীতে উড-এ্যাবটের প্রস্তাবটিকে সমর্থন করা হয়। এই বিবরণীটি সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণধর্মী এবং বৃত্তিমূলক দু রকম পাঠক্রম পাশাপাশি প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

তারাচাঁদ কমিটি—১৯৪৮

স্বাধীনতা লাভের পরেই ১৯৪৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য তারাচাঁদ কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটিও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করা একান্ত প্রয়োজন বলে মত দেন।

মুদালিয়ার কমিশন—১৯৫২

১৯৫২ সালে ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা তৈরীর জন্য ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। আধুনিক বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির পরিকল্পনাটি এই কমিশনেরই অবদান। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বহুবিধ সংস্কারের প্রস্তাব করেন এবং ভারতে বহুসাধক বিদ্যালয় প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। এই সম্পর্কে কমিশনের প্রধান নির্দেশগুলি হল এই—

ক) বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল দশ বছরের জায়গায় এগারো বছর হবে।

খ) ইণ্টারমিডিয়েট স্তর বিলুপ্ত করতে হবে।

গ) ডিগ্রীস্তর তিন বৎসরব্যাপী হবে।

ঘ) বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শেষ তিন বছরের পাঠক্রম বহুমুখী হবে। অষ্টম শ্রেণীর পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমত পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করে নিতে পারবে।

ঙ) শেষ তিন বছরের পাঠক্রমে সাতটি বিভিন্ন পাঠপ্রবাহ থাকবে। নিজের পছন্দ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থী যে কোন একটি প্রবাহ নির্বাচন করতে পারবে। এই প্রবাহ সাতটি হল—(১) মানববিজ্ঞানাদি, (২) সাধারণবিজ্ঞানাদি, (৩) কারিগরি বিষয়াদি, (৪) বাণিজ্যিক বিষয়াদি, (৫) কৃষি, (৬) চারুকলা এবং (৭) গৃহবিজ্ঞান।

চ) এছাড়াও বহুসাধক বিদ্যালয়ে একটি শিল্পকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

মুদালিয়ার কমিশনের এই নির্দেশগুলি ভারত সরকার গ্রহণ করেন এবং বহুসাধক বিদ্যালয় প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে গতানুগতিক দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে পরিবর্তিত করে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত করা সুরু হয়েছে। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে প্রচুর অর্থসাহায্য বরাদ্দ করেছেন। অনেক রাজ্যেই পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকে আধুনিক বহুসাধক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হচ্ছে।

বহুসাধক বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পাঠক্রম

মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশগুলি অবলম্বনে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রদেশে বহুসাধক বিদ্যালয় (Multipurpose School) স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১১টি ক্লাশ থাকে। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। ৯ম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারবে। তবে নির্বাচনীয় বিষয়গুলি ছাড়া পাঠক্রমে কতকগুলি কেন্দ্র-বিষয় (core subject) আছে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই সেগুলি শিক্ষা করতে হবে। এগুলির মধ্যে ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, শিল্প, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি থাকে। এই বহুসাধক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শিক্ষার্থীরা সোজা তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে যোগ দিতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত এই নতুন বহুসাধক স্কুলের পাঠক্রমটির বর্তমান রূপের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল :

'ক' বিভাগ—ভাষা :

(নীচের প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে একটি করে ভাষা নিতে হবে)

১। প্রথম ভাষা—বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী নেপালী ও উর্দু বা একটি অনুমোদিত ভাষা এবং প্রাথমিক হিন্দীর মিশ্রিত পাঠক্রম।

২। দ্বিতীয় ভাষা—ইংরাজী (ইংরাজী যাদের প্রথম ভাষা নয়) বা বাংলা (বাংলা যাদের প্রথম ভাষা নয়)।

৩। তৃতীয় ভাষা—রাষ্ট্রভাষা বা হিন্দী ভাষা।

৪। চতুর্থ ভাষা—একটি প্রাচীন ভাষা। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

'খ' বিভাগ—সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাথমিক গণিত :

সমাজ বিজ্ঞানকে একটি ব্যাপক বিষয়রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিকে এর অন্তর্গত করা হয়েছে। এই বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ করা। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ঘটনা নিবিড়ভাবে জড়িত, সেগুলিকে কেন্দ্র করেই সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রণীত হয়েছে।

'গ' বিভাগ—একটি শিল্প :

বয়ন শিল্প, কাঠ শিল্প, বাগান শিল্প, সীবন শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কারিগরী শিল্প, প্রভৃতির মধ্যে থেকে যে কোন একটি শিল্প।

'খ' বিভাগ—নির্বাচনের বিষয়সমূহ :

এই বিষয়গুলিকে ৭টি পাঠপ্রবাহে ভাগ করা হয়েছে : (১) মানবতত্ত্বমূলক বিজ্ঞান (২) সাধারণ বিজ্ঞান, (৩) কারিগরী বিষয়, (৪) বাণিজ্যিক বিষয়, (৫) কৃষি বিষয়, (৬) চারুকলা ও (৭) গৃহবিজ্ঞান।

মুদালিয়র কমিশন বহুমুখী পাঠব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেছেন, সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে হলে প্রচুর অর্থব্যয় অপরিহার্য। তাছাড়া এর জন্য বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরও প্রচুর প্রয়োজন। তার এখনও এদেশে যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, অষ্টম শ্রেণীর পরেই শিক্ষার্থীর রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে বহুমুখী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের ব্যাপারেও অনেকে বলে থাকেন যে, এত অল্প বয়সে পাঠপ্রবাহ নির্বাচনের যোগ্যতা জন্মায় না। ঐ অপরিণত বয়সে পাঠপ্রবাহ নির্বাচনে কোন ভুল হলে ডিগ্রী কোর্সে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে আর কোন পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। ইংল্যাণ্ডে এই ধরনের বহুসাধক স্কুলশিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ভার্নন বিরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

বহুসাধক বিদ্যালয়ের গুণাবলী

গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলির তুলনায় সাম্প্রতিক কালের বহুসাধক বিদ্যালয়গুলি যে অনেক দিক দিয়ে উন্নত এবং আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির গুণাবলীর মধ্যে নীচের গুণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রমটিকে বহুমুখী করা হয়েছে। নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী তার পছন্দ মত পাঠধারা বেছে নিতে পারে। আগে মাত্র একই প্রকৃতির পাঠক্রম থাকায় শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের কোন সুবিধা পেত না কিন্তু বর্তমানে সাতটি বিভিন্ন পাঠ প্রবাহের প্রবর্তন করায় শিক্ষার্থীর পক্ষে তার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী পাঠপ্রবাহটি বেছে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আজকাল মনোবিজ্ঞানে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর অর্থ হল যে বিভিন্ন ব্যক্তির সামর্থ্য, রুচি ও আগ্রহ বিভিন্ন। বহুসাধক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমটিকে এই মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির উপরই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

২। কতকগুলি সমধর্মী বিষয়কে একত্রিত করে ব্যাপক পাঠ্যবিষয়ের

পরিকল্পনাটি বহুসাধক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করা হয়েছে। যেমন, সমাজবিদ্যা, মানবতামূলক বিষয়াদি, কারিগরি বিষয়াদি, বাণিজ্যিক বিষয়াদি ইত্যাদি। এই ধরনের পাঠক্রমকে ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম বলা হয়। এর দ্বারা বিষয়বিভাজনের ত্রুটি পুরোপুরি দূর করা না গেলেও কিছুটা যে দূর করা গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩। পাঠক্রমটিকে আবশ্যিক কেন্দ্রীয় এবং নির্বাচনমূলক প্রান্তীয়—এই দুই শ্রেণীর বিষয়ে ভাগ করায় সমস্ত শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে যেমন একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সমতা রাখা সম্ভব হয়েছে তেমনি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিজস্ব সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠস্তরে বিশেষধর্মী জ্ঞান অর্জন করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪। পাঠক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে একটি শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করায় শিক্ষার্থী সৃজনমূলক কাজ সম্পাদনের সুযোগ পেয়েছে এবং এর ফলে তার সহজাত সৃজনীস্পৃহাটি তৃপ্তিলাভ করতে পারবে।

৫। পাঠক্রমে শিল্পকার্য প্রবর্তন করার ফলে পাঠক্রমটি অনেকখানি সক্রিয়তা-ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। গতানুগতিক নিছক তত্ত্বমূলক পাঠক্রমের চেয়ে এ ব্যবস্থা যে অনেক উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৬। শিল্পকার্য পাঠক্রমভুক্ত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ বিকশিত হতে পারবে। শিল্প অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগিতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য প্রভৃতি বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের মধ্যে বিকাশলাভের সুযোগ পাবে। তাছাড়া আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত সমাজের দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি যে অবহেলাপূর্ণ মনোভাব আছে সেটি এখন দূর হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা কায়িক পরিশ্রমের মূল্য উপলব্ধি করবে এবং তার যথোচিত সম্মান দিতে শিখবে।

৭। সাহিত্যধর্মী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠ্যবিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং কিছু পরিমাণে বৃত্তিশিক্ষাও লাভ করতে পারবে। এর ফলে মাধ্যমিক পাঠস্তরের শেষে যদি তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ নাও হয়, তাহলে কোন না কোন বৃত্তি গ্রহণ করার মত প্রাথমিক যোগ্যতা তাদের থাকবে। বলাবাহুল্য এই বৃত্তিধর্মী বিষয়গুলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পাঠক্রমটি আগের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

৮। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির পাঠগ্রহণের কাল এক বছর বাড়িয়ে দশ বছরের জায়গায় এগার বছর করা হয়েছে। এর ফলে মাধ্যমিক পাঠক্রমটিকে আরও বেশী করে সুসংগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে মাধ্যমিক পাঠস্তরের স্থায়িত্বের

স্বল্পতার জন্য কোনও বিষয়ই সুষ্ঠুভাবে পড়ানো সম্ভব হত না। যা পড়ানো হত তা নিতান্তই খণ্ডধর্মী ও বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির ছিল। ফলে সে পাঠ থেকে কোন স্থায়ী মূল্য শিক্ষার্থীরা পেত না এবং ফলে পরবর্তী স্তরে ঐ পাঠেরই আবার পুনরাবৃত্তি করতে হত। কিন্তু বর্তমানে পাঠস্তরের দায়িত্ব এক বছর বাড়ানোর ফলে অধিকতর সুপরিকল্পিত ও সুসম্পূর্ণ পাঠক্রম প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্য ও ব্যবহারিক কার্যকারিতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

৯। বর্তমান ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যাওয়া যাবে। মধ্যবর্তী ইণ্টারমিডিয়েট স্তরটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের পঠনীয় পাঠক্রমের বেশ কিছুটা অংশ মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাতে মাধ্যমিক স্তরটি সমৃদ্ধতর ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং জ্ঞান ও কৌশল আহরণের একটা সুসম্পূর্ণ পর্যায়রূপে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

১০। স্নাতক স্তরটির স্থায়িত্বও এক বৎসর বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ স্তরটির পাঠক্রমটি অধিকতর সম্পূর্ণ ও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মধ্যবর্তী ইণ্টারমিডিয়েট পাঠস্তরটি বিলুপ্ত হওয়ায় মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলে এই দুটি শিক্ষাস্তরের মধ্যে অধিকতর সংহতি ও সমন্বয়ন সহজেই দেখা দেবে। ডিগ্রী স্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী একদিকে যেমন মাধ্যমিক স্তরের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব হবে তেমনই অপর দিকে মাধ্যমিক স্তরের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিগ্রী স্তরটিকেও সংগঠিত করা যাবে।

বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির অসম্পূর্ণতা ও সমস্যা

বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও এগুলির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা প্রচুর। বিশেষ করে বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বিবিধ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি থেকে আশানুরূপ ফল লাভ করা শক্ত হয়ে উঠেছে। বহুসাধক বিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১। এই বিদ্যালয়গুলির পরিকল্পনা অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের একটি বিশেষ পাঠপ্রবাহ বেছে নিতে হবে। মানবতত্ত্ব, বিজ্ঞান,

কারিগরি, বাণিজ্যবিষয়, কৃষি, চারুকলা ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান—এই সাতটি পাঠ-প্রবাহের মধ্যে থেকে যে কোন একটি পাঠপ্রবাহ শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাধারা রূপে নির্বাচিত করে নিতে হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই নির্বাচিত পাঠপ্রবাহটির দ্বারাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বরূপ ও প্রকৃতি চরমভাবে নির্ধারিত হবে এবং প্রচুর অসুবিধা ও অপচয়কে স্বীকার না করে নিলে কোন কারণে পরে তার আর পরিবর্তন করা যাবে না। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রকৃতিও এই নির্বাচনের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং ইচ্ছা ও রুচি থাক আর না থাক, শিক্ষার্থীকে উচ্চস্তরের পড়াশোনাও ঐ পাঠপ্রবাহ অনুযায়ীই করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন শিক্ষার্থী যদি মানবতত্ত্বমূলক বিষয়গুলি নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তাহলে তার পক্ষে পরে সাধারণ বিজ্ঞান-মূলক বা কারিগরি বা বাণিজ্যিক বা অন্য কোনও পাঠধারা স্নাতকস্তরে অনুসরণ করা সম্ভব হবে না এবং তার ভবিষ্যৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ঐ মানবতত্ত্বমূলক বিষয়-গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার কোন শিক্ষার্থী যদি কারিগরি বা বিজ্ঞানমূলক পাঠপ্রবাহ নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তাহলে তাকেও ভবিষ্যতে ঐ বিশেষ পাঠপ্রবাহ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তার বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ঐ প্রবাহ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

কিন্তু বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানী এই ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সাধারণত অষ্টম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীদের বয়স ১৪+তে গিয়ে দাঁড়ায়। এই বয়সে ভবিষ্যৎ বৃত্তি পাকাপাকি নির্বাচন করে নিতে বলাটা মনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে। কারিগরি, বাণিজ্যিক, চারুকলা ইত্যাদি বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিতে উৎকর্ষ দেখাতে হলে বিভিন্ন বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির প্রয়োজন। মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী শিশুর মধ্যে বিশেষ শক্তি-গুলি প্রথম দিকে পূর্ণ বিকশিতরূপে থাকে না, পরে শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে বিকাশ-লাভ করে। শিশুর মানসিক শক্তির পরিণতিকাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে ১৫ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে যে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির পূর্ণ পরিণতি ও বিশেষীভবন ঘটে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব বিশেষধর্মী বিষয়গুলি শেখার সময়কে ১৪+তে পাকাপাকি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া যে সব সময় কার্যকরী নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ইংলণ্ডেও ১৪+বয়সে বিভিন্ন স্কুলে যোগদানের ব্যবস্থা করা আছে। এই একই কারণে ভার্নন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা ইংলণ্ডের এই ব্যবস্থারও সমালোচনা করেছেন। তবে ইংলণ্ডে

এক ধরনের স্কুলে যোগ দেওয়ার পর প্রয়োজন বুঝলে আর এক ধরনের স্কুলে পরিবর্তন করার স্বাধীনতা শিক্ষার্থীরা ভোগ করে থাকে। আমাদের দেশে প্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে কিন্তু এ স্বাধীনতা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় না তার ফলে একবার তারা যে পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করে নেয় সেটিই তারা চিরকালের জন্য অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। এতে কেবল যে অনুপযোগী পাঠক্রম নির্বাচনের আশঙ্কাই থাকে তাই নয়, একবার অনুপযোগী পাঠক্রম নির্বাচিত করা হলে পরে তা সংশোধন করারও কোন উপায় থাকে না।

২। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রমকে বহুমুখী করার ফলে আরও একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটি হল বিষয় নির্বাচনের পদ্ধতি। কোন্ শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন্ পাঠপ্রবাহ উপযোগী এটি নির্ধারণ করার কোন সুচিন্তিত মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি আমাদের দেশে এখনও তৈরী হয় নি। তার ফলে এমন কতকগুলি ব্যাপার বা বিষয়ের বিবেচনা করে শিক্ষার্থীকে পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করতে হয় যেগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রকৃত যোগ্যতা বা মানসিক শক্তির কোনও সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পিতামাতার পছন্দ, চাকুরীর সুবিধা, সামাজিক বৃত্তিঘটিত মূল্য ইত্যাদির কথা চিন্তা করেই শিক্ষার্থীর পাঠপ্রবাহ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এতে অনেক ক্ষেত্রেই যে শিক্ষার্থীর প্রকৃত উপযোগী পাঠপ্রবাহ নির্বাচিত হয় না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠক্রম নির্বাচনের জন্য নানা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। ভারতে যতদিন না এই ধরনের বিষয় নির্বাচনের বিজ্ঞানভিত্তিক আয়োজন করা হচ্ছে ততদিন শিক্ষার্থীরা বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের কোন উপকারিতাই লাভ করতে পারবে না।

৩। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম প্রগতিশীল হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়। বিষয় বিভাজনের অপকারিতা দূর করার জন্য এতে ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তিত করা হলেও বিষয়বিভাজনের মৌলিক নীতিটি এখানে অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে। এই পাঠক্রমে বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে কৃত্রিম বিভিন্নতা দূর করে সেগুলির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করার কোন চেষ্টা করা হয় নি। এখানে বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলির স্বতন্ত্র সত্তা গতানুগতিক পন্থাতেই বাজায় রেখে কেবলমাত্র সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণী বা গুচ্ছে সাজান হয়েছে। যেমন মানবতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান,

কারিগরি ইত্যাদি। এর ফলে পাঠক্রমের বিষয়বিভাজনের ত্রুটিটি যেমন তেমনই থেকে গেছে।

৪। পাঠক্রমটির আর একটি বড় দোষ হল যে এটি প্রকৃত কর্মকেন্দ্রিক হয়নি। যদিও একটি শিল্পকে বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তবু কর্মকেন্দ্রিক বা সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রম বলতে যা বোঝায় এটি তা হয় নি। আধুনিক প্রগতিশীল পাঠক্রমে সমাজসেবা, কৃষ্টিমূলক কার্যাবলী, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাগুলিকে পাঠক্রমের সঙ্গে এমনভাবে সুসমন্বিত করা হয় যে পূর্ণ পাঠক্রমটি সক্রিয়তাভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে। এককথায় শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলি এবং জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি বাস্তব যোগসূত্র স্থাপন করাই বাস্তবভিত্তিক পাঠক্রম গঠন করাব উপায়। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে বহিঃপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রবর্তিত করা হলেও সেগুলির সঙ্গে পাঠ্যবিষয়গুলিব কোন স্বাভাবিক যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা হয়নি।

৫। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে গতানুগতিক দশ বৎসরের স্থানে এগার বৎসরের পাঠব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। এর ফলে পাঠক্রমটি আগের চেয়ে অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও সুগঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে এগার বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষাও পর্যাপ্ত নয়। তাঁদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কার্যকরী করে তুলতে হলে এটিকে বার বৎসর ব্যাপী করতে হবে। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে লর্ড সার্জেণ্টকে মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন সম্বন্ধে মতামত দেবার জন্য যখন আনা হয় তখন তিনি বার বৎসরব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার স্বপক্ষেই মত দেন। ইংলণ্ডেও মাধ্যমিক শিক্ষার আয়ুষ্কাল হল বার বৎসর। ১৯৬৩ সালে অখিল ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পবিচালনা সংসদেও মাধ্যমিক শিক্ষাকে বার বৎসর ব্যাপী করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অথচ যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ব্যবস্থাপক মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান নতুন বিদ্যালয়গুলি বাস্তবক্ষেত্রে পরিচালনা করেন তাঁরা এগার বৎসরব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সন্তোষজনক বলে বর্ণনা করেন না। তাঁদের মতে পুরাতন দশ বৎসরব্যাপী স্কুলগুলির ব্যবস্থাই অধিকতর কার্যকরী ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানশিক্ষক পরিষদের অভিমত অনুযায়ী এগার বৎসরের বিদ্যালয়গুলি থেকে মোটেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা দশ বৎসরের ব্যবস্থাতেই ফিরে যাবার পক্ষপাতী। অতএব দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার আয়ুষ্কাল নিয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে বিরাট মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে আসা একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র

বিদেশীদের অনুসৃত আদর্শকে অন্ধভাবে গ্রহণ করলেই চলবে না, ভারতের নিজস্ব প্রয়োজন এবং সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে মাধ্যমিক শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে।

৬। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে একাধিক পাঠপ্রবাহ একই বিদ্যালয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ, বহু ঘর ও স্থান সম্পন্ন প্রশস্ত বিদ্যালয় গৃহ। উদাহরণস্বরূপ, কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানমূলক ও কারিগরি এই দুটি পাঠপ্রবাহ খুলতে হলে পরীক্ষণাগার, যন্ত্রাগার, ক্লাশঘর প্রভৃতি নিয়ে বিরাট এক বা একাধিক বাড়ীর প্রয়োজন। সব কটি পাঠপ্রবাহ খুলতে হলে কত বিরাট স্থান ও বাড়ীর প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে এই ধরনের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া একান্তই দুরূহ এবং জনসাধারণের পক্ষে এত বড় বিদ্যালয় স্থাপন বা পরিপোষণ করা অসম্ভব বললেই চলে। তাছাড়া কেবল অর্থের ব্যবস্থা থাকলেই হয় না, সহরে স্থানাভাবেই জন্য এমনিতেই উপযোগী বাড়ী সংগ্রহ বা নির্মাণ করাও সম্ভব হয় না। এর ফলে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই কেবলমাত্র মানবতত্ত্বমূলক বিষয়গুলিই পড়ানোর ব্যবস্থাই করা হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষক, অর্থ, স্থান ও সাজসরঞ্জামের অভাবে খুব অল্প স্কুলেই বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্যমূলক বিষয়াদি পড়ানোর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই দুটি তিনটির বেশী পাঠপ্রবাহ প্রবর্তিত করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত মোট ৫৭২টি বহুসাধক বিদ্যালয়ের সব ক'টিতেই মানবীয় পাঠপ্রবাহ ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান-প্রবাহ ছিল মাত্র ৩৬১টিতে, বাণিজ্যপ্রবাহ মাত্র ৬৮টিতে, কারিগরি মাত্র ৪৫টিতে, কৃষি ৪৯টিতে, গৃহবিজ্ঞান ৫৮টিতেএবং চারুকলা মাত্র ২৪টিতে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমকে বহুমুখী বলে বর্ণনা করা হলেও সেগুলিকে সর্বত্র প্রকৃত পক্ষে বহুমুখী করা সম্ভবপর হয় নি।

৭। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির স্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ব্যয়বহুল সাজসরঞ্জাম, বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক, পাঠাগার, পরীক্ষণাগার প্রভৃতির জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ নিয়তই দরকার। বাড়ী নির্মাণের জন্য এককালীন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। জনসাধারণের দাক্ষিণ্য বা শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে এই মোটা টাকা সংগ্রহ করা কখনই সম্ভবপর নয়। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেরা উদার হস্তে টাকা সরবরাহ করলেও প্রয়োজনের তুলনায় সে সাহায্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভারতের মত বিরাট দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে এককালে ব্যয় করা সম্ভব নয়। তার ফলে

দেখা যাচ্ছে বহু গতানুগতিক পুরাতন দশ শ্রেণীর বিদ্যালয় এখনও অপরিবর্তিত অবস্থায় তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পাশাপাশি দুটি চারটি করে নতুন বহুসাধক বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। এই দু-ধরনের বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরম অনিশ্চয়তা ও বৈষম্য দেখা দিয়েছে তার দ্বারা আমাদের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটিই যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৮। বহুসাধক বিদ্যালয়ের আর একটি বড় সমস্যা হল উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া। যে ধরনের বিশেষধর্মী এবং বৃত্তিমূলক বিভিন্ন বিষয়গুলি মাধ্যমিক পাঠস্তরে প্রবর্তিত করা হয়েছে সেগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথেষ্টসংখ্যক ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের দরকার। ভারতে শিক্ষকবৃত্তি মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তার ফলে এমনিতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় না। তারপর শিক্ষণের ব্যবস্থাও আমাদের দেশে খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রয়োজনের তুলনায় তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর ফলে বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন পাঠপ্রবাহ পড়াবার উপযোগী শিক্ষক পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে অনুপযোগী শিক্ষণবর্জিত শিক্ষকদের দ্বারা বহুসাধক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত বিশেষধর্মী বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের পন্থা

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রূপে বহুসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি যে যথেষ্ট প্রগতিশীল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতের বর্তমান অর্থাভাব ও অন্যান্য অসুবিধার জন্যই বহুসাধক বিদ্যালয়গুলি থেকে পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ইংলণ্ডেও এই ধরনের বিদ্যালয় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেখানকার শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা ও বিবেচনার সঙ্গে এ বিষয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের শিক্ষার অধিকর্তারা ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব ও অন্যান্য গুরুতর অসুবিধাগুলির কথা না ভেবেই এই ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার যেমন মন্থর হয়ে গেছে তেমনিই শিক্ষার সুষ্ঠু অগ্রগতিতে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে প্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিকে পূর্ণভাবে কার্যকরী [illegible]

হলে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। সেগুলি সংক্ষেপে হল এই—

১। যেখানে যেখানে পুরাতন দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে প্রকৃতপক্ষে বহুমুখী পাঠপ্রবাহ-সম্পন্ন এগার শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা সম্ভব হবে না, সেখানে সেখানে ঐ পুরাতন দশম শ্রেণীর সংগঠনটি বজায় রাখাই শ্রেয়। তবে যথাসম্ভব পুরাতন পাঠক্রমের সংস্কার সাধন করে ঐ বিদ্যালয়গুলিকে আরও কার্যকরী করে তুলতে হবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে প্রবেশের জন্য এই সব বিদ্যালয় থেকে যারা পাশ করে বেরোয় তাদের পাঠমানের সমতার জন্য প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একবছর পাঠগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রবর্তিত এই স্তরটির সঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সংহতি ও সমন্বয়নের একান্ত অভাব দেখা যায়। তার ফলে এই স্তরের সমস্ত পাঠটাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এই সব বিদ্যালয় থেকে যারা পাশ করে স্নাতকস্তরে প্রবেশ করে তারা অনেক দিক দিয়ে পশ্চাদ্‌পদ থেকে যায়। অতএব এই প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরটির যথাযথ সংস্কার করে মাধ্যমিক এবং ডিগ্রীস্তরের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

৩। বাড়ী বা সাজসরঞ্জামের অভাবের জন্য অনেক বহুসাধক বিদ্যালয়ে একটি দুটির বেশী পাঠপ্রবাহ খোলা সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে ব্যয়বহুল পাঠপ্রবাহগুলি কাগজে কলমে পরিকল্পনারূপেই থেকে যাচ্ছে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার মত প্রগতিশীল বিরাট সহরে কারিগরি পাঠপ্রবাহ সম্পন্ন বিদ্যালয় বর্তমানে কয়টি খোলা হয়েছে তা হাতে গোনা যায়। চারুকলা পাঠপ্রবাহ সম্বন্ধে একই কথা। অতএব এইসব ব্যয়বহুল পাঠপ্রবাহগুলির শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা উচিত। কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত কারিগরি কলেজ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার কারিগরি স্তরটিকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সেই রকম চারুকলার কলেজের সঙ্গেও চারুকলার মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি সংযুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এতে এইসব বিষয়গুলির শিক্ষাদানের সমস্যা বর্তমানে মিটতে পারে।

৪। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিকে কার্যকারী করে তুলতে হলে রাষ্ট্রকে উদার ও ব্যাপক অর্থসাহায্য দিতে হবে। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির উপর সুষ্ঠু শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ী ইত্যাদির যাতে কোনও অভাব না হয় তার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে হবে।

ছাত্র-বেতন বা জনসাধারণের দান থেকে কখনও এই বিরাট অর্থ আসতে পারে না। এর জন্য রাষ্ট্রকে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহের দায়িত্বও সরকারকে নিতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করে ও কাজের নিয়মকানুন সমুন্নত করে প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে এবং তাদের শিক্ষণ দানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। বহুসাধক বিদ্যালয়ে যে সব বিশেষধর্মী বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলির জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। পূর্ণ সময়ের জন্য এই ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের নিযুক্ত করা সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য উচ্চবিদ্যাসম্পন্ন অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণের যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার জন্য সুবন্দোবস্ত করা দরকার। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাধ্যমিক বোর্ডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব আংশিকভাবে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কারিগরি, বাণিজ্য ইত্যাদি ঘটিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বড় বড় কারখানা, শিল্পাগার, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া শিক্ষার পক্ষে পরম সহায়ক হবে। তেমনই চারুকলার ক্ষেত্রে বড় বড় শিল্পী, ভাস্কর প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করবে।

৭। বিষয় নির্বাচনের জন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষার্থীর সহজাত মানসিক শক্তি এবং আগ্রহ পরিমাপ করার জন্য মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার উদ্ভাবন করতে হবে এবং একমাত্র সেগুলির প্রয়োগের দ্বারাই যাতে শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠপ্রবাহ নির্বাচিত হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে। পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের পছন্দ অপছন্দ বা চাকুরীর প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা বিষয়-নির্বাচনের প্রথা একেবারে বর্জন করতে হবে।

৮। শিক্ষার পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান-সম্মত হবে এবং সক্রিয়তার মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। সামাজিক মেলামেশা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ভ্রমণ, সমাজসেবা, গ্রাম-শিবির ইত্যাদি সহঃপাঠক্রমিক কাজগুলি প্রচুর পরিমাণে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০। অষ্টম শ্রেণীর শেষে কোনও বিশেষ পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করার পর প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী যাতে অন্য কোন পাঠপ্রবাহে তা পরিবর্তিত [illegible]

তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্য এই পাঠপ্রবাহের পরিবর্তন যথেষ্ট চিন্তা ও বিবেচনার পরই করা চলবে।

১১। বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত বিষয়গুলির উপর যাতে মাতৃভাষায় ভাল বই লেখা হয় তার জন্য বিশেষজ্ঞদের উৎসাহদান প্রয়োজন। মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য একটি বিশেষ পাঠ্যপুস্তক কমিটি গঠন করে এ সম্বন্ধে ব্যাপক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the development of Multipurpose School in India. Why are they called Multipurpose ?

Ans. (পৃ: ৪২—পৃ: ৪৭)

2. Describe the structure and curriculum of modern Multipurpose School. How far are they effective in India to-day ?

Ans. (পৃ: ৪৬—পৃ: ৫৪)

3. Critically discuss the merits and demerits of Multipurpose School in India. What are your suggestions to improve them ?

Ans. (পৃ: ৪৭—পৃ: ৫৭)

পাঁচ

ভাষার সমস্যা (Problems of Language)

শিক্ষার আর একটি জটিল সমস্যা হল ভাষার সমস্যা। সব দেশের শিক্ষার পরিকল্পনাতেই ভাষা একটি প্রধান স্থান জুড়ে আছে। স্বদেশের ভাষা ছাড়াও বিদেশের প্রগতিশীল ভাষাগুলি শেখার প্রয়োজনীয়তা আজ সকল আধুনিক দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আছে শাশ্বত মর্যাদাসম্পন্ন প্রাচীন ভাষাগুলির দাবী। সেগুলি শেখার মূল্যও সর্বজনস্বীকৃত। এই সব কারণে সবদেশেই শিক্ষার কর্মসূচী রচনা করার সময় ভাষার সমস্যা একটা সমস্যারূপে দেখা দেয়।

ভারতে এ সমস্যা জটিলতর। তার কারণ হল ভারত বহুভাষাভাষী দেশ। বিভিন্ন রাজ্যে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারপর জাতিগত সংহতি আনার উদ্দেশ্যে এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাছাড়া দু'শ বছরের ঐতিহ্য-সম্পন্ন ভারতের শিক্ষিত জনগণের ভাষা ইংরাজীর দাবী ত আছেই। এর পরেও আছে ভারতের প্রাচীন সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উপর এতগুলি ভাষার দাবী এসে পড়াতে আমাদের দেশের শিক্ষায় ভাষার সমস্যা বিশেষ জটিল আকার ধারণ করেছে।

ভাষার সমস্যাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত, শিক্ষার মাধ্যমের সমস্যা, দ্বিতীয়ত, শিক্ষণীয় ভাষার সমস্যা। বর্তমান ভারতে ভাষার এই দ্বিবিধ সমস্যাই যথেষ্ট জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ।

ক। শিক্ষার মাধ্যমের সমস্যা

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যে ভাষার মাধ্যমে শেখান হয় সেই ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম বলা হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি একভাষাভাষী দেশে শিক্ষার মাধ্যমের কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু এই সমস্যাটি গত একশ বছরের উপর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে এসেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ১৮৩৫ সালের বিখ্যাত মেকলের বিবরণীতে (Macaulay's Minute) ফিরে যেতে হয়। [illegible]

ভারতে তাঁদের দেশের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত করছিলেন। ইংরাজী ভাষা তখনও ভারতের ছেলেমেয়েদের ব্যাপক ভাবে শেখনোর ব্যবস্থা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশের বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিই ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে কি না এ সম্বন্ধে মেকলে তাঁর প্রসিদ্ধ বিবরণীতে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সেই সময়ের ইংরাজ শাসকেরা সেইটাই মেনে নেন। ফলে ইংরাজী ভাষা কেবল পাঠ্যরূপেই গৃহীত হল না, শিক্ষার মাধ্যম রূপেও ইংরাজী ভাষাকে গ্রহণ করা হল। মেকলের এই বিবরণীর পর থেকে ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সেই থেকে ইতিহাস ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শেখান সুরু হয়। অবশ্য সে সময় ভারতীয় ভাষাগুলি এতই দুর্বল ছিল যে সেগুলি এই সব বিষয়ের শিক্ষাদানের উপযুক্ত মাধ্যমরূপে কাজ করতে পারত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই সব নানা কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ইংরাজীই শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত হল। ১৮৫৭ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে ইংরাজীকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার উচ্চমানের সঙ্গে সমতা রাখা তখনকার ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। অধ্যাপকগণ সকলেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাছাড়া সে সময় বহু বিদেশী অধ্যাপকের সাহায্য নেওয়া হত। ইংরাজী ভাষার স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল যে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। কোন ভারতীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজীয় স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করার কথা তখন কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ একেবারেই উদাসীন ছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল জনসাধারণের উপর। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমের কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা এবং কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরেই ভারতীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হত।

কিন্তু এ ব্যবস্থা শীঘ্রই নানা দিক দিয়ে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করল। ভারতের শিক্ষাবিদেরা ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু করলেন। এই আন্দোলনে বিশেষ শক্তি যোগালেন সে সময়কার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভারতীয় জননেতারা। ইংরাজদের প্রভাব থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করার জন্য এবং তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য তাঁরা আন্দোলন সুরু করলেন। সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও সমালোচকেরা ভারতীয় ভাষাগুলিকে উন্নত করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। দেখতে দেখতে ভারতীয় ভাষায় নানা পুস্তক লেখা হল। ভারতীয় ভাষাগুলি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

এই মুক্তি আন্দোলনের ফলরূপে দেখা দিয়েছিল কতকগুলি প্রসিদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাকীর হোসেনের জামিয়া মিলিয়া, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, গান্ধিজীর বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং কলকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকেই ভিত্তি করে শিক্ষা পরিকল্পনাকে গড়ে তোলা হয়েছিল।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা

মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পেছনে প্রবল মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। শিক্ষার্থীর কাছে মাতৃভাষাই নতুন জ্ঞান অর্জনের সহজতম মাধ্যম। শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন, বিভিন্ন ধারণা, মনোভাব, চিন্তার উপাদান—এ সবই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে শিশুর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। সে যখন নতুন কিছু জানে, শেখে বা বোঝে সে তখন তা তার মনের এই উপকরণগুলির সাহায্যেই করে থাকে। অতএব শিক্ষার্থীর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা মাতৃভাষার মাধ্যমেই সবচেয়ে সহজ ও তৃপ্তিদায়ক। যদি তাকে কোন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে একই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বলা হয় তাহলে তার পক্ষে তা যে কেবল আয়াসবহুলই হবে তা নয় তার অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে।

নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রধান সহায়ক হল পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলি। হার্বার্টের ভাষায় আমরা পুরাতনের মধ্যে দিয়ে নতুনকে জানি। শিশু তার অধিকাংশ পুরাতন অভিজ্ঞতাই তার মাতৃভাষার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। সেইজন্য সে কোন নতুন অভিজ্ঞতা মাতৃভাষার মাধ্যমে যত সহজে আয়ত্ত করতে পারে তেমন আর কোন ভাষার মাধ্যমে পারে না। এ কথা কেবল শিশুর বেলাতেই সত্য নয়, যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষেই সত্য।

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জনের আর একটি অসুবিধা হল যে—বস্তু, ভাব, ধারণা ইত্যাদির নাম আমরা শৈশবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিখে থাকি। ফলে সেগুলি আমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়বদ্ধভাবে থেকে যায় যে বিদেশী প্রতিশব্দের সাহায্যে সেগুলিকে চেনা বা বোঝা আমাদের পক্ষে আয়াসবহুল হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্যই মাতৃভাষার মাধ্যমে কিছু উপস্থাপিত করলে সেটি শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারে। শিক্ষার্থীর অর্জিত বিদেশী ভাষার শব্দভাণ্ডার কখনই পর্যাপ্ত হতে পারে না এবং এইজন্যই শিক্ষার্থীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় কোনও কিছু পরিষ্কারভাবে বোঝা প্রায়ই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

বাগ্‌ভঙ্গী এবং বর্ণনাকৌশল বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন। অতি শৈশব থেকে বয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে শিশু এই বর্ণনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করে নেয় এবং পরে সেগুলি তার পরিণত চিন্তা, কথাবার্তা, ধারণাগঠন প্রভৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য অন্য কোনও ভাষায় কোন বক্তব্য, বর্ণনা বা ভাব তার সামনে উপস্থাপিত করলে তার সেটি বুঝতে স্বভাবতই অসুবিধা হয়। বিদেশী ভাষার উপর গভীর এবং ব্যাপক অধিকার যতক্ষণ না জন্মাচ্ছে ততক্ষণ ঐ ভাষায় উপস্থাপিত কোন কিছু সম্পূর্ণ বোঝা যেতে পারে না। অন্তত চিন্তার সূক্ষ্ম ও জটিল অঙ্গগুলির সম্বন্ধে যে তার মধ্যে আংশিক বা ভুল জ্ঞান থেকে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই কারণেই মাতৃভাষায় একটি জিনিষ যত সহজে ও পূর্ণভাবে শিশু বুঝতে পারে তত সহজে ও পূর্ণভাবে সে অন্য কোন ভাষায়—সে ভাষা যত সমৃদ্ধ ও উন্নত হোক না কেন—তা বুঝতে পারে না।

মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে শিক্ষকের সমস্যাও তত তীব্র হয় না। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দিতে সমর্থ এমন যোগ্য শিক্ষক যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া শক্ত। কিন্তু মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা বা গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

সবশেষে বিদেশী ভাষায় সাধারণ পাঠ্যবিষয়াদি শেখা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। মাতৃভূমির উপর ব্যক্তির অধিকারকে যেমন জন্মগত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তেমনই মাতৃভাষার উপরও ব্যক্তির অধিকারকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক ও অব্যাহত বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। এটি অন্যান্য স্বাধীনতার মত তার জন্মগত অধিকার। বিদেশীর অধীনস্থ না হলে বিদেশীর ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার কথা উঠতে পারে না। এইজন্য কোন স্বাধীন দেশেই শিক্ষার মাধ্যমের সমস্যা বলে কোন সমস্যাই নেই। ভারত

দু'শ বছরের উপর ইংরাজদের অধীনে থাকার ফলে কথ্য ও লেখ্য উভয় ভাষারূপে ইংরাজী ভারতের সাহিত্য, চিন্তা ও ধারণার রাজ্যে বিরাট একটা স্থান অধিকার করে বসে আছে। তাছাড়া ইংরাজ শাসকেরা নিজেদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত করেছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতে সে প্রয়োজন না থাকায় প্রত্যেক শিশুরই নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার জন্মেছে।

মাধ্যমিকস্তরে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজীভাষা প্রায় একশ বছরের উপর ব্যবহৃত হয়েছিল। সে সময়ে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার কিছুটা যৌক্তিকতা ছিল। প্রথমত, কোনও উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারতীয় ভাষা তখনও গড়ে ওঠে নি। উল্লেখযোগ্য ভাষা বলতে ছিল, আরবী, সংস্কৃত, ফার্সী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা। দ্বিতীয়ত, সে সময়ে ইংরাজ ও ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের অনেকেই ভারতবাসীদের আধুনিক বিজ্ঞানধর্মী শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী হয়েছিলেন এবং সে শিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তৃতীয়ত, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার পরিকল্পনাটিও ইংরাজীশাসকদের ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত করতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু এই সব যৌক্তিকতা থাকলেও বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞান অর্জনে বাধ্য করাটা অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব পন্থাই হয়েছিল। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি বিরাট দুরূহ কাজ হয়ে উঠেছিল। পরে বহু ভারতীয় ইংরাজ শিক্ষাবিদ্ এই প্রথার তীব্র সমালোচনা করেন এবং তার ফলে প্রথাটি বিলুপ্ত হয়।

এখনও অনেক ভারতীয় পিতামাতা ইংরাজী ভাষাকে শিশুর শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত দেখতে চান। ইংরাজী ভাষার সমৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং বৃত্তিঘটিত মূল্য দেখে তাঁরা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরাজীভাষা অবিসংবাদিত ভাবে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম ও শ্রেষ্ঠ ভাষা হলেও ইংরাজী যার মাতৃভাষা নয় এমন শিশুকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। অনেক ভারতীয় পিতামাতা ও অভিভাবক শিক্ষার্থীর ইংরাজীতে পারদর্শিতা বাড়াবার জন্য শিশুকে ইংরাজী-মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করে দেন। এতে যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং তার উপর অযথা মানসিক চাপ দেওয়া হয় এটা তাঁরা বোঝেন না। এর ফলে শিক্ষার্থী ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ

বিষয়গুলি শেখা তার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে এবং শিক্ষাও বহু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ও দুর্বল থেকে যায়। ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করা কাম্য হতে পারে কিন্তু তার প্রকৃত উপায় হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে ইংরাজীর চর্চা করা, ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার্থীর অন্যান্য পাঠ্য বিষয়গুলির মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা নয়।

হিন্দী ভাষার সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের কাছে হিন্দী একই অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। বিদেশী ভাষার চেয়ে হিন্দী শেখা ও বোঝা যদিও সহজ তবু তা মাতৃভাষার মত সহজবোধ্য ও কার্যকরী শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষাই যে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কোথাও কোন দ্বিমত দেখা যায় নি। শুধু শিক্ষার মাধ্যম নয় অনেক শিক্ষাবিদ্‌দের মতে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাও প্রাথমিক স্তরে শেখান যুক্তিযুক্ত নয়।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা চলতে পারে না। ভারতে সুসমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষা বহুদিন ধরে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার দাবী যে সব চেয়ে আগে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরাজী ভাষা

উচ্চশিক্ষাস্তরে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে অনেক বিতর্ক দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দু-চারটি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্রই এখন ইংরাজী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার স্বপক্ষে নীচের যুক্তিগুলি দেওয়া হয়।

প্রথমত, বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার যে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে তাতে ইংরাজী ভাষার অবদান সবচেয়ে বেশী। অতএব ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যত সহজসাধ্য এবং কার্যকরী করা হবে, অন্য ভাষায় তত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমস্যাও ভারতীয় ভাষায় কম নয়। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে পাঠ্যপুস্তক, পরিভাষা ইত্যাদির সমস্যা থাকে না।

তৃতীয়ত, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে যোগ্য শিক্ষক পাওয়াও শক্ত হবে। সমস্ত ভারতীয় শিক্ষকই ইংরাজী ভাষায় অধ্যয়ন করে এসেছেন এবং যাঁদের আমরা বিশেষজ্ঞ বলে সম্মান দিয়ে থাকি তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এই সব শিক্ষকদের পক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া প্রায়ই অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিশেষজ্ঞ ভারতীয় অধ্যাপক পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যায় না এবং উচ্চশিক্ষায় এইজন্য প্রায়ই বিদেশী শিক্ষকদের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দিলে এ সুযোগটি আর পাওয়া যাবে না।

চতুর্থত, বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষা নিছক জ্ঞান আহরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গবেষণা, পরীক্ষণ, নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও তত্ত্বের সংগঠন ইত্যাদি হল আধুনিক উচ্চশিক্ষার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ভারতে এ সবের আয়োজন ও সুযোগ খুবই কম। প্রথম পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় প্রতিনিয়ত অতিদ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলেছে। এই অগ্রগতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে আজকের শিক্ষাদান অচল ও বাতিল হয়ে দাঁড়াবে। এগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থী পরিচিত থাকতে পারে একমাত্র ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র পত্রিকা, বুলেটিন, গবেষণার বিবরণী ইত্যাদির মাধ্যমে।

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করার স্বপক্ষে উপরের যুক্তিগুলি যথেষ্ট সবল হলেও মাতৃভাষার দাবীর কাছে সেগুলি টিঁকতে পারে না। শিক্ষা যে পর্যায়েরই হোক না কেন তার মধ্যে যদি অর্থবোধ ও হৃদয়ঙ্গম করার সমস্যা থাকে তাহলে মাতৃভাষাই যে সহজতম ও সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

একথা সত্য যে উচ্চশিক্ষার স্তরে এমন সব অতিবিশেষধর্মী পাঠ্যবিষয় আছে যা ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া কথনই সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, পারমাণবিক বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্রগুলি শিক্ষা দেবার মত যোগ্যতা কোন ভারতীয় ভাষারই হয় নি। সেজন্য এগুলির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ইংরাজী ভাষার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। তবে যাতে এ সব বিষয়েও ভারতীয় ভাষাগুলি শিক্ষাদানের যোগ্য হয়ে ওঠে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিটি রাজ্যসরকারের ব্যাপক সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

খ। শিক্ষণীয় ভাষার সমস্যা

সব দেশের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভাষা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। ভাষা দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটি অপরিহার্য উপকরণ। বিশেষ করে আধুনিক সভ্য সমাজে ভাষার সাহায্য ছাড়া জীবন যাত্রার উন্নত মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। মাতৃভাষা ছাড়াও প্রগতিশীল বিদেশী ভাষা শেখাও আজকাল সব সভ্য দেশেই উচিত বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিশুর কটি ভাষা শেখা উচিত সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। সকল দেশেই ভাষার শিক্ষা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলেও ভারতের মত এ সমস্যা এত জটিল আর কোথাও নয়।

ভারত বহুভাষাভাষী দেশ হওয়ার ফলে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার অসীম পরিব্যাপ্তির জন্য এই সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পাঠক্রমে চারটি বিভিন্ন ভাষার দাবী দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি, মাতৃভাষা; দ্বিতীয়, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী; তৃতীয়, ইংরাজী এবং চতুর্থ, প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত। বলা বাহুল্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর পক্ষে চারটি ভাষা শিক্ষা করা বেশ কষ্টসাধ্য। এতে তার অন্যান্য সাধারণ জ্ঞান অর্জনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন ভাষার জটিল নিয়মকানুন আয়ত্ত করতে প্রচুর মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করা যথেষ্ট শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। শিশুর বিকাশোন্মুখ মনকে যত কম ভারাক্রান্ত করা যায় তত শিক্ষা আনন্দদায়ক ও কার্যকরী হয়ে উঠবে। সেজন্য নিতান্ত অনিবার্য না হলে শিক্ষাবিদেরা সাধারণ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক ভাষা শেখানোর সমর্থন করেন না।

কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে চারটি ভাষারই দাবী বেশ সবল। এ চারটি ভাষার মধ্যে যে কোন বিশেষ একটি ভাষাকে বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে বহু সুচিন্তিত যুক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তার ফলে ভারতীয় শিক্ষার নীতিনির্ধারকেরা ভাষার সমস্যা নিয়ে প্রায়ই বেশ অসুবিধায় পড়েন এবং এ সম্বন্ধে কোনও সুষম নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় বিভিন্ন রাজ্যে ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা অনুসৃত হয়ে থাকে। এখানে এই চারটি ভাষার দাবীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

মাতৃভাষার দাবী

শিক্ষণীয় ভাষাগুলির মধ্যে মাতৃভাষার স্থান সব চেয়ে আগে। বিশেষ বা অ-সাধারণ ক্ষেত্র ছাড়া শিক্ষার্থীর প্রথম শিক্ষণীয় ভাষা হল মাতৃভাষা। শিশু জন্মাবার পর থেকেই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সুরু করে। তার ইন্দ্রিয়গুলি হল তার অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের দ্বারপথ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি দিতে পারে নিছক মৌলিক অভিজ্ঞতা। সেগুলির সংব্যাখ্যান, প্রসারণ, প্রস্ফুটন ও সমৃদ্ধি সাধন করার একটা বড় উপকরণ হল ভাষা এবং এদিক দিয়ে শিশুর কাছে মাতৃভাষার মত সহজবোধ্য ও শক্তিশালী ভাষা আর কোনও ভাষা হতে পারে না। এই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে এবং যে শিশুর মাতৃ-ভাষা যত পুষ্ট তার জ্ঞানও তত বিবিধধর্মী এবং সুবিস্তৃত। এইজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়স্তরেই মাতৃভাষা অপরিহার্যভাবে শিক্ষণীয় ভাষারূপে স্থান পাবে। তাছাড়া মাতৃভাষার উপর শিশুর অধিকার যাতে বেশ গভীর ও স্থায়ী হতে পারে সেইমত পাঠক্রমটি রচনা করতে হবে এবং শিক্ষার পদ্ধতিকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বর্তমানে সবদেশের শিক্ষাবিদেরাই একমত এবং পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমে মাতৃভাষা অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে মাতৃভাষা পঠনীয় বিষয়রূপে থাকবে কিনা সে বিষয়ে নানা বিরোধী মতবাদ দেখা যায়। বহু শিক্ষাবিদের মতে যেহেতু উচ্চশিক্ষার স্তরে বিশেষধর্মী জ্ঞান নিয়েই চর্চা করা হয় সেহেতু এই স্তরে ভাষামূলক কোন শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই নীতির অনুসরণে আমাদের দেশের বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার স্তরে কোনরকম ভাষামূলক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম রচনার এই নীতি কতকগুলি গুরুতর কারণে সমর্থন করা যায় না। প্রথমত, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা এতই বিশেষধর্মী যে এগুলি থেকে শিক্ষার্থীর মন তার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির খাদ্য খুঁজে পায় না। বিশেষধর্মী বিষয়গুলি মনের আংশিক তৃপ্তি দিতে পারে মাত্র, সম্পূর্ণ মনকে তৃপ্ত করতে পারে না। এর ফলে শিক্ষার্থী কোন একটি বিষয়ে বা জ্ঞানের শাখায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে বটে কিন্তু তার মনের সর্বাঙ্গীণ ও সুষম বিকাশ হয় না। আমেরিকার মত শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগামী দেশে উচ্চশিক্ষায় ভাষামূলক সাধারণ শিক্ষা একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তাতে শিক্ষার্থীরা নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠত বটে কিন্তু তাদের ব্যক্তিসত্তার সংগঠন থেকে যেত অসম্পূর্ণ। এই সব ব্যক্তিদের মনের সংগঠনে একটা বিরাট শূন্যতা থেকে যেত এবং একটা অভাব ও অতৃপ্তিবোধ তাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত। এইজন্য আমেরিকায় আজকে উচ্চশিক্ষার স্তরে সাধারণধর্মী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কমিশনেও সাধারণধর্মী শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কমিশনের মতে উচ্চশিক্ষার স্তরে যদি যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা না রাখা হয় তাহলে উচ্চশিক্ষা কৃত্রিম ও অসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। সর্বস্তরেই সাধারণ শিক্ষা দেবার প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল মাতৃভাষা। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, কৃষ্টিমূলক অগ্রগতি প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

উচ্চশিক্ষার স্তরে মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে আর একটি বড় যুক্তি হল যে মাতৃভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যত বেশী পুষ্ট হয় ততই ভালো। উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে মাতৃভাষায় পঠনীয় কিছু কিছু বিষয় যদি যোগ করে দেওয়া যায় তাহলে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার চর্চা অব্যাহত থাকতে পারে এবং সে মাতৃভাষাতেও উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার স্তরেও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাঁরা বিভিন্ন বিশেষধর্মী বৃত্তিমূলক পাঠস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁরা যাতে মাতৃভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তার আয়োজন করতে হবে।

সুসমৃদ্ধ ইংরাজী ভাষার তুলনায় ভারতীয় ভাষাগুলির বহুদিক দিয়ে অসম্পূর্ণতা থাকলেও ভারতীয়দের শিক্ষায় ভারতীয় ভাষাকেই শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম করে তুলতে হবে। এর জন্য ভারতীয় ভাষাগুলিকে নতুন নতুন সৃষ্টির সংযোজনে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, শব্দমালাকে প্রসারিত করতে হবে এবং প্রগতিশীল ভাব ও চিন্তাধারার পরিপোষণে ভাষার মানের উন্নয়ন করতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টির দ্বারা ভারতীয় ভাষাগুলিকে বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী করে তুলতে হবে এবং যাতে কৃতী অধ্যাপক ও চিন্তাবিদেরা ভারতীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ লেখেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইংরাজী ভাষার দাবী

ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার পরেই দাবী হল ইংরাজী

ভাষার। ইংরেজী ভাষা যদিও বিদেশী শাসকদের ভাষা ছিল, তবু গত দুশো বছরের উপরেও ভারতের শিক্ষিত জনসমাজে ইংরাজীর প্রাধান্য কেউই অস্বীকার করেন নি। ইংরাজী ভাষা পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। শব্দসম্ভার, ভাবসমৃদ্ধি, বর্ণনকৌশল এবং প্রতিভাবানদের অবদানের দিক দিয়ে বর্তমানে ইংরাজী ভাষার সমকক্ষ হতে পারে এমন দ্বিতীয় ভাষা নেই। অতএব এ ধরনের একটি সুসমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন ভাষা শেখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ভারতে বর্তমান এবং গত শতাব্দীর সমগ্র শিক্ষামূলক অগ্রগতি সংঘটিত হয়েছে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। যদি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী ভাষা না জানে তাহলে জাতীয় শিক্ষামূলক ঐতিহ্যের সঙ্গেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অথচ ইংরাজী ভাষার সম্পূর্ণ অবদানকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। অতএব ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষণীয় ভাষারূপে রাখা অপরিহার্য।

তৃতীয়ত, ভারতে এতদিন ইংরাজী সর্বভারতীয় ভাষারূপে কাজ করে এসেছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই বিভিন্ন অঞ্চলস্থ লোকদের মধ্যে সংহতি ও সংযোগ বজায় রাখা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্বীকার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দীর আশানুরূপ প্রচার ও উন্নতি এখনও হয় নি। অতএব সেই কারণে বর্তমানে ইংরাজী শেখা এক প্রকার অপরিহার্য বললেই চলে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর স্থান সবচেয়ে আগে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সর্বপ্রকার আদানপ্রদানের একটি স্বীকৃত মাধ্যম হল ইংরাজী। অতএব ভারতের বাইরে যদি কোন কারণে যাবার প্রয়োজন হয় তখন ইংরাজীর জ্ঞান বিশেষভাবে কাজে লাগে।

পঞ্চমত, বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে অতি দ্রুত অগ্রগতি ঘটে চলেছে তার সঙ্গে পরিচিত থাকা প্রতি সভ্য মানুষেরই কর্তব্য। একমাত্র ইংরাজীর মাধ্যমেই আমরা এই বহুমুখী অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারি। যে সব দেশ ইংরাজী ভাষাভাষী নয় সে সব দেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতিতে যে সব নিত্য নতুন তথ্যের আবিষ্কার হয় সেগুলি অনতিবিলম্বেই ইংরাজী ভাষাতে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তার ফলে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে যথাযথ সংযোগ থাকলেই পৃথিবীর সর্ববিষয়ে সকলপ্রকার অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত থাকা যায়।

এদিক দিয়ে ইংরাজী ভাষাকে আমরা 'বিশ্বের বাতায়ন' বলে বর্ণনা করতে পারি। শিক্ষার্থী যদি এই ভাষাটির সঙ্গে পরিচিত থাকে তাহলে সে বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে। ইংরাজী ভাষার এই আন্তর্জাতিক মূল্য ও শিক্ষামূলক উপযোগিতার জন্য পৃথিবীর সব দেশেরই বিদ্যালয়-শিক্ষাতেই ইংরাজী ভাষাকে পঠনীয় ভাষারূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ষষ্ঠত, বিজ্ঞানমূলক, কারিগরি, যন্ত্রশিল্পমূলক, চিকিৎসামূলক প্রভৃতি বিশেষধর্মী বিষয়গুলির উন্নত শিক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষার সাহায্য অপরিহার্য। এই সব শাস্ত্রগুলিতে যে সব নতুন নতুন তথ্যের উদ্ভাবন হয়েছে সেগুলি শেখা ইংরাজী ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এই সব শাস্ত্রগুলিতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন খুবই বেশী। অতএব ইংরাজী ভাষাকে পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া মানে এই সব অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ লোকের সৃষ্টিতে বিঘ্ন উৎপাদন করা। ভারতের শিল্পমূলক ও বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির জন্য ইংরাজী শিক্ষা একান্তই দরকার।

সপ্তমত, ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নয়নের জন্যও ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন। সমস্ত ভাষারই উন্নতি হয় অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ ও চিন্তার সমৃদ্ধি আহরণ করে। ইংরাজীর বহুমুখী ভাবপ্রবাহের সেচনে ভারতীয় ভাষাগুলি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ভাষাগুলির এই পুষ্টিকে অব্যাহত রাখতে হলে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না।

অষ্টমত, উন্নত শিক্ষার স্তরে ইংরাজির সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কাজটিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে না। প্রথম কারণ, উচ্চশিক্ষার সমস্ত পাঠ্যপুস্তকই ইংরাজিতে লেখা। ভারতীয় ভাষায় প্রয়োজনীয় উন্নতস্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় কারণ, ইংরাজী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষাদানে সমর্থ ব্যক্তি পাওয়াও শক্ত। অধিকাংশ শিক্ষকই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের এদেশে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। ইংরাজীকে বর্জন করলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের কাজ বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে।

নবমত, ভারতীয় ভাষাগুলির মান এখনও তেমন উন্নত হয় নি। শিক্ষার বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় যে বহুমুখী উন্নতি বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছে সেগুলিকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে সম্ভব হয় নি। অতএব ইংরাজীকে বর্জন করলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যার মান বিশেষভাবে অবনত হবে

এবং অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অনগ্রসর হয়ে উঠবে।

ইংরাজী ভাষার উপযোগিতা ও আভ্যন্তরীণ মূল্যের জন্য ভারত স্বাধীন হবার পরেও ইংরাজী ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে চলে আসছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হলেও স্বাধীনতার পর ১৯ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তবু ইংরাজীকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হয়নি। এর পিছনে হিন্দী ভাষার প্রতি কোন কোন সমাজের বিদ্বেষ থাকলেও ইংরাজী ভাষা যে তার নিজস্ব মূল্য ও উৎকর্ষের জন্যই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংবিধানে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ইংরাজী ভাষাকে অপসারিত করে তার জায়গায় হিন্দী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করাব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং কবে যে তা দেওয়া সম্ভব হবে সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না।

রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্র থেকে ইংরাজীকে অপসারিত করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অধিবেশন হয়ে গেছে। এই সব অধিবেশনের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি হল যে ইংরাজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসন থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও এ সম্বন্ধে সময়ের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা স্থাপন করা চলতে পারে না। তবে হিন্দী ভাষাকে সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করা হলেও ইংরাজী ভাষাকে বিকল্প ভাষারূপে অনেক দিনই রাখতে হবে।

ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন দেখা দেয় তার মূলে আছে প্রধানত নানা রাজনৈতিক কারণ। যে সব রাজনীতিজ্ঞ হিন্দীকে জাতীয় সংহতির সহায়ক বলে মনে করেন তাঁরা অবিলম্বে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ইংবাজীকে অপসারণের কথা বলে থাকেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজীকে সম্পূর্ণ অপসারণের ফলে যে শিক্ষামূলক বিপর্যয় ঘটবে এই সব রাজনীতিজ্ঞ তার কথা একেবারেই ভাবেন না। ইংরাজীর স্থানে হিন্দীকে প্রবর্তিত করলে একটা সংহতি বা একতা আসবে বটে কিন্তু সে সংহতি ও একতা শিক্ষার মান ও উৎকর্ষকে বিসর্জন দিয়েই পাওয়া যাবে এবং তা হবে অর্ধ-শিক্ষার ও স্বল্প-শিক্ষার একতা। ইংরাজীর মত সমৃদ্ধিবান সুপরিণত ভাষার অবদানকে পূরণ করা হিন্দীর মত অনুন্নত ভাষার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ইংরাজীর প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষা

স্তরে ইংরাজীকে পঠনীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কোন রাজনৈতিক বা ব্যবহারিক কারণের জন্য নয়, নিছক কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক মূল্যের দাবীতেই ইংরাজী ভাষা তার এই স্থান করে নিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজী ভাষা

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা এ সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক দেখা যায়। নীতির দিক থেকে দেখতে গেলে প্রাথমিক স্তরে প্রধানতম ও একমাত্র শিক্ষণীয় ভাষা হল মাতৃভাষা। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও শেখান হত। তখন ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ দেখা দেয়নি। শাসকদের ভাষা, প্রগতির ভাষা এবং সবশেষে জীবিকার্জনের ভাষারূপে ইংরাজী ভাষাকে সকলে প্রধানতম শিক্ষণীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেছিল। পিতামাতা ও শিক্ষক সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থী যাতে ইংরাজীতে চরম ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে এবং এই উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রায় প্রথম থেকেই ইংরাজী ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরে ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইংরাজী শিক্ষার চাপ কমে আসে, এমন কি অনেক রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার ফলে বহুক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষার মানের প্রচুর অবনতি ঘটে।

প্রাথমিক শিক্ষায় স্তরে ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ করলে একটি বড় অসুবিধা দেখা যায়। সেটি হল পরে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয় মান পর্যন্ত শিক্ষার্থী পৌছতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার চার বছর বাদ দিলে থাকে মাধ্যমিক শিক্ষার ছয় বছর (বর্তমানে সাত বছর)। দেখা গেছে যে এই ছয় সাত বছরে সাধারণ শিক্ষার্থী ইংরাজী ভাষায় যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে সেটি খুব গভীর হয় না এবং সাধারণ কাজ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম মান পর্যন্তও বহু শিক্ষার্থী পৌছতে পারে না। তার ফলে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় একমাত্র ইংরাজীর জন্য পরীক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ অকৃতকার্য হয়ে থাকে। যারা কোন রকমে মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে যায় তাদের অনেকেরই ইংরাজী বেশ ত্রুটিপূর্ণ থাকে এবং পরবর্তী উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরাজীতে পাঠগ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে উচ্চশিক্ষার পরীক্ষাতেও, বিশেষ করে যেখানে ইংরাজী পাঠ্যরূপে থাকে, সেখানে অকৃতকার্যতার হারও বিরাট হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার বর্তমান সংগঠনে ইংরাজীতে যদি পারদর্শিতা কম থাকে তাহলে শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইংরাজী শিক্ষার এই নিম্নমান কেবলমাত্র পাঠগ্রহণ কালের স্বল্পস্থায়িত্বের জন্যই যে হয় তা নয়, অনুপযোগী পাঠক্রম, ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি কারণও এর জন্য প্রচুর পরিমাণে দায়ী। তবে একথা সত্য যে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরাজীর পাঠ সুরু করলে ইংরাজীতে পারদর্শিতার মান যে যথেষ্ট উন্নত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে আগেই বলা হয়েছে যে প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার চাপ যতটা কম দেওয়া যায় ততই ভাল। বিদেশী ভাষার অপরিচিত রূপ ও ব্যাকরণগত জটিলতা শিশুর বোধশক্তির উপর অযথা মানসিক চাপের সৃষ্টি করে থাকে। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই স্তরে বিদেশী ভাষা না শেখানই উচিত।

তবে ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে প্রাথমিক স্তরের শেষ দু বছরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে এই শিক্ষাদানের মধ্যে কোনও রূপ ব্যাকরণগত নিয়মকানুন বা সংগঠনমূলক জটিলতা আয়ত্ত করানোর প্রয়াস থাকবে না। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে মূর্তবস্তুর মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনে ভাষার ব্যবহারে শিশুকে সক্ষম করে তুলতে হবে। নতুন শব্দমালার মাধ্যমে পুরানো জিনিষগুলিকে দ্বিতীয়বার জানার আনন্দ থেকে যেন শিশু বঞ্চিত না হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

হিন্দী ভাষার দাবী

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে হিন্দীর অন্তর্ভুক্তির দাবী জাতীয়তামূলক। জাতীয় সংহতির জন্য হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে স্থান পেয়েছে। সমৃদ্ধি ও ভাবসম্পদের মূল্যের দিক দিয়ে ভারতে হিন্দীর চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষা একাধিক আছে। কিন্তু সংখ্যায় হিন্দী ভাষাভাষীরা অন্যান্য ভাষাভাষীর চেয়ে বেশী হওয়ায় হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

ভারতের মত বহুভাষাভাষী রাষ্ট্রে একটি সর্বজনীন রাষ্ট্রভাষা থাকা নানাকারণে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভাষা হিসাবে ইংরাজীর দাবী সব চেয়ে আগে হলেও বিদেশী ভাষা বলে ইংরাজীকে সে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে ভারতের সমস্ত নাগরিকেরই মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তখন সাধারণ নাগরিকের পক্ষে হিন্দীতে উচ্চমানের পারদর্শিতার বিশেষ প্রয়োজন নেই। যে সব শিক্ষার্থী

সর্বভারতীয় স্তরের কাজকর্মে যোগ দেবার ইচ্ছা রাখে তাদের ক্ষেত্রে হিন্দীতে উচ্চমানের শিক্ষাগ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। অতএব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য হিন্দীর এমন একটি পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষার্থী হিন্দীর উপর মোটামুটি অধিকার অর্জন করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজী ভাষাকে যুক্ত করায় সেখানে তৃতীয় কোন ভাষা শিক্ষার আর স্থান থাকে না। অতএব হিন্দী ভাষা আরম্ভ করা উচিত মাধ্যমিক স্তরের সুরুতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে। হিন্দী শিক্ষার স্থায়িত্ব দু বছরের কম হওয়া উচিত নয় এবং চার বছরের বেশী হওয়ারও প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই চার বছরের মধ্যে হিন্দী শিক্ষা সুরু ও শেষ করতে হবে। মনে হয় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সুরু করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বা পঞ্চম শ্রেণী থেকে সুরু করে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত এই তিন বৎসর হিন্দী পড়ানো হলে শিক্ষার্থী হিন্দীতে ঈপ্সিত জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

প্রাচীন ভাষার দাবী

বহুদিন থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ভারতের অতীত ঐতিহ্যে সুদীপ্ত সমৃদ্ধশালী প্রচীন ভাষা সংস্কৃত পড়ান হয়ে আসছে। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে যেমন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা এককালে অবশ্য পঠনীয় বলে মনে করা হত, ভারতের বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃতকেও ঠিক সেইভাবে দেখা হত। মাধ্যমিক পাঠক্রম রচনায় সংস্কৃতের স্থান আগে থেকেই অবিসংবাদিতভাবে সুনির্ধারিত হয়ে থাকত।

পৃথিবীর সর্বত্রই মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম রচনায় প্রাচীন ভাষাকে এই ধরনের মর্যাদা দিয়ে আসা হয়েছে। প্রাচীন ভাষার প্রতি এই অনুরাগের মূলে কিন্তু আছে একটা অর্ধ-মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। মনে করা হত যে এই প্রাচীন ভাষার চর্চার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলির অনুশীলন হয় এবং তার ফলে সেগুলি আরও অধিক পরিমাণে কার্যক্রম ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এটিকে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of Mental Discipline) নাম দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে এই তত্ত্ব অনুযায়ী গত শতাব্দীতে পৃথিবীর সব প্রাচীন দেশেই মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে গ্রীক, রোমান, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা অবশ্য পঠনীয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতেও একই নীতির অনুসরণে সংস্কৃত ভাষা মাধ্যমিক পাঠক্রমে স্থান পেয়ে এসেছে।

কিন্তু বর্তমানে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ফলে এই মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশের মাধ্যমিক

স্তরের সাধারণ পাঠক্রমে এখন আর প্রাচীন ভাষার সে স্থান নেই। যে সব শিক্ষার্থী বিশেষভাবে ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্যের উপর পড়াশোনা করতে চায় তারাই ঐসব ভাষাকে পাঠ্যরূপে নির্বাচন করে নেয়।

ভারতে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নীচের যুক্তিগুলি দেওয়া হয়।

প্রথমত, সংস্কৃত, ভাষা থেকেই অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎপত্তি হওয়ায় সংস্কৃত ভাষার পাঠ থেকে অন্য ভাষা সম্বন্ধে অনেক গভীর ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান লাভ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত ভাষা পড়া থাকলে বাঙলা শব্দের উৎপত্তি, গঠন-বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য ব্যুৎপত্তিগত তথ্য জানা যায় এবং তার ফলে বাঙলা ভাষার জ্ঞানও অনেক উন্নত হয়ে উঠতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ভাষা রূপে সংস্কৃত অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সমুন্নত ভাষা। বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে সংস্কৃত সাহিত্য শাশ্বত স্থান অধিকার করে আছে। অতএব এ ভাষা পাঠে শিক্ষার্থী সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ অধিকার পাবে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি হল যে প্রথমত, সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত গুরুভার সম্পন্ন। এর ব্যাকরণের নিয়মকানুন অত্যন্ত জটিল, রুক্ষ ও অগণিত। সামান্যতম ভুলে সম্পূর্ণ ভাষাটি অশুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে বহু শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। নীরস সূত্র ও শব্দরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদি মুখস্থ করতে শিক্ষার্থীর উপর মানসিক চাপও যথেষ্ট পড়ে। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষার কৃষ্টিমূলক মূল্য যথেষ্ট থাকলেও তার ব্যবহারিক উপযোগিতা বা বৃত্তিমূলক মূল্য কিছুই নেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা পরবর্তী জীবনে সত্যকার কোন কাজে লাগে না। অতএব সংস্কৃত ভাষা শেখায় অযথা শ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটে থাকে।

ভারতে অনেক বিদ্যালয়ে এখনও সংস্কৃত ভাষা অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে পড়ানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার মানসিক শৃঙ্খলামূলক মূল্যের উপর এখনও বিশ্বাস করা হয়। আবার ঐতিহ্যের প্রতি আবেগজনিত মনোভাবের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত পাঠক্রমে স্থান পেয়ে এসেছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সংস্কৃতকে সকলের জন্য অবশ্য পঠনীয় বিষয়রূপে নির্বাচিত করার পেছনে কোন সবল যুক্তি দেখা যায় না। যারা অবশ্য ভাষামূলক পাঠপ্রবাহ অনুসরণ করবে কিংবা যারা সাহিত্যে উন্নত পাঠস্তর অনুকরণ করার ইচ্ছা রাখে তাদেরই ক্ষেত্রে সংস্কৃতকে অবশ্য পঠনীয় করা যেতে পারে। কিন্তু

যে সব শিক্ষার্থী সাধারণ পাঠস্তর অনুসরণ করবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বৃত্তিমূলক বা বিশেষধর্মী পাঠস্তর অনুসরণ করবে তাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা না শিখলে কোন গুরুতর অসুবিধা হবে না।

তবে যদি পাঠক্রমে সংস্কৃতভাষাকে একান্তই অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে অন্তত চার বৎসরের একটি পাঠক্রম রচনা করতে হবে এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এর পাঠ-ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাঠস্তরের স্থায়িত্ব চার বছরের কম হলে লব্ধ জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আর চার বছরের বেশী পাঠের স্থায়িত্ব করলে তা অন্যান্য পাঠের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Give in nutshell the problems of language related to the present educational structure of India. What measures do you suggest for their solution ?

Ans. (পৃঃ ৫৮—পৃঃ ৭৫)

2. Discuss the problems of medium of instruction in the different stages of Indian education.

Ans. (পৃঃ ৫৮—পৃঃ ৬৪)

3. Critically discuss the problems of language that are to be taught in the Primary and Secondary stages of education in India .

Ans. (পৃঃ ৬৫—পৃঃ ৭৫)

4. Discuss the place of English in the Primary and Secondary education in India.

Ans. (পৃঃ ৬৭—পৃঃ ৭২)

ছয়

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার সমস্যা

(Problems of Discipline in School)

সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাকার্য নির্বাহ করতে হলে সব চেয়ে আগে দরকার শৃঙ্খলার। বিশেষ করে যেখানে কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে শৃঙ্খলা অপরিহার্য। স্কুল কলেজে দেখা গেছে যে যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকে তাহলে শিক্ষাদানের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এইজন্য শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করা।

তত্ত্বের দিক দিয়ে শৃঙ্খলাকে শিক্ষার আদর্শের বিরোধী বলে মনে হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর নিজস্ব স্বাধীনতা থাকবে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ। পড়ার বিষয়, সময়, পদ্ধতি এ সবেরই নির্বাচনে শিক্ষার্থীর নিজস্ব রুচি ও ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অথচ শৃঙ্খলার অর্থ হল এর বিপরীত—শিক্ষার্থীকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে, এক কথায় তার স্বাধীনতার সংকোচন হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা এ দুটি পরস্পরের বিরোধী ধারণা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কথাটা ঠিক হলেও প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যখন শিক্ষার্থী সত্যকারের সৃজনমূলক কিছু করে তখন দেখা গেছে যে সে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই নিয়মকানুন মেনে চলে, তার উপর কোনও রকম জোর বা চাপ দিতে হয় না। কিন্তু যখনই কৃত্রিম বা যান্ত্রিক কোন কাজ করতে তাকে দেওয়া হয় তখনই দেখা গেছে যে নিয়মকানুন মেনে চলতে সে রাজী হয় না এবং তার ফলে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়।

বর্তমানে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা একটা বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়ই শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায় এবং বহুক্ষেত্রে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। স্কুল কলেজে এই শৃঙ্খলাহীনতার জন্য শিক্ষার মানের যথেষ্ট পতন ত ঘটেই, শিক্ষার সমগ্র পরিকল্পনাটিই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাহীনতার প্রভাব সমগ্র সমাজ জীবনের উপর প্রতিফলিত হয় এবং সামাজিক সংগঠনকে শিথিল করে তোলে। ভবিষ্যৎ সমাজজীবনের গঠনে প্রধানতম উপকরণ হল

শিক্ষার্থীরা। তাদের সুষ্ঠু মানসিক সংগঠনের উপর নির্ভর করে সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন, তাদের শিক্ষার মান ও উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে সমাজের জ্ঞানমূলক ও সংস্কৃতি-মূলক অগ্রগতির মান ও উৎকর্ষ। অতএব শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা কেবল শিক্ষারই সমস্যা নয়, সমগ্র জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার সমস্যা।

শৃঙ্খলাভঙ্গের বিভিন্ন রূপ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণ নানা রূপ নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যে নিদর্শনগুলি প্রায়ই দেখা যায় সেগুলির কয়েকটির বিবরণ নীচে দেওয়া হল। যথা—

১। ক্লাশে গোলমাল করা ২। ক্লাশ পালানো ৩। অবাধ্যতা ও নিয়মকানুন ভঙ্গ করা ৪। দলবদ্ধ ভাবে মারামারি করা ৫। শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষের অবমাননা করা ৬। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, আক্রমণ করা প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ করা ৭। পরীক্ষায় অসদ্ উপায় অবলম্বন করা ৮। অশোভন আচরণ করা, অশ্লীল বা অশালীন কাজ করা, যৌন অপরাধ করা ৯। বিদ্যালয়ের ক্ষতি করা, জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করা প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজ করা এবং ১০। ষ্ট্রাইক, আন্দোলন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগত এবং দলগত। ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাহীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অপসঙ্গতি বা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষুণ্ণতা থেকে দেখা দিয়ে থাকে। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তির মানসিক বিকার বা অসুস্থতার চিকিৎসা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

দলগত শৃঙ্খলাভঙ্গের ক্ষেত্রগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। এই ধরনের আচরণের কারণগুলিকে আমরা নীচের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা—

১। পারিবেশিক
২। সামাজিক
৩। মনোবৈজ্ঞানিক
৪। উত্তেজক

১। পারিবেশিক কারণ

শৃঙ্খলাহীনতা নানা পারিবেশিক কারণ থেকে দেখা দিতে পারে। যথা—

(ক) সহপাঠী, খেলার সঙ্গী, স্কুলের পরিপার্শ্বের লোকজন প্রভৃতি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মনে উত্তেজনা বা উচ্ছৃঙ্খলতার মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে।

অনেক স্কুলে দেখা যায় যে ক্লাশে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বয়সে বড় এমন অনেক ছেলে মেয়ে পড়ে। তারা যে-কোন কারণেই হোক না কেন পড়াশোনায় বিমুখ হয়ে ওঠে এবং তাদের কারও কারও অনেক সময় অনিষ্টকর কাজকর্মের দিকে প্রবণতা যায়। বহুক্ষেত্রে তাদের প্রভাবে বা চাপে পড়ে নিরীহ ছেলেমেয়েরা অন্যায় কাজ করে থাকে।

(খ) শিক্ষার পরিবেশটি যদি স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিদায়ক না হয় তাহলে শৃঙ্খলা "বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। অপ্রশস্ত ক্লাশঘর, বসার জায়গার অনটন, আলো হাওয়ার অভাব, খেলার মাঠের অভাব প্রভৃতি কারণও শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকে।

(গ) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমাজটি যদি সুসংগঠিত না হয় তাহলে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সমবেত হয়ে যে সমাজের সৃষ্টি করে সেটি যদি কৃত্রিম এবং সংকীর্ণ হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতার প্রবণতা দেখা দেয়। ডিউইর মতে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি যদি সত্যকারের সমাজধর্মী হয় তাহলে স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের উপর একটি অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণ দেখা দেয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিয়ম-কানুনগুলি মেনে চলে। ডিউই একে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নাম দিয়েছেন। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতা বা আত্মীয়তার বন্ধন নেই সেখানে শৃঙ্খলাও থাকে না।

(ঘ) শিক্ষার পদ্ধতি এবং পাঠক্রমের অনুপযোগিতাও শৃঙ্খলাহীনতার আর একটি বড় কারণ। অনেক সময় ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষাগ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তার ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার প্রবণতা দেখা দেয়। তেমনি পাঠক্রমও যদি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী গঠিত না হয় তাহলেও শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার কোন আকর্ষণ থাকে না এবং তারা শৃঙ্খলাহীনতার আশ্রয় নেয়।

২। সামাজিক কারণ

শিক্ষার্থী-সমাজের শৃঙ্খলাহীনতাকে একটি সামাজিক ব্যাধি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের সমাজ বৃহত্তর সমাজের একটি অংশ বিশেষ। সেই জন্য যদি বৃহত্তম সমাজের সংগঠনে কোনরূপ গলদ বা অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেটি শিক্ষার্থীসমাজে প্রতিফলিত হয়। আধুনিক শিক্ষার্থীদের

মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের যে প্রবণতা দেখা যায় তার প্রকৃত কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যাবে বৃহত্তর সমাজের সংগঠনের মধ্যে। এই জন্যই শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাভঙ্গের সমস্যা সমগ্র সমাজের সমস্যার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে হবে। শিক্ষার্থীর সমাজকে প্রভাবিত করে এমন কতকগুলি সামাজিক কারণের এখানে উল্লেখ করা হল।

(ক) মাধ্যমিক এবং কলেজ-স্তরের শিক্ষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, এই সময় ছেলেমেয়েদের মনে বিভিন্ন আদর্শগত ধারণা বা মানের সৃষ্টি হয়। কৃষ্টিগত, জ্ঞানমূলক এবং নীতিগত মানগুলি (values) তাদের মধ্যে ধীরে ধারে দানা বেঁধে ওঠে। বাইরের সমাজ যদি এই সময়ে যথেষ্ট প্রগতিশীল এবং উন্নত না হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের আহরণ করা মান বা আদর্শের সঙ্গে সমাজের আচরণ-ধারার সংঘর্ষ দেখা দেয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে শিক্ষার্থী-সমাজে বহু শৃঙ্খলাভঙ্গের পিছনে আছে এই নীতিগত ও আদর্শগত মানের সংঘর্ষ। যে সমাজ যত অসংগঠিত ও অনুন্নত অবস্থায় থাকে সেই সমাজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানগত সংঘর্ষ তত প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের নিদর্শনও সংখ্যায় তত অধিক হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান ভারতের সমাজব্যবস্থা এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলেছে। গতানুগতিক সনাতন মানগুলি প্রগতিশীল শিক্ষার তীক্ষ্ণ বিচারে মূল্যহীন ও অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে শিক্ষার্থীদের সমাজের সঙ্গে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সমাজের নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে যে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে তারই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মনোভাব দেখা দিয়েছে এবং তাই থেকে নানা রকম শৃঙ্খলাহীনতা জন্ম নিয়েছে।

(খ) সমাজের দুর্নীতি, বৈষম্যমূলক আচরণ, আদর্শহীনতার নিদর্শন, বয়স্কদের দুষ্কৃতি, নেতাদের দলাদলি প্রভৃতি ঘটনাগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈরাশ্য ও গ্লানি সৃষ্টি করে থাকে। বহুক্ষেত্রে শৃঙ্খলাহীনতা এই ধরনের মনোভাব থেকে দেখা দেয়। ভারতে বর্তমান সমাজে বয়স্কদের নানা অবাঞ্ছিত আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ।

(গ) আন্তর্জাতিক সমাজের পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রেষারেষি, আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার প্রসার, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আসন্নতা, সর্বাত্মক ধ্বংসের ভীতি আজ পৃথিবীর সমস্ত জনসমাজের উপর যে মানসিক পীড়ন সৃষ্টি করেছে সে পীড়ন থেকে শিক্ষার্থীসমাজও

মুক্ত নয়। তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তার বোধটি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যেও নৈরাশ্য ও বিরক্তি দেখা দেয়। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাভঙ্গের পেছনে এই বিশ্বব্যাপী দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা যে একটা শক্তিশালী কারণ রূপে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩। মনোবিজ্ঞানমূলক কারণ

শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক শক্তির প্রভাবও প্রচুর দেখা যায়। তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল :—

মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌবনের সূত্রপাত হয়। এই সময় তার মানসিক সংগঠনে বিরাট একটা পরিবর্তন আসে। পৃথিবী সম্পর্কে তার জ্ঞান ও ধারণা সুপরিণত হয়, তার পুরাতন প্রক্ষোভমূলক সংগঠনে বিরাট বিপর্যয় দেখা যায়, নীতিগত ও আদর্শগত মানগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে—এক কথায় সে তার পুরাতন পৃথিবীকে নতুন করে জানতে, বুঝতে এবং অনুভব করতে শেখে। তার ফলে তাকে নতুন করে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হয়। কিন্তু নানা কারণে শিক্ষার্থীদের এই সঙ্গতিবিধান বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। এ থেকে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের সেই মানসিক দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে থাকে এমন কতকগুলি মানসিক কারণের উল্লেখ করা হল।

(ক) যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন চাহিদাগুলি ঠিক মত বুঝতে না পারার জন্যে প্রায়ই তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। তার ফলে তাদের অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং নানা শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে।

(খ) নিছক গ্রন্থসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা যৌবনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ও সৃষ্টির চাহিদা তৃপ্ত হয় না এবং সেজন্যও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেয়।

(গ) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি, অনুপযোগী পাঠক্রম, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রভৃতিও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অতৃপ্তি ও ব্যর্থতার সৃষ্টি করে এবং তার ফলেও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেয়।

(ঘ) গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলির নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা এবং কৃত্রিম শৃঙ্খলার প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াই হল শৃঙ্খলা রক্ষার

প্রকৃষ্ট উপায়। শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব যদি তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর কৃত্রিম পন্থায় ভয় বা শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা করলে শৃঙ্খলা ত থাকেই না, বরং শিক্ষার্থীদের অনুভূতিপ্রবণ মন অতি শীঘ্রই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

৪। উত্তেজক কারণ

বহুক্ষেত্রে কোনও বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন শক্তি বা কোনও উত্তেজনাকর ঘটনা বা ব্যাপার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা এনে থাকে। এই ধরনের কয়েকটি উত্তেজক কারণের এখানে উল্লেখ করা হল।

(ক) দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা ঘটনাবলী শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাভঙ্গতার একটা বড় কারণরূপে কাজ করে থাকে। যদি দেশে কোনও অস্বাভাবিক রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে বা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের উপর তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। নির্বাচন, রাজনৈতিক আন্দোলন, জনবিক্ষোভ প্রভৃতি প্রায়ই ছাত্রসমাজের শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে।

(খ) অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি স্কুল কলেজের ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে প্ররোচিত করে এবং তার ফলে স্কুল কলেজগুলি রাজনৈতিক দলাদলির রঙ্গভূমি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন দলের নেতারা ছাত্রসমাজকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(গ) শিক্ষার্থীসমাজের স্বার্থ বা আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কোন ঘটনা ঘটলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেয়। অন্যায় ভাবে ছাত্র বিতাড়ন, শিক্ষকদের প্রতি অবিচার, বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক ঘটনা শিক্ষার্থীসমাজকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বিক্ষুব্ধ করে থাকে। তার ফলে ষ্ট্রাইক, বিক্ষোভ-প্রদর্শন, আন্দোলন প্রভৃতি নানারকম শৃঙ্খলাভঙ্গের নিদর্শন দেখা দেয়। পরীক্ষায় কঠিন প্রশ্ন দেওয়া হলে বা পাঠক্রমের বহির্ভূত প্রশ্ন করলেও পরীক্ষার হল থেকে উঠে আসা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, নাশকতামূলক কাজ করা প্রভৃতি শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণ ঘটতে দেখা যায়। এগুলি অবশ্য সাময়িক বা স্বল্পস্থায়ী কোন উত্তেজক কারণ থেকে ঘটে থাকে এবং ঐ উত্তেজক কারণটি চলে গেলে এগুলিও আর দেখা যায় না।

শৃঙ্খলাহীনতা দূর করার উপায়

শিক্ষার্থী সমাজের শৃঙ্খলাহীনতার বিভিন্ন কারণগুলি দূর করাই শৃঙ্খলাহীনতা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। এই উপায়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। শিক্ষায়তনগুলির পরিবেশ স্বাস্থ্যময় তৃপ্তিদায়ক করে তুলতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীদের দৈহিক পুষ্টি সুষ্ঠুভাবে ঘটে এবং শিখন কাজটি তাদের কাছে আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অবাঞ্ছিত ও উদ্দেশ্যপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা যাতে শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২। শিক্ষার্থীদের দলটি যাতে সত্যকারের সমাজধর্মী হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা যখন বুঝবে যে তাদের প্রত্যেকের আচরণের উপর প্রত্যেকের মঙ্গল নির্ভর করছে তখন তারা স্বভাবতই শৃঙ্খলা অনুসরণ করবে।

৩। শিক্ষণ পদ্ধতিকে আধুনিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। শিক্ষার কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে অনুসৃত পদ্ধতির উপর। শিক্ষার পাঠক্রমটিকেও প্রগতিশীল এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম করে তুলতে হবে।

৪। বৃহত্তর সমাজকে যাতে শিক্ষার্থী তার যথার্থ স্বরূপে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য তার মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে হবে। দেখতে হবে সমাজের সঙ্গে তার নীতিগত ও আদর্শগত মানের সংঘর্ষ যেন উৎকট না হয়ে ওঠে। উদার ও প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে তার ধারণা ও চিন্তার বিচার করতে হবে এবং সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত মানগুলির সঙ্গে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর যাতে সে সঙ্গতিবিধান করে চলতে পারে তার জন্য তাকে সুপরিচালিত করতে হবে।

৫। সমাজের অবাঞ্ছিত আচরণ ও প্রথাগুলি যাতে শিক্ষার্থীর মনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না করে তার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আদর্শনিষ্ঠার সৃষ্টি করতে হবে। বয়স্কদেরও মনে রাখা উচিত যে তাদের অন্যায় আচরণ শিক্ষার্থীদের মনোভাব, আচরণ ও বিশ্বাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

৬। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্কটিকে আরও ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক করে তুলতে হবে।

৭। শিক্ষার্থীদের যৌবনাগমের সময় যে সব নতুন নতুন চাহিদা দেখা দেয় সেগুলি তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। পাঠক্রমে খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ, ভ্রমণ, শিল্পকার্য, প্রদর্শনী ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবর্তিত করতে হবে।

৯। শিক্ষার্থীরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

১০। শিক্ষায়তনে নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা দূর করে সেখানে সত্যকারের স্বাধীনতাভিত্তিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

১১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যৌন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। শিক্ষার্থীদের সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করার জন্য তাদের সমস্যাগুলি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করতে হবে এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলির সমাধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Dsicuss the problems of discipline in Indian education. What measures do you propose for their solution ?

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮৩)

2. Discuss the various causes that lead to indiscipline among Indian students. What steps should be taken to counteract them ?

Ans. (পৃঃ ৭৭—পৃঃ ৮৩)

সাত

সুপরিচালনার সমস্যা (Problems of Guidance)

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাকে সমুন্নত করার জন্য যে সব নতুন নতুন প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপক পরিকল্পনাটি। প্রাচীন কালে শিক্ষার মধ্যে তেমন কোনও বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা ছিল না, তার ফলে সকল শিক্ষার্থী একই পাঠধারা অনুসরণ করতে বাধ্য হত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষার পাঠক্রমে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা প্রবর্তিত হল এবং শিক্ষার্থীকে বহু পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে থেকে নিজের পাঠ্যবিষয়গুলি নির্বাচিত করে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হল। এই নির্বাচনের স্বাধীনতা থেকে দেখা দিল এক নতুন সমস্যা। শিক্ষার্থীকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হলেও তার নির্বাচন যে সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আর যদি কোন কারণে তার শিক্ষার বিষয়বস্তুর নির্বাচন ভুল হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার শিক্ষা যে কেবলমাত্র আয়াসবহুল ও অপচয়ময় হয়ে দাঁড়ায় তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পূর্ণ সাফল্যও অনিশ্চিত ও সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর ফলেই দেখা দিয়েছে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে সুপরিচালনার পরিকল্পনাটি।

সুপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাবিদেরা বহুদিন উপলব্ধি করলেও শিক্ষার্থীর সুপরিচালনার জন্য যে সব উপকরণ ও জ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলি এতদিন শিক্ষাবিদদের আয়ত্তে ছিল না। তার ফলে সত্যকারের শিক্ষার্থীকে সুপরিচালনা দেওয়া এতদিন সম্ভবই হয় নি। গত পঞ্চাশ বছরে ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও বিভিন্ন সহজাত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের যে সব অভিনব আধুনিক অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি বর্তমানে সুপরিচালনাকে সম্ভবপর করে তুলেছে। শিক্ষার্থীকে সত্যকারের কার্যকরী সুপরিচালনা দিতে হলে দুটি বস্তুর প্রয়োজন। প্রথম, শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান এবং দ্বিতীয়, শিক্ষার্থীর প্রকৃতিদত্ত শক্তি ও আগ্রহ সম্বন্ধে সুপরিষ্কার ধারণা। এই দু শ্রেণীর জ্ঞান না থাকলে সুপরিচালনা দান সম্ভবই হয় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান আহরণ করা শক্ত হয় না। কিন্তু শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ শক্তি ও

আগ্রহের স্বরূপ জানতে হলে মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ যন্ত্রের প্রয়োজন। আধুনিক অভীক্ষাগুলি সে প্রয়োজন অনেকখানি মিটিয়েছে।

সুপরিচালনার ব্যাপক অর্থ

সুপরিচালনার সমস্যাটি প্রথম দেখা দেয় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠধারা ও বৃত্তির নির্বাচন সম্পর্কে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যতের জন্য কোন্ পাঠধারা অনুসরণ করবে এবং কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে—এ দুটি বিষয় সম্বন্ধে তাকে পরিচালিত করা বা নির্দেশ দেওয়াই এতদিন সুপরিচালনার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে সুপরিচালনাকে আরও ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়। দেখা গেছে যে কেবলমাত্র পাঠধারা ও বৃত্তির নির্বাচনেই শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করার প্রয়োজন থাকে তা নয়, তার সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে যাতে সে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে সে সম্বন্ধেও তাকে সাহায্য ও পরিচালিত করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

আমাদের সমাজজীবন যতই উন্নত ও প্রগতিশীল হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীর চারপাশের পরিবেশও তত বিচিত্র ও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিভিন্নধর্মী পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থী যদি ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠনই অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন দুইই ব্যর্থতাময় হয়ে ওঠে। অতএব কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠধারা ও বৃত্তি সম্বন্ধেই তাকে পরিচালিত করলেই চলবে না তার সামগ্রিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটিই যাতে অনুকূল স্বাস্থ্যময় পথ ধরে এগোতে পারে তার ব্যবস্থা করাও সুপরিচালনার কর্মসূচীর অন্তর্গত।

এইজন্য আধুনিক সুপরিচালনার সমস্যাগুলি ব্যক্তিজীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্র তিনটি হল—১। ব্যক্তিগত ও সমাজগত ২। শিক্ষাগত এবং ৩। বৃত্তিগত।

১। ব্যক্তিগত ও সমাজগত সুপরিচালনা

সুপরিচালনার ব্যক্তিগত ও সমাজগত সমস্যাগুলি বলতে প্রধানত ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানের সমস্যাগুলিকেই বুঝিয়ে থাকে। শিক্ষার্থী যত বড় হয়. তত তার জীবনকে ঘিরে নানারকম জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা দেখা দেয়। সেগুলিকে ঠিকমত তার মানসিক সংগঠনের সঙ্গে সমন্বিত করা তার মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক দ্রুত পরিবর্তনশীল সংঘর্ষময় সমাজে শিক্ষার্থী সব সময় এই ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের কাজটি সুষ্টুভাবে করে উঠতে পারে না।

তেমনই শিক্ষার্থীকে তার পরিপার্শ্বের সমাজের নানা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করতে হয়। তার সুষ্ঠু সমাজজীবনের জন্য এই সঙ্গতিবিধান অপরিহার্য। কিন্তু আধুনিক জটিল সমাজে এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সব সময় সহজ হয় না এবং অনেক সময় নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

সুপরিচালনার বিষয়বস্তু হল সমগ্র শিশু সমাজ। অতএব শিশু যাতে তার ব্যক্তি-জীবন ও সমাজজীবন—এই উভয় জীবনেই সার্থক ও সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে তার আয়োজন করাই আধুনিক শিক্ষাসূচীর অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে।

২। শিক্ষাগত সুপরিচালনা

সুপরিচালনার দ্বিতীয় সমস্যা হল শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বরূপ নিয়ে। যে বিশেষ শিক্ষাধারা বা পাঠপ্রবাহ শিক্ষার্থীর উপযোগী সে সম্বন্ধে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া বা উপযুক্ত পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষাগত সুপরিচালনার লক্ষ্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই বিভিন্ন মানসিক শক্তি, আগ্রহ ও দক্ষতা নিয়ে জন্মায়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীতে শিক্ষার্থীতে বিরাট পার্থক্য। অতএব সব রকম পাঠধারাই সকলের উপযোগী নয়। বুদ্ধি ছাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি আছে যেগুলির দিক দিয়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষার ধারা পৃথক হওয়া উচিত। বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি অনুযায়ী কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে সাহিত্যমূলক পাঠধারা উপযোগী, কারও পক্ষে আবার কারিগরি, যন্ত্রশিল্প বা অন্য কোনও পাঠধারা উপযোগী। যে সব ছেলেমেয়ে সাধারণ বুদ্ধি এবং ভাষামূলক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারা সাহিত্য এবং ভাষার উন্নত পাঠধারা অনুসরণ করলে উপকৃত হয়। যারা সংখ্যামূলক বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তাদের পক্ষে গণিতধর্মী পাঠধারা অনুসরণ করা বিধেয়। তেমনই যে সব শিক্ষার্থীর মধ্যে যন্ত্রঘটিত বিশেষ শক্তি থেকে থাকে তাদের পক্ষে কারিগরি বা যন্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট পাঠক্রম সবচেয়ে উপযোগী। এইভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী পাঠধারাটি নির্ধারিত করা না হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও অপচয়ময় হয়ে ওঠে।

অথচ আজকাল এত নতুন নতুন পাঠধারার উদ্ভব হয়েছে যে শিক্ষার্থীর পক্ষে

তার উপযোগী পাঠক্রম নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। এর জন্য যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা, বিচার ক্ষমতা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর নিজের মানসিক শক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন তা শিক্ষার্থী বা তার পিতামাতা-অভিভাবকদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

তার ফলে পাঠপ্রবাহের নির্বাচন শিক্ষার্থীর নিজের বা তার পিতামাতা অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের পছন্দ মত শিক্ষণীয় পাঠপ্রবাহের নির্বাচন করে থাকেন। দেখা গেছে, সমাজে যে সব বিষয়ের শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য অধিক বলে বিবেচিত হয় সেই বিষয়গুলিই সাধারণত শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর শক্তি ও আগ্রহের উপযোগী কিনা সে বিচার কেউই করেন না। এর ফলে শিক্ষার্থী সেই বিষয়গুলিতে সন্তোষজনক ফল ত দেখাতে পারে না বরং শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যটিই তার কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। অথচ সেই শিক্ষার্থীকেই যদি তার সামর্থ্য ও আগ্রহের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া হত তাহলে তার শিক্ষা সন্তোষজনক ও সার্থক হয়ে উঠত।

এইজন্য আজকাল প্রতি প্রগতিশীল শিক্ষায়তনেই শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠধারা নির্বাচন করার জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া হয়।

একথা সত্য, যে কোন ভাল শিক্ষা-পরিকল্পনারই মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সুপরিচালনা থেকে থাকে। তবু তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সুপরিচালনা দান করা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন—(১) পাঠপ্রবাহ ও পাঠসূচীর নির্বাচনে (২) পাঠপ্রবাহ অনুসরণে অসুবিধা দূর করার ব্যাপারে এবং (৩) ভবিষ্যৎ শিক্ষাধারা ও শিক্ষার্থীর উপযোগী শিক্ষায়তন নির্বাচনে।

শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠপ্রবাহ নির্বাচনে প্রথমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করা অপরিহার্য। সাধারণ স্কুলকলেজের পাঠে সাফল্য লাভ করার একটি বড় উপকরণ হল পর্যাপ্ত বুদ্ধি। অতএব শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাণের উপর অনেকখানি তার ভবিষ্যৎ পাঠপ্রবাহের নির্বাচন নির্ভর করে। বুদ্ধির পর আসে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলি। ভাষামূলক, সংখ্যামূলক, অবস্থানমূলক, যন্ত্রমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষ শক্তিগুলির মাত্রা ও পরিমাণের বিচার করে শিক্ষার্থীর উপযোগী পাঠধারা নির্বাচন করা উচিত। আজকাল বুদ্ধির পরিমাপের নানা উন্নত অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ শক্তি ও দক্ষতা পরিমাপেরও বিশেষধর্মী অভীক্ষা বহু নির্মিত হয়েছে। এগুলির প্রয়োগের দ্বারাই শিক্ষার্থীর বুদ্ধি এবং বিশেষ

শক্তির যথার্থ স্বরূপ পরিচালক জানতে পারেন। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য এ সমস্যাটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিদেশী ভাষায় অনেক উন্নত অভীক্ষা আবিষ্কৃত হলেও ভারতীয় ভাষায় ও ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উপযোগী অভীক্ষার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ভারতীয় ভাষায় বিশেষ শক্তির অভীক্ষা তৈরী হয় নি বললেই চলে।

মানসিক শক্তি পরিমাপের পর শিক্ষার্থীর আগ্রহ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। এর জন্যও বিদেশে বহু উল্লেখযোগ্য অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন্ কোন্ শিক্ষণীয় বিষয়গুলির উপর শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে তা এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যায় এবং সেইমত তার বিষয় নির্বাচন করা যায়।

৩। বৃত্তিগত সুপরিচালনা

পাঠপ্রবাহের মত উপযুক্ত বৃত্তির নির্বাচনও বর্তমানকালে বিশেষ জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কলা, কারিগরি প্রভৃতির অতুলনীয় প্রসারের ফলে শিক্ষার্থীর সামনে একসঙ্গে বহু বৃত্তির পথ আজ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অথচ কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করতে হলে বিশেষ মানসিক শক্তি, দক্ষতা ও আগ্রহ থাকার প্রয়োজন। যদি বৃত্তির নির্বাচন ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের উপযোগী না হয় তাহলে সে বৃত্তি অন্যান্য দিক দিয়ে যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, শিক্ষার্থীর মনে অসন্তোষ ও বিরক্তির সৃষ্টি করবেই এবং তার জীবনে ব্যর্থতা অনবে। তাছাড়া নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও তার কাছ থেকে আশানুরূপ কাজ পায় না। ফলে অর্থ, সময় ও মানব-শক্তি সবেরই অযথা অপচয় ঘটে। অথচ বৃত্তিটি যদি ব্যক্তির মানসিক শক্তি ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তার বৃত্তিতে সে সাফল্য লাভ করতে পারে, নিয়োগকারীও তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য পায় এবং জাতীয় আয়ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের দিক দিয়েই প্রতি ব্যক্তিরই বৃত্তির সুনির্বাচন অবশ্য প্রয়োজন। এই কারণে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলির সম্বন্ধে পরিচালকের বিশদ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। যথা, ১। ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে তার শক্তি, দক্ষতা, শিক্ষা, আগ্রহ এবং অন্যান্য ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি, ২। প্রচলিত বিভিন্ন বৃত্তির স্বরূপ এবং সেগুলিতে সাফল্যলাভ করতে হলে যে ধরনের মনোবিজ্ঞান-

মূলক গুণাবলী থাকা দরকার। ৩। বিভিন্ন বৃত্তিতে যোগ দেবার সুযোগ সুবিধা, ৪। কোনও বৃত্তি গ্রহণ করতে হলে কি ধরনের শিক্ষা বা দক্ষতার প্রয়োজন এবং ৫। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কি ধরনের ব্যবস্থা বা সুবিধা আছে।

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনাতেও প্রথমে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করতে হয়। এমন অনেক বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য উন্নত বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। পরিশাসনমূলক কর্মচারী, আইনজীবি, শিক্ষক, বিচারক, ব্যবসায় পরিচালক প্রভৃতি পদে উচ্চমানসম্পন্ন বুদ্ধির প্রথমেই প্রয়োজন। তাছাড়া সব বৃত্তিতেই অল্পবিস্তর বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য। বৃত্তির নির্বাচনে অবশ্য বিশেষধর্মী মানসিক-শক্তিগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, কেননা বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন বিশেষশক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন, লেখাপড়া ঘটিত বৃত্তিতে ভাষামূলক শক্তির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তেমনই কারিগরি বা যন্ত্রশিল্প ঘটিত কাজে যন্ত্রমূলক শক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্সের কাজ, বড় বড় ব্যবসায়ের হিসাব গণনার কাজ প্রভৃতিতে সংখ্যামূলক শক্তি থাকাটা অপরিহার্য। অতএব ব্যক্তি কোন্ ধরনের বিশেষ শক্তির অধিকারী তা নির্ণয় করেই তার বৃত্তির নির্বাচন করা উচিত।

বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শক্তিগুলির পর ব্যক্তির আগ্রহের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। বৃত্তিতে সাফল্যও অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহের উপর। কেননা বৃত্তিমূলক যোগ্যতা আংশিক নির্ভর করে অর্জিত দক্ষতার উপর। এই অর্জিত দক্ষতার মাত্রা আবার নির্ভর করে ব্যক্তির আগ্রহের উপর। যদি ব্যক্তি কোনও বৃত্তিতে আগ্রহ বোধ করে তাহলে সে নিজের প্রচেষ্টার সাহায্যে ঐ বৃত্তিটি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তার সহজাত শক্তির অভাবকেও পূরণ করে নিতে পারে।

এছাড়া প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time), মনোযোগের বিস্তার, স্মৃতির বিস্তার প্রভৃতির পরিমাপও অনেক বৃত্তিতে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল মনোযোগের বিস্তার, স্মৃতির বিস্তার প্রভৃতি বিভিন্ন। অনেক বৃত্তির ক্ষেত্রে এগুলির মূল্য যথেষ্ট। যেমন, যারা রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী বা বড় বড় মেসিন চালানোর কাজ করে তাদের প্রতিক্রিয়া কাল কম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সুপরিচালনার উপকরণাদি

আধুনিক কালে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার জন্য নানা ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটির নাম নীচে দেওয়া হল।

বুদ্ধির অভীক্ষা : বিনে-সাইমন স্কেল ও তার ইংরাজী সংস্করণ। বর্তমানে এই প্রসিদ্ধ অভীক্ষাটির ভারতীয় ভাষার সংস্করণ রচিত হয়েছে। তাছাড়া ওয়েক্স্লার-বেলিভিউ টেষ্টটিও বুদ্ধির পরিমাপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যৌথ পরিমাপের জন্য অনেক যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষাও রচিত হয়েছে।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষা : এই পর্যায়ে নীচের অভীক্ষাগুলির নাম করা যেতে পারে। ষ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাল টেষ্ট (যন্ত্রমূলক শক্তির অভীক্ষা), সিসোর মিউজিক্যাল এবিলিটি টেষ্ট (সঙ্গীতমূলক শক্তির অভীক্ষা) থার্ষ্টোনের প্রাইমারি এবিলিটি টেষ্ট (সাতটি প্রাথমিক শক্তির অভীক্ষা)। ইত্যাদি।

আগ্রহের অভীক্ষা : ষ্ট্রংস্ ভোকেসানাল ইণ্টারেষ্ট ব্লাঙ্ক, কুদের প্রেফারেন্স রেকর্ড, থার্ষ্টোন ইণ্টারেষ্ট সিডিউল, গিলফোর্ড-স্নিডম্যান-জিম্যারম্যান-ইণ্টারেষ্ট সার্ভে ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

1. What is Guidance? Discuss its need and importance in modern education.

Ans. (পৃ: ৮৪—পৃ: ৯০)

2. What do you understand by Guidance? What are the problems of Guidance? How do you propose to solve them?

Ans. (পৃ: ৮৪—পৃ: ৯০)

3. Write an essay on educational and vocational guidance.

Ans. (পৃ: ৮৬—পৃ: ৯০)

4. Guidance involves the whole child—Discuss.

Ans. (পৃ: ৮৪—পৃ: ৯০)

আট

শিক্ষক সমস্যা (Problems of Teacher)

শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেন শিক্ষক। শিক্ষার উৎকর্ষ, সার্থকতা ও সাফল্য সবই নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। সুশিক্ষক সুশিক্ষার নামান্তর। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সমস্ত শিক্ষা প্রক্রিয়াটাই বিকল এমন কি ক্ষতিকরও হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্য যে কোন শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরী করতে হলে প্রথমেই শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যাগুলির বিবেচনা করা দরকার।

শিক্ষক সমস্যাগুলিকে আমরা দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম, প্রয়োজন মত পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক পাওয়ার সমস্যা, দ্বিতীয়, শিক্ষকদের শিক্ষণের সমস্যা। শিক্ষক সমস্যার এই দুটি দিকের আমরা আলোচনা করব।

পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক পাওয়ার সমস্যা

ভারতের শিক্ষার সমস্ত স্তরেই প্রয়োজন মত পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে পল্লীগ্রামে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া একান্ত দুরূহ। এই শিক্ষকের অভাবের অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

১। বৃত্তিরূপে শিক্ষকতা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। শিক্ষকতার পিছনে যে অবাস্তব আদর্শতার বোধ ছিল তা আজকের বাস্তবধর্মী যুগে আর অনুভূত হয় না। বৃত্তির উৎকর্ষ বিচারে শিক্ষকতা নিতান্ত একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়। এই কারণে অনেকে শিক্ষকতাকে বৃত্তিরূপে নির্বাচিত করেন না।

২। শিক্ষকদের সাধারণ বেতনের হার অত্যন্ত শোচনীয়। অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় শিক্ষকদের পারিশ্রমিক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি প্রভৃতি আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও শিক্ষকরা ভাল ভাবে পান না।

৩। শিক্ষকবৃত্তি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আইনকানুন নেই। তার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মকানুন অসম্পূর্ণ ও অনির্দিষ্ট হওয়ায় শিক্ষকরা তাঁদের চাকুরী সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে পারেন না। এজন্য তাঁরা সব সময়েই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তা বোধের অভাবে ভোগেন। বিশেষ করে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চাকরী নির্ভর করে পরিচালকদের খেয়াল খুশীর উপর। তাছাড়া যোগদানের সর্তাদি, ছুটির

নিয়মকাম্বন, কর্তব্যচ্যুতির দণ্ড, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আবেদন, বেতনবৃদ্ধির বিধি ইত্যাদি সম্পর্কেও কোনরূপ স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকামুন শিক্ষকবৃত্তিতে পাওয়া যায় না। বেতনের হার যে কেবল স্বল্প তাই নয়, অনেক স্থানে বেতন নিয়মিত পাওয়াই যায় না। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়কেই সরকারী অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সরকারী অর্থসাহায্য অত্যন্ত অনিয়মিতভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে। তার ফলে শিক্ষকদের বেতন দানে অযথা বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আংশিক বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং বছরের শেষে সরকারী সাহায্য এসে পৌছলে বাকী বেতন পাওয়া যায়।

৪। অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা যেমন ঋণগ্রহণের সুবিধা, রোগের চিকিৎসা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, জীবন-বীমা প্রভৃতির সুবিধা পেয়ে থাকেন, শিক্ষকবৃত্তিকে সে সবের কোন ব্যবস্থা নেই।

সরকারী চাকুরীতে শিক্ষকদের সব চেয়ে কম বেতন দেওয়া হয়। বর্তমানে ভারতে স্নাতকস্তরের শিক্ষালাভ করে বিভিন্ন বৃত্তিতে প্রবেশ করার সময় কোন্ বৃত্তিতে কি ধরনের বেতন পাওয়া যেতে পারে তার একটা মোটামুটি ছক দেওয়া হল। এ থেকেই বোঝা যাবে যে শিক্ষকবৃত্তি কেন আমাদের দেশের যুবকদের কাছে আকর্ষণীয় নয়।

	মাসিক বেতন	উচ্চতর স্কেল
(ক) ইঞ্জিনিয়ারীং বা কারিগরি বৃত্তি	টাঃ ২৫০—৪৫০৲	৫০০—৯০০৲
(খ) বৈজ্ঞানিক বৃত্তি	টাঃ ২৫০—৩৫০৲	৫০০—৭০০৲
(গ) চিকিৎসা বৃত্তি	টাঃ ২০০—৩০০৲	৪০০—৬০০৲
(ঘ) শিক্ষকতার বৃত্তি	টাঃ ১০০—১৫০৲	২০০—৩০০৲

৫। শিক্ষকরা যে কেবল আর্থিক দুরবস্থাতে ভোগেন তা নয় সামাজিক পদমর্যাদার দিক দিয়েও তাঁদের স্থান বেশ নীচুতে। শিক্ষকবৃত্তির প্রতি জনসাধারণের উচ্চ ধারণা থাকলেও পার্থিব জীবনে শিক্ষকেরা মোটেই মর্যাদা পান না। বরং অনেকেই শিক্ষকদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে থাকেন। শিক্ষক জাতির জনক, সমাজের ভিত্তি ইত্যাদি আদর্শমূলক বহু কথা শোনা গেলেও সাধারণ মানুষের চোখে শিক্ষকেরা অপদার্থ ও সহানুভূতির পাত্র বিশেষ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ত সমাজে কোনরূপ পদমর্যাদাই দেওয়া হয় না।

৬। অধিকতর আকর্ষণীয় অন্যান্য বৃত্তির তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষক-বৃত্তিতে যোগ্য লোক থাকে না। যে সব ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করে

বেরোয় তাদের ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, বড় বড় মার্চেন্ট অফিস, কারখানা, খবরের কাগজ প্রভৃতি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলি মোটা বেতনের চাকরী দিয়ে প্রথমেই প্রলুব্ধ করে নেয়। ইচ্ছা বা রুচি থাকলেও এরা শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে না। এদের মধ্যেও যারা কোন কারণে শিক্ষকতা গ্রহণ করে তারা অন্য কোন বৃত্তিতে চাকরী পেলেই শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে একটুও ইতস্তত করে না। এর ফলে স্থায়ীভাবে ভাল শিক্ষক পাওয়া খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য কথা বলতে কি ভাগ্যান্বেষী তরুণেরা শিক্ষকবৃত্তিকে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সাফল্যের নিছক মধ্যবর্তী সোপানরূপেই গ্রহণ করে থাকে, জীবনের স্থায়ী বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে কখনই রাজী হয় না। ফলে শিক্ষকতায় পড়ে থাকে হয় নিছক আদর্শবাদী মুষ্টিমেয়, নয় অযোগ্য অক্ষমের জনতা।

৭। যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক না পাবার আর একটা বড় কারণ হল যে আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রবেশ করে নি। শিক্ষকতা মেয়েদের স্বাভাবিক বৃত্তি। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে অধিকাংশ শিক্ষকই হল নারী। কিন্তু ভারতের মেয়েরা কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও নারীসমাজের বিরাট একটা অংশ পুরাতনপন্থী জীবনযাত্রাই অনুসরণ করে অন্তঃপুরবাসী হয়ে আছে। ভারতের পুরুষরাও এখনও মেয়েদের সম্বন্ধে এতটা প্রগতিপন্থী হয়ে ওঠে নি। তার ফলে কেবলমাত্র পুরুষসমাজের উপরই শিক্ষক সরবরাহের চাপ পড়াতে শিক্ষকের অভাবটা এত প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিক্ষক-শিক্ষণের সমস্যা

শিক্ষক-সমস্যার দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে শিক্ষণের সমস্যা, কেবল সংখ্যায় যথেষ্ট শিক্ষক হলেই হবে না, শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। কি প্রাথমিক স্তর, কি মাধ্যমিক স্তর সর্বত্রই যোগ্য শিক্ষণ ছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেই ভাল শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়, শিক্ষার মৌলিকতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান থাকা প্রত্যেক সুশিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশের শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ।

বিভিন্ন শিল্পের শিক্ষকদের শিক্ষণদানের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান আছে। অনেক রাজ্য সরকার স্বয়ংই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে থাকেন।

অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি চারুকলার শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বভারতীতে এই বিষয়গুলিতে শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন সুবিখ্যাত। অতি সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী নামে চারুকলার আর একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম বাংলায় গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কলকাতার সরকারী আর্টস কলেজ, বরোদার চারুকলার জন্য এম এস ইউনিভার্সিটি, মাদ্রাজের সঙ্গীত শিক্ষকদের কলেজ, লক্ষ্ণৌর সরকারী আর্টস কলেজ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া নানা বিশেষধর্মী বিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষণদানের ব্যবস্থাও আছে। যেমন ভূগোল, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী ইত্যাদি বিদ্যালয়ে পঠনীয় বিষয়গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষক-শিক্ষণদানের জন্য ক্লাশ বা প্রতিষ্ঠানও বহু দেখা যায়।

শিক্ষক-শিক্ষণের সমস্যা

ভারতের শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় জর্জরিত। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান ত্রুটির আলোচনা করা হল।

১। অপর্যাপ্ত আয়োজন

আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য যে সংখ্যার শিক্ষকের প্রয়োজন তার তুলনায় শিক্ষণদানের আয়োজন একান্তই অপ্রচুর। এর ফলে বহু শিক্ষক শিক্ষণগ্রহণে আগ্রহশীল থাকলেও শিক্ষণদানের সুব্যবস্থা না থাকার জন্য তাঁরা শিক্ষণ লাভে বঞ্চিত হন। পশ্চিমবঙ্গের মত বিরাট রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিতে মোট ১৮০০র মত শিক্ষক শিক্ষিকা প্রতি বৎসর শিক্ষণ লাভ করতে পারেন। অথচ প্রতিবৎসর শিক্ষণকামী শিক্ষকদের আবেদন আসে এই সংখ্যার পাঁচগুণেরও বেশী। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন এর চেয়ে আরও স্বল্প।

২। অনুপযোগী পাঠক্রম

শিক্ষক-শিক্ষণের যে আয়োজন বর্তমানে আমাদের দেশে আছে তাও আবার সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমটি অতি পুরাতন ও অসম্পূর্ণ। ইংরাজ শাসনের সময় ইংলণ্ডের অনুকরণে

এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমটির প্রচলন করা হয়। তারপর ইংলণ্ডে সেই পাঠক্রমটির বহুল সংস্কার করা হলেও এদেশে সেই অতীতে প্রবর্তিত পাঠক্রমটি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। অবশ্য স্বাধীনতা লাভের পর কোন কোন রাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমের কিছুটা সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রচলিত পাঠক্রমের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এখানে তত্ত্বমূলক বিষয়গুলির শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রয়োগমূলক শিক্ষাদানের আয়োজন মোটেই যথেষ্ট নয়। তার ফলে শিক্ষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষকতা সম্বন্ধে কোন কার্যকরী অভিজ্ঞতা হয় না। নিছক কতকগুলি তত্ত্ব আয়ত্ত করে অথচ সেগুলি প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না আহরণ করলে সে তত্ত্বমূলক জ্ঞানের কোনও বাস্তব মূল্য থাকে না।

৩। অপর্যাপ্ত অনুশীলন

সাধারণত শিক্ষক-শিক্ষণস্তরের শেষভাগের দু মাস থেকে তিনমাসের জন্য শিক্ষকদের কোন বিদ্যালয়ে পাঠ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে এই আয়োজন এতই অপ্রচুর যে তা থেকে সত্যকারের কোন প্রয়োগমূলক অভিজ্ঞতা শিক্ষকরা সঞ্চয় করতে পারেন না। বিশেষ করে অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে এত দ্রুত নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠদানেব দায়িত্ব শিক্ষকদের পালন করতে হয় যে সেই পাঠদান থেকে তাঁরা কোন সত্যকারের উপকার লাভ করতে পারেন না। তার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠদান যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হয়ে ওঠে।

৪। আধুনিক শিক্ষণব্যবস্থার অভাব

যদিও পদ্ধতি-শিক্ষণ শিক্ষকশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রধানতম অঙ্গ তবু নানা কারণে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিক্ষকেরা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা রকম তত্ত্বমূলক জ্ঞান সঞ্চয় করলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলির সত্যকারের প্রয়োগ কৌশল তাঁরা শেখেন না এবং যখন তাঁরা শিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান তখন তাঁরা তাঁদের শেখা পদ্ধতিগুলি পুঁথির পাতায় জমা রেখে চিরন্তন গতানুগতিক পদ্ধতিরই অনুসরণ করে থাকেন। এর ফলে শিক্ষকশিক্ষণের সমগ্র প্রচেষ্টাই একটি অপচয়মূলক অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হয়।

৫। সময়ের স্বল্পতা

শিক্ষকশিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ও যথার্থ শিক্ষণের পক্ষে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। প্রায় সব রাজ্যেই এই নির্দিষ্ট সময় হল এক বৎসর। তার মধ্যে ছোট বড় ছুটি

বাদ দিয়ে নয় দশ মাসের বেশী অবশিষ্ট থাকে না। এই স্বল্পসময়ের মধ্যে তত্ত্বমূলক শিক্ষা, পাঠদানের অনুশীলন ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত সময় মোটেই পাওয়া যায় না। তার ফলে কোনটিরই শিক্ষা কার্যকরী ওঠে না।

৬। গবেষণার সুযোগসুবিধার অভাব

শিক্ষণপ্রার্থী শিক্ষকদের গবেষণা পরিচালনা করার কোন সন্তোষজনক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না। তার ফলে যেমন শিক্ষকদের কোন সৃজনমূলক অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, তেমনই শিক্ষার পদ্ধতি, তত্ত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন ঘটে ওঠে না।

৭। অর্থ সাহায্যের অব্যবস্থা

শিক্ষার্থী শিক্ষকদের অর্থ সাহায্যদানের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেই। শিক্ষণ গ্রহণকালে নিজেদের ব্যয়ভার বহন করার সঙ্গতি শিক্ষকদের কখনই থাকে না। তার ফলে তাঁদের পর্যাপ্ত অর্থসাহায্য না দিলে তাঁদের পক্ষে শিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভবপর হতে পারে না। অনেক রাজ্যে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিক্ষা গ্রহণকালে বিদ্যালয় থেকে বেতন দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সুবিধা অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষকই পেয়ে থাকেন। তার ফলে ইচ্ছা থাকলেও বহু শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৮। বিশেষধর্মী বিষয়ে শিক্ষণ-ব্যবস্থার অভাব

বহুসাধক বিদ্যালয়গুলি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। নতুন বিদ্যালয়গুলিতে বহু বিশেষধর্মী বৃত্তিমূলক বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য। স্বল্পশিক্ষণপ্রাপ্ত বা শিক্ষণবর্জিত শিক্ষকদের দ্বারা এ সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে যে সব শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলির অধিকাংশতেই এই সব বিষয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি শিক্ষাদানের এখনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। তার ফলে বহুসাধক বিদ্যালয়ে এই নবপ্রবর্তিত বিশেষধর্মী বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী শিক্ষক পাওয়া যায় না।

৯। সরকারী ঔদাসীন্য

ভারতে শিক্ষণ-শিক্ষণের অবনতি ও শোচনীয় দুরবস্থার জন্য সর্বপ্রথম দায়ী হল সরকারী ঔদাসীন্য। ইংরাজ শাসনকালে রাষ্ট্রের তরফ থেকে শিক্ষক-শিক্ষণের

কোনরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করা হয় নি। মিশনারী সম্প্রদায়ের উদ্যোগেই অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

ভারত স্বাধীন হবার পরও যে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে তা মোটেই নয়। ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে শিক্ষার স্থানই দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত গৌণ। তার ফলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থারই অগ্রগতি নিতান্ত মন্থর হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার যে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে এটা ভাবা ভুল।

১৯৫১ সালে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মোট সংখ্যা ছিল ৫৩টি, ১৯৫৬ সালে এ সংখ্যা হয় ১০৭টি, ১৯৬৩ সালে মাত্র ২৭৮টি এবং আশা করা যায় ১৯৬৬ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এ সংখ্যা ৩১২তে দাঁড়াবে। বলা বাহুল্য সমগ্র ভারতের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতা নিতান্তই স্বল্প।

১৯৫১ সালে দেখা যায় যে ভারতের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৫৫·৩%। ১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৬৪·৭%তে দাঁড়ায়। দীর্ঘ দশ বৎসরে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার এই অকিঞ্চিৎকর অগ্রগতি চরম সরকারী ঔদাসীন্যের পরিচয় দেয়।

১০। সুপরিকল্পনার অভাব

ভারতের শিক্ষক-শিক্ষণের বর্তমান সংগঠনটি ইংরাজী আমলে তদানীন্তন ইংলণ্ডে প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ সংগঠনগুলির অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছিল। তারপর ইংলণ্ডের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দিয়ে বহু পরিবর্তন ও সংস্কারসাধনের স্রোত বয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতের শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সংগঠনমূলক পরিবর্তন করাই হয় নি। তাদের সেই গতানুগতিক সংগঠন ও প্রথাপদ্ধতি সমস্তই অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে প্রচলিত শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থাটি নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। যে পন্থায় শিক্ষকদের শিক্ষণ দেওয়া হয় তা যেমনই গতানুগতিক, তেমনই সম্পূর্ণ অবিজ্ঞানোচিত। অধিকাংশ শিক্ষাই দেওয়া হয় নিছক বক্তৃতা পদ্ধতির সাহায্যে। কোনরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বা সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার আয়োজন নেই। ফলে শিক্ষকদের শিক্ষা গুরুতরভাবে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ, শিশু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন

শিক্ষক শিক্ষণের পাঠক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। এ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বমূলক শিক্ষা শিক্ষকেরা লাভ করেন তা সত্যকারের প্রয়োগমূলক অভিজ্ঞতার অভাবে অবাস্তব থেকে যায়। এজন্য নিছক তত্ত্বমূলক শিক্ষার উপর জোর না দিয়ে যাতে বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানগুলি অর্জন করেন সেদিকে যত্ন নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শিক্ষণ গ্রহণের সময় বিদ্যালয়ে পাঠদানের যে প্রথা প্রবর্তিত আছে তা নিতান্তই অপরিকল্পিত হওয়ায় তা থেকেও সত্যকাবের কোনও সুফল শিক্ষকেরা আশা করতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে প্রচলিত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষণকাল সুরু হবার সময় থেকেই প্রতিটি শিক্ষককে কোনও না কোনও স্কুলে সংযুক্ত করে দেওয়া হত এবং সমগ্র শিক্ষাকাল ধরেই শিক্ষককে সেই স্কুলে পাঠদানের অনুশীলন করে যেতে হত। এতে যে পাঠদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষকদের অনেক উন্নত ও দৃঢ়বদ্ধ অভিজ্ঞতা হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিক্ষক সমস্যার সমাধান

বর্তমানে দেশে শিক্ষক সমস্যার সমাধান করতে হলে দু ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত, যাতে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

১। শিক্ষক সংখ্যার বৃদ্ধির উপায়

১। শিক্ষকদের বেতনের হার বাড়াতে হবে এবং সমস্তরের অন্যান্য বৃত্তিতে প্রচলিত বেতনের হারের সমান করতে হবে। শিক্ষকদের নিকট থেকে সন্তোষজনক কাজ পেতে হলে তাদের প্রথমেই দারিদ্রমুক্ত করতে হবে এবং তাঁরা যাতে গবেষণার জন্য যথেষ্ট সময় পান ও চিন্তার জন্য যথেষ্ট অবসর পান সেজন্য তাঁদের পারিশ্রমিকের হার পর্যাপ্ত করে তুলতে হবে। অধিকাংশ শিক্ষককেই অবসর সময়ে অতিরিক্ত কোনও কাজ করে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হয়। এর ফলে তাঁদের কাছ থেকে প্রেরণাময়, উন্নত ও সংগঠনমূলক শিক্ষা আশা করা যায় না।

২। অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা চাকুরীর ক্ষেত্রে যে সব সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন সে সব সুযোগ ও সুবিধা যাতে শিক্ষকবৃত্তিতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, চিকিৎসায় ব্যয় ইত্যাদি সুখসুবিধাগুলি আজকাল সমস্ত ভাল চাকুরীতে পাওয়া যায়। শিক্ষকরাও যাতে এই সুখসুবিধাগুলি সমানভাবে পান তার উপযুক্ত আয়োজন করতে হবে।

৩। শিক্ষকদের চাকুরী সম্বন্ধে অধিকতর নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করার জন্য আরও সুসংবদ্ধ আইন-কানুন প্রস্তুত করতে হবে। বিদ্যালয়কর্তৃপক্ষের অযথা খেয়ালখুসীর উপর নির্ভর করে শিক্ষকদের যেন জীবনধারণ করতে না হয়। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা যাতে অন্যান্য বৃত্তির মত শিক্ষকবৃত্তিতেও থাকে তার আয়োজন করতে হবে।

৪। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা স্বাভাবিক-ভাবেই বৃদ্ধি পাবে। তবু জাতীয় সংগঠনে শিক্ষকদের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও মূল্য বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

৫। শিক্ষকবৃত্তিতে মেয়েরা যাতে আরও বেশী সংখ্যায় আকৃষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপকতর আয়োজন করা এবং যাতে আরও অধিকসংখ্যক মেয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব দূর করার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কর্মক্ষেত্রে নামা যে একান্ত প্রয়োজন এই সত্যটুকু যদি জনসাধারণকে বোঝান যায় তাহলে মেয়েদের কাজ করা সম্পর্কে সাধারণের মনে যে বিরূপ মনোভাব এখনও দেখা যায় সেটি দূর হতে পারে।

২। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

৬। শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে হবে। বিভিন্ন প্রদেশে আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং যাতে প্রতি বৎসর যথেষ্ট সংখ্যায় শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়কে উদার অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৭। শিক্ষণ গ্রহণ কালে শিক্ষকদের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিতে হবে। এর জন্য সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। শিক্ষক শিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলির আমূল সংস্কার করা দরকার। সাধারণত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী নির্বাচনের কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের সাধারণ শিক্ষার মান বা সাফল্য দেখে বা নিজেদের পছন্দমত শিক্ষার্থী নির্বাচন

করে থাকেন। কিন্তু সুশিক্ষক গঠনে কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষার মানই সব নয়। ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি গুণাবলী বিশেষ ভাবে সুশিক্ষক গঠনে অপরিহার্য, এই জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা উচিত।

৯। সংগঠনের দিক দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন আনতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে প্রচলিত বুনিয়াদী স্তরের শিক্ষণ ব্যবস্থা ও সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষণব্যবস্থার মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। আবার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণব্যবস্থা ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যেও কোন যোগাযোগ নেই। এই সংগঠনগত দোষগুলি দূর করা আগে দরকার। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষণব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনার সময় সেগুলির মধ্যে যাতে স্বাভাবিক যোগসূত্র থাকে তা দেখা দরকার।

১০। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলিত পাঠক্রমটি বিশেষ ভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এটিকেও বিশেষভাবে সংস্কার করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রম রচনায় তত্ত্বমূলক বিষয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে প্রয়োগমূলক ও গবেষণামূলক কাজের পরিমাণ বাড়াতে হবে। শিক্ষকেরা যাতে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হতে পারেন এবং সেগুলির সমাধানের জন্য কার্যকরী উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন তার পর্যাপ্ত আয়োজন পাঠক্রমে থাকবে।

শিক্ষক শিক্ষণের একটি আদর্শ পাঠক্রম

১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর বি-টি বা বি-এড স্তরের পাঠক্রম রচনা সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান নির্দেশ দেন। তাঁদের সেই নির্দেশগুলিকে ভিত্তি করে নীচে শিক্ষক-শিক্ষণস্তরের একটি আদর্শ পাঠক্রমের খসড়া দেওয়া হল। যথা—

ক। তত্ত্বমূলক অংশ

১। শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব ও বিদ্যালয় পরিচালনা

২। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

৩। পদ্ধতিতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিদ্যা

৪। বিশেষ বিষয়মূলক পদ্ধতি শিক্ষা

৫। শিক্ষার আধুনিক সমস্যা ও সেগুলির সমাধান

৬। বিদ্যালয়-সমস্যা-সংক্রান্ত নীচের যে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে অধ্যয়ন। যেমন, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা, অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা, গ্রামীণ শিক্ষা,

ইন্দ্রিয় সহায়ক সাজসরঞ্জাম, পরিসংখ্যান ও পরিমাপ তত্ত্ব, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পরিচালনা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি।

খ। প্রয়োগমূলক অংশ

১। পাঠদান ২। পাঠ পর্যবেক্ষণ ৩। পাঠ সমালোচনা ৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠন ও ততে অংশ গ্রহণ। ৫। শিক্ষার্থীদের বিশেষ সমস্যা ও অনগ্রসরতার কারণ পর্যবেক্ষণ। ৬। ইন্দ্রিয়সহায়ক সাজসরঞ্জামের ব্যবহার।

গ। গবেষণামূলক অংশ

প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীই শিক্ষাঘটিত কোনও বিশেষ একটি সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালাবেন এবং সে সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধ করবেন।

১৯৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু বৎসর পরে তাঁদের প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমটির সংস্কার করেছেন। তাতে পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনের দিক দিয়ে আগের চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলেও অন্যান্য দিক দিয়ে গতানুগতিকতাকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষকদের পাঠ অনুশীলনের সেই সনাতন প্রথাটিকেই বজায় রাখা হয়েছে। তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। সব শেষে শিক্ষকদের গবেষণার কোনরূপ আয়োজন এই পাঠক্রমে নেই।

১১। শিক্ষকরা যাতে প্রগতিশীল শিক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হন তার ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষণ পদ্ধতির যে সব নতুন নতুন তথ্য নিত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে সেগুলি পরিবেশনের আয়োজন রাখতে হবে।

১২। নব প্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষণে সমর্থ শিক্ষক তৈরী করার দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিরই এবং এই সব বিদ্যালয়ের সাফল্য নির্ভর করছে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুশিক্ষক পাওয়ার উপর। অতএব বিভিন্নধর্মী বিষয়গুলিতে শিক্ষকদের শিক্ষণপ্রাপ্ত করার আয়োজন করতে হবে।

১৩। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য স্বল্পস্থায়ী রিফ্রেসার পাঠস্তরের (Refresher Course) প্রবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে শিক্ষকদের জন্য সেমিনার বা আলোচনা সভারও আয়োজন করতে হবে। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষকেরা কয়েক মাসের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষণের আধুনিক গবেষণামূলক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

১৪। শিক্ষকদের গবেষণা ও পরীক্ষণ পরিচালনার উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষণরত অবস্থায় তাঁরা যাতে শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে বাস্তবমূলক পরীক্ষা চালাতে পারেন এবং তা থেকে নতুন সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব গঠন করতে পারেন তার জন্য যথেষ্ট অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিতে হবে। আধুনিক শিক্ষামূলক পত্রিকা, বিদেশী পুস্তক, পরীক্ষণের ফলাফল ইত্যাদি যাতে শিক্ষকেরা যথাসময়ে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। সব শেষে শিক্ষকশিক্ষণের সময় যাতে বাড়ান যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠস্তরের দৈর্ঘ্য এক বৎসর ব্যাপী রেখেও যাতে শিক্ষণের জন্য দীর্ঘতম সময় পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ছুটির পরিমাণ যতটা সম্ভব কমাতে হবে এবং অধ্যয়নকালকে দীর্ঘতর করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the major problems concerning teachers in our country? What measures do you suggest to solve them?

Ans. (পৃ: ৯১—পৃ: ১০০)

2. Why are not the teachers available in required number in the educational institutions of India? What are the defects in the teacher's training system in India?

Ans. (পৃ: ৯১—পৃ: ১০৬)

3. Give a short history of the teachers' training system in India.

Ans. (পৃ: ৯৪—পৃ: ৯৮)

4. Discuss the problems of the curriculum at the teachers' training stage and give the sketch of an ideal curriculum for the same.

Ans (পৃ: ৯৮—পৃ: ১০৬)

এক

জিন জাকুই রুশো (Jean Jacques Rousseau)

মাঝে মাঝে মানব ইতিহাসে এমন এক এক জন মনীষী জন্মগ্রহণ করেন যাঁর নতুন চিন্তা ও ভাবধারা পরবর্তীকালের মানব জাতির বহুবর্ষ পোষিত আদর্শ, মতবাদ ও প্রথা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে দেয়। রুশো ছিলেন এই শ্রেণীর একজন মনীষী। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের যে নতুন ব্যাখ্যা রুশো দিয়েছিলেন তার সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছিল প্রসিদ্ধ ফরাসী গণবিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁরই দেওয়া গণ-স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত আজকের গণতন্ত্রের মূলভিত্তিটি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত শিক্ষাবিজ্ঞানকেও রুশোর প্রতিভার সোনার কাঠি স্পর্শ করে গিয়েছিল। বহু শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতিগুলির বিকৃত রূপ তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল এবং সেগুলির অপূর্ণতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘাটিত করার জন্য রুশো লেখনী ধারণ করেন। তাঁর লেখা 'এমিল' (Emile) নামে বইটিতে তিনি যে কেবল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন তা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাও উপস্থাপিত করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে রুশোর বৈপ্লবিক আদর্শ ও মতবাদ নিতান্ত অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল এবং সে সময়কার শিক্ষাবিদেরা তাঁর নবপরিকল্পনার কোন রূপ মূল্যই দেন নি। কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের নবীন শিক্ষাবিদেরা রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত সুসমৃদ্ধ ভাবসম্পদটির সন্ধান পান এবং গত একশ বছর ধরে সারা পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে রুশোর বিভিন্ন ভাবধারাকে বিভিন্ন পন্থায় বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টাই একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে। আজকের প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই বীজের আকারে পাওয়া যায় রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনায় যদিও সেগুলিকে যথাযথ জলসিঞ্চন করে অঙ্কুরে এবং অঙ্কুর থেকে মহীরুহতে পরিণত করার কৃতিত্ব পরবর্তীযুগের রুশোর অনুগামী সমর্থকগণেরই।

অসাধারণ প্রতিভা, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী হলেও

রুশোর লেখার মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য ও আত্মবিরোধিতা দেখা যায়। শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে তিনি প্রচলিত প্রথা ও তত্ত্বমাত্রকেই বিনা বিচারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। যা কিছু এতদিন চলে এসেছে সবই ভুল। সবই নতুন করে গড়তে হবে। পুরাতনের মধ্যে কোন ভাল নেই, গ্রহণযোগ্য কিছু নেই। পুরাতন মানেই ভুল, অকেজো ও ক্ষতিকর। প্রচলিতের প্রতি রুশোর এই যে চরম মনোভাব এর দুটি কারণ আছে। প্রথমত, রুশোর সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা কৃত্রিমতা ও সঙ্কীর্ণতার দিক দিয়ে চরমে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় যাজক শিক্ষকগণের হাতে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আকার-সর্বস্ব, বিতর্কধর্মী ও অন্তঃসারশূন্য। শিক্ষার নামে তখন কেবলমাত্র কতকগুলি কৃত্রিম বাক্‌চাতুর্য ও তর্ককুশলতাই শেখান হত। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ থেকে সে শিক্ষা সরে এসেছিল অনেক দূরে। শিক্ষার এই কৃত্রিমতা ও বিকৃতি রুশোর অনুভূতি-প্রবণ মনকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল যে তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি।

দ্বিতীয়ত, রুশোর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও সামাজিক অসাফল্যও তাঁর এই চরম মনোভাবের জন্য অনেকটা দায়ী। শারীরিক অসুস্থতা, অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও পার্থিব সাফল্যলাভের অযোগ্যতা ইত্যাদি কারণে রুশোর ব্যক্তিগত জীবনটি আশাভঙ্গের ব্যথা ও নৈরাশ্যে ভরে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতাই সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু প্রচলিত ও অনুমোদিত তারই বিরুদ্ধে তাঁর মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁর সেই পরাজয়কে পূরণ করার প্রচেষ্টারূপেই দেখা দিয়েছিল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ব্যবস্থা ও রীতির বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্ষমাহীন নিরঙ্কুশ জেহাদের ঘোষণা। এই সব কারণে অনেকে রুশোর মতবাদের যথার্থ মূল্য দিতে চান না। কিন্তু অসামঞ্জস্য, অতিরঞ্জন ও চরমতাকে বাদ দিয়ে রুশোর ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিক্ষার মৌলিক আদর্শগুলির অধিকাংশই রুশোর পরিকল্পনায় বর্তমান এবং পরবর্তীযুগের বিভিন্ন দেশের শিক্ষানায়কগণ রুশোর এই সুসমৃদ্ধ ভাবসম্পদকে ভিত্তি করে নিজের নিজের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্যই বিনা দ্বিধায় আমরা রুশোকে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জনক বলে বর্ণনা করতে পারি।

রুশো ১৭১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন জেনেভা নামক সহরে। রাষ্ট্রনীতির উপর তাঁর প্রথম বই বেরোয় ১৭৬২ সালে সোশ্যাল কনট্রাক্ট (Social

Contract) নামে এবং ঐ বৎসরেই শিক্ষানীতির উপর তিনি 'এমিল' (Emile) নামে বইখানি লেখেন। তাঁর এই দুটি বইতে যথাক্রমে রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর অভিনব বৈপ্লবিক মতবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি বই লেখেন। ১৭৭৮ সালে রুশোর মৃত্যু হয়।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব

রুশো মূলত দার্শনিক ছিলেন। তিনি শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলি নতুন আদর্শে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষক বলতে যা বুঝি রুশো কোনদিনই তা ছিলেন না। কোনও স্কুল তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন নি। কোনদিন শিক্ষকতাও তিনি করেন নি। সেইজন্য শিক্ষার পদ্ধতি বা ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে রুশোর অবদান অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে রুশো সুচিন্তিত অভিমত এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাধান দিয়ে গেছেন। আমরা সেগুলির এখানে আলোচনা করব।

রুশোর প্রকৃতিবাদ :

রুশোর শিক্ষামূলক মতবাদকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিবাদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক মতবাদ নয়। এটি শিক্ষার সংগঠন ও সমস্যাগুলিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা মাত্র। দার্শনিক মতের দিক দিয়ে রুশো নিসংশয়ে ভাববাদী (Idealist) ছিলেন। তিনি আর সব ভাববাদীদের মতই সর্বাধিনায়ক এবং সর্বজনীন এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

রুশোর প্রকৃতিবাদকে একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়, শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি অনুযায়ী (according to Nature)। কথাটি শুনতে যদিও সহজ সাধারণ বলে মনে হয় তবু বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা রুশোর মতবাদের গভীরতা ও গুরুত্বের পরিচয় পাব।

'এমিল' ও প্রকৃতি-অনুযায়ী শিক্ষা

রুশো তাঁর 'এমিল' বইটিতে এমিল নামে একটি ছেলের শৈশব থেকে শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত তার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। এমিল বইটি অর্ধ উপন্যাস অর্ধ আলোচনামূলক। এমিলকে তার পিতার কাছ থেকে সরিয়ে এনে এবং সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে তাকে এক আদর্শ শিক্ষকের হাতে

দেওয়া হল। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভাবসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যে দিয়ে এমিল সেখানে তার শিক্ষা লাভ করল এবং সে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে হল প্রকৃতি অনুযায়ী।

'এমিল' বইটির সুন্দর পংক্তি কয়েকটিতে রুশোর প্রকৃতিবাদের মৌলিক তত্ত্বটির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। "প্রকৃতির সৃজকের হাত থেকে যা কিছু আসে তাই ভাল কিন্তু মানুষের হাতে সব কিছুই বিকৃত হয়ে যায়।" রুশোর মতে আমরা শিক্ষালাভ করি তিনটি উৎস থেকে,—প্রকৃতির কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে এবং বহির্জগতের বস্তুর কাছ থেকে। এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে যদি পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা না দেয় তবে ব্যক্তির শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিন প্রকারের শিক্ষা সমন্বয় লাভ করে তার শিক্ষাকেই সার্থক শিক্ষা বলা চলে। মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায়, সেগুলির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আছে কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করা যায়, সেগুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অতএব মানুষ এবং বস্তুজগতের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে প্রকৃতির কাছে পাওয়া শিক্ষার সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হবে এবং সে সামঞ্জস্য আসবে মানুষ ও বস্তুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে প্রকৃতির শিক্ষার অধীনস্থ করে। এক কথায় প্রকৃতির শিক্ষা অনুযায়ী শিশুর আর সব শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক তার বিপরীতটি করা হয়। পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকেই বড় করে তোলা হয়, প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে অবহেলা করে, তাকে অবদমিত করে।

'প্রকৃতি'র তিন অর্থ

রুশোর মতে প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই হল আদর্শ ও সার্থক শিক্ষা। কিন্তু প্রকৃতি কথাটিকে রুশো তাঁর 'এমিল' বইতে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে তিনি প্রকৃতি কথাটির ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি (Psychological Nature)
(খ) জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি (Biological Nature)
(গ) বস্তুজাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature)

রুশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই তিন রকম প্রকৃতির অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বলতে বোঝায় শিশু যে সমস্ত প্রকৃতিগত শক্তি, সম্ভাবনা, চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, আবেগ ইত্যাদির অধিকারী সেগুলির সমন্বয়কে। রুশোর মতে শিশুর শিক্ষা এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত হবে। সাধারণত শিশু একটু বড় হলেই পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির চাপে তার এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে যায় এবং তাকে কতকগুলি কৃত্রিম আচরণ ও অভ্যাস শিখতে বাধ্য করা হয়। সেজন্য শিশু যাতে তার প্রকৃতিগত চাহিদা ও সামর্থ্য, পছন্দ ও আগ্রহ অনুযায়ী শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এইজন্যই রুশো বলেছেন, 'একমাত্র অভ্যাস যা শিশুকে আহরণ করতে দেওয়া যেতে পারে তা হচ্ছে অভ্যাস আহরণ না করার অভ্যাস।'

জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি বলতে রুশো বোঝাচ্ছেন সেই প্রকৃতিকে যা ব্যক্তিগত প্রাণীরূপে মানুষ সঙ্গে নিয়ে জন্মেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ইত্যাদি সৃষ্ট হবার আগে মানুষ বাস করত যে অবস্থায় রুশো তার নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক অবস্থা (Natural State) এবং সেকালের মানুষের নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক মানুষ (Natural Man) এই প্রাকৃতিক মানুষই রুশোর মতে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির অধিকারী ছিল। কিন্তু সমাজ এবং অন্যান্য সংস্থার সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে যায়।

তেমনই শিশু যখন জন্মায় তখনও তার এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি থাকে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে সমাজের সংসর্গে আসে সেই মুহূর্ত থেকেই তার সেই প্রকৃতিও বিকৃত ও কলুষিত হতে সুরু করে। অতএব শিশুর শিক্ষাকে তার এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ হল যে শিশুকে সরিয়ে আনতে হবে সমাজের সংসর্গ থেকে, তার অন্তর্বাসী এই সহজাত যথার্থ প্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে এবং তার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে পরিচালিত হতে দিতে হবে এই প্রকৃতির চাহিদার দ্বারা, অন্য কোন বাইরের শক্তি বা অনুশাসনের দ্বারা নয়।

রুশোর এই জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতির ধারণা থেকেই জন্মেছে তার মতবাদের সমাজবিরোধী অংশটুকু। সেইজন্য যথার্থ শিক্ষা দেবার জন্য এমিলকে সমাজের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এ থেকে অবশ্য এ সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনা পুরোপুরি সমাজবিরোধী। তদানীন্তন কলুষিত ও নীতিবিধ্বস্ত সমাজ যে শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী সে কথাই তিনি

বলতে চেয়েছেন এবং শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরগুলি সমাজের প্রভাবমুক্ত করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার শেষে তাকে সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত হবারও নির্দেশ ও পরিকল্পনা রুশো দিয়েছেন। অতএব রুশোর শিক্ষাতত্ত্ব বাহ্যত সমাজ-বিরোধী হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজবিরোধী নয়।

প্রকৃতির তৃতীয় অর্থটি হল বস্তুজাগতিক প্রকৃতি। গাছপালা, নদী, পাহাড়, আকাশ-বাতাস, রোদ-জল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি দিয়ে যে বস্তুজগতের মূর্তপ্রকৃতি সেই প্রকৃতি অনুযায়ী হবে শিশুর শিক্ষা। এর অর্থ হল শিশুকে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পারে। খোলা মাঠে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে ফিরে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, পশু পক্ষীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে সে যেন প্রকৃতির প্রশান্ত প্রভাব অনুভব করতে পারে। তার প্রাথমিক শিক্ষায় জীবনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলি আহরণে প্রকৃতিই হবে তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। এই চিন্তাধারায় স্বাভাবিক ভাবেই পল্লীজীবনকে নগরজীবনের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। রুশোর মতে শহর হল মানবজাতির কবর স্থান।

এই হল রুশোর মতে শিশুর ত্রিবিধ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সংব্যাখ্যান। এই শিক্ষাপরিকল্পনা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কতকগুলি অতি-গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অভিনব সিদ্ধান্ত গঠন করা যায়। সেগুলি হল এই।

নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)

প্রাচীনকালে মনে করা হত যে শিশু যে প্রকৃতি নিয়ে জন্মায় সে প্রকৃতি স্বভাবতই অসৎ। এই অসৎ আদিম প্রকৃতিকে নির্মূল করে তার জায়গায় ঈপ্সীত প্রকৃতি স্থাপন করাই হল শিক্ষার মুখ্য কাজ। অতএব প্রথম থেকেই কঠোর শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনের মধ্যে শিশুকে রাখতে হবে। কিন্তু রুশোর মতে আদিম প্রকৃতি তো অসৎ নয়ই, বরং সে প্রকৃতি অকলুষিত, অবিকৃত এবং পূর্ণ ভাবে সৎ। অতএব শিশুর প্রথম জীবনের শিক্ষা হবে নেতিবাচক শিক্ষা (Negative Education)। রুশোর মতে এই শিক্ষাকালে শিশুকে কোন সত্য বা সদ্‌গুণ শেখান হবে না, কেবল তার মন যাতে কোন মন্দের দিকে না যায় বা সে কোন ভুল না করে সেদিকে পাহারা দিতে হবে। তার সমস্ত শিক্ষাই আসবে তার প্রকৃতি, তার বিভিন্ন শক্তি এবং তার স্বাভাবিক আগ্রহের বাধাহীন বিকাশের মধ্যে দিয়ে।

রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। শিশু তার নিজস্ব চাহিদামত কাজ করবে, কোন বাধা তাকে দেওয়া হবে না। কোন কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে তাকে কিছু শেখান হবে না, নিজের পছন্দমত জিনিস শেখার তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। শিশুকে জোর করে শেখাবার চেষ্টা করেই শিক্ষকেরা হিংসা, বিরক্তি, রাগ ইত্যাদি কুবৃত্তিগুলিই তার মধ্যে সৃষ্টি করে এসেছেন। শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেবার একমাত্র পন্থা হল তাকে কিছু না শেখান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা বুঝি শিক্ষার অভাবকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নেতিবাচক শিক্ষার মধ্যেও প্রচুর শিক্ষা আছে, তবে গতানুগতিক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, এ শিক্ষা সে শিক্ষা নয়। রুশো নিজেই বলেছেন যে নেতিবাচক শিক্ষা বলতে আলস্যের কালকে বোঝায় না। বরং ঠিক তার বিপরীত। এ সময়ে শিশু কোন জ্ঞান লাভ করে না বটে কিন্তু জ্ঞানলাভের উপকরণ যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সেগুলি সুগঠিত হয়, কোন যুক্তি বা বিষয় সে শেখে না বটে কিন্তু তা শেখার জন্য তার মন প্রস্তুত হয়ে ওঠে। শিশু এই শিক্ষাকালে কোন সদ্‌গুণ অর্জন করে না বটে কিন্তু মন্দ গুণ থেকে সে তার মনকে মুক্ত রাখে। সে কোন সত্য আহরণ করে না বটে কিন্তু কোনও মিথ্যাও তার মনে প্রবেশ করতে পারে না। যখন সে বড় হয় যখন তার ইন্দ্রিয় সব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং যখন তার বোঝার মত বয়স হয় তখন সে জ্ঞান, সত্য ও সৎকে নিজে থেকেই চিনে নিতে পারে, সেগুলিকে ভালবাসতে শেখে এবং তাদের পথেই স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যায়।

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব (Theory of Natural Consequence)

এই নেতিবাচক শিক্ষার মতবাদের দিক দিয়ে শিশুর শারীরিক শিক্ষা হবে মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে অবাধ সঞ্চালন, তার মানসিক বা জ্ঞানমূলক শিক্ষা বলতে কিছুই থাকবে না, কেননা, রুশোর মতে 'শৈশব হল বিচার বুদ্ধির ঘুমন্ত অবস্থা।' শিশুর নৈতিক শিক্ষাতেও মানুষের কোনও হস্তক্ষেপ থাকবে না। সেখানেও প্রকৃতি হবে একমাত্র শিক্ষক। রুশো এ তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব (Theory of Natural Consequence)। এর অর্থ হল যে শিশুর কাজের ভাল মন্দ বিচার করে পুরস্কার শাস্তি যা দেবার তা প্রকৃতিই দেবে, মানুষ দেবে না। রুশোর মতে ভাল মন্দ কাজের বিচার প্রকৃতি নিজেই করে থাকে এবং সেই মত তাকে পুরস্কৃত বা শাস্তিদান প্রকৃতিই করে থাকে। যেমন, বেড়াতে যাবার সময় শিশু

পোষাক পরতে দেরী করছে, তাকে বাড়ীতে রেখে যাওয়া হোক। জলে বেশী ভিজছে, তার ঠাণ্ডা লাগবে এবং তখন সে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে বাধ্য হবে। যদি সে বেশী খায় তবে স্বাভাবিকভাবেই তার শরীর খারাপ হবে। এক কথায় সমস্ত কাজেরই স্বাভাবিক ফলাফল শিশু ভোগ করুক এবং সেইভাবেই কোন্ কাজটা ভাল, কোন্ কাজটা মন্দ তা সে শিখুক।

রুশোর এই প্রকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বটি পরে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বিশেষভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু নানা দিক দিয়ে দেখা যায় যে এ তত্ত্বটি পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, প্রকৃতির দেওয়া শাস্তি সব ক্ষেত্রেই যে অপরিহার্য তা নয়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এই শাস্তি এত পরে আসে যে শিশু অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে কোনরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অপরাধ এবং প্রাকৃতিক ফলের মধ্যে আনুপাতিক সম্বন্ধও ঠিক থাকে না। অর্থাৎ লঘুপাপে গুরুদণ্ড এবং গুরুপাপে লঘুদণ্ডের দৃষ্টান্ত প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ফলাফলের উপর নির্ভর করাটা বিপজ্জনক হতে পারে, যেমন যে শিশু জলে ভিজছে তাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করা হলে তার নিউমোনিয়া হতে পারে এবং জীবনসংশয়ও হবার সম্ভাবনা থাকে।

শিশুর বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা

রুশো এমিলের শিক্ষাকে তার বয়স অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের শিক্ষার স্বরূপ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—

ক। এক থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের শিক্ষা

এ সময়ে শিক্ষা হবে প্রধানত শরীরমূলক। পিতা হলেন স্বাভাবিক শিক্ষক, মা স্বাভাবিক ধাত্রী। শিশুর প্রথম শিক্ষা আসবে এঁদের কাছ থেকেই। সাধারণভাবে প্রচলিত যে সমস্ত বাধা বা বিধিনিষেধ শিশুর উপর আরোপ করা হয়ে থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত করাই হবে এই শিক্ষার মূলধর্ম। শিশুকে আঁটসাট জামা পরিয়ে তার সহজ অঙ্গসঞ্চালনকে খর্ব করা, তার স্বাধীন চলাফেরাকে নানা বিধিনিষেধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা, তাকে বন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে রাখা, তার স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবণতাকে তৃপ্ত হতে না দেওয়া এবং তার কাজের ভালমন্দ বোঝার আগেই তাকে শাস্তি দেওয়া—ইত্যাদি যে সব অসংখ্য বাধা ও নিষেধ

শিশুর উপর আরোপ করা হয়ে থাকে সেগুলি থেকে তাকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে এ সময়ের শিক্ষার একমাত্র কর্মসূচী। শিশুর স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং শরীরকে সবল করাই হচ্ছে এ পর্যায়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। রুশোর মতে শরীর যত বলবান হবে ততই শরীর মনের অনুগত হবে। দুর্বলতা থেকেই আসে যত দুর্নীতি। শিশু দুর্বল বলেই মন্দ হয়। তাকে সবল করে তোলা হোক, সেও সৎ হয়ে উঠবে।

এক কথায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে নিছক শরীরমূলক। এ সময় তার মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের দিকে কোনরূপ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই। এমন কি শিশু যাতে বেশী কথা বলতে না শেখে তাও দেখতে হবে। কেননা অধিক কথা বলতে শেখা হল চিন্তা করতে শেখার পরিপন্থী।

রুশোর এ শিক্ষা পরিকল্পনা যে অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে কথা বলতে শেখা যে শৈশবকালে উন্নত চিন্তা করার পক্ষে অপরিহার্য এ মনোবৈজ্ঞানিক সত্যটি রুশোর জানা ছিল না।

খ। পাঁচ থেকে বার বছর বয়সের শিক্ষা

এ সময়ের শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটি নীতির দ্বারা শিশুর এ পর্যায়ের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথম নেতিবাচক শিক্ষা ও দ্বিতীয় প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্ব।

এই বয়সে শিশুকে কিছু শিক্ষা না দেওয়াই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। গতানুগতিক প্রথায় শিশুর উপর নানারূপ ভাবধারা, আচরণ, বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার সনাতন প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে রুশো বলেছেন যে শিশুর মনকে তার সহজ স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে দিতে হবে। তাকে কিছু পড়াতে বা শেখাতে হবে না। সে যা শিখবে তা নিজে থেকেই এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ীই শিখবে। প্রকৃতি চান যে শিশু মানুষ হয়ে ওঠার আগে যেন শিশুই থাকে।

এক কথায় এ পর্যায়ের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে নিছক ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি-গুলির অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে। সে কিছু শিখবে না বটে, কিন্তু কি করে শিখতে হয় তাই শিখবে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও ঘটনার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার বিভিন্ন মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে সে পরিচিত হবে। এই হল রুশোর নেতিবাচক শিক্ষার মূল কথা। আর এসময় শিশুর নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের সাহায্যে। নৈতিক নিয়মকানুন ভাঙার জন্য মানুষের আরোপিত শাস্তি তার উপর প্রযোজ্য হবে না, প্রকৃতি নিজে তাঁর বিচার করবেন এবং সেইমত তাকে শাস্তি দেবেন।

গ। বারো থেকে পনেরো বছর বয়সের শিক্ষা

এ সময় থেকে সুরু হবে শিশুর অস্তিবাচক শিক্ষা (Positive Education)। এতদিন শিশু তার জ্ঞান আহরণের মাধ্যমগুলিকে তৈরী করেছে। এখন থেকে সুরু হবে তার সত্যকারের জ্ঞান আহরণের কাজ।

কিন্তু সত্যকারের প্রয়োজনীয় ও মূল্যসম্পন্ন জ্ঞান কোন্‌টি তা কিসের দ্বারা বোঝা যাবে ? এ বিষয়ে শিশুর কৌতূহলই হবে একমাত্র পথনির্দেশক ; যা শিখতে এবং জানতে শিশু স্বাভাবিক কৌতূহল অনুভব করবে সেইটি শেখা এবং জানা হবে শিশুর পক্ষে সব দিক দিয়ে কাম্য। বিজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্য লাভ করার ইচ্ছা থেকে শিশু জ্ঞান আহরণ করবে না, তার নিজস্ব উন্নতিবোধের স্পৃহাই হবে তার জ্ঞান আহরণের মূলে প্রধান শক্তি।

গতানুগতিক শিক্ষার প্রচলিত পাঠক্রমে এমন অনেক কিছু থাকে যা শিশুর স্বাভাবিক রুচি-বিরোধী এবং যা তার কৌতূহল-প্রসূত নয়। রুশোর এই মতবাদ অনুযায়ী সে সবগুলিকে পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। রুশো এ পর্যায়েও বিশেষ কোনও বই পড়ার নির্দেশ দেননি। তাঁর মতে 'রবিনসন ক্রুসো' হল একমাত্র বই যা শিশুকে পড়তে দেওয়া যেতে পারে। আত্মনির্ভরতা, প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন, প্রচলিত জ্ঞানের অসারতা ইত্যাদি মূল্যবান বিষয়গুলি এই বই থেকে শিশু শিখতে পারবে।

নিছক জ্ঞান আহরণ করারও রুশো তীব্র সমালোচনা করেছেন। জ্ঞান মাত্রেই সত্য নয়, আবার প্রয়োজনীয়ও নয়। এমন অনেক জ্ঞান আছে যা ভুলে ভরা। ফলে যত বেশী জ্ঞান আহরণ করা যায় তত বেশী ভুলও আহরণ করা হয়। আবার সত্য মাত্রেই প্রয়োজনীয় নয়। কেবলমাত্র যে সব সত্য শিশুর কাছে প্রয়োজনীয় শিশু সেগুলিই শিখবে।

এ সময়ে শিশু কোন একটা শিল্পও শিখবে। এই শিল্প শেখাটি অর্থ-উপার্জনের জন্য নয় বা জ্ঞানলাভের জন্যও নয়। শ্রমমূলক কাজের প্রতি সাধারণের যে বিরূপ মনোভাব আছে তা দূর করাই হল এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ঘ। পনের থেকে কুড়ি বৎসর বয়সের শিক্ষা

এতদিন এমিলের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ও আত্ম-সীমিত। তার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবার সুরু হবে তার হৃদয়ের শিক্ষা। এতদিন কেবলমাত্র নিজের চাহিদাতৃপ্তি, নিজের উন্নতি, নিজের বিকাশসাধনই ছিল তার শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু এখন থেকে সুরু হল সমাজেব আর দশজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের শিক্ষা এবং এ শিক্ষায় অপরের প্রতি ভালবাসাই হবে প্রধানতম শক্তি।

দেখা যাচ্ছে যে রুশোর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক শিক্ষার সুরু হবে পনেরো বৎসর বয়স থেকে। এর আগের শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিমুখী—শিশুর নিজস্ব চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী। কিন্তু পনেরো বছর বয়স থেকে তাকে সমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য সমাজমূলক শিক্ষা দেওয়া সুরু হবে। অতএব রুশোর শিক্ষা-পরিচালনাকে সমাজ-বিরোধী বলা চলে না। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে শিশুকে সমাজমূলক শিক্ষা দেবার সুপরিকল্পিত আয়োজনই আছে।

শিশুর প্রক্ষোভের সুষম বিকাশই হবে এ পর্যায়ে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যা ছিল আত্মপ্রেম, তা এখন অপরের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগে পরিবর্তিত হবে। ফলে প্রথম দেখা দেবে বিবেক, ভালবাসার পাশাপাশি উদয় হবে ঘৃণা এবং তা থেকে জন্ম নেবে শিশুর ভাল-মন্দর জ্ঞান। এই ভাবে সুরু হবে শিশুর নৈতিক শিক্ষা।

এ নৈতিক শিক্ষা ধর্মমূলক শিক্ষার সঙ্গে একযোগে দেওয়া হবে। সহানুভূতি ও প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশু সামাজিক একতা শিখবে। নিছক কথার মধ্যে দিয়ে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার কোন মূল্য নেই। ব্যক্তিগত সংযোগ, সুদৃষ্টান্ত, ইত্যাদি বাস্তব অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে শিশুর প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা আসবে। রুশোর মতে সব নৈতিক শিক্ষাই কাজ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যায়। সেইজন্য শিশুকে ভাল কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সে ভাল মন্দ নিজে থেকে চিনতে পারে।

ঙ। মেয়েদের শিক্ষা

ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর অভিমত যথেষ্ট প্রগতিশীল হলেও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর মতবাদ সেই পুরাতনপন্থীই। তাঁর মতে মেয়েদের জন্মই হয়

পুরুষদের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য, অতএব তার শিক্ষাও পরিকল্পিত হবে সেই লক্ষ্যের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী তার শিক্ষা হবে—দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা সম্বন্ধে রুশোর এই প্রগতিশীল নীতিটি মেয়েদের ক্ষেত্রে কোন দিক দিয়েই প্রযোজ্য হচ্ছে না।

রুশোর শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ

শিক্ষা সম্পর্কে রুশোর যে অভিনব চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত রূপে আমরা নীচের শিক্ষানীতিগুলি গঠন করতে পারি।

(ক) শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী। প্রকৃতি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে শিশুর মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, আগ্রহ আর প্রকৃতিদত্ত মানসিক শক্তি-সামর্থ্য, তার পছন্দ অপছন্দ, তার সহজাত প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, আবেগ অনুভূতি ইত্যাদি। যা প্রকৃতিগত তাই শিশুর শিক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর, যা কৃত্রিম তাই তার পক্ষে ক্ষতিকর।

(খ) শিক্ষা একটি স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, তা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট করা যায় না। শিক্ষা হল প্রকৃতপক্ষে শিশুর সহজ, আভ্যন্তরীণ বিকাশ। অতএব বাইরে থেকে শাসনশৃঙ্খলার সাহায্যে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রকৃতিগত শক্তিগুলির কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেখা দেয়, শিক্ষকের বা অন্য কোন বহিঃশক্তির চাপে দেখা দেয় না।

(গ) শিক্ষা নিছক তথ্য বা জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা প্রকৃতিদত্ত শক্তিগুলির পুষ্টি ও উৎকর্ষসাধন। শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মানসিক শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই হল যথার্থ শিক্ষা।

(ঘ) শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হবে শিশুর নিজের চাহিদা ও ইচ্ছার দ্বারা, পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতির চাহিদার দ্বারা নয়।

(ঙ) শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হলে শিশুকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং যেহেতু প্রকৃতির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রয়েছে সেহেতু শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু এবং তার স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করাটাই রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

(চ) প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষা দেবার আগে শিশুকে ভাল করে জানা

উচিত। রুশোর মতে শিশুকে ভাল করে না জেনে কোন কিছুই তাকে শেখান উচিত নয়।

(ছ) শারীরিক সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্য বজায় রাখা শিক্ষার কর্মসূচীর প্রধানতম অঙ্গ।

(জ) শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হবে শিশুর কৌতূহল ও আগ্রহের দ্বারা। ভাষামূলক ও সাহিত্যধর্মী শিক্ষার পরিমাণ কমিয়ে ইন্দ্রিয়ভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(ঝ) প্রকৃত শিক্ষা আসবে শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নিছক বই পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে নয়। রুশো বলেন যে, আমাদের প্রথম শিক্ষক হল আমাদের হাত পা আর চোখ। এদের পরিবর্তে বইকে শিক্ষক করার অর্থ হল আমাদের অপরের বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করতে শেখান। এইজন্য শিশুর শিক্ষাকে ব্যাপক এবং বহুমুখী করতে হবে যাতে সে সকল প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং যাতে তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়।

শিক্ষায় রুশোর অবদান

রুশোর মতবাদের মধ্যে স্ববিরোধিতা, অতিরঞ্জন এবং বহুবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যকারের একটা বিপ্লব এনে গেছেন এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিমত থাকতে পারে না। বর্তমানে আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তার বিভিন্ন ভাবধারার গঙ্গোত্রী যে রুশোর নতুন মতবাদটী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁরই ভাবসম্পদকে আশ্রয় করে পরবর্তী যুগের শিক্ষাবিদেরা গড়ে তোলেন আধুনিক শিক্ষার সুরম্য সৌধটি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান, এই উভয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নীতি ও পদ্ধতির নিরূপণে পরবর্তী যুগে রুশোর মতবাদ অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা ছিল যে মানুষের ত্রিবিধ প্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তার মনোবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি অর্থাৎ তার সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা, প্রকৃতিদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদির বাধাহীন বিকাশই হবে প্রকৃত শিক্ষা। তার ফলে শিক্ষাকে শিশুর এই অন্তঃপ্রকৃতিকে ভাল করে জানতে হবে, তার চাহিদা পছন্দ আগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে হবে। রুশোর এই মতবাদ

থেকে জন্ম নিয়েছিল যাকে আমরা বলতে পারি শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলন। তাঁর চিন্তাধারার এই প্রবাহটির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী যুগে পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বার্টের প্রসিদ্ধ শিক্ষাপরিকল্পনাগুলি।

বহির্জাগতিক প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ থেকে দেখা দিয়েছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ঘটনা ও তথ্যাবলীকে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু করে তোলার ব্যাপক আয়োজন। প্রকৃতিকে কেবলমাত্র কতকগুলি জড়বস্তু এবং প্রাণীর সমষ্টি মনে করলেই চলবে না, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত সর্বজনীন সূত্রগুলিকে আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণ করাই হল প্রকৃতিকে সত্যকারের জানা। রুশোর দেওয়া প্রকৃতির এই নতুন সংব্যাখ্যান পরবর্তীযুগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল এবং শিক্ষার কর্মসূচীর মধ্যে প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণকে অপরিহার্য অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

রুশোর প্রাকৃতিক মানুষের তত্ত্ব থেকে দেখা দিয়েছে শিক্ষার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতবাদটি। মানুষের আদিম প্রকৃতি, তার প্রকৃতিদত্ত অনুভূতি ও নীতিবোধ, তার আত্মসচেতনতা ইত্যাদিকে অবিকৃত রাখতে হবে সমাজে প্রচলিত কৃত্রিম শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাব থেকে। এই ভাবধারা থেকে জন্ম নিয়েছে রুশোর সমাজ-বিরোধী শিক্ষার পরিকল্পনাটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রুশোর শিক্ষাদর্শ সমাজবিরোধী নয়। তিনি এমন একটি সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন যেখানে প্রীতি সহানুভূতি, দয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণভাবে বিকশিত হবে।

রুশোর এই বিভিন্ন ভাবসম্পদকে ভিত্তি করে নানাস্থানে নানা প্রকৃতির প্রগতিশীল শিক্ষা প্রচেষ্টা জন্ম নিয়েছিল। জার্মানীতে বেসেডো স্যালজমান (Salzmann) এবং ক্যাম্পে (Campe) পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পরবর্তী যুগে পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বার্ট আরও ব্যাপকভাবে রুশোর নতুন ভাবধারাগুলি শিক্ষায় প্রয়োগ করতে চেষ্টা করলেন এবং তার ফলে নতুন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে উঠতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর সুরুতে রুশোর নতুন মতবাদের মূল্য ও গুরুত্ব শিক্ষাবিদেরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলেন এবং ইংলণ্ড, ইটালি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন প্রগতিশীল বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগলো।

বর্তমানে যাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা (Child-centred Education) নাম

দেওয়া হয়েছে তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিটি কোন না কোন রূপে রুশোর মতবাদে নিহিত ছিল এবং মন্টেসরি, ফ্রান্সিস পার্কার, জন ডিউই, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণের দীর্ঘ সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে আজ সেই সুপ্ত বীজগুলি এক একটি বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

প্রশ্নমালা

1. Describe in brief the major educational ideas of Rousseau and their influence on the development of education in later period.

Ans. (পৃঃ ৩—পৃঃ ১৫)

2. Critically estimate Rousseau's contribution to education.

Ans. (পৃঃ ১৩—পৃঃ ১৫)

3. Rousseau is the father of modern education—how far do you support this statement?

Ans. (পৃঃ ১২—পৃঃ ১৫)

4. Describe after Rousseau the education of the child in different stages. Comment on his concept of Negative Education.

Ans. (পৃঃ ৮—পৃঃ ১৫)

দুই

জোহান হিনরিক পেষ্টালৎসী (Johann Heinrich Pestalozzi)

শিক্ষাজগতের নতুন প্রগতিশীল ভাবধারার জন্ম দেবার পূর্ণ কৃতিত্ব রুশোর হলেও সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার মত শক্তি বা পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। রুশো নিজে সৃজনধর্মী ছিলেন না এবং তাঁর কোন সংগঠনমূলক গুণও ছিল না। সেজন্য রুশোর বৈপ্লবিক মতবাদগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করবার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত অনুগামীদের উপর। রুশোর ঠিক পরেই যে কয়জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রুশোর আদর্শে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পেষ্টালৎসীই প্রথম। শিশুকে কিছু শেখাতে হলে তাকে আগে ভালো করে জানতে হবে—রুশোর এই অভিমত থেকেই জন্ম নিয়েছিল শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের অর্থ হল যে শিশুর শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলতে হবে। পেষ্টালৎসীকেই সাধারণত এই আন্দোলনের জনক বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে পেষ্টালৎসীর অনুগামী আরও দুজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল এবং হার্বার্ট এই আন্দোলনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে পেষ্টালৎসীর সময়ে মনোবিজ্ঞানের উন্নতি বা প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। পেষ্টালৎসী নিজে মোটেই উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি গর্ব করে বলতেন যে গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি কোন বই স্পর্শ করেননি। মুনষ্টারবার্গের (Munsterberg) মতে পেষ্টালৎসী মনোবিজ্ঞানের অ-আ-ক-খও জানতেন না। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি এবং সু-সমৃদ্ধ সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে পেষ্টালৎসী প্রচলিত শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠনের প্রচুর উন্নতি সাধন করেন এবং তাঁর সেই শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার অপরিণত ও অসম্পূর্ণ আন্দোলনই পরবর্তী যুগের প্রগতিশীল শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি বিরাট শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

১৭৪৬ সালে ইউরোপের জুরিখ নামক শহরে পেষ্টালৎসীর জন্ম হয়। তিনি প্রথম জীবন থেকেই রুশোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রুশোর নতুন

আবেগপ্রবণ উক্তিগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে—একথা পেষ্টালৎসী ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি প্রথমে রুশোর এমিল (Emile) বইতে বর্ণিত শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী তাঁর একটি ছেলেকে মানুষ করতে সুরু করলেন। পরে ১৭৭৪ সালে নিউহফ নামক একটি জায়গায় দরিদ্র ও অবহেলিত ছেলেমেয়েদের জন্য পেষ্টালৎসী একটি স্কুল খুললেন। অর্থের অভাবে তাঁর স্কুল না চললেও তিনি শিক্ষার উপর পর পর অনেকগুলি বই লেখেন। এই বইগুলিতে তিনি তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদগুলিকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তাছাড়া পেষ্টালৎসী পঁচিশ বৎসরের উপর সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে শিক্ষকতা করে কাটিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ শিক্ষকতা এবং তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষাতত্ত্ব পেষ্টালৎসীকে শিক্ষার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়ে গেছে।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্ব

রুশোর মত পেষ্টালৎসীও শিক্ষার গতানুগতিক সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে একজন পরম ধর্মানুরাগী ব্যক্তি হয়েও ধর্মাচরণকে শিক্ষার লক্ষ্য বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে শিক্ষা হল শিশুর সমস্ত শক্তি এবং মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং সুষম বিকাশ। অতএব শিক্ষককে শিশুর শক্তি ও বিভিন্ন বৃত্তিগুলির স্বরূপ ভাল করে জানতে হবে। এক কথায় শিশুর প্রকৃতিটির সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হতে হবে এবং তার সেই প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শিশুর প্রকৃতিকে ভাল ভাবে জানা মানেই হল শিশুর মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া এবং সেই মনোবৈজ্ঞানিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে শিশুর শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে তোলাই সার্থক শিক্ষাদানের প্রথম সোপান। শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তোলার যে আদর্শের পেছনে পেষ্টালৎসী বলতে গেলে একরূপ তাঁর সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করেছিলেন—এইটি হল সেই আদর্শের মূলকথা। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি শিক্ষাকে নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণ বলে মনে করতেন। লেওনার্ড ও গারট্রুড (Leonard & Gertrude) নামে তাঁর প্রসিদ্ধ বইটিতে তিনি একটি নতুন শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা কেবলমাত্র যে শিশুরই নৈতিক ও মানসিক বিকাশই সাধন করবে তাই নয়, সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও অনুরূপ সংস্কার ও পরিবর্তন আনবে। গারট্রুড ছিল একজন অজ্ঞ সাধারণ গ্রাম্য নারী। কিন্তু সে নিছক অন্তর্দৃষ্টি, সাধনা ও

পরিশ্রমকে সম্বল করে তার নিজের ছেলেমেয়েদেরই যে কেবল সার্থক শিক্ষা দিয়েছিল তা নয়, তার নতুন শিক্ষাদর্শের প্রভাবে তার অলস ও পানাসক্ত স্বামী লেওনার্ডও সম্পূর্ণ বদলে গেল। দেখতে দেখতে তার এই নতুন ভাবধারার প্রভাবে তার ছোট গ্রামখানির প্রত্যেক অধিবাসীর মধ্যেই মানসিক ও নৈতিক উন্নতি দেখা দিল। সমাজের উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনে শিক্ষার এই অপরিহার্যতা পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা।

এ থেকেই এসেছে পেষ্টালৎসীর শিক্ষাতত্ত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি। শিক্ষা কোন বিশেষ শ্রেণী বা দলের জন্য নয়। শিক্ষা সর্বজনীন, প্রত্যেকের আজন্ম অধিকার। রুশো যা চেয়েছিলেন একটি ছেলের জন্য—এমিলের জন্য, পেষ্টালৎসী তা চাইলেন বিশ্বের সব ছেলেমেয়ের জন্য, তা সে দরিদ্র, নীচ বা ক্ষীণবুদ্ধিষ্ট হোক না কেন। পেষ্টালৎসীর এই শ্রেণীধর্মনির্বিশেষে সর্বজনগণের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার দাবীও যে সে সময়ের পবিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পেষ্টালৎসীব শিক্ষাতত্ত্বের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া। রুশোর অনুকরণে তিনিও প্রচলিত শিক্ষাপ্রথাব তীব্র সমালোচনা করেন এবং স্বাভাবিক বিকাশ-প্রক্রিয়া অনুযায়ী শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত কবার নির্দেশ দেন। তাঁর মতে শিশু যে প্রকৃতিদত্ত শক্তি, আগ্রহ, সম্ভাবনা ও বিকাশোন্মুখতা নিয়ে জন্মায় সেগুলিকে আমরা শিক্ষার নামে হত্যা করি। সত্যকারের শিক্ষা হবে এগুলিকে পূর্ণ ও বাধাহীনভাবে বর্ধিত হতে দেওয়া। পেষ্টালৎসীর মতে আদর্শ শিক্ষা হল শিশুর মানসিক, নৈতিক, দৈহিক প্রভৃতি সব দিকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশ কখনও নিছক বই পড়ে বা তথ্য আহরণ করে আসে না। শিশুর বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুসংহত কার্যাবলীর মাধ্যমেই এই ঈপ্সীত বিকাশ দেখা দিয়ে থাকে।

পেষ্টালৎসীব শিক্ষাতত্ত্বের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলিত আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন সাধন। গতানুগতিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম, রুক্ষ, বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ শিক্ষাব পরিবেশকে তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে সেখানে প্রীতি, ভালবাসা ও সহানুভূতির এক মধুর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। তাঁর মতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বোঝাপড়া ও সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকে তবে সেখানে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে এই যে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি, এইটি বোধ করি নবশিক্ষার আন্দোলনে পেষ্টালৎসীর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতি

রুশোর মত পেষ্টালৎসী নিছক শিক্ষার কতকগুলি তত্ত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির কার্যকারিতাও বিচার করেছিলেন। রুশো পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে বহু নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে-ছিলেন কিন্তু সেগুলির সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নি। পেষ্টালৎসী তাঁর শিক্ষাতত্ত্বগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নিজে শিক্ষকতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে কার্যোপযোগী করে তোলার কাজেই সারাজীবন নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই সুতীব্র উদ্দীপনা, সীমাহীন অনুপ্রেরণা অনলস সাধনা এবং আত্মোৎসর্গই তাঁকে সারা বিশ্বের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। নিজে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করে পেষ্টালৎসী দেখলেন যে শিক্ষার দুটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই পাওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি হল কোন্ কোন্ জ্ঞান ও ব্যবহারিক শক্তি শিশুর পক্ষে আহরণ করা প্রয়োজন এবং দ্বিতীয় কি পদ্ধতিতে সেই জ্ঞান ও শক্তি শিশুকে অর্জন করতে সমর্থ করা যায়। এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পেছনেই তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন।

বস্তুভিত্তিক পাঠ (Object Lesson)

পেষ্টালৎসী তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষণের ফলরূপে একটি নতুন শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তার নাম দেন তিনি বস্তুভিত্তিক পাঠদান (Object Lesson)। এই পদ্ধতির মূল নীতি হল যে শিশুর শিক্ষা নিছক ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া হবে না কোন মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে দেওয়া হবে। এর ফলে বস্তুটি সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করবে তা বাস্তবধর্মী ও স্থায়ী হবে। তাছাড়া এর দ্বারা শিশুর পর্যবেক্ষণ-কুশলতাও বৃদ্ধি পাবে। পেষ্টালৎসীর আগে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াসও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সে পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করা। পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠদানের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর সমগ্র মনের বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। পেষ্টালৎসীর ভাষায়, শিশু শিখেছে মানেই শিশু মনের দিক দিয়ে বেড়েছে এবং সে বাড়ে তার নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে, তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, নিছক কথার মধ্যে দিয়ে নয়। এক কথায় বাস্তব জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতির সমগ্র পরিকল্পনাটাই এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে শিক্ষা হল মনের ছেদহীন বিকাশ এবং তা আসে মনের

এমন কতকগুলি বিশেষ দিকের চর্চা থেকে যার ফলে মন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রগতিশীল পন্থায় কাজ করতে পারে। মনের এই বিশেষ দিকগুলির চর্চাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যেন শিশুর বৃদ্ধির যে কোন স্তরেই তার মানসিক বিকাশ সুষম ও সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই চর্চাও আবার নির্ভর করবে কথা বা ভাষা শিক্ষার উপর নয় মূর্ত বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর। শিক্ষার এই মৌলিক ব্যাখ্যান থেকেই পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠদানের পদ্ধতিটি জন্মলাভ করেছে।

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিক্ষণে পেষ্টালৎসী তাঁর এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষায় পেষ্টালৎসী গণিতের উপর জোর দিয়েছিলেন, বিশেষ করে মানসিক গণিতের উপর। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থায় গণিতও শেখান হত মূর্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে এবং তার ফলে গণিত শিক্ষার পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। অঙ্কন ও লিখনের উপরও পেষ্টালৎসী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। লেখা ও আঁকা উভয় ক্ষেত্রেই শিশু সরলরেখা, বক্ররেখা প্রভৃতির সমাবেশের সাহায্যে কুশলতা অর্জন করত। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বানান করে অক্ষর শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার স্থানে উচ্চারণ করে শব্দাংশ শিক্ষার পদ্ধতির অনুসরণ করা হত এবং তার ফলে ভাষা শেখাটা অনেক বেশী সহজসাধ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতিটিও তিনি একইভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন। সাধারণ ও সহজ বস্তুর সাহায্যে ভৌগোলিক সত্তাগুলিকে ধীরে ধীরে গঠন করে তোলা এবং মানুষের সঙ্গে সেই সত্তাগুলির সম্পর্ক নিরূপণ করাই ছিল তাঁর ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতি। তাছাড়া ভূগোল শিক্ষাকে প্রকৃতিবীক্ষণ এবং কৃষিকার্য শেখার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকেই প্রকৃতি বীক্ষণকে পাঠক্রমের অঙ্গীভূত করার আন্দোলন জন্ম নিয়েছে। সঙ্গীত এবং শরীরচর্চাকে বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর প্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করা হত। পেষ্টালৎসীর শিক্ষণ পদ্ধতির মৌলিক নীতিগুলি সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হল।

(ক) পর্যবেক্ষণ সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি এবং ভাষা শেখানোর সময় পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মূর্তবস্তুর সঙ্গে ভাষাকে গ্রন্থিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) শেখার সময় আর বিচার ও সমালোচনা করার সময় এক নয়।

(গ) শিক্ষার প্রত্যেকটি অংশের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে যাতে শিশু ভালভাবে বিষয়টি শিখতে পারে।

(ঘ) শিক্ষণ সব সময়ে সাধারণ ও সহজ বস্তু দিয়ে সুরু হবে এবং ধীরে ধীরে শিশুর বৃদ্ধি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারায় এগোবে।

(ঙ) শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর বৃদ্ধি, কেবল কতকগুলি একতরফা মতবাদ শেখান নয়। শিক্ষক অবশ্যই শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করবেন।

(চ) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে জ্ঞান বা বিদ্যা দেওয়া নয় তার বুদ্ধির ক্ষমতাকে বাড়ান ও বিকশিত করা। তাছাড়া শিশুর মানসিক শক্তির সঙ্গে তার জ্ঞানকে সুসমন্বিত করতে হবে।

(ছ) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

(জ) শিক্ষাদান সব সময়েই শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্যের অধীন হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ

যে যুগে উচ্চকণ্ঠস্বর ও কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষমতাকেই শিক্ষকবৃত্তির প্রধানতম গুণ বলে মনে করা হত, সে যুগেই পেষ্টালৎসী শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করছে পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের উপর। সেইজন্য তিনি তাঁর সময়ের অনেকখানি ব্যয় করতে সুরু করলেন উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করাব জন্য। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁর কাছে শিক্ষকেরা আসতে সুরু করলেন শিক্ষাগ্রহণের জন্য। বহুদেশ সরকারী বৃত্তি ও অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের পাঠালেন পেষ্টালৎসীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণেব জন্য। দেখতে দেখতে পেষ্টালৎসীর শিক্ষায়তন হয়ে উঠল সর্বজনীন কৌতূহল ও বিস্ময়ের বস্তু এবং শিক্ষক থেকে সুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দলে দলে সেখানে ভিড় করতে লাগল, সে সময়কার সর্বাধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির রূপটি দেখবার উদ্দেশ্যে। নবাগত শিক্ষণকামী শিক্ষকদের দল বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় এই নতুন যুগের শিক্ষকটিব অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি দেখত এবং তাঁর প্রগতিশীল শিক্ষাপরিকল্পনার মৌলিক তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে দেশে ফিরত।

পেষ্টালৎসী কেবলমাত্র তাঁব আবিষ্কৃত পদ্ধতিই যে তাদের শেখাতেন তা নয়, তাদের শেখাতেন কেমন করে শিশুর প্রকৃতিকে চিনতে হবে, কি ভাবে সেই প্রকৃতির বিকাশোন্মুখতা অনুযায়ী তার শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং কেমন করে পরীক্ষণের সাহায্যে আরও উন্নততর শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে এবং সব শেষে কেমন করে অভিজ্ঞাতর পরীক্ষণাগারে সেগুলিকে যাচিয়ে নিতে হবে।

দেখতে দেখতে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই পেষ্টালৎসীর ছাত্র, শিষ্য ও অনুগামী সমর্থকদের দল গড়ে উঠল। তাঁরা নবীন উৎসাহে পেষ্টালৎসীর নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োগ করতে সুরু করলেন এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টা থেকে গড়ে উঠল নতুন এক শ্রেণীর শিক্ষায়তন যেখানে প্রথম শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূর্তরূপ দেখা দিয়েছিল। পেষ্টালৎসীর ছাত্র ও অনুগামীদের মধ্যে জার্মানবাসী ফগেনবার্জ (Fallenberge), হার্বার্ট (Herbart), ফ্রয়েবেল (Froebel), জেলার (Zeller), সেলডন (Sheldon) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে হার্বার্ট ও ফ্রয়েবেল পরবর্তী শতকে নবশিক্ষা ব্যবস্থার অধিনায়করূপে দেখা দেন।

পেষ্টালৎসীর শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্তসার

পেষ্টালৎসীর শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই, যথা—

(ক) শিক্ষা হল শিশুর প্রকৃতিদত্ত সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলির সুষম বিকাশ। অতএব জ্ঞান আহরণ, ধর্মানুষ্ঠান বা সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ইত্যাদি শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না।

(খ) শিক্ষা যে কেবলমাত্র শিশুর পূর্ণ বিকাশই আনে তা নয়, সমাজের পুনর্গঠন ও নৈতিক মানের উন্নয়নেরও প্রধানতম উপকরণ হল শিক্ষা।

(গ) শিক্ষা কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার, শিক্ষা সর্বজনীন।

(ঘ) শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা ও বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ প্রক্রিয়া এবং সে বিকাশ আসবে শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সু-সংহত কার্যাবলীর মাধ্যমে।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ কৃত্রিম ও কঠোর শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। বিদ্যালয় হবে গৃহেরই প্রতিচ্ছবি এবং গৃহের মধ্যে যেমন স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিময় আবহাওয়া থাকে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া হবে তার অনুরূপ।

(চ) পর্যবেক্ষণ সমস্ত শিক্ষার মূলে, অতএব শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ বিকাশ এবং তার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতার উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য।

(ছ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক পারস্পরিক আদান প্রদান ও সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিক্ষায় পেষ্টালৎসীর অবদান

রুশোর মত প্রতিভা বা বৈপ্লবিক ভাবধারা নিয়ে পেষ্টালৎসী জন্মান নি। তাঁর অনুগামী হার্বার্টের মত পাণ্ডিত্য বা ফ্রয়েবেলের মত গভীর দার্শনিক অনুভূতিও তাঁর ছিল না। নতুন তত্ত্ব বা চিন্তার দিক দিয়ে রুশোর চেয়ে একটি নতুন কথাও তিনি বলেন নি। তিনি যা লিখেগেছেন তার মধ্যেও প্রচুর স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য বর্তমান। যে মনোবিজ্ঞানকে তিনি শিক্ষার ভিত্তি করার ব্রত নিয়েছিলেন সে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। এমন কি বহুক্ষেত্রে তাঁর ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানবিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেষ্টালৎসীকে আমরা আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম কারুশিল্পী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।

তার প্রথম কারণ হল তিনিই প্রথম রুশোর শিক্ষাতত্ত্বের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা-গুলিকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে বেসডো প্রভৃতি রুশোর অনুরাগীরা রুশোর আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন কবলেও পেষ্টালৎসী হলেন প্রথম শিক্ষক যিনি প্রগতিশীল শিক্ষার রূপটিকে বিশ্বের সামনে সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরলেন এবং সর্বসাধারণের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি ও সমাদর আদায় করলেন।

দ্বিতীয়ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সূত্রপাতে মানব-চিন্তার রাজ্যে বহুমুখী পরিবর্তন এসেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রুশো, ভলটেয়ার, হেগেল প্রভৃতিব নতুন ভাবধারার সৃষ্টি, মনোবিজ্ঞানে ডেকার্ট, লক, হবস্ প্রভৃতির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন, মানবতাবাদী শিক্ষকদের প্রাচীন সংকীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইরাসমাস, কমেনিয়াস, রুশো প্রভৃতি প্রগতিপন্থী শিক্ষাবিদ্দের শিক্ষাব নতুন আদর্শ প্রচাব ইত্যাদি ঘটনাগুলি শিক্ষাজগতে একটা আমূল পবিবর্তনকে আসন্ন করে তুলেছিল। কেবলমাত্র উপযুক্ত মাধ্যমেব অভাবেই সেই বিপ্লবটি এতদিন বিলম্বিত ছিল। পেষ্টালৎসী সেই আসন্ন বিপ্লবের অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যমরূপে দেখা দিলেন এবং তাঁব মধ্যে দিয়েই শিক্ষাজগতের এই বহুমুখী পরিবর্তনের রুদ্ধ শক্তিটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই কারণেই শিক্ষার ইতিহাসে পেষ্টালৎসীর স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, পেষ্টালৎসী কেবল নতুন শিক্ষার আদর্শ বা তত্ত্ব উপস্থাপন করেই নিবৃত্ত হন নি, তাঁর সুদীর্ঘ অনলস জীবন দিয়ে সেগুলির তিনি কার্যকারিতা বিচার করেছিলেন। শিক্ষাবিষয়ে তাঁর মতামত ও নির্দেশ সবই বাস্তব

পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেগুলি গভীরভাবে বিদ্বৎসমাজের অন্তর স্পর্শ করেছিল। পেষ্টালৎসীর এই পরীক্ষণ তাঁর সময়ে এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহুদেশের বহু শিক্ষাবিদ্‌কে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরীক্ষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বর্তমানে শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে যে পৃথিবীব্যাপী নানাবিধ গবেষণা চলেছে তার মূলে আছে পেষ্টালৎসীর এই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা।

চতুর্থত, পেষ্টালৎসীই প্রথম শিশুশিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তী যুগে শিক্ষার পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারের আন্দোলনের জন্ম হয় এবং কালক্রমে তার ফলস্বরূপে বহু প্রগতিশীল পদ্ধতির আবিষ্কার হয়।

পঞ্চমত, শিক্ষার রুক্ষ কঠোর পরিবেশের মধ্যে তিনি এক নতুন প্রীতিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে শিক্ষা সম্বন্ধে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালবাসা ও প্রীতি যে যথার্থ শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য—আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এই মৌলিক তথ্যটুকু প্রথম বাস্তবে প্রয়োগ করেন 'ফাদার পেষ্টালৎসী'।

ষষ্ঠত, পেষ্টালৎসী শিক্ষাকে সর্বজনীনতা দান করে গেছেন। শিক্ষা যে সকলের জন্মাধিকার তাঁর এই মতবাদ থেকে জন্মেছে আধুনিক সর্বজনীন শিক্ষাদানের আদর্শটি।

সবশেষে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করার প্রচেষ্টাই পেষ্টালৎসীর শিক্ষাক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় অবদান। প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পেষ্টালৎসীর বিশেষ কোন পরিচয় না থাকলেও এবং বহুক্ষেত্রে ভুল মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর তাঁর মতবাদ এবং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হলেও পেষ্টালৎসীর প্রচেষ্টাই যে পরবর্তীযুগের শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল, মন্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাব্যবস্থাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং আজ সেই সব প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলরূপে দেখা দিয়েছে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা। বস্তুত, প্রগতিশীল শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সাম্প্রতিক সৌধরচনার মালমশলা দিয়ে যান রুশো। পেষ্টালৎসী হলেন প্রথম কারুশিল্পী যিনি সেই মালমশলা দিয়ে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সে সৌধের

ভিত্তি স্থাপন করেন। শিক্ষার পূর্ণ সৌধগঠনের কৃতিত্ব পরবর্তী শিক্ষাবিদগণের হলেও পেষ্টালৎসীকে তার প্রথম ভিত্তিস্থাপকরূপে আমরা সব সময়েই মনে রাখব।

প্রশ্নাবলী

1. "The modern education breathes the spirit of Pestalozzi"—Discuss.

Ans. (পৃ: ১৭—পৃ: ২৫)

2. Critically estimate Pestalozzi's contribution to education.

Ans. (পৃ: ২৩—পৃ: ২৫)

3. Discuss the new method of teaching introduced by Pestalozzi.

Ans. (পৃ: ১৬—পৃ: ২৫)

4. Pestalozzi is the originator of the movement of psychologising education. How far is this statement true?

Ans. (পৃ: ১৯—পৃ: ২৫)

তিনি দিয়েছেন আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জ (apperceptive mass)। এক কথায় আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষণ করি তখন সেই বস্তুটিকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আত্মবীক্ষণ করি।

হার্বার্টের এই আত্মবীক্ষিত বস্তুপুঞ্জের মতবাদটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মতবাদ থেকে পরে শিক্ষার যে পদ্ধতি-তত্ত্বটি (methodology) গড়ে ওঠে তা সব দেশের শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বহু বৎসর ধরে প্রভাবিত করে এসেছে।

এই মতবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোন্ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দেব এবং কোন্ বস্তুটির প্রতি দেব না তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আত্মবীক্ষিত বস্তু-পুঞ্জের উপর। অতএব নতুন কোন ভাব বা জ্ঞান আয়ত্ত করার কাজে ব্যক্তির মানসিক পটভূমিকার প্রকৃতি এবং সংগঠনটিই সবচেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় শক্তি অর্থাৎ এক কথায় নতুন জ্ঞান আমরা পুরোনো জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষা করে থাকি।

হার্বার্টের পাঁচটি সোপান

এই যুক্তি থেকেই বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হার্বার্টীয় শিক্ষাতত্ত্বটি জন্মলাভ করেছে। সেটি হল যে শিশুর পুরোনো শিক্ষা যতদূর তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ঠিক সেইখান থেকেই তার নতুন শিক্ষা সুরু হবে। নতুন কিছু শেখবার আগে শিক্ষক ভাল করে দেখে নেবেন যে শিশুর পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা সেই নতুন জ্ঞান বা তথ্য গ্রহণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত কি না। হার্বার্টের প্রসিদ্ধ আকারমূলক পাঁচটি সোপান (Five Formal Steps) তাঁর এই আত্মবীক্ষণের তত্ত্ব থেকে জন্মলাভ করেছে এবং সম্পূর্ণ-ভাবে পুরোনো থেকে নতুনে বা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে যাওয়ার শিক্ষানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নীচে এই সোপান পাঁচটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। **প্রস্তুতিকরণ** (Preparation)

এই পর্যায়ে শিক্ষক এমন একটি বিষয় নিয়ে তাঁর পাঠ সুরু করেন যার স্বরূপ সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে পূর্ব থেকেই পরিষ্কার জ্ঞান রয়েছে।

২। **উপস্থাপন** (Presentation)

এই সোপানে শিক্ষক নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করেন।

৩। **অনুষঙ্গস্থাপন** (Association) বা **তুলনাকরণ** (Comparison)

এই পর্যায়ে শিক্ষক পূর্বের সোপান দুটির বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনা করেন এবং তাদের মধ্যে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য ও কোথায় বৈসাদৃশ্য আছে তা দেখিয়ে দেন। এই ভাবে অনুষঙ্গস্থাপন বা তুলনার সাহায্যে শিক্ষক পুরাতন জ্ঞান ও নতুন জ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় এনে দেন।

হার্বার্টের মতে এই ধাপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যত স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু ভাবে শিক্ষক এই অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারবেন, ততই শিক্ষার্থীর আত্মবীক্ষণ সুদৃঢ় ও স্থায়ী হবে।

৪। সামান্যীকরণ (Generalisation)

এই সোপানে শিক্ষার্থী যে সব তথ্য বা ধারণা আহরণ করে শিক্ষক তাকে সেগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শেখান। অর্থাৎ সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বগুলিকে বেছে নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য গঠন করতে তিনি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধাপে শিক্ষাদান কাজটি শেষ হয়।

৫। অভিযোজন (Application)

পূর্বের সোপানে শিক্ষার্থী যে সব সামান্য সত্য বা মৌলিক তত্ত্ব আহরণ করল এই সোপানে সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কতকগুলি নতুন সমস্যা সমাধান করার কাজ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই সোপানে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়।

হার্বার্টীয় শিখন-সোপানের সমালোচনা

হার্বার্টের শিক্ষাদানের এই পাঁচটি সোপান শিক্ষক মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পৃথিবীর বহুদেশের শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের সময় এই পাঁচটি সোপান অনুসরণ করতে সুরু করেন। বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা দানকালে হার্বার্টের আত্মবীক্ষণ তত্ত্ব এবং শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধানতম অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু গত কয়েক দশক থেকে নানা কারণে হার্বার্টীয় পাঁচটি সোপানের মূল্য বেশ কমে এসেছে। বহু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করেন এবং এর গুরুতর অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান সমালোচনা হল এই যে শিক্ষাদান কখনও ছাঁচে ঢালা সুনির্দিষ্ট সোপান অনুসরণ করে এগোয় না। শিক্ষাদান একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অনেকটা নির্বাধ স্রোতস্বিনীর মত তা শিক্ষকের মন থেকে জন্মলাভ করে এবং নিজস্ব গতিপথ ধরে এগোয়। তাকে সুনির্দিষ্ট কোন ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করলে তার সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দ গতিকেই খর্ব করা হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদান একটি নিরবচ্ছিন্ন একক-প্রক্রিয়া, একে টুকরো টুকরো করে বিভাগ করলে সে বিভাজন কৃত্রিমই হবে।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে প্রচলিত ক্লাসে পড়ানোর যে স্বল্প সময় পাওয়া যায় তাতে পাঁচটি সোপান অনুসরণ করবার চেষ্টা করলে কোন পাঠদানই সম্পূর্ণ হবে না। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে অর্থাৎ দ্বিতীয় সোপানে এতটা সময় কেটে যায় যে পরের সোপানগুলি অনুসরণ করার সময়ই থাকে না। এই জন্য আধুনিককালে অনেকে পাঁচটি সোপানকে কেটে ছেঁটে তিনটিতে দাঁড় করিয়েছেন, যেমন প্রস্তুতীকরণ, উপস্থাপন ও অভিযোজন। এতে অবশ্য হার্বার্টীয় সোপানকে কিছুটা বজায় রাখা হল কিন্তু হার্বার্টীয় শিক্ষাদানের মূলতত্ত্বটিকে অনেকখানি বাদ দেওয়া হল। হার্বার্টের তৃতীয় ও চতুর্থ সোপানে অনুষঙ্গস্থাপন ও সামান্যীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে আত্মবীক্ষণ গঠিত হত সেটিই হার্বার্টের মতে শিক্ষার প্রধান সহায়ক। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই দুটি সোপান বাদ দেওয়াতে হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের অনেকখানি খর্ব করা হল। হার্বার্টের সবচেয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক জন ডিউই। তিনিও হার্বার্টের মত শিক্ষাগ্রহণের পাঁচটি সোপানের উল্লেখ করেছেন। যথা, (১) সক্রিয়তা (Activity), (২) সমস্যা (Problem), (৩) তথ্য (Data), (৪) বিকল্পন (Hypothesis) ও (৫) পরীক্ষণ (Testing)। ডিউই হলেন সক্রিয়তামূলক শিক্ষার প্রধানতম সমর্থক। তাঁর দেওয়া শিক্ষা সোপানগুলির প্রথম সোপানে শিক্ষার্থী একটি কর্ম সম্পাদন করে, দ্বিতীয় সোপানে সেই কর্মটি সম্পন্ন করতে করতে সে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়, তৃতীয় সোপানে সে সমস্যাটির সমাধান করার বিভিন্ন পন্থাগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে, চতুর্থ সোপানে সে বিভিন্ন সম্ভাব্য সমাধানগুলি থেকে একটিকে বেছে নেয় এবং শেষ ধাপে সে ঐ নির্বাচিত সমাধানটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখে যে সেটি কার্যকরী কিনা।

হার্বার্টের পাঁচটি সোপান ও ডিউইর পাঁচটি সোপানের মধ্যে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও মূলগত পার্থক্য প্রচুর। ডিউইর পদ্ধতিতে সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়াটিরই সুরু হয়েছে একটি সমস্যা থেকে, কিন্তু হার্বার্টের পদ্ধতিতে কোথাও কোন সমস্যার উপলব্ধি নেই। হার্বার্টের দ্বিতীয় সোপানে নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়েছে বটে কিন্তু তার মধ্যে সমস্যা সমাধান করার কোন চাপ থাকে না, কেবলমাত্র আছে নিছক নতুন তথ্যের আহরণ। ডিউইর দ্বিতীয় সোপানেও কতকগুলি নতুন তথ্য আহরণ করা হয় বটে কিন্তু সে সব তথ্য আহরণ করেই শিক্ষার্থীর কাজ

শেষ হয় না। সেগুলিকে আহরণ করা হয় সমস্যা সমাধানের জন্য। হার্বার্টের পদ্ধতিতে যে সব তথ্য পূর্বে আহরণ করা হয়েছিল সেগুলির সঙ্গে মিল রেখে নতুন তথ্যগুলি আহরণ করা হয়, কিন্তু ডিউইর পদ্ধতিতে নতুন তথ্য আহরণ করা হয় সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিকরূপে (incidentally) কোন বিশেষ একটি কার্য সমাধান করার মাধ্যমে। শেষ ধাপেও এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

হার্বার্টীয় অভিযোজনে পূর্বের ধাপগুলিতে শেখা বিশেষ একটা তথ্য বা ধারণার কতটা শিক্ষার্থী শিখল তারই পরিমাপ করা হয়। তার মধ্যে অজানা বা অনিশ্চিত বলতে কোন কিছু থাকে না। কিন্তু ডিউইর পরীক্ষণ নামক ধাপটিতে একটি বিশেষ বিকল্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলেই অনিশ্চিত থাকেন। ফলে এই অবস্থায় কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা ছাড়া শিক্ষক বেশী কিছু করতে পারেন না। কিন্তু হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাছে শিক্ষণীয় বস্তুটির সবটুকু আগে থেকেই জানা থাকে বলে তিনি ক্লাসেতে অধিনায়করূপে বিরাজ করতে পারেন। কিন্তু ডিউইর পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষার্থীদের সহায়ক, উপদেশদাতা ও সহকর্মী মাত্র।

কৃষ্টি-যুগ তত্ত্ব (Culture-Epoch Theory)

পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও হার্বার্ট তাঁর আত্মবীক্ষণ-তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে পাঠক্রমে এমন ভাবে বিষয়গুলিকে সাজান হবে যাতে শিক্ষার্থী পরিচিত বিষয়বস্তু থেকে অপরিচিত বস্তুতে যেতে পারে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ণয়ে হেগেলের মত হার্বার্টও ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হার্বার্ট প্রসিদ্ধ কৃষ্টি-যুগ তত্ত্বের (Culture-Epoch Theory) প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির প্রথম প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্বটির অর্থ হল যে সুদীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের পথে মনুষ্যজাতি যে সব বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং যে সব বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক যুগ বা স্তর মানবের সম্মিলিত ভাগ্যকে নির্ধারিত করেছিল, শিশুর শিক্ষায় সেই সব বিচিত্র কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাই তার যথোচিত বিকাশের পক্ষে অনুকূল। এই জন্য জাতির বিবর্তনের বিভিন্ন কৃষ্টিমূলক স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর পাঠক্রমে কার্যাবলীর সন্নিবেশ করাই হার্বার্টের মতে পাঠক্রম রচনার মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থা। হার্বার্টের এই নীতিটি কালক্রমে বহু শিক্ষাবিদ্‌কে প্রভাবিত করে এবং বহুদেশের পাঠক্রম রচনার মূলনীতিরূপে গৃহীত হয়। বর্তমানে এ তত্ত্বটি এক রকম পরিত্যক্ত হয়েছে বললেই চলে।

হার্বার্ট ছিলেন একজন বাস্তববাদী। ভাববাদীদের (Idealist) মতে শিক্ষা আসে মানুষের অভ্যন্তর থেকে, বাইরের বস্তুজগতের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু হার্বার্টের মতে বাইরের জগতের সঙ্গে আত্মার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলরূপে শিক্ষা দেখা দেয়। এর ফলে স্পষ্টতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিক্ষার্থীর সামনে যে সকল বাইরের জগতের বস্তু উপস্থাপিত করা যায় সেগুলির নির্বাচনের উপর নির্ভর করে শিক্ষার প্রকৃতি ও ফলাফল। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বাইরের বস্তু বা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। হার্বার্টের এই সিদ্ধান্তটি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা বলা বাহুল্য। এতে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক যে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী এইটিই প্রমাণিত হয়। হার্বার্টের এই তত্ত্বটির অনেকেই তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই তত্ত্বটির দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকায় হার্বার্টের মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

হার্বার্টের আগ্রহতত্ত্ব (Theory of Interest)

হার্বার্টের আত্মবীক্ষণ তত্ত্বের (Theory of Apperception) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অনুসিদ্ধান্তটি হল আগ্রহের তত্ত্বটি (Theory of Interest)। চিরকালই সব শিক্ষাবিদ্ দেখে এসেছেন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর আগ্রহ তৈরী করাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। আগ্রহ ও প্রচেষ্টা (effort) এ দুটিকে তাঁরা শিখন প্রক্রিয়ায় দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু বলে মনে করে এসেছেন। তাঁদের মতে প্রথমটি হল অধিকতর কার্যকরী কিন্তু শিশুর খেয়ালী প্রকৃতির জন্য এটি সব সময় পাওয়া শক্ত। আর দ্বিতীয়টি কম কার্যকরী কিন্তু শিক্ষক ইচ্ছা করলে নানা উপায়ে শিশুর মধ্যে প্রচেষ্টার সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন বিশেষ পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ নেই তখন তিনি শিশুকে প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করেন। অর্থাৎ প্রচলিত মতানুযায়ী আগ্রহের অভাবকেই পূরণ করা হয় প্রচেষ্টা দিয়ে। হার্বার্ট আগ্রহের একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীর খেয়াল বা খুসী থেকে আগ্রহ জন্মায় না। শিক্ষার্থীর সামনে যে সব ভাব বা বস্তু উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই শিশুর মনে স্থান করে নেবার' জন্য চেষ্টা করে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিক্ষা হল এই ভাব বা বস্তুগুলির পারস্পরিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত

ফল। অতএব শেখার আগ্রহ বা প্রেষণা (motivation) নির্ভর করে এই প্রতিক্রিয়ার উপর এবং যখনই উপস্থাপিত বস্তু বা ভাবের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পুরাতন বস্তু বা ভাবের সাদৃশ্য থাকে তখনই সেই বস্তু বা ভাবটির প্রতি শিশুর আগ্রহ জন্মায়। অতএব আগ্রহ হল শিক্ষার্থীর মনে পুরাতন ভাব বা ধারণা কর্তৃক নতুন ভাব বা ধারণা গ্রহণ করার প্রবণতা বা প্রচেষ্টা। অতএব প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে আগ্রহকে শিক্ষার একটি বাহ্যিক উপাদান বলে মনে করতেন সেটা একান্তই ভুল। হার্বার্টেব মতে শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় উপকরণ হল আগ্রহ। আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা হয়ই না এবং হলেও তা হয় অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। হার্বার্ট আগ্রহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কবেছেন, স্বতঃপ্রসূত ও আরোপিত। যেখানে শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি নিজে নিজেই নতুন ভাবকে গ্রহণ করে নেয় সেখা:ন আগ্রহ হল স্বতঃপ্রসূত। আব যেখানে উপদেশ শিক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা শিশুর মধ্যে নতুন শিক্ষাগ্রহণ কবার আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় সেখানে আগ্রহ হল আবোপিত। হার্বার্টের মতে স্বতঃপ্রসূতই হোক আর আরোপিতই হোক আগ্রহ ছাডা শিক্ষা হয় না।

হার্বার্টের পূর্বগামী শিক্ষাবিদগণের তুলনায় যদিও হার্বার্টের আগ্রহতত্ত্বটি যথেষ্ট নতুন ও উন্নত, তবু আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আমেরিকান শিক্ষাবিদ জন ডিউই এই তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। হার্বার্টের এই আত্মবীক্ষণমূলক আগ্রহতত্ত্বের বিরুদ্ধে ডিউইর প্রধান আপত্তি হল যে হার্বার্ট যে ভাবে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার অন্তঃসংঘাত থেকে আগ্রহের জন্ম হয় বলে বর্ণনা করেছেন তাতে আগ্রহ একটি যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া আর বেশী কিছুতেই দাঁড়ায় না। অতএব এ অবস্থায় আগ্রহ একটি সত্যকারের স্বতঃপ্রসূত বস্তুও হতে পারে না, আবার শিক্ষণ বা উপদেশ দিয়েও তাকে সৃষ্টি করা যায় না। তার ফলে আগ্রহ শিক্ষার প্রেষণারূপে কখনই কাজ করতে পারে না।

আগ্রহের সর্বাধুনিক তত্ত্ব দিয়েছেন জন ডিউই। তাঁর মতে ব্যক্তির ভিতরের অহংসত্তার উপর বাইরের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া থেকে আগ্রহ জন্মায় না। হার্বার্টের প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী শিক্ষার্থীর অহংসত্তা একটি গতিহীন বস্তু। কিন্তু ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্তা ক্রিয়াশীল এবং গতিময়। বাইরের বস্তু যেমন সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর অহংসত্তাকে প্রভাবিত করে তেমনই শিক্ষার্থীর অহংসত্তাও সক্রিয়ভাবে পরিবেশের শক্তির প্রতি সাড়া দেয়। যখন কোন একটি বহির্জগতের বস্তুকে গ্রহণ করতে ব্যক্তির অহংসত্তা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত-

ভাবে এগিয়ে আসে তখনই শিক্ষার্থীর সত্যকারের আগ্রহ দেখা দিয়েছে বলা যায়; অর্থাৎ ডিউইর মতে শিক্ষার্থীর অহংসত্তার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বহিরাগমনের নামই আগ্রহ। এই অহংসত্তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার পক্ষে যে বস্তু বা ভাবধারা অনুকূল তার প্রতিই শিক্ষার্থী আগ্রহ অনুভব করে। অতএব আগ্রহ বস্তু বা ভাবের সংঘাতের উপর নির্ভর করে না, করে শিক্ষার্থীর সত্তার চাহিদার প্রকৃতি ও তার পূর্ণতার উপর। আগ্রহ সকল সময়েই স্বতঃপ্রণোদিত, কখনও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট হতে বা বাইরে থেকে আরোপিত হতে পারে না। আর যখনই শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় প্রচেষ্টা। অতএব প্রচেষ্টা আগ্রহের বিরোধী নয়, প্রচেষ্টা আগ্রহের সহায়ক ও সম্পূরক। আগ্রহ যেমন বাড়ে, প্রচেষ্টাও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়।

হার্বার্টের অনুবন্ধতত্ত্ব (Doctrine of Correlation)

হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা হল এই যে পাঠ্যবিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠন সেটিকে বিনা আয়াসে গ্রহণ করতে পারে এবং মনের পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সঙ্গে মিলিয়ে এক করে নিতে পারে। আগ্রহের প্রয়োজনও এই একই কারণে। আগ্রহ কেবল যে শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগই আনবে তা নয়, আগ্রহ এই নতুন পাঠকে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অঙ্গীভূত করতে সাহায্য করবে।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে দুটি বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। প্রথম, উপযুক্ত পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন এবং দ্বিতীয় সেই পাঠ্যবিষয়টি উপস্থাপনের উপযোগী পদ্ধতির অনুসরণ।

উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে হার্বার্ট কৃষ্টি-যুগ তত্ত্বের (Culture Epoch Theory) অবতারণা করেন। তাঁর মতে শিশুর বিভিন্ন বয়সের পাঠ্যবস্তু নির্বাচিত করতে হবে মানবজাতির অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

আর সেই পাঠ্যবিষয় শেখানোর উপযুক্ত পদ্ধতির অনুসরণ প্রসঙ্গে হার্বার্ট আর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। সেটি হল অনুবন্ধ তত্ত্ব (Doctrine of Correlation)। এই তত্ত্বটির অর্থ হচ্ছে যে পাঠ্যবিষয়গুলি যদিও বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র তবু এগুলির মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য এবং অঙ্গগত যোগসূত্র বর্তমান এটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন পাঠ্য-

বিষয়গুলির আকারগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেগুলিকে একটি একক সত্তার বিভিন্ন অংশ বলে মনে করে আয়ত্ত করতে পারে। অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলিকে একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতির একটি বিশেষ প্রকারের নাম কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Concentration Method)। এই পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় বিষয়কে (Core subject) মধ্যে রেখে তার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়। হার্বার্ট ও তাঁর অনুগামীদের মতে এই কেন্দ্রীয় বিষয়টি হয় সাহিত্য হবে, নয় ইতিহাস ও সাহিত্যের মিশ্রিত একটি পাঠ্যবিষয় হবে।

হার্বার্টের শিক্ষায় অবদান

(ক) হার্বার্টই প্রথম শিক্ষাকে সত্যকারের দর্শনমূলক ও মনোবিজ্ঞানমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। রুশো বা পেষ্টালৎসী যা অনুভব করেছিলেন, হার্বার্ট তার বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

(খ) হার্বার্টই প্রথম শিখনপ্রক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন এবং শিখনের সার্থক ও কার্যকরী পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

(গ) হার্বার্টের সব চেয়ে বড় দান হল পদ্ধতিতত্ত্বের (methodology) ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সত্যকার বাস্তব-ভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি কেউ দিতে পারে নি। হার্বার্টই প্রথম উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতির অপরিহার্যতার উপর জোর দেন এবং একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষণপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। আজকের সুসমৃদ্ধ চিন্তাধারা ও প্রগতিশীল পরীক্ষণ ও গবেষণার বিচারে হার্বার্টের পদ্ধতির মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া গেলেও শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, সুদীর্ঘ পরীক্ষণ ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পরবর্তী-কালের শিক্ষার পদ্ধতিতত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছে। ডিউই, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতি পরবর্তীযুগের শিক্ষাবিদ্‌গণের পদ্ধতি-মূলক গবেষণায় হার্বার্টের সমৃদ্ধ চিন্তাধারা অনুপ্রেরণা ও উপকরণ দুইই জুগিয়ে-ছিল।

(ঘ) হার্বার্টের আগ্রহ-তত্ত্বও শিক্ষায় তাঁর একটি বিশেষ অবদান। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষায় আগ্রহকে শিক্ষাদানের প্রধানতম ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষায় আগ্রহের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্বন্ধে হার্বার্টই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আগ্রহের স্বরূপ বিশ্লেষণে হার্বার্টের ত্রুটি থাকলেও তিনিই

প্রথম শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করার নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর পরবর্তীকালে যে সব শিক্ষাবিদ্ দেখা দেন তাঁরা প্রত্যেকেই হার্বার্টের এই আগ্রহের তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the major contributions of Herbart in Education.

Ans. (পৃঃ ২৬—পৃঃ ৩৬)

2. "What Rousseau and Pestalozzi felt, Herbart put them into effect." Discuss.

Ans. (পৃঃ ২৬—পৃঃ ৩৬)

3. Discuss Herbart's contribution to methodology of education and evaluate the merit of the Five Formal Steps of teaching invented by him.

Ans. (পৃঃ ২৮—পৃঃ ৩৬)

4. Write notes on Correlation, Apperception, Apperceptive Mass and Culture Epoch Theory.

চার

ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেল (Freidrich Froebel)

শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার আন্দোলনে যে কয়জন শিক্ষাবিদ্‌কে পুরোগামী বলে ধরা হয় তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েবেল হলেন একজন। হার্বার্টের মত ফ্রয়েবেলও ছিলেন জার্মান এবং তাঁরই সমসাময়িক। তিনি পেষ্টালৎসীর একপ্রকার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং কয়েক বৎসর তাঁর কাছে থেকে তাঁর অভিনব শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বস্তুত ফ্রয়েবেলের শিক্ষা সংস্কারের পেছনে সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল পেষ্টালৎসীর শিক্ষার নবীন আদর্শ।

ফ্রয়েবেল জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮২ সালে। তিনি প্রথম যৌবনে নানা ধরনের কাজ বিক্ষিপ্তভাবে করতে করতে নিতান্ত আকস্মিকভাবে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং উপলব্ধি করেন যে শিক্ষকতাই তার যথার্থ উপযোগী বৃত্তি। এর পর ১৮০৮ সালে তিনি পেষ্টালৎসীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকেই প্রগতিশীল শিক্ষা সম্পর্কে তিনি প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

পেষ্টালৎসীর নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেল যথেষ্ট প্রভাবিত হলেও তিনি তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারেন নি। এর মূলে ছিল ফ্রয়েবেলের গভীর দার্শনিক অনুভূতি। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব দার্শনিক সংব্যাখ্যান ছিল। তিনি পেষ্টালৎসীর শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে তাঁর দার্শনিক সংব্যাখ্যানকে মূর্তরূপ দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৮১৬ সালে তিনি প্রথম নিজস্ব স্কুল খোলেন। স্কুলটি মূলগতভাবে পেষ্টালৎসীর নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে গান, খেলা এবং নানাবিধ কাজই ছিল স্কুলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যদিও স্কুলটির আদর্শ যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক ছিল, তবু অর্থের অভাবে স্কুলটি ১৮২৬ সালে উঠে যায়। স্কুলটি উঠে গেলেও এ দীর্ঘ দশ বৎসরে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নিজস্ব সুনির্দিষ্ট মতবাদ গড়ে ওঠে এবং ১৮২৬ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'দি এডুকেশন অব ম্যান' (The Education of Man) প্রকাশিত হয়।

আরও কয়েক বৎসর কেটে যায়। ফ্রয়েবেল ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে সমগ্র স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থাটাই উপযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং সেজন্য

প্রয়োজন নার্সারি বা অতি শৈশব স্তরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা। তার ফলে ১৮২৭ সালে ফ্রয়েবেল ব্লান্‌কেন্‌বার্গের একটি ছোট সহরে তিন থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। স্কুলটির তিনি নাম দিলেন কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) বা ছেলেমেয়েদের বাগান। আজ এই কিণ্ডারগার্টেন নামটি পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেরই শব্দমালার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানীতে কান্ট, হেগেল, ফিকটে প্রভৃতি কয়েকজন অতিবিখ্যাত দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। এঁদের দার্শনিক মতবাদ ফ্রয়েবেলের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করে।

আত্মসক্রিয়তার তত্ত্ব (Theory of Self-Activity) ও খেলা

হেগেলের দার্শনিক তত্ত্বের মূলকথা হল সর্ববস্তুর চিরন্তন ঐক্য বা অভিন্নতা। দৃশ্যমান জগৎ যদিও অসংখ্য বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নিয়ে গঠিত, তবু সেগুলি সমস্তই একটি সর্বব্যাপী পরমসত্তার অঙ্গীভূত। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব সুরু হয় সর্ববস্তুর এই চিরন্তন ঐক্য বা অভিন্নতা দিয়ে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য হল তার অন্তর্বাসী এই স্বর্গীয় একতাকে উপলব্ধি করা এবং তাকে বিকশিত করা। অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও তাই। এর জন্য কোন বাইরের প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। শিশুর অন্তরগত বা সহজাত প্রকৃতিই পূর্ব থেকেই এই লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, কেননা তার অপরিহার্য ধর্মই হল প্রচেষ্টামূলক স্বয়ংক্রিয়তা। বস্তুত শিশুর মধ্যে সক্রিয়তা আছে একথা বললে কমই বলা হয়, শিশু নিজেই হল সক্রিয়তা। তাকে সক্রিয় করবার জন্য কোনরূপ বাহ্যিক প্রচেষ্টা বা উৎসাহদানের প্রয়োজন নেই, কারণ সে নিজেই এবং স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয়।

শিশুর এই আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই ফ্রয়েবেল হলেন প্রথম শিক্ষাবিদ্ যিনি শিশুর খেলায় শিক্ষামূলক গুরুত্বটা প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফ্রয়েবেলের আগে খেলা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা বিভিন্ন প্রকৃতির অভিমত পোষণ করতেন। একদল শিক্ষাবিদ্ খেলাকে স্কুলের বাইরে নির্দোষ চিত্তবিনোদনের মাধ্যম বলে মনে করতেন এবং এর মন্দ বা ভাল কোনরূপই মূল্য দিতেন না। আবার যাঁরা ছিলেন অতি গোঁড়া শিক্ষাবিদ্ তাঁরা খেলাকে অলস ব্যক্তির প্রতি শয়তানের প্রলোভন বলে মনে করতেন এবং সব দিক দিয়ে খেলাকে

বর্জন করার বিধান দিতেন। লক (Locke), বেসডউ (Basedow) প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাব্যবস্থায় খেলার প্রবর্তন করার প্রস্তাব করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কোন অপ্রীতিকর বা নীরস বিষয়বস্তু শেখবার সময় শিশুকে প্রলুব্ধ করার উপকরণরূপেই খেলাকে গণ্য করতেন। এক কথায় ফ্রয়েবেলের আগে সমস্ত শিক্ষাবিদেরা খেলাকে অবহেলা করেই এসেছেন এবং খেলার কোনও শিক্ষামূলক দিক বা সম্ভাবনা থাকতে পারে একথা তাঁরা একেবারেই ভাবেন নি।

ফ্রয়েবেলই প্রথম খেলাকে দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সমর্থন করেন। খেলাকে তিনি শিশুর আত্ম-সক্রিয়তার অভিব্যক্তি বা স্বাভাবিক প্রকাশ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে আত্মোপলব্ধি লাভের যে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় খেলা হল তারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি। ফ্রয়েবেলের এই যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে খেলা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। অতএব তার শিক্ষামূলক গুরুত্ব অপরিসীম।

আধ্যাত্মিক একতা (Divine Unity)

ফ্রয়েবেলের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী মানব অস্তিত্বের সার্থকতা হচ্ছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক একতাকে (Divine Unity) উপলব্ধি করায়। আবার এই আধ্যাত্মিক একতাকে উপলব্ধি করা এবং নিজের অন্তরস্থিত আত্মা বা পরমসত্তাকে উপলব্ধি করা একই কথা। এই পরম আত্মোপলব্ধিই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। ফ্রয়েবেলের মতে শিশুর আভ্যন্তরীণ বহিঃপ্রকাশের তাড়না যত বেশী বাহ্যিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ (Connectedness) স্থাপন করতে সমর্থ হয় তত তার এই আত্মোপলব্ধি বা শিক্ষা ত্বরান্বিত হয় এবং ততই সে তার জীবনের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক সর্বময় একতাকে প্রকাশ করতে পারে। ফ্রয়েবেল এরই নাম দিয়েছেন 'অন্তরকে বাহির করা এবং বাহিরকে অন্তর করা' (making inner outer and outer inner)। খেলা হল এমন একটি মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির ইচ্ছা বাইরে রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব খেলা হল শিশুর শিক্ষা বা আত্মোপলব্ধির প্রধানতম উপকরণ।

কেবলমাত্র সক্রিয়তার সাহায্যেই যে খেলা শিশুর পরমসত্তাকে জাগিয়ে তোলে তা নয়, শিশুর অন্তরগত আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক (symbol) রূপেও

ব্যবহারের প্রথাটির প্রচলন হয়েছে। তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে তিনি এমন সব খেলার উদ্ভাবন করেন এবং এমন সব খেলার সামগ্রীর প্রচলন করেন যেগুলি প্রতীকরূপে শিশুদের কাছে বিশেষ অর্থবোধক হয়ে দাঁড়ায়।

উন্মেষণ তত্ত্ব (Theory of Unfoldment)

এই আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি কয়েকটি ক্রমবিকাশের স্তরের মধ্যে দিয়ে দেখা দেয়। ফ্রয়েবেল এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন উন্মেষণ (unfoldment)। শিশু ভবিষ্যতে যা হবে তা শিশুর মধ্যে প্রথম থেকেই নিহিত থাকে এবং শিশু তার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে পৌছয় ভিতর থেকে এই বহির্মুখী ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। এককথায় যা ভিতরে ছিল মুদিত বা অবিকশিত (enfolded) অবস্থায় তা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে উন্মেষিত বা বিকশিত (unfolded)। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, তার শিক্ষা—সবই এই উন্মেষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমার্থক। অর্থাৎ এককথায় শিক্ষাই হল উন্মেষণ।

শিক্ষাকে উন্মেষণ রূপে বর্ণনা করার ফলেই ফ্রয়েবেল উদ্ভিদজীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর বৃদ্ধির তুলনা করেন। ফ্রয়েবেলের পূর্বে কমেনিয়াসও একই ধরনের কথা বলেছিলেন কিন্তু ফ্রয়েবেলই এই তত্ত্বটিকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেন এবং তাঁর প্রসিদ্ধ কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় এই তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন।

শিক্ষার এই উন্মেষণ তত্ত্বটি পুরোপুরি ভাববাদ (Idealism) দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে বিশ্বের সব কিছুর বিকাশ বা বিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক এবং বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট (teleological) অর্থাৎ সমস্ত বিকাশেরই চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তার অঙ্কুরের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অবস্থায় নিহিত থাকে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষার উন্মেষণ তত্ত্বটিও অনুরূপ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর ভবিষ্যৎ পরিণতির সুনির্দিষ্ট ও সুসম্পূর্ণ রূপটি তার মধ্যে নিহিত থাকে, যেমন থাকে পূর্ণ-পরিণত আমগাছটির সুসম্পূর্ণ রূপটি তার ছোট বীজটির মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় অন্তর্নিহিত।

পরে বহু শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেলের এই উন্মেষণ তত্ত্বটির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, এই তত্ত্ব অনুসারে শিশুর বিকাশে পরিবেশের কোন প্রভাবই নেই, সব কিছুই বংশধারা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু শিশুর চরম পরিণতি তার মধ্যে জন্ম থেকে নিহিত থাকে, সেহেতু পরিবেশের কোন শক্তিই তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। কিন্তু একথা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের

সম্পূর্ণ বিরোধী। শিশুর বিকাশে ও তার পরিণতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বংশধারা ও পরিবেশ উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে পরিবর্তনের কোন মূল্য স্বীকার করা হচ্ছে না। যাকে আমরা পরিবর্তন বলে মনে করছি প্রকৃতপক্ষে সেটি পূর্বনির্ধারিত একটি ঘটনা মাত্র। তার মধ্যে কোন নতুনত্ব বা অনিশ্চয়তা নেই। আর পরিবর্তন যখন নেই, তখন অগ্রগতি বলে কোন বস্তুই নেই। সবই পৃথিবীতে ঘটেছে পূর্বনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ঘটনার ধারা অনুসরণ করে, সত্যকারের নতুন বা অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটছে না।

তৃতীয়ত, উন্মেষণ তত্ত্বে বিশ্বাসী হলে শিক্ষার কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শিশুর পরিণতি পূর্বনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত। অতএব শিক্ষা দেওয়া হোক আর না হোক, শিশু তার লক্ষ্যে ঠিক গিয়ে পৌঁছবে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা না থাকলে শিক্ষকেরও প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত বিকাশ প্রক্রিয়ায় তাঁর সক্রিয়তা বা অবদান কতটুকু আর থাকতে পারে? এই শেষ সিদ্ধান্তটুকু কিন্তু ফ্রয়েবেল ভালভাবে মেনে নিতে পারেন নি এবং বহু দর্শন-ভিত্তিক যুক্তির দ্বারা তিনি শিক্ষায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতি ও কিণ্ডারগার্টেন

পেষ্টালৎসীর বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object Lesson) পদ্ধতিটিই ফ্রয়েবেল নিজের প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে গ্রহণ করেন। পেষ্টালৎসী বহুবিধ মূর্তবস্তু শিশুর সামনে উপস্থাপিত করতেন যাতে শিশু সেগুলির সংস্পর্শে এসে তার ইন্দ্রিয়-শক্তিকে উন্নত করতে পারে। কিন্তু ফ্রয়েবেল বহু বস্তুর পরিবর্তে কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং নির্দিষ্টসংখ্যক মূর্ত বস্তুর প্রবর্তন করেন। এগুলিই হল তাঁর প্রসিদ্ধ উপহার (gift) এবং কাজ (occupation) নামে খ্যাত। ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি আকারের দিক দিয়ে বিশেষ কতকগুলি গুণসম্পন্ন এবং সেগুলির আকৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতীকরূপে শিশুর কাছে প্রতীয়মান হয়। যেমন কিণ্ডারগার্টেনে 'বল' কেবলমাত্র খেলার সামগ্রীরূপে শিশুকে দেওয়া হয় না, কিংবা গোলাকৃতি বস্তুর ধারণা সৃষ্টি করার জন্যও দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় তার মনে স্বর্গীয় সর্বব্যাপী একতার ধারণা জন্মাতে। তেমনই কিউব বা ঘন আকৃতির বস্তু দেওয়া হয় 'বলে'র ঠিক বিপরীত ধারণাটি জন্মাতে এবং এ দুই বিপরীত ধারণায় মিল-

ঘটিয়ে তৃতীয় ধারণার সৃষ্টি করার জন্য দেওয়া হয় বেলনাকারের বস্তু (cylinder)। কিণ্ডারগার্টেনে বৃত্তাকারে ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত হওয়ার বিখ্যাত প্রথাটিও ঐ সর্বব্যাপী একতার ধারণা দেবার দেবার জন্যই প্রবর্তিত।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমাজধর্মী সহযোগিতা আনা। পেষ্টালৎসীও স্কুলে বাড়ীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে শিক্ষার সামাজিক দিকটার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম স্কুলকে সমাজধর্মী করার চেষ্টা কবেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক একতার ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফ্রয়েবেল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে একতা আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর মতে শিশু একা হলেও সে যে আর দশজনের মত একটি বিরাট সত্তার অন্তর্গত অংশবিশেষ এটুকু জানা শিশুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তার ফলে যৌথকর্ম, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনে অপরিহার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং এই থেকেই এক আধুনিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতি জন্মলাভ করেছে। আধুনিক কালের বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার মতবাদটি সার্থকভাবে রূপ পেয়েছে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায়।

বলাবাহুল্য সক্রিয়তা বা ফ্রয়েবেলের ভাষায় বলতে গেলে আত্মসক্রিয়তা তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। যেহেতু এই আত্মসক্রিয়তা স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে শিশুর খেলা ও স্বতঃপ্রণোদিত কাজের মধ্যে দিয়ে, সেহেতু চলাফেরা, খেলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত ছিল।

তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে তিন রকমের উপকরণ ব্যবহৃত হত, মাদার প্লে (Mother play), নার্সারি গান এবং উপহার ও কাজ। উপহার ও কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশক্তি বাড়বে। উপহার হল বল, কিউব, সিলিণ্ডার ইত্যাদি। এগুলির আকৃতি অপরিবর্তনীয় এবং এগুলি শিশুর সঞ্চালনমূলক অভিব্যক্তিকে সাহায্য করবে। কাজগুলি হল পরিবর্তনশীল আকারের বস্তু যেমন মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি। কিণ্ডারগার্টেনে অবশ্য সবচেয়ে প্রভাবশালী উপকরণ হল গল্প। এগুলি শিশুদের মন থেকে সুরু করে তাদের ভাষা, গান, খেলা সকল বস্তুকেই প্রভাবিত করে থাকে।

ফ্রয়েবেল হাতের কাজের উপরও প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তাঁর কিণ্ডার-গার্টেনের পাঠক্রমে হাতের কাজ একটি উল্লেখযোগ্য [illegible]

হাতের কাজকে সমর্থন করেছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং পেষ্টালৎসী সমর্থন করেছিলেন ইন্দ্রিয়চর্চার জন্য। ফ্রয়েবেল সমর্থন করেছিলেন হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর সৃজন আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পাবে বলে।

পেষ্টালৎসীর মত ফ্রয়েবেলও প্রকৃতিবীক্ষণকে (Nature Study) শিক্ষার অঙ্গ করেছিলেন। পেষ্টালৎসী করেছিলেন প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা বাড়বে বলে। কিন্তু ফ্রয়েবেল প্রকৃতিবীক্ষণকে সমর্থন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে শিশু তার নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ

১। শিক্ষার লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক একতার উপলব্ধি বা এককথায় আত্মোপলব্ধি।

২। এই আত্মোপলব্ধি আসে শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার ক্রমবিকাশ বা ক্রম-উন্মেষণের মাধ্যমে।

৩। আবার এই ক্রম-উন্মেষণের স্বাভাবিক মাধ্যম হল আত্মসক্রিয়তা এবং আত্মসক্রিয়তার স্বাভাবিক রূপ হল খেলা। অতএব খেলা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

৪। অনেক বস্তু ও কাজ আছে যেগুলি এই আধ্যাত্মিক একতার প্রতীক-স্বরূপ। এই ধারণা থেকেই ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় প্রতীকমূলক বস্তুর প্রবর্তন করেছিলেন।

৫। সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুরা দলবদ্ধ হয় এবং তার ফলে তারা আধ্যাত্মিক একতা উপলব্ধি করতে পারে।

শিক্ষায় ফ্রয়েবেলের অবদান

বর্তমানে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত কিণ্ডারগার্টেন প্রথার অপরিসীম জনপ্রিয়তা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফ্রয়েবেলের সুগভীর প্রভাব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের দিয়ে থাকে। বস্তুত প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় নার্সারি এবং তার উপরের স্তরের জন্য ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনকে আদর্শ শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপে প্রায় সব দেশেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষায় ফ্রয়েবেলের প্রকৃত অবদান কেবলমাত্র কিণ্ডারগার্টেন প্রথার উদ্ভাবনেই সীমাবদ্ধ নয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের সব চেয়ে বড় অবদান হল যে তিনিই প্রথম শিক্ষায়

একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে রুশো শিক্ষার নানা সমস্যার ব্যাখ্যায় দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলই প্রথম সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়াটি একটি দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এককথায় তিনিই প্রথম শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের '(Educational Philosophy) জনক। তাঁর পরবর্তী-কালে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর হাতে এই শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন পরিপুষ্টি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় সক্রিয়তার অপরিহার্যতা ফ্রয়েবেলই প্রথম ঘোষণা করেন। পেষ্টালৎসীর শিক্ষাব্যবস্থাতেও সক্রিয়তা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল, কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে সক্রিয়তা যে একমাত্র মাধ্যম একথা ফ্রয়েবেলই প্রথম বলেন। তাঁর দার্শনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিশুর অন্তরস্থ সম্ভাবনাগুলি সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না।

তৃতীয়ত, শিশুর খেলার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েবেল। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বুঝেছিলেন যে শিশুর ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম হল খেলা। ফ্রয়েবেলের এই সিদ্ধান্তটি শিশুশিক্ষার সর্বত্র সর্ববাদীসম্মতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

চতুর্থত, শিক্ষার পরিবেশকে সমাজধর্মী করারও আধুনিক পরিকল্পনাটি ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব থেকে জন্মলাভ করেছে। বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি করাই হল ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই উপলব্ধি আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতার মধ্যে দিয়ে। ফ্রয়েবেলের এই মতবাদ থেকেই বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করার প্রসিদ্ধ আন্দোলনটি জন্মেছে।

পঞ্চমত, ফ্রয়েবেলই পাঁচ থেকে আট বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরবর্তী বয়সের শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে শৈশবের শিক্ষাকে যে সুদৃঢ় করতে হবে এই প্রয়োজনীয় সত্যটি সম্বন্ধে তিনিই প্রথম সকলকে অবহিত করেন।

ষষ্ঠত, ফ্রয়েবেল শিক্ষায় কৃত্রিমতা ও বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দূর করার নির্দেশ দিয়েছেন। শিশুর শিক্ষা গাছের বৃদ্ধির মত স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিত। ফ্রয়েবেলের এই আদর্শ থেকেই এসেছে শিক্ষায় শিশুকে স্বাধীনতাদানের আধুনিক মতবাদটি।

সপ্তমত, ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর শিক্ষাকে নিছক পুঁথিগত বিদ্যার আহরণে সীমাবদ্ধ না রেখে গান, খেলা, হাতের কাজ, গল্প বলা ইত্যাদির মধ্যে

দিয়ে সুসমৃদ্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে রূপান্তরিত করেন। এর ফলেই বর্তমানে এক সহজ, প্রীতিকর ও সার্থক শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির মধ্যে অনেক ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতাও ছিল। প্রথমত, তাঁর মতবাদ পুরোপুরি ভাববাদীমূলক হওয়ায় শিক্ষার উপকারিতা, অভিনবত্ব ও সৃজনক্ষমতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় নি। তাঁর উন্মেষণতত্ত্বের (Theory of unfoldment) ব্যাখ্যা অনুযায়ী বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন ক্ষমতাই নেই। ফলে শিক্ষার কার্যকারিতা হয়ে দাঁড়ায় অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেল শিক্ষায় প্রতীকের (symbol) ব্যবহার প্রবর্তন করাতে তাঁর সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটিই দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য ও অলৌকিক রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযোজ্য, উচ্চস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ চলে না।

প্রশ্নাবলী

1. Give a critical estimate of the contribution of Froebel to modern educational thought, making reference to his important writing. (B.T. 1955)

Ans. (পৃ: ৩৭—পৃ: ৪৫)

2. Describe the major features of Froebel's Kindergarten system and the method of teaching followed in it.

Ans. (পৃ: ৪১—পৃ: ৪৩)

3. Discuss Froebel's theory of unfoldment and the theory of self-activity.

Ans. (পৃ: ৩৮—পৃ: ৪১)

পাঁচ

জন ডিউই (John Dewey)

রুশোর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর মত এত ব্যাপক ও স্থায়ী অবদান আর কোন মনীষীরই নেই। তবে রুশোর মতবাদ প্রধানত প্রতিষ্ঠিত ছিল অনুভূতি ও আবেগের উপর, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ডিউইর মতবাদ জন্ম নিয়েছিল উন্নত দার্শনিক চিন্তা, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বহু বৎসরের বাস্তব পরীক্ষণের সম্মিলিত ফলরূপে। রুশোর সমালোচনা ছিল অসংযত, আবেগপ্রবণ এবং বহু ক্ষেত্রে স্ববিরোধী। কিন্তু ডিউইর সমালোচনা ছিল সুচিন্তিত, স্থিরমস্তিষ্কপ্রসূত ও যুক্তিনির্ভর। রুশো সমালোচনা করেছিলেন নিছক ধ্বংসের উদ্দেশ্যে, তার মধ্যে সৃজনের কোন পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু ডিউইর সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তার স্থানে নতুন ও সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্টি করা। বস্তুত কঠোর প্রতিবাদ ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার আঘাতে রুশো গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে যে ধ্বংসস্তূপ রেখে গিয়েছিলেন ডিউই অসীম অধ্যবসায় ও গভীর যত্নের সাহায্যে তার উপরেই গড়ে তুলেছিলেন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সুরম্য অট্টালিকাটি।

আমেরিকার বার্লিংটন শহরে ১৮৫৯ সালে জন ডিউই জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় বিবর্তনবাদী হাক্সলে এবং ডারউইনের মতবাদের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনীষী স্টানলী হল, চার্লস পিয়াস প্রভৃতির কাছে তিনি দর্শনতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর পরবর্তী জীবনের দার্শনিক ভাবধারার বীজটি তাঁদের হাতেই প্রথম উপ্ত হয়। পড়াশোনা শেষ করে ডিউই প্রথমে মিচিগান এবং পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষণমূলকভাবে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালিসের সহায়তায় সাত বৎসর স্কুলটি চালান। এই স্কুলটিতে ডিউই তার নিজস্ব শিক্ষানীতিগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সেগুলির কার্যকারিতা বিচার করেন। এই স্কুলটি ল্যাবরেটরি স্কুল (Laboratory

School) নামে পরিচিত ছিল। ১৯০৪ সালে ডিউই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময় তিনি শিক্ষা ও দর্শনের উপর কতকগুলি বই লেখেন। ১৯১৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই ডেমোক্রাসি এ্যাণ্ড এডুকেশন (Democracy and Education) বেরোয়। ১৯২২ সালে তাঁর সমাজ ও মনোবিজ্ঞানের উপর হিউম্যান নেচার এ্যাণ্ড কনডাক্ট (Human Nature and Conduct) নামে সারগর্ভ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আমেরিকার শিক্ষার পুনর্গঠনে ডিউইর দান অসীম। শিক্ষাঘটিত তত্ত্ব থেকে সুরু করে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ, শিক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষার সকল প্রকার সমস্যা সম্বন্ধেই ডিউই সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সমাধান দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁর মতবাদ প্রত্যক্ষ-ভাবে আমেরিকার শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে তবু বর্তমানে তাঁর সুচিন্তিত শিক্ষানীতিগুলি পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষাবিদেরাই গ্রহণ করেছেন এবং সর্বত্রই ব্যাপকভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ১৯৫৩ সালে ডিউইর মৃত্যু হয়।

ডিউইর শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy)

দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে ডিউই প্রথমে সুরু করেন ভাববাদী হেগেলের সমর্থকরূপে। পরে তিনি প্রয়োগবাদী (Pragmatist) হয়ে ওঠেন। এদিক দিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক উইলিয়াম জেমস ও চার্লস পিয়ার্সের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ডিউই দর্শনশাস্ত্রের একটি সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে পৃথিবীকে আমরা কি ভাবে জানি তা নির্ণয় করা দর্শনের কাজ নয়, দর্শনের কাজ হল আমরা কিভাবে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত এবং উন্নত করতে পারি তাই দেখা। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে ডিউইর মতে—গণতন্ত্র, শিল্প এবং বিজ্ঞান—বর্তমান পৃথিবীর এই তিনটি প্রধান শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে যে সামাজিক সংঘাতের সৃষ্টি হয় তারই পর্যবেক্ষণের নাম দর্শনশাস্ত্র।

দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ক

দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয়েও ডিউই সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। তাঁর মতে শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ডিউই বলেন যে পরিপার্শ্বের প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি জ্ঞানমূলক ও প্রক্ষোভমূলক মনোভাব তৈরী করাকেই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলা চলে। আর শিক্ষা যদি তাই

হয় তাহলে দর্শন হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার সাধারণ তত্ত্ব বা নীতি। দর্শনের কাজ হল শিক্ষার বর্ত্তমান লক্ষ্যগুলির সমালোচনা করা এবং বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির চাহিদার উপযোগী করে সেগুলিকে পুনর্গঠিত করা। অর্থাৎ এককথায় শিক্ষা হল এমন একটি গবেষণাগার যেখানে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে পরীক্ষা করা হয়।

চিন্তন ও সত্য

ডিউইর দার্শনিক মতবাদ ডারউইনের বিবর্তনবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এ্যারিস্টটল থেকে সুরু করে হেগেল পর্যন্ত সকলেই ধরে নিয়েছেন যে সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ বুদ্ধি এবং চিন্তন শক্তির অধিকারী। তাহলে চিন্তনের চর্চাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের অনুসরণে ডিউই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে মানুষ চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েছে ক্রমবিবর্তনের মধ্যপথে এমন একটি দিনে যখন জটিল এবং বিপদসঙ্কুল সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে তার পক্ষে চিন্তন বা বুদ্ধির ব্যবহার তার অস্তিত্বরক্ষার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠল। এই সিদ্ধান্ত থেকে ডিউই আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তত্ত্বে গিয়ে পৌছলেন। শিক্ষায় চিন্তন অপরিহার্য, কিন্তু যেহেতু চিন্তন কাজটা ভাল সে জন্য নয়, যেহেতু চিন্তন জটিল ও বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে আমাদের সমস্যা সমাধানের উপকরণ এবং আমাদের উন্নত সঙ্গতিবিধানের সহায় সেইজন্যই। চিন্তন দু'রকমের— মননমূলক (reflective) এবং কল্পনামূলক (imaginative)। কল্পনামূলক চিন্তন আমাদের সঙ্গতিবিধানে বা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে না। কিন্তু মননমূলক চিন্তনই আমাদের সত্যে বা নতুন জ্ঞানে পৌছবার প্রধানতম উপকরণ। ডিউই এই মননমূলক চিন্তনেরই আর একটি নাম দিয়েছেন অনুসন্ধান (Enquiry)। নতুন কোন জ্ঞান আহরণ করতে, কোন অজানা সত্যে পৌছতে বা কোন সমস্যার সমাধান করতে এই মননমূলক চিন্তন বা অনুসন্ধান অপরিহার্য।

চিন্তনের এই তত্ত্ব থেকে আসে ডিউইর সত্য (Truth) বা জ্ঞানের (Knowledge) নবতম ব্যাখ্যান। ভাববাদী দার্শনিকদের মতে সত্য চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বজনীন। অর্থাৎ অতীতে যা সত্য ছিল, তা বর্তমানেও সত্য এবং ভবিষ্যতেও তা সত্য থাকবে। তেমনই মানুষে মানুষে দেশে দেশে সত্য বদলায় না। যা তোমার কাছে সত্য, তা আমার কাছে সত্য, যাকে দেখিনি,

জানি না তাদের কাছেও সত্য। সত্য ও জ্ঞান অপরিবর্তনীয় হওয়াতে শিশুদের সত্য বা জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও সহজ বলে এতদিন বিবেচিত হয়ে এসেছে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এবং আমাদের নিজেদের অর্জিত সত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডারটি বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের হাতে তুলে দিলেই কাজ শেষ হয়। প্রয়োজন কেবল সহজ ও সুবোধ্য করে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাতে শিশুদের অপরিণত মন সেগুলি গ্রহণ করতে অসুবিধা বোধ না করে। এই ধারণা থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা বহুদিন ধরে চলে এসেছে।

ডিউই জানালেন যে সত্য বা জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়, সর্বজনীনও নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সত্যের রূপও বিভিন্ন। সত্যকে যদি জানতে হয় তাহলে তাকে তা নিজের প্রচেষ্টায় আহরণ করে নিতে হয়, কারও কাছ থেকে তৈরী বস্তুরূপে তা পাওয়া যাবে না। এক কথায় সত্য বা জ্ঞান শিক্ষক শিশুকে হাতে তুলে দিতে পারবেন না, শিশুকে নিজেকেই নিজের সত্য আবিষ্কার করে নিতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে।

ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্ব

এই থেকেই দেখা দিয়েছে ডিউইর প্রসিদ্ধ সক্রিয়তার তত্ত্বটি (Theory of Activity)। ডিউইর মতে সমস্যা সমাধান বা সত্য আহরণের প্রধানতম পন্থা হল পরীক্ষণ (experiment) এবং চিন্তা বা ধারণার বাস্তবে প্রয়োগ। এই জন্যই ডিউইর মতবাদকে প্রয়োগবাদ (Pragmatism) বা পরীক্ষণমূলকবাদ (Experimentalism) বলা হয়ে থাকে।

কোনও সত্য ও জ্ঞান আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই যখন ব্যক্তি কোন সমস্যার (Problem) সম্মুখীন হয়। সমস্যা মানেই হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে ব্যক্তির পূর্ব অর্জিত জ্ঞান বা ধারণাগুলির দ্বারা তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করা আর সম্ভব হচ্ছে না এবং তার ফলে নতুন জ্ঞান বা সত্য আহরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আবার সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন কোন কাজ করতে করতে হঠাৎ বাধা বা বিঘ্নের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্যা আসে সক্রিয়তার (Activity) সুষ্ঠু সম্পাদনে বাধাসৃষ্টি থেকে। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে

ব্যক্তি তখন তার সমাধানের জন্য মনে মনে নানা সম্ভাব্য উপায়ের চিন্তা করে। সমস্যা সমাধানের এই স্তরকে আমরা তথ্য-সংগ্রহ (Data) বলে বর্ণনা করতে পারি।

এই অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধান থেকে ব্যক্তি তখন বিশেষ একটি সমাধানকে বেছে নেয়। এই স্তরকে আমরা প্রকল্পন (Hypothesis) নাম দিতে পারি। এটিকে প্রকল্পন বলা হয় এইজন্য যে অনেকগুলি বিকল্প তথ্য বা সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে থেকে যেটিকে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করে সেটিকে সে বেছে নেয়।

কিন্তু কেবল একটি সমাধানকে বেছে নিলেই চলবে না, দেখতে হবে সেই সমাধানটি সত্যকারের কার্যকরী কি না। এর জন্য প্রয়োজন সেই তথ্য বা ধারণাটির পরীক্ষণ (Testing)। যদি পরীক্ষণের ফলে দেখা যায় যে সে ঐ তথ্য বা ধারণাটির দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ তথ্য বা ধারণাটি নির্ভুল। তার সমস্যাটির সমাধানও সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। আর যদি দেখা যায় ঐ তথ্য বা ধারণার দ্বারা সমস্যার সমাধান করা গেল না তাহলে ওটিকে বাতিল করে আর একটি নতুন তথ্য বা ধারণা গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকেও অনুরূপভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সেটি সমস্যাটির সমাধানে সক্ষম কি না। এই ভাবে ব্যক্তি যখন বাস্তব পরীক্ষণের দ্বারা কোন তথ্য বা ধারণার কার্যকারিতা প্রমাণিত করতে পারে তখনই ডিউই্র মতে সে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করে। প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করার আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

বলা বাহুল্য পরীক্ষণ প্রক্রিয়াটিও পুরোপুরি সক্রিয়তামূলক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সত্য আবিষ্কার বা সমস্যা সমাধানের সুরু হয় সক্রিয়তা থেকে এবং তার শেষও হয় সক্রিয়তায়।

সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান

অতএব ডিউইর মতে সমস্যা-সমাধান বা সত্য আহরণের পাঁচটি সোপান আছে যথা :—

১। **সক্রিয়তা** (Activity) : ব্যক্তি কোন কাজ সম্পন্ন করতে করতে

২। **সমস্যা** (Problem) : হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলে সমস্যা দেখা দেয়।

৩। **তথ্য** (Data) : তখন তার সমাধানের জন্য সে নানা তথ্য ও ধারণা মনে মনে সংগ্রহ করে এবং

৪। **প্রকল্পন (Hypothesis)**: পরে সেগুলির মধ্যে থেকে একটি বিশেষ তথ্য বা ধারণাকে সে বেছে নেয় এবং

৫। **পরীক্ষণ (Testing)** : সবশেষে সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতার বিচার করে।

ডিউইর দেওয়া সত্য আহরণের পাঁচটি সোপানের শেষ হয়েছে পরীক্ষণে। বলা বাহুল্য পরীক্ষণটি পূর্ণভাবে সক্রিয়তামূলক অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় বাস্তব কর্মের ভেতর দিয়ে তথ্য বা ধারণাটির কার্যকারিতার পরীক্ষা করা হয়। এক কথায় সত্য আহরণের প্রচেষ্টার সুরু সক্রিয়তায় এবং শেষও সক্রিয়তায়। হার্বার্টও শিক্ষণের পাঁচটি সোপানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডিউইর পাঁচটি সোপানের সঙ্গে হার্বার্টের দেওয়া পাঁচটি সোপানের নানা দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য আছে।[১]

ডিউইর সক্রিয়তা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

ইতিপূর্বে শিক্ষায় সক্রিয়তার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সব শিক্ষাবিদ্‌ই তাঁদের অভিমত দিয়ে এসেছেন। অ্যারিস্টটল, কুইন্টিলিয়ান থেকে সুরু করে কমেনিয়াস, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অঙ্গীভূত করার স্বপক্ষে মত দিয়ে গেছেন। ফ্রয়েবেল শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ডিউইর মত সক্রিয়তার এত বড় মূল্য বোধ করি আর কোনও শিক্ষাবিদ্ দেন নি। ডিউইর পূর্বের শিক্ষাবিদেরা সক্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন হয় শারীরিক পুষ্টি বা উন্নতির জন্য, কিংবা আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির বিকাশের জন্য, কিন্তু ডিউই সক্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণে। তাঁর মতে সক্রিয়তা হল সত্যে পৌঁছবার একমাত্র অপরিহার্য সোপান। যেহেতু সত্য আহরণ এবং সমস্যা সমাধান আমাদের বেঁচে থাকা এবং সভ্যতার বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সেহেতু সক্রিয়তাও আমাদের ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক উভয় প্রকার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

ডিউইর দেওয়া সক্রিয়তার এই নতুন তত্ত্বটি সত্যই যুগান্তরকারী। তিনি প্রকৃতপক্ষে সক্রিয়তার একটা সম্পূর্ণ অকল্পিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সত্য স্বাধীন ও স্বয়ংপ্রকাশ ত নয়ই। বরং সত্য পুরোপুরি সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল। সক্রিয়তার

১। হার্বার্টের পাঁচটি সোপানের সঙ্গে ডিউইর পাঁচটি সোপানের তুলনা। ২৯ পাতায় দ্রষ্টব্য।

মাধ্যমে পরীক্ষণের দ্বারা যদি সত্যের কার্যকারিতা বা যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় তবেই সত্য গ্রাহ্য, নইলে নয়। অর্থাৎ সত্য স্বয়ং-প্রমাণিত নয়। সত্য মাত্রেই প্রমাণিতব্য। এদিক দিয়ে ডিউইর সঙ্গে প্রাচীন সোফিষ্ট নামে গ্রীক শিক্ষাবিদদের বেশ মিল আছে।

সত্য আহরণের জন্য যখন সক্রিয়তা অপরিহার্য তখন শিশুর সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনা সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হবেই। শিশুর সমস্ত শিক্ষা, জ্ঞান, ধারণা, তথ্য-সংগ্রহ সবই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে। ডিউইর এই প্রগতিশীল সক্রিয়তার তত্ত্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়তাভিত্তিক করার বর্তমানের পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন।

শিক্ষাই ক্রমবিকাশ (Education is Growth)

প্রাচীন ভাববাদীদের মতে সত্যকারের পরিবর্তন বলে কোন বস্তু নেই। যাকে আমরা পরিবর্তন বলি বা পরিবর্তন বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে সেটি বাহ্যিক বা আকারগত পরিবর্তন, সত্যকারের কোন অস্তিত্বগত পরিবর্তন নয়। অতএব পৃথিবীতে কোন কিছু আসলে বদলায় না, যা বদলায় তা কেবলমাত্র আকার। কিন্তু উইলিয়াম জেম্‌স প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োগবাদীদের মতে সৃষ্টি চিরপরিবর্তনশীল এবং মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য। পৃথিবী নিয়তই বদলাচ্ছে, বাড়ছে, নতুন হচ্ছে। এই দার্শনিক মতবাদটি থেকে জন্মেছে জন ডিউইর শিক্ষার ক্রমবিকাশের তত্ত্বটি (Theory of Growth)।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা হল বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশের নামান্তর। শিশুমাত্রেই নিয়ত বৃদ্ধিশীল—তার শরীর, মন, আগ্রহ, জ্ঞান, কৌশল, আচরণ সব দিক দিয়েই সে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। এই ছেদহীন, বিরামহীন বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশই হল তার শিক্ষা। শিক্ষা, নিছক কতকগুলি নিষ্ক্রিয় তথ্য বা জ্ঞানের আহরণ নয়, শিক্ষা একটি সতত সক্রিয় প্রক্রিয়া বিশেষ, যে প্রক্রিয়া ব্যক্তির সত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন। অতএব প্রচলিত সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিক্ষার যে নানা লক্ষ্যের উল্লেখ করা হয় সেগুলি সবই ভুল। আত্মোপলব্ধি, ভবিষ্যৎ-প্রস্তুতি, বৃত্তি-শিখন, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি যে বহুবিধ শিক্ষার লক্ষ্যের কথা শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতি বলে থাকেন সেগুলি নেহাৎ সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত লক্ষ্য থাকতে পারে না। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া বিশেষ এবং প্রক্রিয়া মাত্রেরই লক্ষ্য প্রক্রিয়াটিকে আরও চালিয়ে যাওয়া। যেমন, 'চলা' নামক

প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল আরও 'চলা'। তেমনই শিশুর বৃদ্ধিরূপ প্রক্রিয়ার কোন দূরবর্তী লক্ষ্যও থাকতে পারে না, বৃদ্ধির লক্ষ্য হল আরও বৃদ্ধি। আবার শিক্ষা আর বৃদ্ধি সমার্থক, অতএব শিক্ষার লক্ষ্যও হল আরও শিক্ষা। এই লক্ষ্য ছাড়া কোনও সংকীর্ণ নির্দিষ্ট লক্ষ্য শিক্ষার উপর আরোপ করা সঙ্গত নয়। শিশুর সামনে শিক্ষার যে সব সুদূর, অস্পষ্ট ও কাল্পনিক লক্ষ্য প্রায়ই শিক্ষক ও অভিভাবকেরা উপস্থাপিত করেন ডিউই সেগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষার সামাজিক দিক ও গণতন্ত্র

ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার সামাজিক দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দান। ব্যক্তির বৃদ্ধি বা ক্রমবিকাশ যদিও মূলত ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া, তবু এ প্রক্রিয়াটি সমাজের ভিতরেই ঘটে থাকে। সমাজের পরিবেশ ছাড়া শিশুর বৃদ্ধি ঘটে না বা ঘটতেও পারে না। বস্তুত শিশুর শিক্ষা ঘটে থাকে সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের সঙ্গে উন্নততর সঙ্গতিবিধানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজনই হল শিক্ষা। আর যত অধিক পরিমাণে ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণ করবে ততই তার অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সুসমৃদ্ধ ও লাভজনক হয়ে উঠবে। ডিউইর মতে ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের যৌথ অভিজ্ঞতা যত বাড়বে ততই ব্যক্তি এবং সমাজের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। আর যৌথ অভিজ্ঞতার সুযোগ সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় গণতান্ত্রিক সমাজে যেখানে ব্যক্তির আচরণের উপর বাধানিষেধ সব চেয়ে অল্প। অতএব সার্থক শিক্ষার উপযোগী সমাজ হল গণতান্ত্রিক সমাজ।

ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে বর্ণনা করেছেন। অতএব বলা বাহুল্য যে শিক্ষার পূর্ণতা ও সার্থকতা নির্ভর করবে আদর্শ সামাজিক পরিবেশের উপর। ডিউইর মতে একমাত্র গণতন্ত্রই হল সেই পূর্ণ ও সার্থক শিক্ষার উপযোগী আদর্শ সংগঠন।

বিদ্যালয়ই সমাজ (School is Society)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমস্ত শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম। কিন্তু গতানুগতিক স্কুলগুলিতে এই অতি প্রয়োজনীয়

সত্যটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়। সেখানে বাইরের সমাজের স্পর্শ থেকে স্কুলকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং বাস্তব সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞতা, আচরণ, কৌশল, মনোভাব ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে শেখাবার কোনরূপ আয়োজনই সেখানে থাকে না। তার ফলে শিক্ষার্থী যখন সমাজজীবনে প্রবেশ করে তখন সেই পরিবেশে সে নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অক্ষমরূপে দেখতে পায়। বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব বা ব্যবধান বহুদিন ধরে চলে আসছে ডিউইর মতে তা নিতান্তই কাল্পনিক ও কৃত্রিম। বিদ্যালয় হবে সমাজেরই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি—যেখানে সমাজের সমগ্র রূপটি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে শিশুদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। ডিউইর এই মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে আধুনিককালের স্কুলকে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে তোলার আন্দোলন।

শিশুকে সমাজজীবনের জন্য প্রস্তুত করাটা যদিও শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত তবু একথা ভাবলে ভুল হবে যে শিশুকে কোন নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা ভবিষ্যতের জন্য শিশুকে প্রস্তুত করাটাই শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতেন। কিন্তু ডিউইর মতে কোন অনির্দিষ্ট ও সুদূর বস্তুকে শিক্ষার লক্ষ্যরূপে স্থাপন করা চলে না। শিক্ষার লক্ষ্য বটে শিশুকে প্রস্তুত করা কিন্তু সে প্রস্তুত করা কোন সুনির্দিষ্ট দূরস্থিত কাল্পনিক লক্ষ্যেব জন্য নয়, সে প্রস্তুত করা হল শিশুকে তার পূর্ণ জীবনের জন্য। আর বিদ্যালয় শিশুকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে বিদ্যালয়-জীবনের সঙ্গে তার নিজের জীবনকে অভিন্ন করে তুলে (prepare for life by being life)।

হার্বার্টের কৃষ্টি-যুগতত্ত্বটিও ডিউইকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল এবং মানবজাতি যে সব মৌলিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বর্তমানের সমুন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে সেগুলির অনুশীলনই তাঁর মতে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশেব পরম সহায়ক। এইজন্য গতানুগতিক পাঠক্রমকে বাতিল করে দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সব মৌলিক ও অপরিহার্য কাজগুলি সম্পন্ন করে গেছেন ডিউই সেগুলিকে শিশুর পাঠক্রমের প্রধান বিষয়বস্তু রূপে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শৃঙ্খলার সমস্যা ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বে কোন সমস্যাই নয়। তাঁর মতে বিদ্যালয়ে যদি সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশের সৃষ্টি করা যায় তাহলে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে দেখা দেবে। শৃঙ্খলা রক্ষা সেখানেই সমস্যারূপে দেখা দেয় যেখানে পরিবেশ অসমাজধর্মী এবং ফলে সেখানে শিশু কাজ করার কোন স্বাভাবিক

ডিউইর আগ্রহতত্ত্ব

ডিউই আগ্রহেরও এক নতুন মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। হার্বার্টের মতে আগ্রহ নির্ভর করে শেখার বিষয়বস্তুর উপর। যদি নতুন শিক্ষণীয় বস্তুটি শিশুর পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে আগ্রহ নিজে নিজেই দেখা দেবে। অতএব হার্বার্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আগ্রহ ভেতর থেকে আসে না, বাইরে থেকে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। ডিউই এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে জানান যে আমাদের অহংসত্তা থেকে যে স্বাভাবিক প্রেরণা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বেরিয়ে আসে তা থেকেই জন্মায় আগ্রহ।

ব্যক্তির নিজস্ব বিকাশপথের অভিমুখে অবস্থিত কোন কিছুর প্রতি অহংসত্তার স্বতঃবহির্গমনের নাম দেওয়া যেতে পারে আগ্রহ। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পরের সহায়ক। আগ্রহ যত বাড়বে, প্রচেষ্টাও তত বাড়বে। আগ্রহ প্রকৃতপক্ষে আত্ম-অভিব্যক্তিমূলক আচরণই, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বিকাশপ্রচেষ্টা অন্তঃসুপ্ত প্রবণতা অনুযায়ী আত্ম-প্রকাশ করে থাকে। গতানুগতিক শিক্ষায় আগ্রহ ও প্রচেষ্টাব মধ্যে বহুযুগ ধরে যে বিরোধিতাকে কল্পনা কবে আসা হয়েছে ডিউই এইভাবে তার মীমাংসা করলেন।

ডিউই ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব পার্থিব অস্তিত্বমাত্রেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই দেহ, মন, শক্তি, রুচি সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ও অতুলনীয়। অতএব এই ব্যক্তিগত বৈষম্যকে শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ণয়ে প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করতে হবে।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার সেই সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক ও জীবতত্ত্বমূলক গবেষণার আধুনিক আবিষ্কারগুলিও ডিউই পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কেবল তাই নয়, বহুবৎসর ধরে ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে নানা পরীক্ষণ চালান এবং তাঁর অধিকাংশ পদ্ধতিমূলক তত্ত্বই দীর্ঘ পরীক্ষণের সিদ্ধান্তের দ্বারা পূর্ণভাবে সমর্থিত। ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

শিক্ষায় শিশুকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দিতে হবে। শিক্ষা হল শিশুর স্বাভাবিক

বৃদ্ধি বা বিকাশপ্রক্রিয়া। অতএব সেখানে কারও কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের স্থান নেই। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ বা প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার অর্থই হল তার স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করা।

শিশুর শিক্ষা আসবে পুরোপুরি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে—নিষ্ক্রিয় লিখন-পঠনের মধ্যে দিয়ে নয়। শিশুর পাঠক্রমে থাকবে এমন সব অভিজ্ঞতা যেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব যোগাযোগ আছে। এক কথায় শিশুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে সব অভিজ্ঞতা শিশু আহরণ করে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও সেগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হবে।

সক্রিয়তা হবে শিশুর শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। ডিউইর মতে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য আহরণ করা যায় সক্রিয়তার মাধ্যমে। সক্রিয়তা বাধা পেলে দেখা দেয় সমস্যা আর সেই সমস্যার সমাধানের মধ্যে দিয়েই শিশু প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যে পৌছয়। এই থেকেই জন্ম নিয়েছিল ডিউইর সমস্যাপদ্ধতি (**Problem Method**)। এই পদ্ধতিটির পাঁচটি সোপানের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে শিশুকে একটি কাজ করতে দেওয়া হয় (সক্রিয়তা)। কাজটি করতে করতে সে একটি বাধার সম্মুখীন হয় (সমস্যা)। তখন সে সেই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করে (তথ্য-সংগ্রহ)। তারপর সেই তথ্যগুলির মধ্যে থেকে সে একটি বিশেষ সমাধানকে বেছে নেয় (প্রকল্পন) এবং সব শেষে সে সেই সমাধানটির বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখে যে ঐটি কার্যকরী কি না (পরীক্ষণ)। ডিউইর মতে এই সমস্যাপদ্ধতির মাধ্যমেই শিশু প্রকৃত সত্য বা জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হল সক্রিয়তা এবং মননমূলক চিন্তন হল তার অপরিহার্য উপকরণ।

ডিউই স্কুল বা ল্যাবরেটরি স্কুল

ডিউই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য নতুন পরিকল্পনায় একটি বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়টি গবেষণাগার বিদ্যালয় (**Laboratory School**) বা ডিউই স্কুল নামে খ্যাত। এই বিদ্যালয়টিতে ডিউই তাঁর আধুনিক সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করে তার কার্যকারিতা যাচাই করেন।

এই স্কুলটিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই ছিল না। যেমন, বেঞ্চ-চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজান ক্লাস, পিরিয়ড অনুযায়ী সময়বিভাগ,

শিক্ষকের প্ল্যাটফর্ম, বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদান, ইত্যাদি প্রচলিত বিদ্যালয়ের অপরিহার্য উপকরণগুলিকে ডিউইর স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সেখানে কোনরূপ পাঠ্যপুস্তক ছিল না, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় অনুযায়ী বিভাজন ছিল না, পড়া দেওয়া, পড়া ধরা ইত্যাদি বহুযুগ ধরে অনুসৃত প্রথাগুলিরও অস্তিত্ব ছিল না। তাছাড়া কোন বাঁধাধরা রুটিন, ক্লাশ, পঠন-লিখনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম, বাড়ীর কাজ ইত্যাদির কোনটাই সেখানে ছিল না।

ডিউইর পদ্ধতি ছিল পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়তা-ভিত্তিক। এমন কি পঠন, লিখন গণিত প্রভৃতি প্রাথমিক জ্ঞানগুলিও শিশু অর্জন করবে তার জীবনের কার্যাবলী থেকে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম বলতে ছিল নানারূপ সৃজনধর্মী সক্রিয়তা এবং শিশুর অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। শিশুদের সক্রিয়তাও ছিল নানা প্রকৃতির, যেমন খেলা, কোন কিছু তৈরী করা, প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা, আত্ম-অভিব্যক্তি ইত্যাদি। এই ভাবে ডিউই স্কুলের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াটাই সম্পূর্ণ বদলে দিলেন এবং বিদ্যালয়কে শিশুর জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করলেন।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শিশুর সমস্ত শিক্ষাই একমাত্র সমাজধর্মী পরিবেশের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান বা কৌশলই আয়ত্ত করবে না, সে সামাজিক গুণাবলীর দিক দিয়ে সুযোগ্য ও সক্ষম হয়ে উঠবে। সেইজন্য ডিউইর বিদ্যালয়ে সব কিছু শেখান হত সহযোগিতা ও পারস্পরিক প্রীতিময় আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ এক কথায় শিশুর শিক্ষা হবে তার জীবনের প্রস্তুতির জন্য এবং সে প্রস্তুতি শিশুকে বিদ্যালয়ই দেবে শিশুর জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের জীবনকে অভিন্ন করে তোলার মধ্যে দিয়ে। বস্তুত যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা ও সম্মিলিত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শিশুর সমস্ত শিক্ষা সম্পন্ন হবে—এইটাই হল ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা। সমাজে বাস করতে গেলে যে সব মৌলিক আচরণ মানুষকে সম্পন্ন করতে হয় সেগুলি শিশুর অভিজ্ঞতায় অপরিহার্যভাবে অঙ্গীভূত হবে এবং বিদ্যালয় হবে শিশুকে সেই সব অভিজ্ঞতা দানের উপযোগী ক্ষেত্র। এক কথায় স্কুলকে গড়ে তুলতে হবে ছোটখাট একটি সমাজ রূপে, যেখানে বৃহত্তর সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত হতে পারবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ডিউইর এই আদর্শ অনুযায়ী আধনিক প্রগতিশীল বিদ্যালয়গুলিতে বাস্তব সমাজজীবনের অনুকরণে সমবায় সমিতি, সংবাদপত্র, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করা হয় এবং

শিক্ষার্থীরা সেগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চয় করতে পারে।

যদিও সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা ডিউইর পদ্ধতির মূলকথা, তবু শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ যে অপরিহার্য একথাও ডিউইও বারবার বলে গেছেন। আগ্রহ হল সেই স্ফুলিঙ্গ যা শিশুর জ্ঞানের শিখাকে জ্বালাবে। তাছাড়া ডিউইর মতে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা পরস্পরবিরোধী নয়। শিশুর প্রকৃত আগ্রহ জাগলে প্রচেষ্টা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই দেখা দেবে। কেননা কোন কাজে যখন স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মায় তখনই প্রচেষ্টা দেখা দেয়।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে ডিউইর শেষ কথা হল যে সমস্ত শেখার মূলেই আছে চিন্তন। সার্থক চিন্তন থেকেই শিখন আসে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ডিউইর মতে শিখনের প্রকৃত পদ্ধতিই হল চিন্তন। অতএব এই চিন্তনকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই কার্যকরী শিখন ঘটে থাকে। চিন্তনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন (১) কোন একটি কাজের সম্পাদন, (২) সমস্যার উপলব্ধি যা থেকে চিন্তনের সুরু হয়, (৩) প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকারী হওয়া ও সেইমত পর্যবেক্ষণ করা, (৪) কোন একটি বিশেষ সমাধানকে নির্বাচন করা এবং (৫) সেই সমাধানটিকে বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখা যে সেটি কার্যকরী কি না।

চিন্তনের এই অপরিহার্য অঙ্গগুলি থেকেই ডিউইর প্রসিদ্ধ পাঁচটি সোপানের উৎপত্তি হয়েছে এবং সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) নামে শিক্ষাপদ্ধতিটির উদ্ভাবন হয়েছে। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

ডিউইর শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ

শিক্ষার দার্শনিক তত্ত্ব, পদ্ধতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ডিউই এত ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন এবং এত অভিনব তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন যে সংক্ষেপে সেগুলিকে উল্লেখ করা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তবু তাঁর শিক্ষানীতির প্রধানতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নীচে উল্লেখ করা হল।

১। শিক্ষা নিছক তথ্য-সংগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষা ব্যক্তির ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধির সঙ্গে সমার্থক। বৃদ্ধি বলতে বোঝায় ব্যক্তির অস্তিত্বের

নির্ধারিত করে দেয় দুটি বস্তু—একটি, ব্যক্তির নিজের আভ্যন্তরীণ সংগঠন এবং অপরটি, যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের বিভিন্ন শক্তি।

২। ব্যক্তির ক্রমবিকাশ বা বৃদ্ধি ব্যক্তির কাছে দেখা দেয় অভিজ্ঞতার রূপে। বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার স্বরূপ ও প্রকৃতি বদলে যায়। যেহেতু পরিবেশ চির-পরিবর্তনশীল, শিক্ষা হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিরামহীন পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজন।

৩। শিক্ষা যখন অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন তখন শিক্ষা নিষ্ক্রিয় কোন বস্তু নয়। শিক্ষা হল চিরপরিবর্তনশীল, গতিময়, ছেদহীন একটি প্রক্রিয়াবিশেষ।

৪। কোন প্রক্রিয়ারই কোন বহিঃস্থিত লক্ষ্য থাকতে পারে না—প্রক্রিয়ার লক্ষ্য প্রক্রিয়াটির মধ্যেই থাকে। শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া অতএব শিক্ষার কোন বহিঃস্থিত লক্ষ্য থাকতে পারে না। সেই হেতু প্রচলিত যত লক্ষ্য শিক্ষার উপর চাপানো হয়ে থাকে তার কোনটিই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না। বৃদ্ধির একমাত্র লক্ষ্য আরও বৃদ্ধি, আর শিক্ষা ও বৃদ্ধি সমার্থক হওয়ায় শিক্ষার একমাত্র সম্ভাব্য লক্ষ্য হল আরও শিক্ষা বা আরও বৃদ্ধি।

৫। শিক্ষাকে কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়া বললেই সব বলা হয় না, শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা একা একা বা শূন্য পরিবেশে ঘটে না, সমাজের আর সকল সদস্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটে থাকে। তাছাড়া শিক্ষা হল সমাজেরই আত্ম-সংরক্ষণের অপরিহার্য উপকরণ বিশেষ এবং অপরিণত ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সমাজের উপযোগী করে তোলার জন্য সমাজের পক্ষ থেকেই শিক্ষা দেবার আয়োজন করা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর পরিবেশকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করে সামাজিক জীবনের জন্য অপরিহার্য আচরণ ও কৌশলগুলিই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় হল এই ধরনের একটি সুপরিকল্পিত মাধ্যম যার পরিবেশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়ে থাকে এই বাঞ্ছিত শিক্ষাগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

৬। সমাজজীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট পরিবেশসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানই হল বিদ্যালয়। অতএব বিদ্যালয় সমাজের সম্পূর্ণ জীবনটিকে নিখুঁতভাবে তার পরিবেশের মধ্যে প্রতিফলিত করবে, যাতে শিশু সেই পরিবেশে মানুষ হয়ে যথার্থ সমাজধর্মী নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যালয় হবে সমাজেরই একটি

৭। প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে আহরণ করা যায় না। সত্য আহরণের একমাত্র মাধ্যম হল সক্রিয়তা। কোন কাজ করতে করতে যখন ব্যক্তি বাধা পায় তখন সে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সেই সমস্যার সমাধান যখন সে করতে পারে তখনই তার নতুন জ্ঞান বা সত্যের অর্জন হয়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে সত্য বা নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অতএব সার্থক শিক্ষামাত্রেই সম্পন্ন হবে সক্রিয়তার মাধ্যমে।

৮। সক্রিয়তা যদি সত্য বা নতুন জ্ঞান লাভের মাধ্যম হয়, তবে চিন্তন হল তার পন্থা। চিন্তন বলতে অবশ্য অলস ভাববিলাসী কল্পনাকে বোঝায় না, বোঝায় উদ্দেশ্যসম্পন্ন মননমূলক চিন্তনকে। এই মননধর্মী চিন্তনের সাহায্যে ব্যক্তি তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় বর্তমানের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং শেষ পর্যন্ত সত্য বা নতুন জ্ঞানে পৌঁছয়। সক্রিয়তা ও চিন্তনের এই অভিনব তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই ডিউই সমস্যা-পদ্ধতি (Problem Method) নামে শিক্ষাদানের নতুন একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন।

৯। শিক্ষার আর একটি অপরিহার্য উপাদান হল শিক্ষার্থীর আগ্রহ। আগ্রহ শিশুর স্বতঃপ্রসূত স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ শক্তিবিশেষ এবং আগ্রহ জাগলে প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়।

১০। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন শিক্ষা আসে তখন সামাজিক সংগঠনের স্বরূপের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে শিক্ষার প্রকৃতি ও সার্থকতা। ডিউইর মতে গণতন্ত্র হল এদিক দিয়ে আদর্শ সামাজিক সংগঠন। সেখানে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা কোন দিক দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত বা সঙ্কুচিত হয় না বলে তার অভিজ্ঞতা হয় সীমাহীন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তার ফলে তার শিক্ষাও হয় সুসমৃদ্ধ ও উন্নত।

১১। ডিউইর মতে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা সত্যকারের সমাজধর্মী পরিবেশে কোন সমস্যাই নয়। যে সব বিদ্যালয়ের পরিবেশ অসামাজিক এবং যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন সামাজিক চেতনার উপলব্ধি নেই সেখানে বহির্জাত ও পীড়নমূলক পন্থার সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। কিন্তু যদি পরিবেশটি সমাজধর্মী হয় তবে শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ থেকে দেখা দেবে।

১২। শিক্ষায় শিশুকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে তার বিভিন্ন বৃদ্ধি প্রচেষ্টা বিনা বাধায়, সুপরিণতির পথে এগিয়ে [illegible]

শিশু-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও উদ্দেশ্যহীন ও অসংযত স্বাধীনতাকে কখনই সমর্থন করেন না। তাঁর মতে যে স্বাধীনতা সৃজনধর্মী আত্ম-অভিব্যক্তির রূপ নেবে তাই হবে প্রকৃত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার সহায়ক নয় তা নিরর্থক, ক্ষতিকরও। এর জন্য শিশুকে তার সুবিকাশের অভীষ্ট পথে পরিচালনা করতে হবে, কিন্তু কোনরূপে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নয়। পরিবেশকে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে শিশুর অভ্যন্তরস্থ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশপ্রচেষ্টাকে সুষ্ঠু আত্ম অভিব্যক্তির পথে পরিচালনা করাই সুশিক্ষার প্রধানতম কর্মসূচী।

ডিউইর শিক্ষায় অবদান

বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত অন্তঃসারশূন্য ও আকারসর্বস্ব প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার নীতি ও পদ্ধতিগুলির তীব্র সমালোচনা করে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার নতুন ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে যান রুশো। পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল ও হার্বার্ট সেই নতুন আদর্শের বিশেষ বিশেষ দিককে অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আংশিকভাবে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজের প্রতিভা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সযত্ন অধ্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব জন ডিউইরই। আমেরিকার পরিকল্পনাহীন ও বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজেই তাঁর নীতি ও পদ্ধতির প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করা হলেও, ডিউইর বৈপ্লবিক ভাবধারা, শিক্ষার অভিনব সংব্যাখ্যান ও নানা জটিল শিক্ষাসমস্যার অপরূপ সমাধান সারা পৃথিবীর শিক্ষাবিদ্‌কেই প্রভাবিত করেছে এবং বর্তমানে এমন কোন প্রগতিশীল দেশ নেই যেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব, পদ্ধতি ও অন্যান্য নির্দেশ অল্পবিস্তরভাবে মেনে নেওয়া হয় নি।

প্রথমত, ডিউইর শিক্ষাঘটিত মতামতগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে তাঁর কোন মত বা নির্দেশই নিছক কল্পনাজাত বা অনুভূতিপ্রসূত নয়, সবগুলিই সুপ্রমাণিত দার্শনিক তত্ত্ব, মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং নিজের পরীক্ষণলব্ধ ফলাফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও প্রমাণের সবল আবেদন তাঁর সমস্ত মতবাদের পেছনে থাকায়, সেগুলি যেমন একদিকে সর্বজনগ্রাহ্য হতে পেরেছে তেমনই অপরদিকে শিক্ষাশাস্ত্রকে নিছক জল্পনা-কল্পনার স্তর থেকে তুলে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করেছে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি রুশো তাঁর গভীর অনুভূতির দ্বারা কল্পনা করেছিলেন, সেগুলির প্রকৃত গুরুত্ব ও মূল্য যাচাই করে বাস্তব শিক্ষা পরিকল্পনায় সেগুলির যথাযথ স্থান নির্ণয় করার গুরুভার পড়েছিল ডিউইর উপর। বস্তুত শিশু স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, মূর্তবস্তুর মাধ্যমে শিক্ষণ, প্রকৃতি-বীক্ষণ প্রভৃতি ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই রুশোর মতবাদে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক মূল্য নিখুঁতভাবে নিরূপণ করে গেছেন জন ডিউই।

তৃতীয়ত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ সংজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়ে অভিনব ব্যাপক সংজ্ঞা দান করে শিক্ষার মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা দুইই অভাবিত মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন ডিউই। শিক্ষা এখন কতিপয়ের ইচ্ছানির্ভর মানসিক বা সাংস্কৃতিক সৌকর্য-সাধন নয়, শিক্ষা মানবমাত্রেরই অস্তিত্বরক্ষার অপরিহার্য উপকরণ। ডিউইর দেওয়া শিক্ষার এই নবতম সংব্যাখ্যান থেকেই এসেছে আধুনিককালের গণতান্ত্রিক সর্বজনীন শিক্ষার আদর্শ।

চতুর্থত, আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের (Educational Philosophy) প্রকৃত জন্মদাতা হলেন জন ডিউই। ইতিপূর্বে বহু শিক্ষাবিদ্‌ই শিক্ষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন, কিন্তু সেগুলি দার্শনিক তত্ত্বই থেকে গেছে, প্রকৃত শিক্ষাতত্ত্ব হয় নি। এদিক দিয়ে অবশ্য ফ্রয়েবেলই প্রথম শিক্ষার দার্শনিক সংব্যাখ্যান দানে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু সত্যকারের শিক্ষাতত্ত্বের সুসংহত ও যুক্তি-নির্ভর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করে যান জন ডিউই। তাঁর মৌলিক দার্শনিক মতবাদের প্রতি অনেক শিক্ষাবিদের সমর্থন না থাকলেও তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের সংব্যাখ্যান গুলি মেনে নিতে তাঁরা বিশেষ দ্বিধা করেন নি।

পঞ্চমত, প্রকৃত শিক্ষা যে কর্মসম্পাদন ছাড়া আসে না—ডিউইর এই অভিনব মতবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে শিক্ষাকে সক্রিয়তাভিত্তিক করার পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন। তাঁর এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে এবং প্রচলিত লিখন পঠন সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ষষ্ঠত, শিক্ষার প্রচলিত সংকীর্ণ লক্ষ্যগুলিকে অবাস্তব ঘোষণা করে এবং শিক্ষাকে শিশুর জীবন ধারণের সঙ্গে সমার্থক বলে বর্ণনা করে ডিউই সমগ্র শিক্ষার পরিকল্পনাকে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, শিক্ষানীতি-নির্ধারক প্রভৃতি সকলেই শিক্ষার এই অতিব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট

গতানুগতিক শিক্ষায়তনগুলির স্থানে শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা গঠনে সক্ষম সার্থক শিক্ষার মাধ্যম সৃষ্টির পরিকল্পনা দিয়েছেন।

সপ্তমত, গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি, পাঠক্রম প্রভৃতির ব্যাপক সংস্কারসাধনও ডিউইর মতবাদের প্রত্যক্ষ ফল। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতম করা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তোলার বর্তমান আন্দোলন ডিউইরই আদর্শজাত। এর ফলে আধুনিক বিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, পাঠক্রম ও সংগঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

অষ্টমত, ডিউইর আধুনিক শিক্ষার আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল সমাজধর্মী ভাবধারার উপর শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা। ডিউইর মতে সামাজিক আবহাওয়া ছাড়া শিক্ষা হয় না এবং যে পরিবেশ যত সমাজধর্মী সে পরিবেশে শিক্ষাও তত উন্নত ও সার্থক হয়ে উঠবে। শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আসবে যৌথ কর্মসম্পাদন, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে গণতন্ত্রই হল শিক্ষার পক্ষে আদর্শ সমাজ। সমাজতত্ত্বমূলক ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের এই সমন্বয়ন ডিউইর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তির নিজস্ব বৃদ্ধি ও সমাজের যৌথ উন্নতি এ দুয়ের মধ্যে যুগযুগান্তরের দ্বন্দ্ব দূর ত করলেনই এমন কি এ দুটিকে পরস্পর নির্ভরশীল বস্তু বলে প্রমাণ করলেন।

নবমত, পদ্ধতি-তত্ত্বের দিক দিয়েও ডিউইর অবদান কম নয়। সক্রিয়তা ও চিন্তনকে ভিত্তি করে প্রকৃত শিক্ষা সম্পন্ন হবে, এই হল ডিউইর উদ্ভাবিত সমস্যা-পদ্ধতির (Problem Method) মূলকথা। ডিউইর পদ্ধতিটির গঠনমূলক জটিলতার জন্য সেটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করা দুরূহ ছিল। কিন্তু তার পদ্ধতির মৌলিক তত্ত্বটি'ক ভিত্তি করে তাঁরই অনুগামী শিষ্য কিলপ্যাট্রিক প্রসিদ্ধ প্রজেক্ট মেথডের (Project Method) উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেই কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দশমত, ডিউই সক্রিয়তাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে স্বীকার করলেও চিন্তনকেও শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর মতে সক্রিয়তার মাধ্যমে এবং চিন্তনের সাহায্যে আসবে সত্যকারের শিক্ষা। অনেকে ভুল করে ডিউইর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে নিছক দৈহিক অঙ্গসঞ্চালন ও কর্মসম্পাদনে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। কিন্তু ডিউইর মতে সমস্ত কাজের পেছনে যদি সত্যকারের মননমূলক চিন্তন না থাকে তাহলে সমস্ত কর্মসম্পাদনই বৃথা হবে এবং সক্রিয়তার মূল লক্ষ্য যে সত্য বা জ্ঞান আহরণ তাই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss John Dewey's main contributions to educational theory and practices. (B. T. 1953, B. A. 1963, 1966, B. T, 1964)

Ans. (পৃ: ৪৭—পৃ: ৬৩)

2. John Dewey says, "The principle that development of experience comes through interaction means that education is essentially a social process. This quality is realised in the degree in which individuals form a community or group." Amplify. (B. T. 1955)

Ans. (পৃ: ৫৩—পৃ: ৫৪)

3. Discuss the major characteristics of Dewey's educational theories and estimate his contribution to modern education. (B. T. 1962)

Ans. (পৃ: ৪৭—পৃ: ৬৩)

4. What does Dewey mean by "learning by doing"? Why does he describe activity as essential to learning?

Ans. (পৃ: ৪৯—পৃ: ৫২)

5. Discuss Dewey's theory of activity and five steps of learning. Compare the five steps of Dewey with those of Herbart.

Ans. (পৃ: ৪৯—পৃ: ৫২)

6. Bring out the significance of the following statements of Dewey.

(i) Education is growth.

(ii) Education is the constant reconstruction and reconstitution of experience.

(iii) Education is a social porcess. (B. T. 1961)

(iv) Education being a process cannot have an aim outside it.

(v) The aim of education is more education.

(vi) School is a miniature society.

(vii) School is a special environment.

(viii) School will prepare child for life by being life.

7. Compare the theory of interest of Dewey with that of Herbart.

Ans. (পৃ: ৫৫)

ছয়

মারিয়া মণ্টেসরি (Maria Montessori)

প্রগতিশীল শিক্ষার ভাবধারাকে ভিত্তি করে যে কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে শিক্ষার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মারিয়া মণ্টেসরি অন্যতমা। শিক্ষার জগতে জনপ্রিয়তা ও বহুল প্রচারের দিক দিয়ে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন প্রথার পরেই মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থার নাম করা যায়।

মারিয়া মণ্টেসরি ইটালির আঙ্কোনা প্রদেশে ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ইটালীয় মহিলা যিনি এম-ডি হবার গৌরব অর্জন করেন এবং পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই মানসিক চিকিৎসা বিভাগে সহকারী চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ ইটালীয় চিকিৎসকদ্বয় সেগুঁই (Seguin) ও ইটরাডের (Itrad) সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের অনুসৃত ক্ষীণবুদ্ধি (feebleminded) ও ত্রুটিসম্পন্ন (defective) ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেন। সেগুঁই এবং ইটরাড তাঁদের আবিষ্কৃত পদ্ধতির দ্বারা মানসিক ও দৈহিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। মণ্টেসরি তাঁদের চিকিৎসা-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে যদি সেগুঁই ও ইটরাডের পদ্ধতিতে ত্রুটিসম্পন্ন ও ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের উন্নতি হতে পারে তাহলে স্বাভাবিক ও ত্রুটিহীন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ঐ একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে আরও অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে।

এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৯০৭ সালে চিলড্রেনস হাউস (Children's House) নামে একটি স্কুলে তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেন। ১৯০৯ সালে তিনি তাঁর এই পদ্ধতির উপর প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বই লেখেন। শীঘ্রই তাঁর এই পদ্ধতি মণ্টেসরি পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করে এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই তাঁর পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে সুরু হয়।

১৯৫২ সালে মারিয়া মণ্টেসরির মৃত্যু হয়। এই সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি ও সংস্কারের পিছনেই উৎসর্গ করেন এবং তাঁর অদম্য উৎসাহ ও অসীম প্রেরণার ফলেই আজ লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও প্রভৃতি বিরাটকায় শহর থেকে সুরু করে আফ্রিকার অন্ধকারতম গ্রামেও তাঁর শিক্ষার অগ্নিশিখা অনির্বাণভাবে প্রজ্জলিত রয়েছে।

মণ্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

মণ্টেসরি শিক্ষার কোন দার্শনিক সংব্যাখ্যান দেবার চেষ্টা করেন নি। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ বহুলাংশে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়। ফ্রয়েবেলের মত মণ্টেসরিও বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা হল শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার উন্মেষণ বা বিকাশ। অতএব শিশুর শিক্ষায় বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপের স্থান নেই। শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। আর সেইজন্য তাকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা। এই থেকেই জন্ম নিয়েছে মণ্টেসরির প্রসিদ্ধ স্বয়ং-শিক্ষার (auto-education) পরিকল্পনাটি।

১। পূর্ণ স্বাধীনতা

বস্তুত মণ্টেসরির পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। মণ্টেসরির মতে শিশুর বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ যাতে বাধাহীন ভাবে তার পূর্ণপরিণতিতে গিয়ে পৌছতে পারে সেইজন্য অবাধ স্বাধীনতার প্রয়োজন। মণ্টেসরি স্বাধীনতাব একটা নতুন সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। তাঁব মতে শিশুকে ইচ্ছামত আচরণ করার ক্ষমতা দেওয়াকেই স্বাধীনতা বলা চলে না। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নানাবিধ প্রথা, ব্যবস্থা, নিয়মকানুনের দ্বারা শিশুর স্বচ্ছন্দ আচরণকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে। এই সব বাধা বন্ধন যা শিশুকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে সেগুলিব অপসারণকেই প্রকৃত স্বাধীনতা বলে। রুশো, পেষ্টালৎসী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা শিশু স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক হলেও স্বাধীনতার এই বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যা দেওয়ার কৃতিত্ব মণ্টেসরিরই।

মণ্টেসরি প্রথমেই তাঁর বিদ্যালয় থেকে বহুযুগ ধরে প্রচলিত ছেলেমেয়েদের বেঞ্চে বসার প্রথা উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ছোট ছোট হাল্কা টেবিল ও চেয়ার স্থাপন করলেন। তাঁর মতে বেঞ্চগুলি ছিল যুগযুগান্তরের শিশুদের গতিহীনতার প্রতীক। এই হাল্কা চেয়ার-টেবিলগুলি শিশুরা নিজেরাই নাড়াচাড়া করতে পারে। তার ফলে তাদের

স্বচ্ছন্দ ও বিকাশমূলক আচরণে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না।

গতানুগতিক শাসনমূলক শৃঙ্খলার কোন স্থান নেই মণ্টেসরির নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনায়। রক্তচক্ষু তর্জনকারিণী কর্তৃত্বময়ী শিক্ষিকাদের স্থানে এলেন হাস্যময়ী সহানুভূতিশীলা পরিচালিকার (directress) দল। তাঁদের কাজ শিশুকে কিছু শেখান নয় বা তার কোন কাজে বাধা দেওয়াও নয়। তাঁদের একমাত্র কাজ নিষ্ক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া, যেমন করেন জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি চোখে দিয়ে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা রূপে আর দেখেন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে চলেছে। শিশুর সমস্ত কাজই তেমনই পরিচালিকারা পর্যবেক্ষণ করবেন বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে এবং দেখে যাবেন যে কেমন করে শিশু ধীরে ধীরে স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত হন।

২। স্বতঃপ্রসূত শৃঙ্খলা

এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে মণ্টেসরির শিক্ষাব্যবস্থায় তাহলে শৃঙ্খলা কিভাবে বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু মণ্টেসরি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে গতানুগতিক শাসনধর্মী ও উৎপীড়নমূলক পন্থায় প্রকৃত শৃঙ্খলা রাখা যায় না। শৃঙ্খলা সত্যকারের আসে স্বাধীন কর্মের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের নাম শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা হল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার ক্ষমতা। স্বাধীনতায় শৃঙ্খলা পুষ্টিলাভ করে, শাসনে শীর্ণ হয়ে যায়। মণ্টেসরির এই আদর্শ অনুযায়ী তাঁর বিদ্যালয়গুলি থেকে শাসন, কঠোর নিয়ম-কানুন, বাঁধাধরা বিধি-নিষেধ ইত্যাদিকে নির্বাসন দেওয়া হল। তার স্থানে শিশুকে দেওয়া হল চলা, ফেরা, খেলা ও কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

মণ্টেসরির বিদ্যালয়েতে পুরস্কার এবং শাস্তিরও কোন স্থান ছিল না। তাঁর মতে শাস্তি এবং পুরস্কার দুইই অর্থহীন ও কোন দিক দিয়েই কার্যকরী নয়। শাস্তি শিশুর দোষকে ত দূর করে না বরং তার নৈতিক অবনতি আনে। পুরস্কারও শিশুর মধ্যে লোভ ও অহঙ্কার সৃষ্টি করে।

সাধারণত মণ্টেসরি স্কুলে শৃঙ্খলা রাখার জন্য শাস্তির কোন প্রয়োজন হয় না। তবে মাঝে মাঝে যখন তেমন দুরূহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন সাধারণ গতানুগতিক প্রথায় শাস্তির সাহায্য না নিয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। যদি দেখা যায় যে কোন শিশু খুব গোলমাল করছে বা শান্তিভঙ্গ করছে

পরিচালিকা তাকে তখন শান্তভাবে বলেন যে সে ভুল করছে বা অশোভনতা প্রকাশ করছে। তাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তখন তাকে ঐ দল থেকে সরিয়ে এনে ঘরের এক কোণে একটি আরামকেদারায় আলাদা বসিয়ে তার খেলনাপত্র তার সামনে রেখে দেওয়া হয়। ছেলেটি সেখান থেকে দলের আর সকলের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে এবং শীঘ্রই ঐ দলে ফিরে আসার ইচ্ছা অনুভব করে।

৩। সক্রিয়তা (Activity)

স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে আসে সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা। মণ্টেসরির মতে স্বাধীনতাই হল সক্রিয়তা (Liberty is Activity)। প্রাণীমাত্রেরই সক্রিয়তা হল জীবনের ভিত্তি। শিশুকে চলাফেরা করতে এবং নানাবিধ কাজ করতে শেখানোর অর্থই হল তাকে জীবনের জন্য শিক্ষা দেওয়া এবং সেটাই হল বিদ্যালয়ের প্রকৃত কাজ। মণ্টেসরির ভাষায় জীবনের অপরিহার্য বস্তু হল গতি এবং গতিকে ব্যাহত করা বা ক্ষুণ্ণ করা কখনই শিক্ষার কাজ হতে পারে না। এই জন্যই দেখা যাবে যে মণ্টেসরি স্কুলে ছেলেমেয়েদের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্বের সঙ্গে কেমন অভিন্ন হয়ে মিশে গেছে এই নির্বাধ গতির ছন্দ। যত ছোট সে হোক না কেন, তার নিজের সব কাজই তাকে করতে হয়। স্কুলের ঘর তারা নিজেরাই গুছোয়, ধূলো ঝাড়ে, চেয়ার টেবিল সাজায়, আবার কাজ হয়ে গেলে সেগুলিকে উঠিয়ে রাখে। তাছাড়া নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটায়, নিজেদের সাজসরঞ্জামের যত্ন নেয় এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েরা গ্লাস, ডিশ ইত্যাদি ব্যবহার করতে শেখে এবং খাবার টেবিলে হাতে হাতে খাবার বিলোতে জানে। মণ্টেসরির মতে শিশুকে সাহায্যদানের প্রথা তার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশে বাধারই সৃষ্টি করে থাকে। তাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে তার আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশ হবে এবং তার বৃদ্ধি ক্রমশ আদর্শ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে।

৪। ইন্দ্রিয়-অনুশীলন (Training of Senses)

কিন্তু মণ্টেসরির পদ্ধতির সব চেয়ে অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সেই সব যন্ত্রপাতি যা মণ্টেসরি শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন ও উৎকর্ষসাধনের জন্য উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যন্ত্রপাতিগুলির পরিকল্পনা অবশ্য মণ্টেসরি ইটার্ড ও

সেগুঁইয়ের কাছ থেকে পুরোপুরিই নিয়েছিলেন। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল তাঁরা ঐগুলির ব্যবহার করতেন মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আর মণ্টেসরি ব্যবহার করলেন সেগুলি স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য।

এই সাজসরঞ্জামগুলি বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রস্তুত এবং এগুলির ব্যবহারে কেবলমাত্র শিশুর প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রই যে প্রসারিত হয় তাই নয় তার বুদ্ধির বিকাশের সবল ও সুসমৃদ্ধ ভিত্তিটিও গঠিত হয়। বস্তুত আমাদের আচরণগত ধারণাগুলি তৈরী হয় পরিবেশকে জানা এবং চেনার মধ্যে দিয়ে এবং যেহেতু এই জানা এবং চেনা কাজগুলি সম্পন্ন হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেহেতু যতই ইন্দ্রিয়গুলি উন্নত ও শিক্ষণপ্রাপ্ত হবে ততই আমাদের ধারণা ও প্রত্যক্ষণের ভিত্তি সুদৃঢ় ও নিখুঁত হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত স্কুলে আসার আগে থেকেই শিশু কোনরূপ বাইরের পরিচালনা ও সাহায্য ছাড়াই অসংখ্য ধারণা ও মনোভাব গঠন করে থাকে। ফলে এই ধারণাগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে তার অচেতন মনে একটি বিপর্যস্ত অথচ সুসমৃদ্ধ ভাবসমষ্টির সৃষ্টি করে। এর জন্য প্রয়োজন শিশু বড় হলে যাতে তার পরিবেশকে নতুন করে আবিষ্কার করতে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাকে জানতে পারে তার সুযোগ দেওয়া। মণ্টেসরির মতে ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধনই হল পরিবেশকে ভাল করে জানার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপযোগী সাজ সরঞ্জামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।

৫। শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus)

মণ্টেসরির প্রবর্তিত ইন্দ্রিয় অনুশীলনের উপকরণগুলি শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus) নামে পরিচিত। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশুর মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা ও তুলনা করার শক্তিকে জাগান। কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের টুকরোর উপর সব চেয়ে মসৃণ থেকে সুরু করে সব চেয়ে কর্কশ শিরিষ কাগজ (Sand paper) পর পর লাগান থাকে। তারপর চোখ বাঁধা অবস্থায় ছেলেমেয়েরা সেগুলির উপর হাত বুলিয়ে তাদের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করে। এই একই উপায়ে বস্তুর গঠন, আকৃতি, রঙ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জনের জন্য নানারকম সরঞ্জামের ব্যবস্থা আছে। মণ্টেসরি পদ্ধতিতে পড়তে ও লিখতে শেখানর সময়ও চোখে দেখা ও কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহারও শেখান হয়

এবং বিশ্বাস করা হয় যে এর দ্বারা শিশুর পঠন ও লিখনের জ্ঞান আরও উন্নত ও কার্যকরী হবে। যেমন শিরিষ কাগজ দিয়ে তৈরী বর্ণমালার অক্ষরগুলি চৌকো কার্ডবোর্ডের উপর আঁটা থাকে এবং শিশু সেগুলির উপর হাত বুলিয়ে বিভিন্ন অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়। অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্যে শোনা, দেখা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিরও উৎকর্ষসাধন করা হয়ে থাকে। শব্দ এবং শব্দাংশের উচ্চারণের অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর বাচন-ক্ষমতারও উন্নতি করা হয়। কোন কোন সরঞ্জামের আবার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। সরঞ্জামটি নিজে নিজেই শিশুর ভুলটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অর্থাৎ যদি শিশু কোন ভুল করে ফেলে তবে সরঞ্জামটি নিজে থেকেই সেই ভুল শিশুকে দেখিয়ে দেবে। এমন কি এই অবস্থায় সরঞ্জামটি কাজ করতে করতে নিজে নিজেই বন্ধ হয়েও যায়। তার ফলে শিশুর সামনে একটি সমস্তার সৃষ্টি হয় এবং তখন নিজের প্রচেষ্টায় তাকে সেই সমস্যাটির সমাধান করতে হয়। মন্টেসরির সরঞ্জামগুলির এই আত্মসংশোধনমূলক প্রকৃতির জন্য শিশুর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন হয়ে ওঠে।

মন্টেসরির সরঞ্জামগুলির আর একটি লক্ষণীয় হল এগুলির সৌন্দর্যানুভূতির দিকটা। শিশুর চারপাশে যা কিছু থাকে সে সবগুলিই যাতে রঙ, ঔজ্জ্বল্য, আকৃতির সামঞ্জস্য প্রভৃতির দিক দিয়ে তৃপ্তিকর হয় তার ব্যবস্থা করা মন্টেসরির শিক্ষা পরিকল্পনার একটা বড় অঙ্গ। মন্টেসরির প্রবর্তিত সরঞ্জামগুলিও গঠন, আকৃতি ও রঙের দিক দিয়ে এতই আকর্ষণীয় হয় যে শিশুর সৌন্দর্যবোধ জাগানোর পক্ষে তারা পরম সহায়ক। কেবল এই বিশেষ সাজসরঞ্জামগুলিই নয়, মন্টেসরি স্কুলে শিশুর চারপাশের সমগ্র পরিবেশটিকেই এমন আকর্ষণীয় করে তোলা হয় যে শিশু তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়েই পারে না।

মন্টেসরির এই শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি দু শ্রেণীর—ইন্দ্রিয়মূলক ও বিকাশ-মূলক। প্রথম শ্রেণীটির কাজ হল ইন্দ্রিয়গুলিকে উন্নত করা আর দ্বিতীয় শ্রেণীটির কাজ হল, লিখন, পঠন, গণিত এবং অন্যান্য কাজে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। ইন্দ্রিয়মূলক সরঞ্জামগুলির দ্বারা শিশুর স্পর্শ, আস্বাদ, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি ঘটিত ইন্দ্রিয়গুলির চর্চা ত হয়ই, তা ছাড়াও উত্তাপ, ভারসাম্য, ত্রি-আয়তন ইত্যাদি ঘটিত ইন্দ্রিয়গুলিরও অনুশীলন হয়ে থাকে। বিকাশমূলক সরঞ্জামগুলি বহুবিধ হতে পারে এবং পাঠক্রমের অধিকাংশ বিষয়ই এই সরঞ্জামগুলির সাহায্যে শেখান যেতে পারে।

৬। ব্যক্তিমুখী শিখন

মণ্টেসরি পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও একসঙ্গে শ্রেণীগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা মণ্টেসরি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচলিত তবু সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যক্তিগতভাবেই। মণ্টেসরিই প্রথম শ্রেণীগত শিক্ষণের গুরুতর ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন এবং তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

মণ্টেসরি ও কিণ্ডারগার্টেনের তুলনা

মণ্টেসরি পদ্ধতি ও কিণ্ডারগার্টেন উভয় পরিকল্পনাই শিশু ও কিশোরদের জন্য এবং উভয় ব্যবস্থাতেই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিক নীতিগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে। দুটি পরিকল্পনার মধ্যে অনেকাংশে মিল থাকলেও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও বর্তমান।

উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর স্বাধীনতা, সক্রিয়তা ও মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শেখার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতেই শিশুর আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাগুলির স্বতঃপ্রণোদিত বিকাশকে শিক্ষা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অন্তর্জাত ও স্বাধীনতা-ভিত্তিক শৃঙ্খলা, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, সৃজনমূলক কাজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও উভয় পরিকল্পনাতে সমভাবে বর্তমান।

পার্থক্যের দিক দিয়ে কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় দলবদ্ধ কাজের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু মণ্টেসরি প্রথায় শিশুদের ব্যক্তিগতভাবেই কাজ বেশী করতে হয়। মণ্টেসরি প্রথায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ খুব সুনির্দিষ্ট নয়, কিন্তু কিণ্ডার-গার্টেন প্রথায় গতানুগতিক প্রথার মতই শ্রেণীবিভাজন সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। উভয় পদ্ধতিতেই ইন্দ্রিয়-চর্চাকে শিক্ষার অপরিহার্য সোপান বলে গণ্য করা হয়েছে। মণ্টেসরি প্রথায় ইন্দ্রিয়-চর্চার জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও সরঞ্জামের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় বিভিন্ন উপহার ও কাজের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-চর্চার ব্যবস্থা আছে। দলগত কাজের মধ্যে দিয়ে উভয় পদ্ধতিতেই সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় যৌথ খেলা, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু মণ্টেসরি পদ্ধতিতে বিভিন্ন সামাজিক আচরণের মধ্যে দিয়েই সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

মণ্টেসরি পদ্ধতিতে লিখন, পঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কিণ্ডার-গার্টেনে এ সব কাজের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

ফ্রয়েবেলের উপহার ও মণ্টেসরির শিক্ষা সরঞ্জাম

উভয় পদ্ধতিতেই বিশেষ বিশেষ বস্তু বা সরঞ্জামের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফ্রয়েবেল শিশুর শিক্ষার উপকরণরূপে উপহার (gifts) নামে কতকগুলি বস্তুর প্রবর্তন করেন। তবে মণ্টেসরির শিক্ষা সরঞ্জাম ও ফ্রয়েবেলের উপহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমত ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি বিশেষ বিশেষ ধারণা বা ভাবের প্রতীক কিন্তু মণ্টেসরির সরঞ্জামের মধ্যে কোন প্রতীকধর্মিতা (symbolism) নেই। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েবেলের উপহারগুলি উপস্থাপিত করার একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অনুক্রম আছে, মণ্টেসরির সরঞ্জামে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট অনুক্রম নেই। তৃতীয়ত, ফ্রয়েবেলের উপহারের দ্বারা পাঠ্যবিষয় শেখান যায় না, কিন্তু মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলি প্রধানত লিখন, পঠন, গণিত ইত্যাদি শেখানর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মণ্টেসরি পদ্ধতির সমালোচনা

শিশু-শিক্ষার সার্থক পদ্ধতিরূপে মণ্টেসরির পরিকল্পনা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির প্রতি আধুনিক শিক্ষাবিদেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন—

প্রথমত, এই পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েরা প্রচুর শারীরিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও তাদের মানসিক স্বাধীনতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। তারা যথেচ্ছ যেতে আসতে পারে, কাজ করতে বা চুপ করে বসে থাকতে পারে, কথা বলতে বা নড়াচড়া করতে পারে, কিন্তু নিজেদের স্বাধীনভাবে কোন কিছু নতুন সৃষ্টি করার সুযোগ ও সুবিধা তাদের বিশেষ দেওয়া হয় নি। শিক্ষার সরঞ্জামগুলিরও তারা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে বটে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে নিজেদের পরিকল্পনা বা প্রয়োজনমত কিছু করতে পারে না। সরঞ্জামগুলির যান্ত্রিকতা শিশুর আচরণকে এমনভাবে সব দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে যে শিশুর নিজস্ব সৃজনমূলক প্রচেষ্টা অভিব্যক্ত হবার পথ পায় না।

দ্বিতীয়ত, যে সব সরঞ্জাম শিশুদের কাজ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির সঙ্গে শিশুর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশেষ সম্পর্ক নেই। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে জীবনসমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই যথার্থ শিক্ষা হয়ে থাকে। যে সব কাজ শিশুকে বড় হয়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সব সমস্যা তাকে পরবর্তী জীবনে সমাধান করতে হবে সেগুলিই শিশুর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। মণ্টেসরি পদ্ধতিতে এই মূল্যবান সত্যটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মণ্টেসরি প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মত মানসিক শক্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মনের মধ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র শক্তি আছে এবং চর্চার দ্বারা সেগুলির মধ্যে উন্নতি বা উৎকর্ষ আনা যায়। সে উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সাজসরঞ্জামগুলি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু বর্তমানে মানসিক শক্তির এ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

চতুর্থত, মণ্টেসরির সরঞ্জামগুলি বিশেষ একটি ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য-নির্ণয়ন ও তুলনা-করণের শক্তির উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা শিশু বাস্তব জীবনে কখনই পায় না। ফলে এই সরঞ্জামগুলি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা অবাস্তব ও কৃত্রিম হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তার স্বাধীনতাকে আরও বেশী করে খর্ব করা হয়। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু বা সাজসরঞ্জামেব মাধ্যমে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করাটা মোটেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। তাছাড়া প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার সামগ্রী বা সরঞ্জাম নির্ণয়ে শিশুর নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং সেই সামগ্রীগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুর বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলি সেগুলির মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. Give a critical estimate of the contribution of Montesssori to education. (B. T. 1958, 1965)

Ans. (পৃঃ ৬৫—পৃঃ ৭৩)

2. Compare Kindergarten System of Froebel with the Montessori-System.

Ans. (পৃঃ ৭১—পৃঃ ৭২)

সাত

বুনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education)

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক হলেন গান্ধীজী। এটিকে তাঁর দেশবাসীর নিকট তাঁর 'সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান' বলে বর্ণনা করা হয়। ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় চরম দৈন্য ও ব্যর্থতা তাঁকে এই নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন করতে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি প্রথম এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটির একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষাসম্মেলনে এই পরিকল্পনাটি প্রথম গৃহীত হয়। সেজন্য এটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardha Scheme) নামেও পরিচিত।

পরাধীন ভারতে এই শিক্ষাপরিকল্পনাটি নানা কারণে তেমন প্রসারলাভ ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক স্তরের আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছেন এবং প্রচলিত গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্থানে যাতে এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটি গৃহীত হয় তার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পাঠক্রম নিয়ে নানারূপ পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সম্প্রতি বহুদিক দিয়ে এর সংগঠন ও পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন ও পাঠক্রম

বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে ৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে বোঝায়। ১৯৪৯ সালে জাকীর হোসেন কমিটি এর প্রথম পাঠক্রম তৈরী করেন। পরে এই পাঠক্রমটির প্রয়োজনমত নানা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তিত পাঠক্রমের বর্তমানে অনুমোদিত রূপটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভ্যাস এবং কৌশলসমূহ।

২। নাগরিকতার শিক্ষা—ব্যবহারিক এবং তত্ত্বমূলক—গৃহে, বিদ্যালয়ে, গ্রামে, শহরে এবং সারা বিশ্বে। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থবিজ্ঞানের পাঠ।

৩। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষমতা অর্জন।

৪। যে কোন একটি বুনিয়াদী শিল্প—কৃষি এবং উদ্যান গঠন, সুতো কাটা এবং বয়ন, কাষ্ঠশিল্প, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সংস্কার।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান এবং গণিত।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক পরিকল্পনায় ইংরেজী শিক্ষাকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছিল, পরে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরাজীকে একটি বিকল্প বিষয়রূপে নেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাস্তরের পাঠ শেষ করে অন্যান্য শিক্ষায়তন-গুলিতে প্রবেশ করতে হলে ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহার্য বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় হিন্দী একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার সুরু হয় ৭ বৎসর বয়স থেকে এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব। এর পূর্বের স্তরকে বলা হয় পূর্ব বুনিয়াদী স্তর অর্থাৎ ৭ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্তর। আর এর পরের স্তরকে বলা হয় উত্তর বুনিয়াদী স্তর, অর্থাৎ ১৪ বৎসর উপরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্তর। এই তিন স্তরের শিক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার স্তর যোগ করলে ব্যক্তির সারা জীবনের শিক্ষাই এই নতুন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সকল মানুষের সকল স্তরের শিক্ষার এই নতুন পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে নই তালিম বা নতুন শিক্ষা।

বুনিয়াদী শিক্ষাস্তরকে সাধারণত বিদ্যালয়গুলিতে দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে: নিম্ন বুনিয়াদী স্তর—৬ বৎসর বয়স থেকে ১১ বৎসর এবং উচ্চ বুনিয়াদী স্তর—১১ বৎসর বয়স থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই বিভাগ অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা হল মোট আটবৎসর ব্যাপী। অনেক বুনিয়াদী শিক্ষাবিদ বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এই ভাবে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার বিরোধী। তাঁদের মতে এতে বুনিয়াদী শিক্ষার অবিভাজ্যতা ও সমগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি: অনুবন্ধ পদ্ধতি

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম অভিনবত্ব হল এর কর্মভিত্তিক পাঠসূচী। বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে একটি শিল্প (craft)। শিক্ষার্থীরা সেই শিল্পটির সম্পাদনের মাধ্যমেই অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলি শিখবে। এই শিখনের পদ্ধতির নাম হল অনুবন্ধ (correlation) পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক সুতো কাটা ও বয়ন হল কেন্দ্রীয় শিল্প। শিক্ষার্থীদের এই শিল্পটি সম্পাদন করতে বহু বিভিন্নধর্মী কাজ করতে হয়। যেমন, জমিকে চাষের উপযোগী করে তৈরী করা, তুলোর বীজ

বপন করা, তুলো কেটে সুতো তৈরী করা, সেই সুতো রঙ করা, তাঁতে সুতো থেকে কাপড় বোনা, নানা রকম নক্সা করা ইত্যাদি। এখন এই কাজগুলি করার সময় শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিকভাবে নানা জ্ঞান অর্জন করে। তারা জমি চাষ করার সময় শেখে মাটির প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের মাটির ধর্ম, কোন্ মাটিতে কি ধরনের জিনিস জন্মায়, এককথায় ভূবিদ্যা (Geology) ও ভূগোলের (Geography) নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। তেমনই যখন তারা তুলোর গাছ চাষ করে তারা সাক্ষাৎভাবে গাছ, পাতা ফুল ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুবিধ জ্ঞান অর্জন করে, অর্থাৎ তাদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাও (Botany) পড়া হয়। তারপর যখন তারা কাপড় তৈরী করে তখন তারা শেখে মানুষের পরিধেয়ের বিভিন্ন যুগের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের ইতিবৃত্ত। সেই সঙ্গে তারা জানতে পারে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের পোষাকের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য, পোষাকের সঙ্গে মানুষের সভ্যতা ও শিক্ষার কতটুকু সম্পর্ক —এককথায় তাদের পড়তে হয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব (Sociology), এমন কি মনোবিজ্ঞানেরও কিছুটা। কাপড়ের নক্সা তৈরী করার সময় শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয় অঙ্কনশিল্পের সঙ্গে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণে তাদের সৌন্দর্যবোধের অনুশীলন হয়। কত তুলোয় কত সুতো হল, কত সুতোয় কটা কাপড় হয় ইত্যাদি নির্ণয় করবার সময় তাদের প্রচুর গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করতে হয়। তার ফলে তাদের শেখা হয় গণিত। আর ভাষার শিক্ষা ত এই সব রকম জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়ে সব সময়েই হয়ে থাকে।

এই ভাবে একটি কেন্দ্রীয় শিল্প সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী ভাষা, গণিত থেকে সুরু করে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত পঠনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করে থাকে।

তত্ত্বের দিক দিয়ে এই পরিকল্পনাটি যথেষ্ট প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবে শিক্ষকেরা এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে বেশ অসুবিধা অনুভব করতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন যে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শিল্পের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলি পড়ান যায় না এবং গেলেও তার দ্বারা নির্ধারিত পাঠক্রমটি শেষ করা সম্ভব হয় না, যেমন বয়ন শিল্পের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি শেখান গেলেও পুরো ইতিহাসের পাঠক্রমটি কোনক্রমেই ঐ শিল্পটির সঙ্গে নিছক অনুবন্ধের সাহায্যে শেষ করা যায় না। তার মধ্যে মাঝে মাঝে বহু ফাঁক থেকে যায় এবং তার ফলে সমস্ত পড়াটাই অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য বর্তমানে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীয় শিল্পতে অনুবন্ধ প্রণালীকে সীমাবদ্ধ না রেখে শিশুর শারীরিক

ও সামাজিক পরিবেশকেও অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এর ফলে অনুবন্ধ সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হবার পথে একটা বড় বাধা থেকে যাচ্ছে। সেটি হল এর শিল্প-কেন্দ্রিকতা। একটি শিল্পকে শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার মূলে গান্ধীজীর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, শিশুর শিক্ষাকে এর দ্বারা কর্মভিত্তিক করে তোলা হবে। দ্বিতীয়, কোন একটি শিল্পে দক্ষতা লাভ করলে শিশু নানা বস্তু সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে শিখবে, এমন কি ভবিষ্যতে ঐ শিল্পকে সে তার বৃত্তি রূপে গ্রহণ করতে পারবে। গান্ধীজী যে সময়ে এই শিক্ষাব্যবস্থাটির পরিকল্পনা করেন সে সময় ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা দূরে থাকুক। গান্ধীজী ভাবলেন যে কোন বিশেষ শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিল্পটি থেকে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় করে শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করা যাবে এবং শিশুরাও ভবিষ্যতের জন্য একটি বৃত্তি শিখতে পারবে। এইভাবে তিনি শিক্ষাকে স্বয়ংনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী করে শিক্ষককে পারিশ্রমিক দেবার পরিকল্পনাটিকে ইতিপূর্বে সকলেই অবাস্তব ও আদর্শবিরোধী বলে সমালোচনা করেছেন এবং প্রথম থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনাটি প্রগতিশীল হলেও একটিমাত্র শিল্পে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে নানা দিক দিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য এর দ্বারা ব্যাহত হয়ে থাকে। প্রথমত, ঐ কেন্দ্রীয় শিল্পটি শিক্ষার্থীর কাছে সব সময়েই আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে বিশেষ কোন শিল্পে শিক্ষার্থীকে পারদর্শিতা লাভ করানই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়, ঐ শিল্পসংশ্লিষ্ট নানা কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর দেহ-মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আনাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। অতএব দেখতে হবে যে শিল্পটির প্রতি যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ সব সময় সজীব থাকে। দ্বিতীয়ত, যে শিল্প বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার অধিকাংশই গ্রামে প্রচলিত। যান্ত্রিক শিল্পে উন্নত শহরাঞ্চলে ঐ সব শিল্পের কোন সমাদর নেই। ফলে শহরবাসী পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের ঐ সব গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চান না। তৃতীয়ত, এমন অনেক পিতামাতা আছেন যাঁরা ছেলেমেয়েদের শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ারই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া বহু শিক্ষাবিদেরই এই মত যে একটিমাত্র শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোন বিশেষ শিল্পেরই সংশ্লিষ্ট কাজের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে

দিয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে সে শিক্ষাও হয়ে উঠবে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ।

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এবং আমাদের দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেন। বস্তুত এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার আমাদের দেশে এত মন্থর। ফলে সাম্প্রতিক কালে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

যান্ত্রিক শিল্প

প্রথমত, কেন্দ্রীয় শিল্পকে আর গ্রামীণ শিল্পে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে না। বিভিন্ন যান্ত্রিক শিল্পকে কেন্দ্রীয় শিল্পরূপে ব্যবহার করারও ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেক স্থানে কারিগরী শিল্প, যন্ত্র শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প, প্রভৃতি আধুনিক শিল্পকে কেন্দ্রীয় শিল্পরূপে গ্রহণের চেষ্টা চলছে। এর ফলে আশা করা যায় শহরাঞ্চলের পিতামাতাদের বুনিয়াদী শিক্ষার উপর বিতৃষ্ণা থাকবে না।

শিল্প-কেন্দ্রিক থেকে কর্ম-কেন্দ্রিক

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন কোন না কোন শিল্পকেই বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে রাখা হত এবং তার মধ্যে দিয়েই অন্যান্য বিষয়গুলি শেখান হত। কিন্তু বর্তমানে শিল্প ছাড়াও অন্যান্য ধরনের সক্রিয়তাকে শিক্ষণের কেন্দ্ররূপে ধরা হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বিষয়গুলি শেখান হয়। এই কেন্দ্রীয় কর্মটি বেশ ব্যাপক ধরনের নেওয়া হয় এবং তার ফলে অনুবন্ধ তৈরী করাও যেমন সহজ হয়ে ওঠে তেমনই বিভিন্ন বিষয়গুলির সূক্ষ্ম ও জটিল অংশগুলি শেখার অবকাশ পাওয়া যায়। এই ধরনের সক্রিয়তা-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা যে নিছক শিল্পকেন্দ্রিকের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ 'গ্রাম-পরিদর্শন'কে কেন্দ্রীয় কার্যরূপে গ্রহণ করে অনুবন্ধের সাহায্যে ভাষা, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস ইত্যাদি শেখানো চলতে পারে। যেমন গ্রামটির পুরোনো ইতিহাস আলোচনা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির ইতিহাস সংগ্রহ, জনসংখ্যা, অধিবাসীদের ধর্ম, বৃত্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভাষা শেখান চলতে পারে। সেই সঙ্গে ইতিহাসের পড়াও বেশ ভালভাবে হয়ে যাবে। গ্রামের উৎপন্ন শস্য, ফল, মূল অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানী, আমদানী, পথঘাটের বিবরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে ভূগোল পড়ানো হবে। তেমনি গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা রোগ ও রোগের কারণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড়া হয়ে যাবে। তেমনি আবার গ্রামের কত ছেলে স্কুলে পড়ে,

কত ছেলে পড়ে না, কত লোক নিরক্ষর, মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা, গ্রামপঞ্চায়েতের গঠন ও কার্য প্রভৃতির বিবরণী সংগ্রহ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা হবে। আবার গ্রামের মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ, লোকসংখ্যা গণনা, নারীপুরুষের অনুপাত নির্ণয়, জমিপিছু শস্য উৎপাদনের হিসাব, কৃষকদের জমির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের গণিত শেখাও হবে।

উপরের উদাহরণ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই ধরনের ব্যাপকধর্মী কোন সক্রিয়তা বা কর্মকে যদি অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে ধরে নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক সম্পূর্ণ, চিত্তাকর্ষক ও আয়াসহীন হয়ে উঠতে পারে। কেবলমাত্র একটি শিল্পকে শিক্ষণের কেন্দ্ররূপে ধরে নেওয়ার চেয়ে এই ধরনের সক্রিয়তাকে অনুবন্ধের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা যে অনেক বেশী কার্যকরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ধরনের পরিবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে আর শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা (craft-centred) বলা চলে না। এটিকে আমরা কর্মকেন্দ্রিক (activity-centred) বুনিয়াদী শিক্ষা নাম দিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে এই পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

যৌথ কার্যসূচী ও চরিত্র গঠন

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় যৌথ কর্মসূচী ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পাঠক্রমের অন্তর্গত সমস্ত কার্যাবলীই সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলপ্রীতি, সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী জন্মলাভ করে থাকে। গান্ধীজী নিজে আদর্শবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য গুণ ও অভ্যাসগুলি সৃষ্টি করাই হবে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। সত্যবাদিতা, স্বাবলম্বন, আত্মসংযম, মিতাচার ইত্যাদি বৃত্তিগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিলাভ করে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাগুলিকে সেইমত নিয়ন্ত্রিত করা হয়। স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভরতা ও সরল জীবনযাপনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়ে থাকে। নিজেদের জল তোলা, কাপড় ধোওয়া, ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখা স্কুলঘর পথঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই শিক্ষার্থীদের করতে হয়। নিজেদের বোর্ডিং চালানো, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা, বাগান তৈরী করা, তরিতরকারী, ফলমূল উৎপাদন করা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে দিয়ে

শিক্ষার্থীরা শ্রমের মূল্য যেমন শেখে তেমনই শেখে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার গুণাবলী

১। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণ সকলেই একমত যে কেবল বই পড়ে বা বক্তৃতা শুনে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করা যায় না। তার চেয়ে কোন কর্ম-সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষায় সমস্ত কিছুই শেখান হয়ে থাকে একটি বিশেষ শিল্পের মধ্যে দিয়ে।

২। তা ছাড়া যে শিল্পটি নির্বাচিত হয় সেটি সৃজনমূলক ও সামাজিক উপযোগিতা-সম্পন্ন। ফলে সেটির সম্পাদনের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক কল্যাণের বোধ জন্মায়।

৩। শিল্পটি থেকে যে সব বস্তু উৎপন্ন হয় সেগুলি বাজারে বিক্রয় করা যায় এবং তার অর্থে শিক্ষাকে অন্তত কিছু পরিমাণে স্ব-নির্ভর করা যেতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যটি অবশ্য বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে।

৪। শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেবার ফলে নিছক সাহিত্যমূলক শিক্ষার একঘেয়েমি বা বিরক্তি এখানে থাকে না। এখানে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় হয়।

৫। কায়িক পরিশ্রমকে পাঠক্রমের পুরোভাগে স্থান দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

৬। গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা যে অনেক পরিমাণে বাস্তবধর্মী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর জীবনের মধ্যে সত্যকারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

৭। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক পরিচিতি ঘটে। শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে তার শিক্ষাজীবনের শিল্পকে তার জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারে।

৮। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।

৯। শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সামাজিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশই এই শিক্ষাব্যবস্থার মূল পরিকল্পনা।

১০। বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয় সামাজিক পরিবেশে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই দলের মধ্যে নিজের স্থান সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং বিভিন্ন সমষ্টিগত কাজের মধ্যে

দিয়ে প্রত্যেকেই সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলি শেখে তাছাড়া স্বাবলম্বন, সততা, আত্মসংযম, মিতাচার ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলি এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয়।

১১। কর্মসম্পাদনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে বলে এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী প্রতি পদে তার সাফল্যের আনন্দ ভোগ করে। এর ফলে তার শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়। থর্নডাইকের শিক্ষার ফলভোগের সূত্র অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ার শেষে যদি শিক্ষার্থী সন্তোষজনক ফল লাভ করে তাহলে তার সে শিখন স্থায়ী হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার দোষ

১। একটি মাত্র শিল্পের মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে অনেক সময় তার সহজ কর্মতৎপরতা ব্যাহত হয়ে যেতে পারে এবং তার সৃজনীশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না।

২। অনুবন্ধ পদ্ধতি হল বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালীর প্রধানতম ভিত্তি। কিন্তু এই পদ্ধতিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রথমত, সব সময় বা সব ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত অনুবন্ধ আনা যায় না এবং তার ফলে শিক্ষাদান যান্ত্রিক ও অবাস্তব হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য একটি মাত্র শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়গুলি অনুবন্ধ পদ্ধতির সাহায্যে পড়ানোর অসুবিধা দেখে আজকাল আরও দুটি বিষয়কে অনুবন্ধের মাধ্যম রূপে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে। সে দুটি হল শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ। এর ফলে অনুবন্ধ আগের চেয়ে সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক হয়েছে।

৩। অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়াও খুব সহজ কাজ নয়। সত্যকারের কার্যকরী অনুবন্ধ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন সুযোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের। কিন্তু তেমন উন্নত-ধীসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহজে শিক্ষকরূপে পাওয়া যায় না। শিক্ষণহীন সাধারণ শিক্ষকদের হাতে অনুবন্ধ কষ্টকল্পিত ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য পুরোপুরি অনুবন্ধপদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

৪। একটি বিশেষ শিল্পে শিক্ষাব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখায় শিশুর বহুমুখী চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যেতে পারে এবং তার মানসিক ও অনুভূতিমূলক বিকাশ এই ধরনের সংকীর্ণ পাঠক্রমে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। অবশ্য আজকাল বহু ক্ষেত্রে

শিল্পের পরিবর্তে কোন বিশেষ কর্মসূচীকে কেন্দ্রীয় সক্রিয়তা রূপে নেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে এ অসম্পূর্ণতাটি অনেক কম দেখা যায়।

৫। এই পরিকল্পনাটির স্বনির্ভরতার প্রস্তাবটি অবাস্তব ও অবিজ্ঞানোচিত। এই আদর্শ কার্যকরী হলে স্কুল ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

৬। এই ব্যবস্থায় ইংরাজীকে কোন স্থান দেওয়া হয় নি। এর ফলে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাগ্রহণের সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটে থাকে। ইংরাজী বর্তমানে একটি প্রগতিশীল ও অতি প্রয়োজনীয় ভাষা। ইংরাজী ভাষার শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নয়। এই কারণে সাম্প্রতিককালে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজীকে বিকল্প বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

৭। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে গ্রাম্য পরিবেশের উপযোগী, শহরের জন্য নয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্পনির্বাচন সম্ভবপর কিন্তু শহরের উপযোগী শিল্পমাত্রেই অতি জটিল ও যন্ত্রধর্মী। সেজন্য এ ধরনের কোন শিল্প এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তন করা শক্ত। তবে আজকাল এই দোষ দূর করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রধর্মী শিল্পকে কেন্দ্র-শিল্পরূপে নেওয়া হয়েছে।

গান্ধিজীর শিক্ষাতত্ত্ব

গান্ধিজী প্রধানত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি এমন একটি বিশেষ সময়ে ভারতবাসীর জীবনে দেখা দেন যখন শোচনীয় রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ভারতবাসীর স্বাভাবিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অনুগামীরূপে স্বভাবতই দেখা দিয়েছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অবনতি। বহু শতাব্দী বিদেশী-শাসনে উৎপীড়িত ভারতবাসী তার পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা, গৌরব, ঐতিহ্য সব হারিয়েছিল। গান্ধিজীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ব্যাপৃত ছিল দেশবাসীকে এই আসন্ন রাজনৈতিক বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার অনলস সংগ্রামে।

কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতির প্রথম সোপান হল শিক্ষার বিস্তার। ব্রিটিশ শাসনে অবহেলা, বিশৃঙ্খলা, পরিকল্পনার অভাব প্রভৃতি কারণে ভারতবাসীর শিক্ষার মান বিশেষ ভাবে নেমে গেছল। বিশাল ভারতীয় জনসমাজে শিক্ষিত লোক ত সংখ্যায় খুব কমই ছিল, সাক্ষর মানুষের হারও ছিল নিতান্ত অল্প।

গান্ধিজী দেখলেন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে জনশিক্ষার প্রয়োজন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সেই কারণেই গান্ধিজী তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গরূপেই শিক্ষাসমস্যার সমাধানের কাজটি গ্রহণ করেছিলেন।)

(গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শনেরই প্রতিফলিত রূপ।) প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর দার্শনিক মতবাদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন থেকেই প্রসূত। অবশ্য গান্ধিজী দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে কোনদিনই বিশেষভাবে গবেষণা করেন নি এবং কোন সম্পূর্ণ যুক্তিধর্মী দার্শনিক মতবাদও তিনি রেখে যান নি।

গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শন

তাঁর দার্শনিক মতবাদের প্রথম কথা হল সত্যের উপলব্ধি এবং সে সত্য বলতে কোন বিশেষ তথ্য বা জ্ঞানকে বোঝায় না। আমরা যেমন জ্ঞান অর্জন বা আলোচনার সাহায্যে নানা তথ্য জানতে পারি তেমন করে সত্যকে জানতে পারি না। সত্য নিছক জানার বস্তু নয়। সত্য হল সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করার এবং প্রতিটি চিন্তা এবং আচরণের মধ্যে তাকে প্রতিফলিত করার বস্তু। এই জন্য গান্ধিজী দৈনন্দিন জীবনে আচরণের পবিত্রতার উপর এত জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে আদর্শ জীবন যাপনের মধ্যে দিয়েই সত্যকে পাওয়া যায়। কথাবার্তা, চিন্তা, ভাবনা, আচার, আচরণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতির শুদ্ধতা ও আন্তরিকতার উপর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য সত্য নির্ভর করে থাকে। গান্ধিজীর এই দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের দেশের যুগযুগান্তরের জীবনদর্শনের কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু গান্ধিজীর তত্ত্বের নতুনত্ব হল এই সত্যকে পাবার পন্থার নির্দেশ। (গান্ধিজীর মতে আমাদের জীবনে সত্যকে পাওয়ার একমাত্র উপায় হল অহিংসা।) প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে বৌদ্ধ আদর্শের ব্যাখ্যায় অহিংসাকে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গান্ধিজীর অহিংসার পরিকল্পনা অনেক ব্যাপক ও গভীর। (অহিংসা তাঁর কাছে নিছক হিংসার অভাব নয়—কোন নেতিবাচক ধারণা নয়। অহিংসা একটি জীবনাদর্শের ব্যাপক নীতি, একটি সম্পূর্ণ অস্তিবাচক পরিকল্পনা। এই নীতি মানুষের সমগ্র চিন্তা ও আচরণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে উন্নত গঠনমূলক জীবন ও সুসমৃদ্ধ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। গান্ধিজীর অহিংসানীতিকে এদিক দিয়ে দুর্বলের বা অক্ষমের নীতি বলা চলে না। একে বাস্তব রূপ দিতে গেলে যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তা, ত্যাগ, সংযম প্রভৃতি দুর্লভ গুণ থাকা দরকার।

গান্ধিজীর শিক্ষানীতি ও বুনিয়াদী শিক্ষা

গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শনও এই সত্য ও অহিংসার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক জ্ঞান ও তত্ত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে ভরিয়ে দেওয়াই শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা হল শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন, যাতে সে তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে এবং জীবনের প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় সত্যের বাস্তব রূপকে প্রতিফলিত করতে পারে। এইজন্য যাতে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি আচরণ শিক্ষার স্থচীর অন্তর্গত হয় সেদিকে সযত্ন মনোযোগ দিতে হবে এবং দেখতে হবে যেন শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশ এই সত্য ও অহিংসার আদর্শকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

গান্ধিজী তাঁর এই শিক্ষানীতি তাঁর প্রসিদ্ধ বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগ করেছেন। তাঁর এই নীতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে কয়টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই সেগুলি হল এই—

প্রথমত, শিক্ষার্থীকে অহিংসার অন্তর্নিহিত নীতিটিকে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার দৈনন্দিন কাজ, চিন্তা ও সংকল্প যাতে এই অহিংসার নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অহিংসাকে মূর্ত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন আত্মসংযমের। মনের বিভিন্ন কল্পনা, ইচ্ছা, আবেগ, প্রভৃতিকে যদি যথাযথ ভাবে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তাহলে গঠনমূলক কিছু করা সম্ভব হয় না। হিংসা প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে আদিমকাল থেকেই সহজাত প্রবণতারূপে রয়ে গেছে। তারই তাড়নায় আমাদের জীবনে এত সংঘর্ষ ও সংঘাত দেখা যায়। এই প্রতিকূল প্রবণতাগুলিকে যদি সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা না যায় তাহলে সুষ্ঠু সুষম জীবন গঠন করা সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাবলম্বন একটি অপরিহার্য গুণ। জীবনে সত্যকে প্রতিফলিত করতে হলে শিক্ষার্থীর দেহ, মন, প্রক্ষোভ প্রভৃতির পূর্ণ বিকাশ সর্বপ্রথম সোপান। স্বাবলম্বন হল এই পূর্ণ বিকাশের অত্যাবশ্যক উপকরণ বিশেষ। অপরের উপর অনাবশ্যক নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীকে অলস ও আত্মম্ভরী করে তোলে। স্বাস্থ্যময় জীবনগঠনের জন্য শিক্ষার্থী তার নিজস্ব অভাব নিজেই পূর্ণ করতে এবং নিজের চাহিদা নিজেই মেটাতে শিখবে।

চতুর্থত, সত্যকারের সমৃদ্ধ ও কার্যকরী শিক্ষা আসে সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টির স্পৃহা সহজাত এবং সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা না দিলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটিই অবহেলিত থেকে যায়।

পঞ্চমত, শিক্ষা নিছক তথ্য আহরণ বা গ্রন্থলব্ধ বিদ্যা নয়। শিক্ষা আসে কাজ করার মধ্যে দিয়ে, নিজের হাতে বস্তু সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সমাজের আর সকলের সঙ্গে একযোগে গঠনমূলক কাজ করার ভেতর দিয়ে। সমাজের প্রয়োজন ও নিজের নৈতিক আদর্শবোধ যে সব দায়িত্ব ও কর্মভার ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেবে সেগুলি যথাযথ পালনের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা আসবে।

ষষ্ঠত, সামাজিক চেতনাবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা অবশ্যই সুশিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত হবে। সেজন্য সমাজের আর সকলের প্রতি প্রীতি ও ঐক্যবোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। ব্যক্তির উন্নতি কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে পারে না। তার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক দিকের বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশের উপর, তার পরিপার্শ্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগিতার উপর। শিক্ষার্থীকে জানতে হবে যে তার জীবনের সার্থকতা তার একক জীবনের সাফল্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সমষ্টিগত জীবনের উন্নয়ন ও পরিপূর্ণতার উপর। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত এবং অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়ে জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া উচিত।

সপ্তমত, গান্ধিজীর শিক্ষানীতির আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল সব মানুষকে সমান বলে মনে করা। মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ভেদাভেদকে আমরা এতদিন বড় বলে মনে করে এসেছি তার বিরুদ্ধেই তিনি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন। সাম্য ও ঐক্যের এই মহান আদর্শটি যেমন রাজনীতিতে তেমনই তাঁর শিক্ষানীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল।

অষ্টমত, গান্ধিজী জাতীয় ঐতিহ্যে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের যে প্রাচীন সুসমৃদ্ধ ভাবধারা ভারতবাসীর মধ্যে যুগ যুগ ধরে সংহতি ও সমন্বয় বজায় রেখে এসেছে তাকেই তিনি বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর এই নতুন শিক্ষা পরিকল্পনায়। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি পূর্ণভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার আদর্শে গড়া।

সব শেষে সত্যের উপলব্ধিকেই সমস্ত শিক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করতে হবে। শিক্ষার্থীর চিন্তা, ধারণা, আচরণ প্রভৃতি এমনভাবে সংগঠিত হবে যে সেগুলির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী তার জীবনদর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে শিখবে। ন্যায়বিচার, সততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি শিক্ষার্থীর আচরণের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হবে এবং সে তার জীবনকে সত্যের আদর্শে গড়তে শিখবে। প্রকৃত শিক্ষার একমাত্র উপজীব্যই হল সত্য।

গান্ধিজী বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর এই শিক্ষাদর্শনকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সৃজনমূলক কর্মকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষাব্যবস্থাটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় শিক্ষাদানের পদ্ধতির কোন মূল্য সেখানে দেওয়া হয় নি। স্বাবলম্বন, আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি মহৎ বৃত্তিগুলি যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে।

এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে নিজের প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি নিজেকেই সম্পন্ন করতে হয়। তাছাড়া সমস্ত শিক্ষার্থী মিলে সম্মিলিতভাবে বহু কাজই সম্পন্ন করার সুযোগ পায়। এই ধরনের সমষ্টিগত কাজের মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে সুচরিত্র গঠন করা হয় তেমনই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা হয়।

গান্ধিজী ও ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের তুলনা

আধুনিক শিক্ষাজগতে ডিউইকে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার জনক বলে বর্ণনা করা হয়। তাঁর প্রচারিত মতবাদ ও প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রেই গ্রহণ করা হয়েছে। গান্ধিজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাটিও একটি প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং বর্তমানে ভারত সরকার এই শিক্ষাব্যবস্থাটি জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা রূপে গ্রহণ করেছেন।

গান্ধিজী ও জন ডিউইর শিক্ষানীতি ও প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। সেগুলি হল এই।

প্রথমত, গান্ধিজী ও জন ডিউই উভয়েই শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক করার নীতি গ্রহণ করেছেন। গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী সমস্ত শিক্ষাই লাভ করে থাকে বিশেষ একটি শিল্প পরিচালনার মাধ্যমে। প্রচলিত পুস্তকপাঠ বা শিক্ষকের বক্তৃতাশ্রবণকে সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। জন ডিউইও তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ কর্মভিত্তিক করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে

কর্মের মধ্যে দিয়ে ছাড়া সত্যকার কোন জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ করা যায় না। নিষ্ক্রিয় তথ্য আহরণ বা জ্ঞান অর্জন সম্পূর্ণ নিষ্ফল, ব্যবহারিক জীবনে তার কোন মূল্য নেই। অতএব শিশুর সমস্ত শিক্ষাকেই কর্মকেন্দ্রিক করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, গান্ধিজী ও ডিউই উভয়েই শিক্ষায় তথ্যকৌশল ইত্যাদির আহরণের চেয়ে অনেক বেশী জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের উপর। নিছক জ্ঞানমূলক দিকটির শ্রীবৃদ্ধিসাধনই যে শিক্ষা নয়, প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির পূর্ণ বিকাশ—এ সত্য গান্ধিজী ও ডিউই দুজনেই উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বহুমুখী বৃদ্ধিকে প্রথম স্থান দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, গান্ধিজী ও ডিউই দুজনেই শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্তার যথাযথ বিকাশকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। শিশুর সার্থক জীবনের সংগঠনে তার সামাজিক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সুনাগরিকের গুণাবলীর সুপরিণতি অপরিহার্য অঙ্গ। অতএব শিক্ষার্থীর পরিবেশ পুরোপুরি সমাজধর্মী হবে, সেখানে সম্মিলিত কাজকর্মের প্রচুর অবকাশ থাকবে এবং শিক্ষার্থীর উপর দলগত দায়িত্ব দিয়ে তাকে সমাজ জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষার এই সমাজতত্ত্বমূলক নীতিটিই ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বে বিদ্যালয়কে ক্ষুদ্রসমাজ রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনার রূপ নিয়েছে। গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাতেও সমাজধর্মী অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর সুযোগ স্থান পেয়েছে।

গান্ধিজী ও ডিউইর শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনার মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনই কতকগুলি অতি মৌলিক পার্থক্যও আছে। যেমন,

প্রথমত, গান্ধিজী দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়ে পুরোপুরি ভাববাদী, কিন্তু ডিউই বাস্তববাদী। গান্ধিজী সমস্ত দৃশ্যমান জগতের ধারকরূপে এক আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী। তার ফলে তাঁর শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হল শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় ধারণা এবং মানসমূহ। সেগুলিতে পৌছনই হল সব শিক্ষাপ্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু ডিউইর কাছে পরিবর্তন ও নতুনত্বই হল বিশ্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অতএব শিক্ষাও সতত পরিবর্তনশীল, নতুন পরিবেশের জন্য নতুন রূপ নিয়ে তা সর্বদা দেখা দেয়। এইজন্য ডিউই শিক্ষার কোন স্থায়ী লক্ষ্য বা বিষয়বস্তুর কথা বলতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, গান্ধিজীর শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়তা অন্তর্ভুক্ত হলেও ডিউইর সঙ্গে মৌলিক তত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর একটা বিরাট পার্থক্য রয়ে গেছে। ডিউই শিক্ষার

সক্রিয়তাকে সমর্থন করেন দার্শনিক কারণে। তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞান বা সত্যকে পাবার একমাত্র পথই হল সক্রিয়তা। অতএব শিক্ষার্থীর সব শিক্ষাই আসবে সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে। গান্ধিজী কিন্তু সক্রিয়তার কোন দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। শরীরকে পুষ্ট করার, মনকে সুস্থ রাখার, সৃজনমূলক কিছু করার এবং সবশেষে বৃত্তিমূলক যোগ্যতা লাভ করার মাধ্যমরূপেই শিল্পকে গান্ধিজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সক্রিয়তার কোন অন্তর্নিহিত ও গভীর সংব্যাখ্যান তিনি গ্রহণ করেন নি।

তৃতীয়ত, গান্ধিজীর শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়তার স্থান থাকলেও সে সক্রিয়তা নিতান্ত সংকীর্ণ প্রকৃতির। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়তা হল শিল্পভিত্তিক এবং একটিমাত্র শিল্পেই সে সক্রিয়তা সীমাবদ্ধ থাকে। সেখানে শিক্ষার্থীকে শিল্প সম্পর্কে নির্বাচনের কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। কিন্তু ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থায় সক্রিয়তার প্রকৃতি ব্যাপক। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং শিক্ষার্থীর পছন্দমত শিল্প অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকে।

চতুর্থত, ডিউই একাধারে দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে সেইজন্য দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষানীতির সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত রূপ দেখা যায়। গান্ধিজীর প্রতিভা অন্য কর্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত ছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে তিনি শিক্ষাসমস্যা সমাধানের গুরুভার গ্রহণ করেন নি। তার ফলে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে মনোবিজ্ঞানের দিকটা অবহেলিত রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যে অনুষঙ্গ পদ্ধতির উপর গান্ধিজী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেটি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থাকে ঐ পদ্ধতিটির উপর প্রতিষ্ঠিত করাটা মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির সঙ্গে গান্ধিজীর অপরিচিতিরই ঘোষণা করে। শিক্ষাবিদ্মাত্রেই জানেন যে এই শিক্ষণপদ্ধতিটির দুর্বলতাই বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্যের প্রধানতম অন্তরায়। আর গান্ধিজীর অপূর্ব চিন্তাক্ষমতা, দূরদৃষ্টি ও আন্তরিক অনুভূতি থেকে যে শিক্ষা পরিকল্পনা জন্মলাভ করেছিল তা নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হলেও তার অভিনবত্ব ও কার্যকারিতা অস্বীকার করার নয়।

প্রশ্নাবলী

1. The Basic education scheme is considered as the most important national educational experiment throughont India.

Discuss its merits and show how it can be linked up with an improved type of education recommended by the Mudaliar Commission. (B.T. 1955)

2. Enumerate the main principles underlying the scheme of education propounded by Mahatma Gandhi. (B. A. 1956)

3. State the significant features of Wardha Scheme of education and critically consider the value of the same. (B. A. 1958, 62)

4. "In West Bengal the scheme of Basic Education that is followed is activity-centred and not craft-centred." Discuss. (B. A. 1961)

5. Give a critical estimate of Basic Education as a method of progressive education. (B. T. 1963)

6. State in brief the origin and gradual expansion of Basic education in India. How has it changed from its original form and why ? (B. A. 1964)

7. Give an account of the recent development in the field of Basic education in India. What difficulties do you find in its aim and practices ? (B. A. 1963)

8. Give a short account of the educational philosophy of Mahatma Gandhi. How has it been reflected in his scheme of Basic Education ?

আট

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব

বর্তমান পৃথিবীতে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিচিত হলেও অন্যান্য প্রতিভাধর ব্যক্তির মত রবীন্দ্রনাথেরও সৃজনীশক্তি বিভিন্ন দিকে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। সঙ্গীতে, অঙ্কনে, অভিনয়ে, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনায় তাঁর অপূর্ব সৃজনীপ্রতিভার কথা বিশ্ববিশ্রুত। শিক্ষাব ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রসিদ্ধ সৃষ্টি 'বিশ্বভারতীতে' এক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে।

বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রচেষ্টা প্রথম মুক্তিলাভ করে শান্তিনিকেতনে পাঠভবন নামে একটি বিদ্যালয়ের রূপে। এই পাঠভবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত কবার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রতিভা ও আন্তরিকতাব স্পর্শে পাঠভবনটি ধীরে ধীরে অভিনব এক আধুনিক শিক্ষানিকেতনে রূপান্তরিত হয়। পাঠভবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বিদ্যাভবন নামে কলেজটি। তাবপর একের পর এক সঙ্গীতভবন, কলাভবন, চীনাভবন, বিনয়ভবন প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষাব প্রতিষ্ঠানগুলি দেখা দেয়। বর্তমানে বিশ্বভারতী নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সযত্নবোপিত বীজটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে ক্ষুদ্র তরুতে, তরু থেকে ডালপালা মেলে বৃহৎ মহীরুহতে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন

দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী ছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটি সর্বব্যাপী অধ্যাত্মিক শক্তির অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই সর্বব্যাপী শক্তির পরিকল্পনা ভারতীয় দর্শনের অনুরূপ হলেও উপনিষদের ব্রহ্ম বা পবমাত্মার মত রবীন্দ্রনাথের পরম সত্তাটি অনুভূতিবিহীন পার্থিব সুখদুঃখের অতীত একটি নির্গুণ অতীন্দ্রিয় নিরাকার শক্তি বিশেষ নয়। রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তা যেমন একাধারে সর্বব্যাপী, সর্বধারক ও সর্বশক্তির আধার, তেমনই আবার সুখশান্তির চিরন্তন উৎস

পরম কল্যাণকর মহামানব বিশেষ। তিনি একসঙ্গে মানুষের স্রষ্টা, পালক, রক্ষক, বিচারক, করুণাময় পরম পিতা। পার্থিব জন্ম, ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, কামনা-বাসনার হিসাব-নিকাষই মানুষকে সেই মহামানবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাঁর দেওয়া আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করেছে। কিন্তু মানুষ আন্তরিকভাবে যখনই তাঁকে কামনা করবে তখনই তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে, তাঁর প্রদর্শিত পথ দেখতে পাবে। মানুষের সারা জীবনের সাধনার একমাত্র লক্ষ্যই হল সেই পুরুষপরমের সন্ধান পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তা সর্বব্যাপক। আকাশে, বাতাসে, লতাপাতায়, পশুতে, পাখীতে, মানুষে সবেতেই তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর সন্ধানের জন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। ছায়ার মতনই তিনি আমাদের সহগামী। তাঁর স্পর্শ, করুণাময় বাণী, তাঁর সান্নিধ্য এ সবই আমাদের ঘিরে আছে, খুঁজে নেওয়ার যা অপেক্ষা। তাঁকে উপলব্ধি করাই হল আমাদের সমস্ত দুঃখপীড়নের অবশেষ, সমস্ত অতৃপ্তি-অশান্তির নিবারণ, সমস্ত অসম্পূর্ণতার সমাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন

রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব জীবনদর্শন তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর কাছে সকলপ্রকার শিক্ষারই লক্ষ্য হল নিজেকে উপলব্ধি। আর নিজেকে উপলব্ধি করার অর্থই হল সমস্ত প্রাণশক্তির উৎস সেই পরমসত্তাকে জানা।

আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান হল ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ বিকাশ। দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভমূলক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি যদি অবাধিত ও স্বাস্থ্যময় পথে বিকশিত না হয় তাহলে ব্যক্তির পক্ষে নিজের অন্তরস্থিত সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ব্যক্তির সত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশের মধ্যে দিয়েই পরমসত্তা বিকশিত হয়। যখনই ব্যক্তির বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিনা বাধায় ও অক্ষুণ্ন স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে তাদের পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে তখনই ব্যক্তির অন্তরস্থিত পরম সত্তাটি ব্যক্তির কাছে নিজের দীপ্তিতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই আত্মবিকাশের তত্ত্ব থেকেই শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার পরিকল্পনাটি জন্ম নিয়েছে। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে যাতে কোন দিক দিয়ে খর্ব করা না হয় তার জন্য সযত্ন আয়োজন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মবিকাশের তত্ত্বের সঙ্গে ফ্রয়েবেলের উন্মেষণ তত্ত্বের

(Theory of unfoldment) তুলনা করা যায়। প্রকৃত পক্ষে যে সব ভাববাদী শিক্ষাবিদ্ আত্মবিকাশের তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরাই শিক্ষাকে পরমসত্তার এই ক্রম-উন্মেষণের সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হল প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে প্রকৃতি একটি বড় স্থান জুড়ে আছে। প্রকৃতি তাঁর কাছে মাটি, পাথর, জল, হাওয়া, গাছপালার নিছক সমাবেশ নয়। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মত তিনিও প্রকৃতিকে প্রাণময় বিরাট এক সত্তারূপে দেখে এসেছেন—যার আকারে, রঙে, গন্ধে ও স্পর্শে এক অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রতি পদে পাওয়া যায়। দেহে মনে অপরিণত শিশুটির সত্যকার লালন-পালনের স্থান হল প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ অঞ্চলাশ্রয়। প্রকৃতির নিকট সংস্পর্শে এসে একদিকে যেমন তার দেহমনের সুষম সংগঠন ঘটবে তেমনি সে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে তার পরমসত্তার প্রতিচ্ছবি প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাবে। প্রকৃতি তার পালিকা হবেন, তার রক্ষয়িত্রী হবেন, তার শিক্ষিকা হবেন, তার জীবনযাত্রায় পথপ্রদর্শিকা হবেন।

সৌন্দর্যানুভূতি ও রসোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার আব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন আজন্ম সৌন্দর্যের উপাসক। জীবনেব সার্থক পরিণতি বহুলাংশে নির্ভর করে পৃথিবীর সৌন্দর্য ও রস উপলব্ধির উপর। বিশেষ কবে শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি সুষমভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে জীবনের সহস্র দিক থেকে যে অপরূপ সৌন্দর্যরস-ধারা নিত্য প্রবাহিত হয় তার আস্বাদন করতে তাকে শেখাতে হবে। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরিকল্পনায় সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি সুকুমার কলাগুলি অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্থান পেয়েছে।

সৃজনমূলক প্রচেষ্টাও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। নতুনত্ব হল এই বিশ্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। নতুন নতুন সৃষ্টিতে এই জগৎ চির অভিনব। মানুষেরও সার্থকতা নতুনের সৃজনে। শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভাকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দিতে হবে। শিল্প, অঙ্কন, ভাস্কর্য, অভিনয় প্রভৃতি নানা সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর সহজাত সৃজনীশক্তি নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে মানবপ্রেম আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছোট বড়, ধনী নির্ধন সব মানুষই তাঁর কাছে এক। মানুষে মানুষে কৃত্রিম

ভেদাভেদ তাঁর অনুভূতিপ্রবণ কবিমনকে বিশেষভাবে ব্যথিত করেছিল। তিনি সমস্ত মানুষকে নিয়ে এক অখণ্ড অবিভক্ত মানবজাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। গান্ধিজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের শিক্ষানীতিতেই মানুষের মধ্যে সাম্য ও একতাকে সবচেয়ে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে।

গান্ধিজীর মত রবীন্দ্রনাথও ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনাকে কোনও বিদেশী ছাঁচে গড়ার চেষ্টা করেন নি। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টিধারাকেই তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মূর্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক সংহতির মূল্যও অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ বিকাশ তার সামাজিক জীবনের স্বাস্থ্যময় সংগঠনের উপর নির্ভর করে। একা বনবাসী পরিজন-প্রতিবেশী-ত্যাগীর জীবন আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উন্নত হতে পারে কিন্তু সে জীবন সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও পরিণত হয় না। মানবজীবন রূপে রসে অর্থে ভাবে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশে, আর দশজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার মধ্যে দিয়ে।

অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী পরমশক্তির উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য। এখানে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেনের মৌলিক তত্ত্বটির সঙ্গে প্রকৃতিগত মিল পাওয়া যায়। ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিজের অন্তরস্থ পরমসত্তাকে উপলব্ধি করা। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য—কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্য কেন, মানুষের জীবনেরও উদ্দেশ্য হল সেই সর্বব্যাপী পরমসত্তাকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির উপকরণরূপে ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় নানা বিভিন্ন আকৃতির প্রতীক প্রবর্তিত করেছেন যাতে শিশু সেগুলির মধ্যে দিয়ে পরমসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রহস্যময়তা থাকলেও তিনি ফ্রয়েবেলের মত অত স্পষ্ট মিষ্টিক ছিলেন না। তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় কোন রকম প্রতীক প্রবর্তিত করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়েছিলেন উদার মাঠ, দিগন্তপ্রসারিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্তহীন চন্দ্রাতপতুল্য আকাশ, সূর্যকরোজ্জল দিন, অগণিত তারার বাতিতে আলোকিত রাত্রি, পত্রের মর্মরধ্বনি, বাতাসের হিল্লোল ও লাতাপাতার উজ্জল শ্যামলিমা। এ সবের মধ্যে দিয়েই তিনি চেয়েছিলেন যে শিক্ষার্থীরা সেই সর্বব্যাপী পরমশক্তির নিকট সংস্পর্শে আসবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি বাস্তবে রূপায়িত হয় তাঁর পাঠভবন নামে বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে। শান্তিনিকেতনের শান্ত ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ সুরু করেন। ইটকাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আলোবাতাস-শূন্য বদ্ধ অপরিসর ক্লাশরুমে পড়াশোনা যে কৃত্রিম ও গতানুগতিক পথে এতদিন চলে এসেছে, নিজের ছাত্রাবস্থা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়ে ছিল। সেদিন থেকেই তাঁর মন এমন একটা বিদ্যালয় তৈরির স্বপ্ন দেখে এসেছিল যেখানে শিক্ষার্থীরা মুক্ত পরিবেশে অবাধিত আচরণ ও আত্ম অভিব্যক্তির মধ্যে তাদের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, কৃত্রিম বাধানিষেধ ও সংকীর্ণ পরিবেশ তাদের সহজাত বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করতে পারবে না। পাঠভবন হল রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নাদর্শেরই মূর্ত রূপ।

পাঠভবনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার মুক্ত ও বাধাহীন পরিবেশ। শিক্ষার্থীরা এখানে কাজকর্ম, আচরণ, খেলাধুলার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। শিক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য শৃঙ্খলাটুকু বজায় রেখে পাঠভবনে শিক্ষার্থীদের যত দূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে।

পাঠভবনের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে গতানুগতিক বিদ্যালয়ের মত বদ্ধ কক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ করতে হয় না। উন্মুক্ত মাঠে, গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়, আলো বাতাসের প্রাচুর্যের মধ্যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে থাকে। তার ফলে তাদের দেহ এবং মন দুইই সমানভাবে স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে এবং পরম আনন্দ ও তৃপ্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বলে শিক্ষা স্থায়ী ও পরিপূর্ণ হয়।

গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের সময়-তালিকা ও কার্যসূচী অনুসৃত হয় সেগুলি উৎপীড়নেরই নামান্তর। পাঠভবনের কার্যসূচী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের বিচার করে যথাসম্ভব শিথিল ও পরিবর্তনশীল করা হয়েছে।

পাঠ-ভবনের শিক্ষা তালিকায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণ, সম্মেলন, নানা উৎসব, বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলা, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যেমন একদিকে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা হয় সেই রকম তাদের মনকে আনন্দ ও বৈচিত্র্যে ভরিয়ে রাখা হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হল পাঠভবনের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ইট কাঠের দেওয়ালে ঘেরা বদ্ধ গৃহ থেকে বিদ্যালয়কে তুলে এনে স্থাপিত করা হয়েছে প্রকৃতির উদার ও শান্ত পরিবেশে। সেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় রূপের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগোতে পারে।

পাঠভবনের শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে অখণ্ডতা, মানুষে মানুষে যে সাম্য ও বিভেদ-হীনতা তাকেই বাস্তবে মূর্ত করাই হল পাঠভবনের শিক্ষার লক্ষ্য। এই বিশ্বমানবতার আদর্শ আজকে পাঠভবনকে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the Educational Philosophy of Rabindranath. Show how it has been translated into reality in Visvabharati.

2. Discuss the major characteristics of the educational system of Rabindranath.

বর্তমান ভারতের শিক্ষার সোপান

বয়স	শ্রেণী	ক	খ	গ	ঘ
25		গবেষণামূলক ও উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ স্তর			
24		ডি-ফিল্, ডি-লিট্, এম-ডি, যন্ত্রশিল্প, কারিগরী, পূর্তশিল্প,			
23		চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আইন বিদ্যা প্রভৃতির			
22		উচ্চতম পরীক্ষা ও উপাধির			৫
21		এম-এ	এম-এড্	স্তর	
20		২ ও এম-এস্-সি	২ বি-এড্	৩	বছরের
19		৩	৩	বছরের	বৃত্তি
18		বছরের	বছরের	বৃত্তি স্তর	স্তর
17		ডিগ্রী স্তর	ডিগ্রী স্তর	প্রাক্ ১ বৃত্তিমূলক ১ স্তর	
16	XI	প্রাক ১ বিশ্ববিদ্যালয়	৩	৩	৩
15	X	২	উচ্চতর মাধ্যমিক	উচ্চতর মাধ্যমিক	উচ্চতর মাধ্যমিক
14	IX	উচ্চ মাধ্যমিক	(বহুমুখী)	(বহুমুখী)	(বহুমুখী)
13	VIII	৪	৪	৪	৪
12	VII				
11	VI	নিম্ন	নিম্ন	মিড্ল	উচ্চ
10	V	মাধ্যমিক	মাধ্যমিক		বুনিয়াদী
9	IV	৪	৪	৪	৪
8	III				
7	II	প্রাথমিক	প্রাথমিক	প্রাথমিক	নিম্ন বুনিয়াদী
6	I				
5					
4		নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন			

নয়

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে শিক্ষার জগতে একটি নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব হয়। এটিকে বৈজ্ঞানিক প্রবণতা নাম দেওয়া হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা শাখার বহুল উন্নতি হয়েছিল এবং তার ফলে একটা বিজ্ঞানধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল।

যখন এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনটি আত্মপ্রকাশ করে তখন শিক্ষার ক্ষেত্রে আধিপত্য করছিল কঠোর শৃঙ্খলাধর্মী একশ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা। এই শৃঙ্খলাবিদ্‌রা শিক্ষাকে কতকগুলি নিখুঁত সংগঠনের ছাঁচে ঢেলে শিক্ষার একটি সুসংবদ্ধ ধরাবাঁধা পরিকল্পনা খাড়া করেছিলেন। বিজ্ঞানবিদ্‌রা এই শৃঙ্খলাধর্মী অবাস্তব শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং পাঠক্রমে বিজ্ঞানকে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান দেবার জন্য আন্দোলন সুরু করলেন। প্রাচীন শৃঙ্খলাবিদ্‌রা ভাষা, ব্যাকরণ, লিখন, পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতিকে শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌রা শিক্ষাকে দু-শ্রেণীতে ভাগ করলেন। উপকরণমূলক শিক্ষা এবং প্রকৃত শিক্ষা। উপকরণমূলক শিক্ষার বিষয়গুলি আমাদের চার পাশের প্রাকৃতিক, মানসিক সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদির যে পৃথিবীটি রয়েছে সেটির সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ভাষা, ব্যাকরণ, লিখন, গণিত ইত্যাদিকে শৃঙ্খলাবিদেরা এতদিন প্রকৃত শিক্ষা বলে ঘোষণা করে এসেছিলেন সেগুলিকে বিজ্ঞানীরা নিছক উপকরণমূলক শিক্ষার পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁদের মতে এই বিষয়গুলির নিজস্ব কোন শিক্ষামূলক মূল্য নেই। প্রকৃত শিক্ষা হল সেই সব বিষয়বস্তুগুলির জ্ঞান যেগুলি আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের যথার্থ মান নির্ণয়ে সাহায্য করবে। আমাদের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলির প্রকৃত স্বরূপ যে সব বিষয়পাঠের মধ্যে দিয়ে জানা যাবে সেই বিষয়গুলিকে পাঠক্রমে সবচেয়ে আগে প্রাধান্য দিতে হবে। পদ্ধতির দিক দিয়ে বিজ্ঞানীরা মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিকে স্বীকার করলেন না এবং শিক্ষায় সক্রিয়তাকে তাঁরা বেশী মূল্য দিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের পুরোধারূপে দেখা দেন ইংরাজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। ১৮৬০ সালে তাঁর লেখা 'এডুকেশন, ইনটেলেকচুয়াল মরাল এ্যাণ্ড ফিজিক্যাল' নামে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর নতুন শিক্ষাতত্ত্বটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

স্পেন্সারের শিক্ষাদর্শন

স্পেন্সারের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষা সার্থক হল কি অসার্থক হল তা পুরোপুরি নির্ভর করবে আমরা কোন্ বিষয়বস্তুটি শিক্ষার জন্য বেছে নিয়েছি তার উপর। স্পেন্সারের মতে আমরা যে সব বিষয় শিখি সেগুলির প্রকৃত কোন মূল্য আছে কিনা তা আমরা পূর্বে বিচার করি না। তাছাড়া বিচার করতে চাইলেও সত্যকারের বিচার সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার কারণ হল বিভিন্ন জ্ঞান বা শিক্ষণীয় বস্তুর মূল্য নির্ধারণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট মান আমাদের জানা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিছক প্রথা, পছন্দ, সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আমরা বিষয়বস্তুর নির্বাচন করে থাকি। কোন যুক্তিধর্মী পন্থার অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে আমরা করি না। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা যে একেবারে হয় না তা নয়। কিন্তু সে মূল্যায়ন নিতান্তই অবিজ্ঞানোচিত এবং কোন সর্বজনস্বীকৃত মাপ বা পরিমাপ অনুসরণ করে তা করা হয় না। তাছাড়া কেবল কোন সুনির্ধারিত পরিমাপক বা মানের অভাবই আমাদের শিক্ষার বড় দোষ নয়। অকারণ ও অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ সমস্যা দিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ভারাক্রান্ত করা হয়েছে যে প্রকৃত মৌলিক প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি অবহেলিতই রয়ে গেছে।

শিক্ষার লক্ষ্য—সম্পূর্ণ জীবনযাপন

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার কার্যকারিতা কতখানি। তাঁর ব্যাখ্যায় শিক্ষার লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতি। আবার স্পেন্সারের মতে ব্যক্তির মঙ্গলই হল এই সম্পূর্ণ জীবনের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। তবে সে মঙ্গল একক জীবনযাপন থেকে আসবে না, আসবে সুপরিণত সামাজিক জীবনের মধ্যে দিয়েই।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেওয়াটা হার্বার্ট স্পেন্সারের ক্ষেত্রে নতুন নয়। শিক্ষায় ব্যক্তি-কল্যাণকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে যান রুশোই প্রথম এবং

তাঁর সেই শিক্ষানীতি তাঁর পরবর্তী শিক্ষাবিদেরা সকলেই গ্রহণ করেছিলেন। স্পেন্সারও তাঁর শিক্ষানীতির ব্যাখ্যায় রুশো কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্পেন্সারের মতে জীবনের সমস্যা হল কেমন করে বাঁচতে হবে। বস্তুত এইটি হল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে এই বাঁচাটা নিছক সঙ্কীর্ণ পার্থিব অর্থে ধরা হবে না, ধরা হবে ব্যাপকতম অর্থে। শিক্ষার কাজ হল সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করা। আর এইটিই হবে শিক্ষার সার্থকতার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি। কোন্ পাঠক্রমটি কতখানি কাযকরী তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে পাঠক্রমটি কি পরিমাণে এই মূল্যবান কাজটি সম্পন্ন করতে পারছে, তারই উপর।

দ্বিবিধ শিক্ষা

সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতি বলতে হার্বার্ট স্পেন্সার দু'শ্রেণীর শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী জ্ঞানের আহরণ। দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞানকে কাজে লাগাবার উপযোগী শক্তির বিকাশ।

সার্থক উপযোগী জ্ঞান

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের সবচেয়ে উপযোগী জ্ঞান বলতে হার্বার্ট স্পেন্সার কোন্ কোন্ জ্ঞানকে বোঝাতে চেয়েছেন।

বস্তুত এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই শিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান নির্ভর করছে। অবশ্য হার্বার্ট স্পেন্সার এই প্রশ্নের অতি সুনির্দিষ্ট উত্তরই দিয়েছেন।

তাঁর মতে সার্থকতম জ্ঞানের মধ্যে সর্বপ্রথমে আসে (ক) সেই সব জ্ঞান যা প্রত্যক্ষভাবে আত্ম-সংরক্ষণে সাহায্য করে, যেমন শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নতত্ত্ব। তার পর আসে (খ) সেই জ্ঞান যা পরোক্ষভাবে আত্মসংরক্ষণে সাহায্য করে, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং প্রয়োগবিদ্যা (গ) গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে সেই জ্ঞান যা সন্তানপালনে সাহায্য করে। স্পেন্সারের মতে পশুপালন, সেতু নির্মাণ বা জুতো তৈরীর বেলায় আমরা যেটুকু প্রস্তুতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, শিশু পালনের বেলায় আমরা সেটুকুও প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না। বরং আমরা ধরে নিয়েছি যে পিতামাতা হলেই সন্তানপালনের যোগ্যতা স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। (ঘ) চতুর্থ প্রয়োজনীয় জ্ঞান হল সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কীয় জ্ঞান—যা ব্যক্তিকে উপযুক্ত

চলে না। কোন কিছুব প্রস্তুতি বলে যাকে বর্ণনা করা হবে সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি উপকরণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তার একটা স্বতন্ত্র লক্ষ্য থাকবে কিন্তু শিক্ষা কোন কিছুর উপকরণ নয় এবং তার কোন অন্য লক্ষ্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষাই।

দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ জীবনকে শিক্ষার লক্ষ্য বললে লক্ষ্যটি আমাদের কাছে হয়ত বোধগম্য হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর কাছে তা মোটেই স্পষ্ট হবে না। শিক্ষার্থীর কাছে বর্তমান মুহূর্ত ছাড়া আব সব কিছুই অর্থহীন। অতএব সম্পূর্ণ জীবন যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন শিক্ষার্থীর কাছে তার কোন গুরুত্বই নেই। অতএব শিক্ষার এ ধরনের কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়া যায় না।

বস্তুত স্পেন্সারের শিক্ষার লক্ষ্যের বর্ণনায় সব চেয়ে বড ত্রুটি হল যে তিনি জ্ঞানার্জনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা নিছক জ্ঞানের আহরণ থেকে আসে না—জ্ঞান যতই উপকাবী বা প্রয়োজনীয় হোক না কেন। সম্পূর্ণ জীবন আসবে আদর্শ জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে। নিছক কতকগুলি জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা আসে সে শিক্ষা আদর্শ জীবন সৃষ্টি করতে পারবে না। আদর্শ জীবন যাপনেব উপযোগী পরিবেশ তৈরী কবে এবং সেই পরিবেশে শিক্ষার্থীকে জীবন কাটাতে সক্ষম করেই শিক্ষা শিক্ষার্থীব জীবনকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবে। শিক্ষাব পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্পেন্সার নতুন কিছু বলেন নি। পেস্টালৎসীর মত তিনিও শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করার নির্দেশ দেন এবং পেস্টালৎসীর শিক্ষা পদ্ধতিগুলিকেই তিনি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা কবেন মাত্র। শিক্ষা সরল থেকে জটিল হবে, মূর্ত থেকে অমূর্তে যাবে, অভিজ্ঞতামূলক থেকে যুক্তিমূলকে যাবে, আনন্দদায়ক হবে—ইত্যাদি পেস্টালৎসীর শিক্ষাপদ্ধতিগুলিকেই তিনি সমর্থন করেছেন। তবে পেস্টালৎসীর মত মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত তথ্যগুলির সঙ্গে স্পেন্সারের পরিচিতি না থাকায় তিনিও অনেক ক্ষেত্রে অমনোবিজ্ঞানোচিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। যেমন, তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞানের পঠনের দ্বারা স্মৃতিশক্তি এবং বিচারশক্তিব প্রয়োগের ক্ষমতা বাড়ে। বলা বাহুল্য এই উক্তিটি সেই সময়কার মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বেরই প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

রুশোর মত স্পেন্সারও নৈতিক শিক্ষায় প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। শিশুকে ভালমন্দ, উচিত অনুচিত ইত্যাদির নৈতিক শিক্ষা প্রকৃতিই দেবেন। শিশু যদি অন্যায় করে প্রকৃতি তাকে শাস্তি দেবেন এবং ঐ শাস্তি থেকে সে বুঝবে যে ঐ কাজটি অন্যায়। যেমন শিশু যদি মিথ্যা কথা [illegible]

কাছে অপমানিত হবে এবং তখনই সে বুঝবে যে সত্য কথা বলা ভাল, মিথ্যা কথা বলা অন্যায় ইত্যাদি। কাণ্ট থেকে সুরু করে বহু চিন্তাবিদ্‌ই এই প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রথমত, প্রাকৃতিক শাস্তি অনেক সময় অপরাধ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক পরেই আসে না, তার ফলে শাস্তির মূল্য ব্যক্তির কাছে কমে যায়। দ্বিতীয়ত, অপরাধ অনুযায়ী প্রাকৃতিক শাস্তির মাত্রা সামঞ্জস্যপূর্ণ না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড বা গুরুপাপে লঘু দণ্ড প্রায়ই হতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ফলাফলের উপর নির্ভর করা অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

স্পেন্সারের শিক্ষায় অবদান

স্পেন্সারের শিক্ষায় অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংস্কার যে হার্বার্ট স্পেন্সার এবং তাঁর সমমতাবলম্বীদের প্রভাবের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্পেন্সারের প্রভাবের ফলাফলরূপে আমরা নীচের ভাবধারাগুলির উল্লেখ করতে পারি। যথা—

১। শিক্ষার পাঠক্রমে বিজ্ঞানপাঠকে অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হবে। এ সিদ্ধান্তটি সবদেশেই মেনে নেওয়া হয়েছিল।

২। শিক্ষায় জ্ঞানের মূল্য স্পেন্সারই দিয়ে যান। ইতিপূর্বে রুশো প্রভৃতি শিক্ষাবিদেরা জ্ঞানকে নিছক উপকরণ রূপেই গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোনও কোনও জ্ঞান যে প্রকৃত শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে একথা স্পেন্সারই প্রথম বললেন।

৩। স্পেন্সার প্রকৃত জ্ঞান বলতে অবশ্য ব্যবহারিক জ্ঞানকেই বুঝিয়েছিলেন। তাঁর মতবাদ পুরোপুরি মানা না হলেও শরীররক্ষার শিক্ষা, নাগরিকতার শিক্ষা, সন্তান পালনের শিক্ষা প্রভৃতি বাস্তবধর্মী শিক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তা স্পেন্সারের প্রচেষ্টাতেই পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছিল।

৪। শিক্ষাকে উপযোগিতা-ভিত্তিক করতে হবে। বাস্তব উপযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত স্পেন্সারের শিক্ষা পরিকল্পনাটির যথেষ্ট সমালোচনা হলেও তার ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছে।

৫। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ জীবন গড়ে তোলা। স্পেন্সারের দেওয়া সম্পূর্ণ জীবনের প্রস্তুতির পরিকল্পনাটি অসম্পূর্ণ হলেও তাঁর দেওয়া শিক্ষার লক্ষ্যটি যে

আদর্শস্থানীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরবর্তী যুগের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের প্রধানতম কাজই হল সম্পূর্ণ জীবন গঠনে সক্ষম এমন একটি যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬। রুশোর মত স্পেন্সারও প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। শিশুর শিক্ষায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা বাধাসৃষ্টি তার পূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

৭। স্পেন্সারের প্রকৃতিবাদ চরমধর্মী ছিল। তিনি প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। এ তত্ত্বটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও গতানুগতিক পন্থায় বয়স্কদের প্রদত্ত শাস্তি যে শিশুর প্রকৃত সংশোধন আনতে পারে না একথা আধুনিক শিক্ষাবিদেরা বিশ্বাস করেন।

৮। স্পেন্সারের নৈতিক তত্ত্বের বহু সমালোচনা হয়েছে। তিনি ব্যক্তির উপযোগিতার উপর নীতিধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অনেকে সেইজন্য তাঁর মতবাদকে স্বার্থপর ও অসামাজিক বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সামাজিক কল্যাণকে তাঁর নীতিবাদ থেকে বাদ দেন নি। তিনি ব্যক্তির ও সমাজের যৌথ কল্যাণের উপর তাঁর উপযোগিতার তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে তাঁর নীতিতত্ত্ব অনেক যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানধর্মী।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the Educational Philosophy of Herbert Spencer. Critically examine his doctrine of complete living.

2. What are the educational theories of Herbert Spencer? Evaluate their contribution to modern education.

দশ

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা

ভারতে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার প্রচুর মিল দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ নিতান্তই স্বাভাবিক, কেননা ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণেই ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটির কাঠামো রচিত হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে যখন দেখলেন যে ভারতের সাম্রাজ্যটি একরকম তৈরী অবস্থায় ভাগ্যদেবী তাঁদের হাতে উঠিয়ে দিলেন, তখন তাঁরা ভারতবাসীর শিক্ষাব্যস্থার পুনর্গঠনে মন দিলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা তাদের স্বদেশে প্রচলিত শিক্ষার সংগঠনটিই এদেশে প্রবর্তিত করলেন। সেই থেকেই ভারতে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হল।

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে ভারতের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ— ত্রিবিধ শিক্ষাধারাই ইংলণ্ডের প্রচলিত ঐ তিন শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হয়েছিল। ভারত স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত এই কাঠামোটির কোন পরিবর্তনই করা হয় নি। বর্তমানে একাদশ শ্রেণীর বহুসাধক বিদ্যালয় প্রবর্তনে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন পাঠস্তরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের স্কুলগুলি ইংলণ্ডে নার্সারি স্কুল নামে পরিচিত। ১৯১১ সালে র‍্যাচেল ম্যাকমিলান ও মার্গারেট ম্যাকমিলান নামে দুই ভগ্নী ইংলণ্ডে প্রথম নার্সারি স্কুল স্থাপন করেন। এরপর নার্সারি স্কুলগুলি ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১৮ সালে ইংলণ্ডের এল-ই-এ (স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ) স্কুলগুলিকে নার্সারি স্কুলকে অর্থ সাহায্যের ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেই থেকেই নার্সারি স্কুলগুলি শিক্ষাদপ্তরের সাহায্যে পুষ্ট হয়ে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার একটি কার্যকরী মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৮ সালে ইংলণ্ডে মোট নার্সারি স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯৮তে। এর মধ্যে এল-ই-এ'র শাসনভুক্ত ছাড়াও স্বাধীন নার্সারি স্কুলও অনেক আছে।

ইংলণ্ডের নার্সারি স্কুলগুলি শিক্ষাদপ্তরের উদার অর্থসাহায্যের ফলে যথেষ্ট উন্নত

ও প্রগতিশীল হতে পেরেছে। নার্সারি স্কুলের উপযোগী সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। খেলাধূলার জন্য খোলা জায়গা, আধুনিক শিক্ষাসহায়ক সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ইত্যাদি বেশ ব্যায়সাপেক্ষ। তাছাড়া শিশুদের দুধ, দিবাহার প্রভৃতির আয়োজন করাও নার্সারির অপরিহার্য অঙ্গ। ছেলেমেয়েদের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে যথাযথ বিকাশে সাহায্য করার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলির জন্যও যথেষ্ট অর্থের দরকার হয়। ইংলণ্ডের এল-ই-এ'র অর্থপুষ্ট নার্সারিগুলি এদিক দিয়ে শিশুদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

ভারতের প্রচলিত নার্সারি স্কুলগুলি ইংলণ্ডের আদর্শে গঠিত হলেও কার্যকারিতার দিক দিয়ে ওদেশের স্কুলগুলির সমকক্ষ নয়। তার প্রধান কারণ হল এগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৈরী এবং ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্যে পরিচালিত। নার্সারি স্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন তার কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তার ফলে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রভৃতি সংগ্রহ করা এই সব স্কুলের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে এবং স্বভাবতই শিক্ষার মান বেশ নীচু হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংগ্রহ করার মত অর্থ না থাকার ফলে অযোগ্য, শিক্ষণহীন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এর ফলে অনেক সময় ভুল ও ক্ষতিকর শিক্ষাও দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় কারণ হল, নার্সারিতে শিক্ষা দেবার মত যোগ্য শিক্ষকও যথেষ্ট সংখ্যায় না পাওয়া। নার্সারি শিক্ষার কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষাপদ্ধতির উপর এবং শিশুমনোবিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতিতে অভিজ্ঞ শিক্ষক ছাড়া সুষ্ঠু শিক্ষণ আশা করা যায় না। ইংলণ্ডে নার্সারি-স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান আছে এবং রাষ্ট্রের শিক্ষাদপ্তর থেকে সেগুলিকে উদার অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। আমাদের দেশে নার্সারি-স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেই এবং এই ব্যাপারে সরকারের অর্থসাহায্য এবং আয়োজন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তার ফলে এদেশে নার্সারি স্তরের উপযোগী শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হয় না।

তৃতীয় কারণ হল, ভারতের অধিকাংশ নার্সারি স্কুলগুলিই ইংলণ্ডের স্কুলগুলির তুলনায় পরিকল্পনাহীন। কিণ্ডারগার্টেন ও মণ্টেসরি এই দুটি প্রসিদ্ধ শিশুশিক্ষার পরিকল্পনার মৌলিক তত্ত্বগুলি প্রায় পৃথিবীর সমস্ত নার্সারি স্কুলেই অল্পবিস্তর

গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঐ দুটি শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিই প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়ে থাকে। বস্তুত কেবল ইংলণ্ডে কেন পৃথিবীর সব দেশেই নার্সারি ও শিশু-শিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা প্রচলনের মূলেই আছে এই দুটি প্রগতিশীল শিক্ষাধারার আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ভারতেও এই দুটি শিক্ষাপরিকল্পনার আদর্শের উপর নার্সারি স্কুলগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সত্যকার বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ্‌দের দ্বারা পরিচালিত অল্পসংখ্যক নার্সারি স্কুল ছাড়া ভারতের অধিকাংশ নার্সারি স্কুলই শিক্ষণবর্জিত ব্যবসায়বুদ্ধিতাড়িত অর্থলোভী অযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নার্সারি শিক্ষার কোনও উপকারিতা শিশুরা পায় না।

ইংলণ্ডের মত ভারতের শিক্ষাদপ্তরেরও উচিত নার্সারি শিক্ষায় আরও সক্রিয় মনোযোগ দেওয়া এবং উদার অর্থসাহায্যের দ্বারা নার্সারি শিক্ষাকে সত্যকারের কার্যকরী করে তোলা।

প্রাথমিক শিক্ষান্তর

ভারতের সনাতন প্রাথমিক শিক্ষান্তরটিও ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে গঠিত। ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। ১৯৪৮ সালের আইনে এই বয়সকে কমিয়ে ১০½ বৎসর বয়সে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন ১০½ বৎসর বয়সের নীচের বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকেই প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নানা শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন—

১। **নার্সারি বিদ্যালয়ঃ** যদিও প্রাথমিক স্তর থেকে প্রকৃতিতে বিভিন্ন তবু ইংলণ্ডের নার্সারি বিদ্যালয়গুলি ১৯৪৪ সালের আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলিতে ৫ বছরের নীচের ছেলেমেয়েরা পড়বে।

২। **শিশু বিদ্যালয় (Infant School):** এখানে পড়ে ৫ বৎসর থেকে ৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা।

৩। **কিশোর বিদ্যালয় (Junior School):** এগুলিতে ৭ বৎসর বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়ে থাকে।

৪। **শিশু ও কিশোর বিদ্যালয় (Infant and Junior School):** এগুলিতে ৫ বৎসর বয়স থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা পড়ে।

৫। **প্রাথমিক বিদ্যালয়:** এগুলিতে ৫ বৎসর বয়স থেকে ১০½ বৎসর

বয়সের ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণত দু'শ্রেণীর। প্রথম, সম্পূর্ণ এল-ই-এ পরিচালিত, এগুলিকে কাউন্টি স্কুল বলা হয় এবং দ্বিতীয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত—এগুলিকে বর্তমানে ভলান্টারি স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে।

শিশু বিদ্যালয় ও কিশোর বিদ্যালয়গুলি আগে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বাইরে ছিল। ১৮৭০ সালের শিক্ষা আইনে এগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলি কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এক একটি ক্লাশে ১৬—৪০ জন ছাত্রছাত্রী থাকে। সহর অঞ্চলের শিশু ও কিশোর বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজন মত শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত আছে কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে পড়ে। আগে শিশু ও কিশোর বিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র পড়া, লেখা ও গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের উপরই জোর দেওয়া হত। কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়-গুলিতে সক্রিয়তা ও মৌলিক অভিজ্ঞতা অর্জনের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। খেলাধূলা, গল্পকথন, আলাপ, বাচনশিক্ষা, প্রকৃতিবীক্ষণ, অঙ্কন, সংগীত, নৃত্য হাতের কাজ ইত্যাদি হল ইংলণ্ডের আধুনিক কিশোর বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমের প্রধান অঙ্গ।

৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা ইংলণ্ডে সবস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনেক ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষাও দেওয়া হত। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়।

১৯৪৪ সালের আইনে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক অঞ্চলে স্কুল থাকবে পর্যাপ্ত। পর্যাপ্ত বলতে সংখ্যার দিক দিয়ে ত পর্যাপ্ত বোঝায়ই, গঠন, প্রকৃতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির দিক দিয়েও যাতে স্কুলগুলি পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে সেদিকেও দেখতে হবে। তাছাড়া ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণ করার সময় শিক্ষার্থীর তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। সে তিনটি হল—বয়স, শক্তি ও দক্ষতা।

ইংলণ্ডের স্কুলগুলি সাধারণত দু'শ্রেণীর হয়ে থাকে : কাউন্টি স্কুল এবং ভলান্টারি স্কুল। কাউন্টি স্কুল বলতে বোঝায় সেই সব স্কুল যেগুলি এল ই-এ'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। ভলান্টারি স্কুল বলতে বোঝায় কোন ধর্ম সম্প্রদায় বা কোন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুল। ভলান্টারি স্কুলগুলিও বর্তমানে

এল-ই-এ'র অধীনস্থ। তবে সেগুলির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠাতা সম্প্রদায় বা সংস্থাটির কমবেশী কর্তৃত্ব থাকে। এগুলিও এল-ই-এ'র কাছ থেকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য পায়।

ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সংগঠনের দিক দিয়ে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলির অনুরূপ। এখানেও প্রাথমিক স্তরে চার ও পাঁচ বছর পড়ান হয়ে থাকে। ৬ বছর বয়স থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সুরু করলে এখানেও দশ বা এগার বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার শেষ হয়ে থাকে। ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও ইংলণ্ডের মত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, যেগুলি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় সংস্থাগুলি কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত এবং দ্বিতীয়, যেগুলি সম্পূর্ণ বেসরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত। প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মতই অবৈতনিক। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সাধারণত অবৈতনিক হয় না।

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল সেখানে শিক্ষা, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই বিনা ব্যয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকই আইনত ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে বাধ্য। ভারতে এখনও পর্যন্ত বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাছাড়া এখানে পর্যাপ্তসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই এবং অনেক গ্রামাঞ্চল আছে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানও দেখা যায় না। ১৯৪৪-এর আইনে ইংলণ্ডের প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে তার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এখানেই সমুদ্রোপম ব্যবধান।

পরিশাসনের দিক দিয়ে ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিজের নিজের পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। কাউন্টি স্কুলগুলিতে এই পরিচালকমণ্ডলী এল-ই-এ'র দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর ভলাণ্টারী স্কুল-গুলিও একই রকম পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে তাতে এল-ই-এ'র কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ। ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরও পরিচালনার ভার থাকে নিজের নিজের পরিচালকমণ্ডলীর উপর। এই পরিচালকমণ্ডলীগুলি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা করপোরেশনের অধীনে থাকে এবং তাদের দ্বারা পরিশাসিত হয়ে থাকে। বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলি স্থানীয় সংস্থা বা সরাসরি জনশিক্ষা আধিকারিকের দ্বারা পরিশাসিত

হয়ে থাকে। কাউন্টি স্কুলের মত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা কর্পোরেশন স্কুলগুলির সম্পূর্ণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থাগুলিই বহন করে থাকে।

পাঠক্রমের দিক দিয়ে ইংলণ্ডের প্রাথমিক স্কুলগুলি ভারতের সনাতন প্রাথমিক স্কুলগুলির চেয়ে অনেক প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক স্তরে নিছক জ্ঞান আহরণের প্রতি আর জোর দেওয়া হয় না। নানারকম সক্রিয়তা ও ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির সুষ্ঠুবিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এদিক দিয়ে ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাটির কোনরূপ সংশোধন বা সংস্কারসাধন করা হয়নি। বহু বর্ষের পুরাতন উপযোগিতাবিহীন বিষয়বস্তু এখনও সমানভাবে পড়ান হচ্ছে এবং অনুসৃত পদ্ধতি-গুলিও একান্তই পুরাতনপন্থী।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়। প্রথমত, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এল-ই-এ'রই এক বা একাধিক নিজস্ব স্কুল ক্লিনিক বা বিদ্যালয় চিকিৎসাগার আছে। ১৯৪৪ সালে আইনের দ্বারা প্রত্যেক পিতামাতা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করতে দিতে বাধ্য। প্রত্যেক এল-ই-এ'র অধীনে মেডিকাল অফিসার এবং নার্স স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা থাকে। ১৯৪৪ সালের ন্যাশনাল হেল্‌থ্‌ এ্যাক্টের দ্বারা ছেলেমেয়েদের গুরুতর অসুখে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য স্কুল থেকেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, স্কুলে ছেলেমেয়েদের দুধ এবং দিবাহার সরবরাহের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। এর ব্যয়ভার বর্তমানে এল-ই-এ'ই বহন করে থাকেন। তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে বর্তমানে প্রয়োজন হলে শিশুদের জন্য পোষাকও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পিতামাতার আথিক অবস্থা ভাল না হলে অল্প অর্থ নিয়ে বা বিনা ব্যয়ে ছেলেমেয়েদের পোষাক, শরীরচর্চার সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা আছে। চতুর্থত, যদি কোন শিশু স্কুল থেকে অনেক দূরে বাস করে এবং তার পরিবহনের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এল-ই-এ সেই শিশুর পরিবহনের ব্যবস্থা করবেন বা প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দেবেন। সবশেষে শিশু ও কিশোরদের যাতে শ্রমে নিয়োগ করা না হয় তার জন্য ১৯৪৪ সালের নতুন আইন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত কোন চাকরী বা অর্থকরী কাজে শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না। এই বয়স পর্যন্ত তাকে বাধ্যতামূলকভাবে লেখাপড়া করতে হবে।

বলাবাহুল্য ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় উপরের প্রগতিশীল পন্থাগুলির কোনটিই অবলম্বিত হয় নি। এখানে প্রাথমিক শিক্ষাকেই এখনও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয় নি। স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে এদেশে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শিশুদের দুধ এবং দিবাহার সরবরাহের কোনরূপ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পোষাক, শরীরচর্চার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করার কথাই ত ওঠে না। পরিবহনের কোনরূপ সন্তোষজনক আয়োজনও এখানে নেই। ভারতের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের সংস্কারসাধন করা হয়েছে গান্ধিজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায়। প্রচলিত পুরাতন পাঠক্রমকে বাতিল করে দিয়ে গান্ধিজী তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পকেন্দ্রিক নতুন একটি পাঠক্রম প্রবর্তিত করেছেন। ইংলণ্ডে এই ধরনের শিল্পকেন্দ্রিক কোন শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তবে ইংলণ্ডের বহু আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। পদ্ধতি বা সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলির সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির অনেক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে অনেক মিল আছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা নিতান্তই অসংগঠিত ও পরিকল্পনাহীন অবস্থায় ছিল। ১৯৪৪ সালের আইনের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এতে বলা হয় যে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝাবে ১২ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। ১৯৪৮ সালের শিক্ষা আইনে এই বয়সকে নীচের দিকে দেড় বছর নামিয়ে আনা হয় অর্থাৎ বর্তমান ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় ১০½ বছর বয়স থেকে ১৯ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

ভারতের বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা সুরু হয় ১০ বা ১১ বৎসর বয়স থেকে। পুরাতন ১০-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল ৬ বছর ব্যাপী—পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। এই ব্যবস্থায় শিশুর ১১ বা ১২ বছর বয়স থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব ছিল। কিন্তু বর্তমানে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি প্রবর্তন করার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় আয়ুষ্কাল এক বছর বেড়ে গেছে। এই নতুন বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ মাধ্যমিক শ্রেণীর আয়ুষ্কাল দাঁড়িয়েছে ৭ বছর—শিশুর

১১ বা ১২ বৎসর বয়স থেকে ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত। ভারতের বহু শিক্ষাবিদ্ ইংলণ্ডের অনুকরণে মাধ্যমিক শিক্ষাকালকে আরও এক বছর বাড়াবার পক্ষপাতী এবং ১৯৬৩ সনে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্থাব অধিবেশনে ১২ বৎসর ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে।

১৯৪৪ সালেব শিক্ষা আইনে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার যেমন প্রচুর পরিবর্তন করা হয় তেমনি ১৯৫২ সালে মুদালিয়র কমিশনের নির্দেশ অনুসাবে বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির প্রবর্তনেব মাধ্যমে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে।

বর্তমানে ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষাব জন্য তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। প্রথম গ্রামার স্কুল, দ্বিতীয় মডার্ণ স্কুল, তৃতীয় টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডের হ্যাডো কমিটি প্রথম এই তিন শ্রেণীব বিদ্যালয় স্থাপনেব প্রস্তাব করেন। পরে ১৯৩৮ সালে স্পেনস কমিটি এবং ১৯৪১ সালে নবউড কমিটি মাধ্যমিক স্কুলের এই ত্রিধারাকে সমর্থন কবেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে যদিও এই ত্রিবিধ স্কুলের কথা কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই তবু ধবে নেওয়া হয়েছে যে মাধ্যমিক স্কুলের এই ত্রিধারা এই আইনটিব দ্বাবা সমর্থিত। ইংলণ্ডের এই তিনপ্রকার স্কুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

গ্রামার স্কুল

শিক্ষা দপ্তবেব ভাষায় যে সব স্কুলে বিশেষভাবে সাহিত্যধর্মী বা বিজ্ঞানধর্মী পাঠক্রম অনুসবণ করা হবে সেই স্কুলগুলিকেই গ্রামাব স্কুল বলা হবে। প্রাচীন কালের গ্রামাব স্কুল বলতে সেই স্কুলগুলিকে বোঝাত যেগুলিতে বিশেষ কবে ল্যাটিন সাহিত্য, ল্যাটিন ব্যাকবণ, অলঙ্কার, তর্কবিদ্যা এবং কোথাও কোথাও গ্রীক সাহিত্যও পডান হত। বর্তমানে গ্রামার স্কুলেব পাঠক্রমকে অনেক ব্যাপক করা হয়েছে এবং এতে ইংবাজী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অঙ্কন এবং ইংরাজী ছাডাও আধুনিক ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেয়েদেব জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান এবং ছেলেমেয়ে সকলের জন্য হাতের কাজ এবং শরীবচর্চা পাঠক্রমের অন্তর্গত করা হয়েছে। গ্রামার স্কুলের শিক্ষা কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় না। বিভিন্ন স্কুলসমিতি, অভিনয়, বিতর্ক, ছবি তোলা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বমুখী বিকাশে সাহায্য করাই গ্রামার স্কুলের লক্ষ্য। যে সব ছেলেমেয়ে গ্রামার স্কুলের শিক্ষা সন্তোষজনকভাবে

শেষ করে তারা সাহিত্য বা বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষাধারা অনুসরণ করতে পারে।

সাধারণত বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব ছেলেমেয়ে উচ্চধী-সম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয় তারাই গ্রামার স্কুলে যোগ দেবার অধিকার লাভ করে। গ্রামার স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে সাহিত্য বা বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ শেষ করে এদের মধ্যে থেকেই দেশের গবেষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, বিচারক, বৈজ্ঞানিক, পরিশাসনমূলক উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি গড়ে উঠে।

মডার্ন স্কুল

ইংলণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাধ্যমিক স্কুলগুলি মডার্ন স্কুল নামে পরিচিত। পূর্বে প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত যে সব মাধ্যমিক ক্লাশ বা স্কুল ছিল সেগুলির পরে সেণ্ট্রাল স্কুল বা সিনিয়র স্কুল বলে পরিচিত হয়। হ্যাডো রিপোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এগুলির মডার্ন স্কুল নাম দেওয়া হয়। গ্রামার স্কুলের পাঠক্রম উচ্চধীসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের পক্ষেই উপযোগী। সাধারণ ছেলেমেয়েদের পক্ষে ঐ পাঠক্রম থেকে বিশেষ সুফল আশা করা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য সাধারণ ছেলেমেয়েদের জন্যই তৈরী হয়েছে মডার্ন স্কুল।

মডার্ন স্কুলের পাঠক্রম প্রাথমিক পাঠক্রমেরই উন্নত রূপ। ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি মডার্ন স্কুলের পাঠক্রমের প্রধান অঙ্গ। মূর্তবস্তু নাড়াচাড়া এবং দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষণপদ্ধতি প্রধানত প্রয়োগমূলক। সাধারণ জীবন যাত্রায় যে সব অত্যাবশ্যক অভিজ্ঞতা অপরিহার্য সেগুলি মডার্ন স্কুলের পাঠক্রমে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাধারণ স্তরের মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জীবনপ্রস্তুতির উপযোগী পরিকল্পনা ও আয়োজন পাওয়া যায় মডার্ন স্কুলগুলিতে।

টেকনিক্যাল স্কুল

ইংলণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি টেকনিক্যাল স্কুল নামে পরিচিত। বৃত্তিমূলক কারিগরি বিষয়গুলি বিশেষ করে এই বিদ্যালয়গুলিতে স্থান পেয়েছে। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রঘরসম্পন্ন এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে এবং এই স্কুলগুলি থেকে পাশ করে স্বভাবতই কারিগরিবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের উন্নত শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ভারতে বর্তমানে যে বহুসাধক বিদ্যালয়গুলি প্রবর্তিত করা হয়েছে সেগুলির

সঙ্গে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক স্কুলগুলির সংগঠনের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য আছে। কিন্তু নীতি এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এই দুটি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট মিলও আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য হল বিভিন্ন রুচি ও শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমত শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং এই লক্ষ্যটিকে উভয়ক্ষেত্রেই বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংলণ্ডে তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রতি যে সুবিচারের চেষ্টা করা হয়েছে, ভারতে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে বহুসাধক বিদ্যালয়গুলির সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে সাতটি স্বতন্ত্র পাঠপ্রবাহের প্রবর্তন করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থী তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোনও একটি প্রবাহ নির্বাচন করতে পারে

পাঠক্রম

ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়ে মানবতত্ত্ব এবং সাধারণ বিজ্ঞান নামে যে দুটি পাঠপ্রবাহের প্রবর্তন করা হয়েছে, ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুলের পাঠক্রমেও ঠিক তাই পড়ান হয়ে থাকে। গ্রামার স্কুলের সাহিত্যমূলক পাঠক্রমটি মানবতত্ত্বের পাঠক্রমের অনুরূপ এবং বিজ্ঞানের পাঠক্রমটি এখানের বিজ্ঞানপ্রবাহের পাঠক্রমেরই অনুরূপ। তেমনই মডার্ন স্কুলের পাঠক্রমের সঙ্গে এখানকার বাণিজ্য পাঠপ্রবাহের বেশ মিল আছে, যদিও মডার্ন স্কুলের পাঠক্রম আরও ব্যাপকধর্মী। ইংলণ্ডের টেকনিক্যাল স্কুলের পাঠক্রমটিও ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়ের কারিগরি পাঠপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। এছাড়া ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়ে আরও তিনটি স্বতন্ত্র পাঠপ্রবাহ আছে, যেমন চারুকলা, কৃষি ও মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান। ইংলণ্ডে এগুলি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকলেও মাধ্যমিকস্তরে এগুলি সুপরিকল্পিত ভাবে শেখানোর কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা সেখানে নেই। এদিক দিয়ে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাটি ইংলণ্ডের চেয়েও প্রগতিশীল হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডেও বর্তমানে বহুসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনেক জায়গায় গ্রামার-টেকনিক্যালের মিশ্রিত স্কুল বা মডার্ন-টেকনিক্যালের মিশ্রিত স্কুলও গঠিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে এই ধরনের মিশ্রিত স্কুল ছিল সংখ্যায় ২৫টি এবং তিনটি স্কুলের মিশ্রিত ভারতের মত বহুসাধক স্কুলও তৈরী হয়েছিল ১৩টি। ইংলণ্ডে এই স্কুলগুলিকে সর্বব্যাপক (comprehensive) বিদ্যালয় নাম দেওয়া হয়েছে।

ইংলণ্ডে তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রচলিত থাকলেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েকেই একই পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয় এবং নবম শ্রেণী থেকে

পাঠক্রমের বিভিন্নতা স্থুরু হয়। তেমনই ভারতের বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম একই থাকে, নবম শ্রেণী থেকে যে যার পছন্দমত পাঠ-প্রবাহ নির্বাচন করতে পারে।

ইংলণ্ডে যদিও পাঠক্রমের বিভিন্নতা প্রবর্তিত করার জন্য বিভিন্ন স্কুলের সৃষ্টি করা হয়েছে তবু সে স্কুলগুলির মধ্যে পার্থক্যটিকে খুব বড় বলে ধরা হয়নি। কোন একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর প্রয়োজন বুঝলে শিক্ষার্থী অন্য কোন পাঠ প্রবাহে পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু ভারতে এই পাঠক্রমের বিভাজনকে স্থায়ী ও চরম বলে ধরা হয় এবং শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে এক পাঠপ্রবাহ থেকে আর এক পাঠপ্রবাহে পরিবর্তন করতে পারে না। এদিক দিয়ে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত পরিবর্তনশীল নয়।

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক স্কুলগুলিও দুরকমের। প্রথম কাউন্টি স্কুল, যেগুলি এল-ই-এ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তার দ্বারা পূর্ণভাবে পরিচালিত। দ্বিতীয়, ভলাণ্টারি স্কুল, যেগুলি কোনও ধর্ম সম্প্রদায় বা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট ও পরিচালিত। ভলাণ্টারি স্কুলগুলিও আইনত এল-ই-এ'র অধীনস্থ এবং এল-ই-এ থেকে প্রয়োজনমত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য পেয়ে থাকে। এগুলির পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাতা সংস্থা বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে এল-ই-এ'রও কমবেশী অধিকার থাকে।

ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ রাজ্যেই স্বতন্ত্র মাধ্যমিক বোর্ডের দ্বারা পরিশাসিত। বোর্ডের নিজের প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয় নেই। প্রায় সবগুলি বিদ্যালয়ই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং জন-সাধারণের সাহায্যে পুষ্ট। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থের যে ঘাটতি দেখা দেয় বোর্ড গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে সে ঘাটতি পূরণ করে। এর ফলে বিদ্যালয়গুলির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যেমন এক দিক দিয়ে ব্যাহত হয় তেমনই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ভারতের মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির অবস্থা শোচনীয়, বাড়ীঘর অনুপযোগী, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সবশেষে শিক্ষকদের বেতনের হার লজ্জাজনকভাবে নীচু। কিন্তু ইংলণ্ডে বেশীর ভাগ স্কুলই এল-ই-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হওয়ায় তাদের সাধারণ অবস্থা এমন নিম্নস্তরের নয়। কোনও প্রয়োজনের জন্য তাদের অসুবিধায় ভুগতে হয় না বা অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যেরও অভাব তাদের হয় না। ভারতে অবশ্য সরাসরি রাষ্ট্র-চালিত কিছু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এগুলিকে অর্থের অভাবের জন্য অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে সেখানে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ আমাদের দেশের হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা নিতে প্রত্যেক শিশুই বাধ্য এবং তার জন্য কোন ব্যয়ই অভিভাবককে বহন করতে হয় না। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাই এখনও বাধ্যতামূলক হয়নি, মাধ্যমিক শিক্ষার কথা দূরে থাকুক।

এছাড়া ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার আরও কয়েকটি প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও অসুস্থদের চিকিৎসা আয়োজন বিনা ব্যয়ে স্কুল থেকেই করা হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে স্কুলের খরচায় বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও দেওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয়, স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের দুধ ও দিবাহার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তৃতীয়, পিতামাতার অবস্থা তেমন খারাপ বুঝলে এল-ই-এ থেকে শিক্ষার্থীর পোষাক ও স্বাস্থ্যচর্চার সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়ে থাকে। চতুর্থ, যদি প্রয়োজন বোঝা যায় তাহলে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পরিবহনের ব্যবস্থাও এল-ই-এ করতে পারে কিংবা পরিবহনের জন্য অর্থ সাহায্যও দিতে পারে। পঞ্চম, শিশুদের যাতে শ্রমে নিয়োগ না করা হয় তার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন তৈরী করা হয়েছে। শিশু বলতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরও বুঝিয়ে থাকে।

সব শেষে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ভারতের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। সেখানে শিক্ষকদের বেতনের হার অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের আয়ের চেয়ে বিশেষ কম নয়। এর ফলে শিক্ষকবৃত্তি সেখানে ভারতের মত অনাকর্ষণীয় নয় এবং শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদাও কম নয়। শিক্ষকদের বেতনের হারের দিক দিয়ে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বৈষম্য যে কত তা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

	ইংলণ্ড	ভারত
	মাসিক বেতনের হার	মাসিক বেতনের হার
প্রধান শিক্ষক	৬৫০৲—১৫০০৲	২৫০৲—৫০০৲
সাধারণ শিক্ষক	৫৫০৲—৯০০৲	১৫০৲—২৫০৲

এছাড়া ইংলণ্ডে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বা অতিরিক্ত কোনও যোগ্যতা থাকলে শিক্ষকদের এর উপরেও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

শিক্ষকদের শিক্ষণের আয়োজনও ইংলণ্ডে ভারতের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও উন্নত।

এগার

ভারত ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা নানাদিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উন্নত ও প্রগতিশীল জনশিক্ষার মাধ্যমরূপে আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার নাম সর্বাগ্রে করা যায়। ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সংস্কার সাধনে আমেরিকার প্রভাব বেশ উল্লেখযোগ্য। বহুসাধক বিদ্যালয় ও বিভিন্নমুখী পাঠক্রমের যে পরিকল্পনাটি বর্তমানে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তিত করা হয়েছে তার মৌলিক সংগঠনটি আমেরিকার কাছ থেকেই নেওয়া।

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত তুলনা নীচে দেওয়া হল।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

আমেরিকার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। জার্মানীতে ফ্রয়েবেল যখন তাঁর কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তখন জার্মানী বা ইউরোপের অন্য কোনও দেশে তার যতটা না সমাদর হয় তার চেয়ে অনেক বেশী সমাদর হয় আমেরিকায়। মণ্টেসরির অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতিও ব্যাপকভাবে আমেরিকার শিশুশিক্ষার সংগঠনগুলিতে অনুসৃত হয়। তাছাড়া আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রচুর গবেষণা হয় এবং প্রখ্যাত শিশু মনোবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় নার্সারি স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ভারতের নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেনের সংগঠনগুলিও আমেরিকান শিশুশিক্ষায় প্রচলিত ব্যবস্থার অনুরূপ। উভয় দেশেই সাধারণত ২½ বা ৩ বছর বয়স থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত নার্সারির স্থিতিকাল এবং পদ্ধতি ও পরিচালনার দিক দিয়ে দু'দেশের স্কুলগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

তবে পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা হল সমৃদ্ধতম দেশ এবং ভারতের দারিদ্র্য

সর্বজনবিদিত। অতএব উৎকর্ষের দিক দিয়ে আমেরিকার নার্সারি স্কুলগুলির সঙ্গে ভারতের নার্সারি স্কুলগুলির কোন তুলনাই চলে না।

প্রশস্ত স্কুলবাড়ী, উন্মুক্ত স্থান, খেলা ও শেখার নানা সাজসরঞ্জাম, উপযুক্ত আসবাবপত্র এবং যোগ্য শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা প্রভৃতিব দ্বারা আমেরিকার নার্সারি স্কুলগুলি পর্যাপ্তভাবেই সুসজ্জিত। শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনগুলি পরীক্ষণমূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণের কোন অভাব আমেরিকার নার্সারি স্কুলগুলির হয় না। তার ফলে আমেরিকার নার্সারি স্কুলগুলি দিন দিন প্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেগুলির তুলনায় ভারতের নার্সারি স্কুলগুলি একান্তই পশ্চাদ্‌পদ। সরকারী সাহায্যের অভাবে এবং চিরন্তন অনটনে নার্সারি স্কুলগুলি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যোগ্য শিক্ষক প্রভৃতি সংগ্রহ করতেই পারে না।

প্রাথমিক শিক্ষা

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনায় খুবই সাম্প্রতিক। তার ফলে আমেরিকার শিক্ষার ইতিহাসও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। এখানকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সুরু হয় ইংলণ্ডের অনুকরণেই। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়িত্ব এতদিন ৮ বছর আবার কোথাও কোথাও ৯ বছর ব্যাপী ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার আয়ুষ্কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ছয় বছর —প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। শিশুর পড়ার বয়স হল ছ' বছর বয়স থেকে এগার বছর বয়স পর্যন্ত। তার পরের ছ' বছর মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। কোথাও এই ছয় বছরের মাধ্যমিক স্তরকে আবার দুটি উপস্তরে ভাগ করা হয়, তিন আর তিন। তার পরের দু'বছর হল জুনিয়ার কলেজ স্তর। আমেরিকায় প্রচলিত এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে ৬—৬—২ এবং ৬—৩—৩—২ পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে।

আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। এর প্রথম কারণ হল আমেরিকার সরকারের মতই আমেরিকার শিক্ষাও জনগণেরই সম্পত্তি এবং জনগণের জন্য জনগণের দ্বারাই পরিচালিত। সেদেশে শিক্ষা অবৈতনিক এবং সর্বজনীন। রাষ্ট্রই শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে থাকে। কেবলমাত্র স্কুলই অবৈতনিক নয়। বই, খাতা, পরিবহনের ব্যয়

সমস্তই শিক্ষাকর্তৃপক্ষ দিয়ে থাকে। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমও যথেষ্ট উন্নত। পড়া, লেখা, অঙ্ক করা, বানান শেখা এই চার রকমের অত্যাবশ্যক শিক্ষা ছাড়াও আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নাগরিকতা, ইতিহাস ভূগোল ও পৌরনীতির সামাজিক পাঠ, সাহিত্য, শরীরচর্চা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, নিরাপত্তা, চারুকলা ও শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আধুনিক জীবনযাপনের অপরিহার্য অভিজ্ঞতাগুলি শিশুকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। এর ফলে আমেরিকার প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষা যথেষ্ট ব্যাপকধর্মী ও কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

৩ আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্তই গতানুগতিক ও পুঁথিভিত্তিক। লেখা, পড়া, অঙ্ক করা, নীরস তথ্য আহরণ প্রভৃতি সনাতন অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করা ছাড়া প্রকৃত জীবনপ্রস্তুতির কোনও সুযোগ শিশুরা এই শিক্ষা থেকে পায় না। আমেরিকার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। এ দিক দিয়ে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমটির সংস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমটিকে অনেকখানি প্রগতিশীল করা হয়েছে।

৪ আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সমগ্র শিশুসমাজের মাত্র একটা সামান্য অংশ পেয়ে থাকে। আমেরিকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়স্তরেই সহশিক্ষা প্রচলিত আছে। ভারতের প্রাথমিক স্তরে কোথাও কোথাও সহশিক্ষার প্রথা থাকলেও সাধারণভাবে ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষার আয়ুষ্কাল কম করে ছ'বছর, অনেক জায়গায় আট বা নয় বছরও প্রচলিত আছে। ভারতে চার পাঁচ বছরের বেশী প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষান্তর

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষার মত মাধ্যমিক শিক্ষাও আমেরিকার সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। সেখানে জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী ও বর্ণ

নির্বিশেষে ধনী দরিদ্র সকলেরই ছেলেমেয়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। এই কারণেই আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে আমেরিকার গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে বর্ণনা করা হয়।

কেবল অবৈতনিক ও সর্বজনীন বলেই নয়, আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক বলার আর একটি বড় কারণ হল যে সেখানে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই তার নিজস্ব রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাটিও ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমেরিকার মত এত ব্যাপক ও এত বিভিন্নতা-সম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। তার ফলে যে ধরনের রুচি ও প্রবণতা নিয়েই শিক্ষার্থী জন্মাক না কেন তার উপযোগী শিক্ষার সুযোগ সে পেতে পারবে।

আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পাব্লিক স্কুল নামে পরিচিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাড়াও আমেরিকার পাব্লিক স্কুলে বৃত্তিমূলক ব্যবহারিকধর্মী বহু বিষয় শেখান হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার বিভিন্ন পাব্লিক স্কুলের পাঠক্রম পর্যবেক্ষণ করলে নীচের বিষয়গুলি তাতে অন্তর্ভুক্ত দেখা যাবে, যেমন, মোটরগাড়ী চালান, বিমান চালান, মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যবিধি, গৃহ পরিচর্যা, নাটক রচনা, অভিনয়, বেতার-নির্মাণ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, নানাবিধ চারুকলা, ফলিত বিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, আসবাবপত্রের দিক দিয়ে আমেরিকার বিত্তসম্পন্ন স্কুলগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ শিক্ষায়তন।

ভারতের বর্তমান বহুসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি আমেরিকার কাছ থেকে নেওয়া। আমেরিকায় রাষ্ট্র পরিচালিত পাব্লিক স্কুলগুলি বহুসাধকধর্মী। একই স্কুলে বিভিন্নধর্মী বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। সেগুলি থেকে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত বিষয় বেছে নিতে পারে। ভারতের নতুন বিদ্যালয়গুলি অনেকটা এই প্রকৃতিরই। আমেরিকার অনুকরণে এখানেও একই স্কুলে বিভিন্নধর্মী বিষয় ও পাঠপ্রবাহ পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মৌলিক পরিকল্পনাটি এক হলেও দুটি বিদ্যালয়-ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমেরিকায় প্রতিটি পঠনীয় বিষয় স্বতন্ত্রভাবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থী নিজের পছন্দমত যে কোন পাঠ্য বিষয় বেছে নিতে পারে। সেখানে তার বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতায় কোনরূপে বাধা দেওয়া হয় না। কিন্তু ভারতের বহুসাধক স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়গুলিকে সংঘবদ্ধ করে কতকগুলি পাঠ-প্রবাহের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, মানবতন্ত্রমূলক পাঠপ্রবাহ, বিজ্ঞানমূলক পাঠপ্রবাহ,

কৃষিমূলক পাঠপ্রবাহ, কারিগরি পাঠপ্রবাহ, বাণিজ্যিক পাঠপ্রবাহ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীকে যে কোন একটি পাঠপ্রবাহ নির্বাচন কবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটি পাঠপ্রবাহ একবার নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীকে ঐ পাঠপ্রবাহের অন্তর্গত বিষয়গুলি থেকেই তার নিজস্ব পাঠ্যবিষয়গুলি বেছে নিতে হবে, অন্য কোন পাঠপ্রবাহের বিষয় নির্বাচন করা চলবে না। অর্থাৎ যদি শিক্ষার্থী বিজ্ঞানবিষয়েব পাঠপ্রবাহ নির্বাচন করে তাহলে তাকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানমূলক বিষয়গুলি পাঠ্যরূপে নিতে হবে। বাণিজ্যিক বা কারিগরি বা অন্য কোন পাঠপ্রবাহের বিষয়গুলি নির্বাচন করতে সে পাববে না। কিন্তু আমেরিকাব এই বকম শ্রেণীবদ্ধ পাঠপ্রবাহ না থাকার ফলে শিক্ষার্থী যে কোন রকমের পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করতে পারে এবং একাধিক বিভিন্নধর্মী পাঠ্যবিষয়ও একসঙ্গে গ্রহণ কবতে পাবে। এব ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থীবা ভাবতের বহুসাধক স্কুলগুলির শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ভাবতেব বহুসাধক বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার এই সঙ্কোচসাধনের দ্বাবা ভারতের শিক্ষার নীতিনির্ধাবকেবা বেশ বক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই নীতির স্বপক্ষে যুক্তি হল যে বিশেষধর্মী বিষয় পড়ার সময় একই শ্রেণীভুক্ত বিষয়গুলিতে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখলে শিক্ষা সত্যকার কার্যকবী হতে পারে। আর এব বিপক্ষে যুক্তি হল যে এই নিয়মের দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রচেষ্টাকে জোব করে একটি বিশেষ শিক্ষা ধাবায় সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং তাব বহুমুখী শিক্ষাব আগ্রহ ও শক্তিকে বিকাশ লাভ করার সুযোগ দেওয়া হয় না।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি ছ' বছর ব্যাপী। ছ' বছর ব্যাপী প্রাথমিক এবং ছ' বছর ব্যাপী মাধ্যমিক—এই দুটি স্তর মিলিয়ে হয় মোট বার বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার কাল। মাধ্যমিক স্তবের পব দুবছরের জুনিয়র কলেজ স্তর বলা হয়। এই স্তরটির পরিকল্পনা করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সংযোজক পাঠস্তর রূপে।

ছ' বছরের মাধ্যমিক স্তরটিকেও আবাব কোথাও কোথাও দুটি ৩-বছর ব্যাপী উপস্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর ও দ্বিতীয়টিকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর। তার পর দু'বছর জুনিয়র কলেজ স্তর। আবার কোথাও কোথাও পুরো ছ'বছরই একই স্কুলে পড়ান হয়ে থাকে। এ দু'ধরনের পরিকল্পনাকে যথাক্রমে ৬-২ পরিকল্পনা এবং ৩-৩-২ পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে।

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ৪ বৎসর ব্যাপী। তারপব পুরনো মাধ্যমিক স্কুলগুলি ৬ বৎসর ব্যাপী, নতুনগুলি ৭ বৎসর ব্যাপী। নতুন বহুসাধক স্কুলগুলিতে দুটি স্তর আছে—৪ বৎসবের নিম্ন মাধ্যমিক ও ৩ বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক। তাহলে এখানকার বর্তমান শিক্ষা পবিকল্পনা দাঁড়াচ্ছে দু'প্রকারের, পুবনো ৪-৬ বা নতুন ৪-৪-৩। পুবনো পরিকল্পনার সঙ্গে এক বৎসরের প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্তর যোগ করে নতুন পরিকল্পনাটির সঙ্গে সমতা আনা হয়েছে।

আমেরিকার মাধ্যমিক স্তবে সহশিক্ষা সর্বত্র প্রচলিত। ভাবতে মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা ক্বচিৎ দেখা যায়। আমেবিকাব মাধ্যমিক শিক্ষাও সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ভাবতের মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও মুষ্টিমেয় বিশেষ সৌভাগ্যবানের অধিকাবে। আমেবিকার মাধ্যমিক শিক্ষা রাষ্ট্রাযত্ত হওয়াব ফলে সেখানকার স্কুলগুলি, বাড়ী, সাজসরঞ্জাম, খেলার মাঠ, অন্যান্য উপকরণ, উপযুক্ত শিক্ষক প্রভৃতি সব দিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ। কিন্তু ভাবতে মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও রাষ্ট্র অবহেলিত হওয়ায় নানা অভাবে জর্জবিত ও জাতিব মেরুদণ্ডগঠনে একান্তভাবে অক্ষম।

প্রশ্নাবলী

1. Institute a comparison between the educational system of England and that of India.

2. Give a short account of the systems of primary and secondary education in America and institute a comparison with the corresponding systems of India.

3. Compare the Public Schools of America and the Multipurpose Schools of India. Where do they agree and differ ?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয় এবং গণতন্ত্রভিত্তিক জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়। ভারতের বিবিধ সমস্যার সমাধান করা, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক অবস্থার উন্নয়ন করা এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ভারতকে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা এই নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্য ভারত সরকার পরপর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনাটি চলেছে। এটি শেষ হলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং সে সম্বন্ধে মোটামুটি খসড়াও একপ্রকার তৈরী হয়ে গেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির স্থায়িত্ব ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির স্থায়িত্ব ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ এবং তৃতীয়টির স্থায়িত্ব ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১–১৯৫৬)

প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই সমগ্র ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্য বলেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং শিক্ষার প্রয়োজনীতা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেকথাও এক বাক্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে সে সম্বন্ধে পরিকল্পনাকারিগণ একমত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জাতীয় নেতাগণের কোনরূপ মতভেদ না থাকলেও বাস্তবে তাঁরা শিক্ষার প্রতি কোন সুবিচার করেন নি। শিক্ষার জন্য প্রথম পরিকল্পনাটিতে তাঁরা যে টাকা খরচ করেছেন তা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করলে একপ্রকার অকিঞ্চিৎকর বলা চলে। বস্তুত, প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষি, জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তি এবং পরিবহন এই কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ অর্থই ব্যয়িত হয় এগুলির উন্নয়নের জন্য। তার ফলে শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে গেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সবশুদ্ধ ব্যয় হয়েছে ২০৬৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে মাত্র ১৩৩ কোটি টাকা শিক্ষার খাতে ব্যয় হয়। এই টাকার মধ্যে প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৮৫ কোটি, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ২০ কোটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ১৪ কোটি এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনার জন্য ১৪ কোটি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মোট বরাদ্দ টাকার তুলনায় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ নিতান্তই কম, মোট টাকার মাত্র ৬·৪%।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে স্থির করা হয় যে ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের অন্তত ৬০% এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের অন্তত ২৫% এর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ঐ পরিকল্পনাটিতে শিক্ষার খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ স্বল্প হওয়ার জন্য শিক্ষা বিস্তারের এই লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হয়নি। ১৯৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দেখা গিয়েছে যে ৬ থেকে ১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৫২·৯%, ১১ থেকে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মাত্র ১৬·৫% শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে। এইভাবে অর্থের বরাদ্দ কমিয়ে ফেলার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হয়নি।

অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় শিক্ষার যে একেবারে কিছু উন্নতি হয়নি তা নয়। প্রথম পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার আগে শিক্ষার খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হত এবং এই পরিকল্পনার ফলে আরও ১৩৩ কোটি টাকা পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। তার ফলে পূর্বের তুলনায় শিক্ষার অগ্রগতি যে কিছু পরিমাণে ত্বরান্বিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অধিকাংশ অর্থই বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে সারা ভারতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৩,৭৩০। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭,৮৩২তে। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঐ সময়ে হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষের কিছু বেশী। ঐ পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি। প্রাথমিক ছাত্র সংখ্যাও এই সময়ে ১ কোটি ৮২ লক্ষ থেকে ২ কোটি ২৯ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভারতের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় এই অগ্রগতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

কেননা প্রাথমিক শিক্ষালাভের বয়সপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের প্রায় অর্ধেকই শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট টাকার প্রায় ৳ অংশই ব্যয়িত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং তার পরে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে।

প্রথম পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ। পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা মাত্র ৬২ লক্ষতে পৌঁছয়। এই পরিকল্পনাতে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি কিছুটা উল্লেখযোগ্য। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৩৩৯টি। পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৭৪তে।

প্রথম পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই নবপরিকল্পিত বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয়িত হয়। ১৯৫২ সালের মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১১শ বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজ্যে বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। প্রথম পরি-কল্পনার মধ্যে মোট ২৫৫টি বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

প্রথম পরিকল্পনার সময় আরও পাঁচটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয় এবং ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২৭ থেকে ৩২এতে দাঁড়ায়। এই সময় বিভিন্ন শ্রেণীর কলেজও অনেকগুলি স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যশিক্ষার কলেজের সংখ্যা ছিল মোট ৫৪২টি এবং ঐ পরিকল্পনাটির শেষে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৭২টি। তবে এ পর্যায়ের শিক্ষার অগ্রগতি মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-১৯৬১)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় শিক্ষার উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখীকরণ, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের উন্নয়ন, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের অধিকতর সুযোগদান এবং বয়স্কদের জন্য সামাজিক শিক্ষার

প্রবর্তন—এই কয়েকটি বিষয়ের উপরই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সর্বসমেত খরচ করা হয়েছিল ৪৮০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ২২১ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৯৫ কোটি টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৫১ কোটি টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ৪৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক পরিকল্পনার জন্য ২৭ কোটি টাকা।

উপরের ব্যয়বরাদ্দগুলি ছাড়াও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন পর্যায়ে ১২ কোটি টাকা সাধারণ শিক্ষা এবং ১০ কোটি টাকা সামাজিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা দুটি। প্রথম, সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়, প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। এই দুটি সমস্যাকেই সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দুই দিক দিয়েই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ ৬—১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৫২·৯% জন বিদ্যালয়ে পড়ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২·৪%। তেমনি ১১—১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১৬·৫%জন মাত্র বিদ্যালয়ে পড়ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২২·৬%। এই দুই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের এক করলে অর্থাৎ ৬—১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে মাত্র ৪০% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যেত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বৃদ্ধি পেয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯%তে। অর্থাৎ মোটের উপর মাত্র ৯% ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল। বলা বাহুল্য ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতে সর্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও কিছু দেখা যায় নি।

প্রাথমিক শিক্ষার আরও দুটি বড় সমস্যা হল অপচয় (wastage) এবং অনুন্নয়ন (stagnation)। দেখা গেছে যে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয়ের হার ৫০% এরও উপরে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার আরও বেশী। অপচয় দূর করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে তোলা। মেয়েদের

শিক্ষার উন্নয়ন করার একটা বড় বাধা হল নারী শিক্ষকের অভাব। ১৩৫৩-৫৪ সালে নারীশিক্ষকের মোট সংখ্যা ছিল মোট শিক্ষকসংখ্যার মাত্র ১৭%।

বুনিয়াদী শিক্ষা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। মোট বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়ায় ৮০,২৪৩, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯৭ লক্ষের উপরে। বুনিয়াদী শিক্ষার উপযোগী শিক্ষকের সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বুনিয়াদী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা হয় ২ লক্ষ ৬০ হাজারের উপর। তাছাড়া ১৯৫৬ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institute of Basic Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ হল বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালক এবং শিক্ষকদের শিক্ষণ এবং পরামর্শ দেওয়া। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষাস্তরের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা-গ্রহণের উপাদান এবং পুস্তক সরবরাহ করাও এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কাজ।

বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে অধিক অর্থব্যয় হয়ে যায়। এই জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি সর্বপ্রথম মনোযোগ দিতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার উৎপাদনমূলক দিকটিকে এতদিন যে অবহেলা করা হয়েছিল সেটির প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেখা গেছে যে পাঁচ বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের চেয়ে আট বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায়। এই জন্য যাতে অধিকসংখ্যক আট বৎসর ব্যাপী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে যাতে ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের হার বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া হয়েছে। সবশেষে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যকরী মূল্য বাড়াবার জন্য কৃষি, গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি সমগোত্রীয় পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রন্থিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে ১৯৫৩ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার শিক্ষাকমিশনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বহুমুখী পাঠক্রম সম্বলিত বহুসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা

হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫৫টি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বহুসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮ গুণ বেড়ে যায় এবং মোট দাঁড়ায় ২১১৫টিতে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষ করে উপলব্ধি করা হয়েছিল। দেখা গেল যে এই পরিকল্পনাটির বিভিন্ন দিকগুলিকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে যে সব কর্মী, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞের দরকার তাদের সকলেরই ন্যূনতম শিক্ষারূপে মাধ্যমিক শিক্ষা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পরে অবশ্য তাঁরা প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবেন। এইজন্য শিক্ষকমণ্ডলী, জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মিগণ, সমবায় উদ্যোগের পরিচালকগণ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মচারীগণ প্রভৃতি সকল স্তরের কর্মীদেরই গ্রহণ করা হয়ে থাকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে বা ১৪—১৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে। অতএব এককথায় জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার সবচেয়ে আগে দরকার।

এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫১ কোটি টাকা। যেখানে প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২০ কোটি। এই অর্থের অধিকাংশই খরচ করা হয়েছে নতুন বহুসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং পুরাতন গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পিছনে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার আয়ুষ্কালকে ১০ বৎসর থেকে ১১ বৎসরে উন্নীত করা হয়েছে। অবশ্য ভারতের সমস্ত ১০ বৎসরের বিদ্যালয়কে ১১ বৎসরে রূপান্তরিত করতে বহু বৎসর সময় লাগবে এবং তার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১০ বৎসর ব্যাপী উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং ১১ বৎসরের উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের মিলিত সংখ্যা ছিল ১০,৮৩৮। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭,২৫৭তে। মিডল স্কুল ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ২১,৭৩০ থেকে বেড়ে হয় ৪৯,৬৬৩। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও এই পাঁচ বৎসরে বেশ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১১ থেকে ১৪ বৎসরের পঠনরত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ঐ বৎসরে মোট জনসংখ্যার ১৭·৫% থেকে বেড়ে ২২·৬% হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে এই বয়সের পঠনরত (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে) মোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ এবং

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা হয় ৬৭ লক্ষ। ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিস্তার মোটেই আশানুরূপ হয় নি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ঐ বয়সের পঠনরত ছেলেমেয়েদের (নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী) সংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৯ লক্ষতে। শতকরা দিক দিয়ে প্রথম পরিকল্পনার শেষে ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৭·৮% মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ঐ হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় মাত্র ১০·৬%।

মাধ্যমিক স্তরের মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ১৪ থেকে ১৭ বৎসরের মেয়েদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষের কাছাকাছি। এই জন সংখ্যার মাত্র ৩% মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। তবে তার ফল আশানুরূপ হয়নি।

শিক্ষক শিক্ষণ

শিক্ষকদের উন্নততর শিক্ষণের আয়োজনের সংগে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে জড়িত। সেইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষকশিক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের মাত্র ৬০% শিক্ষণ-প্রাপ্ত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে এই সংখ্যা মাত্র ৪% বৃদ্ধি পায় এবং ৬৪%এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঐ সময়ে মাধ্যমিক স্তরে ১০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬ জনই শিক্ষণ-বর্জিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে দ্রুত হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষার মান ব্যাহত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ২০ হাজার। প্রথম পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা হয় ৭ লক্ষ ২০ হাজার। প্রতি বৎসর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তর থেকে সাফল্যের সংগে পরীক্ষা দিয়ে যারা বেরোয় তাদের সংখ্যাও এই অন্তবর্তীকালে ৪১ হাজার থেকে ৫৮ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কলেজ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের উন্নয়ন এবং এই স্তরে অপচয় এবং অনুন্নয়নের হার কমানোর জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন, টিউটোরিয়াল এবং বিতর্ক সভার সংগঠন, বাড়ী, পাঠাগার, পরীক্ষণাগারের উন্নতি সাধন, ছাত্রাবাসের সুযোগ সুবিধার বৃদ্ধি, প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা এই পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৭৭২টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৮১তে। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও ৭ লক্ষ থেকে বেড়ে হয় ১০ লক্ষের কাছাকাছি। এই পর্যায়ের শিক্ষাকের সংখ্যাও ৩৮ লক্ষ থেকে বেড়ে হয় ৬২ লক্ষ। প্রথম পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ১৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৮ কোটি টাকা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক করে তুলতে হলে সকল স্তরের জন্যই দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। এই জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার আয়োজন করা যে একান্ত প্রয়োজন এই তথ্যটুকু সরকার বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছেন এবং সেইজন্য কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক শিক্ষাদানের আয়োজন করেছেন। প্রথম পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছিল। ১৯৫১ সালে খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিতে ১২০০ শিক্ষার্থীকে নিম্নস্নাতক স্তরের শিক্ষা এবং ৬০০ শিক্ষার্থীকে স্নাতক স্তরের শিক্ষা এবং গবেষণার সুবিধা দানের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে উন্নত কারিগরি শিক্ষার জন্য ভারতের সর্বত্র নতুন নতুন শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়েছে। বোম্বাইতে এবং মাদ্রাজে যথাক্রমে ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরের অনুরূপ দুইটি টেকনোলজিকাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়। চতুর্থ ইনষ্টিটিউটটি স্থাপন করা হয় ১৯৬০ সালে কানপুরে। প্রত্যেকটি ইনষ্টিটিউটে ১৬০০ নিম্নস্নাতক স্তরের এবং ৩০০ স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

সামাজিক শিক্ষা

১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার ১৬'৬%

ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান আছে। এর মধ্যে সাক্ষর (literate) পুরুষের সংখ্যা হল ২৪.৯% এবং নারীর সংখ্যা মাত্র ৭৯.% । আবার গ্রামবাসী এবং সহরবাসীদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে গ্রামবাসীদের মধ্যে সাক্ষর লোকের সংখ্যা মাত্র ১% এবং সহরবাসীদের ৩৪.৬% । এই ভয়াবহ অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাকেই সফল করা যাবে না। এই কারণে সামাজিক শিক্ষাকে স্বতন্ত্র পরিকল্পনারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং যাতে দেশের বয়স্করা কিছু পরিমাণে শিক্ষালাভ করতে পারে তার ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। সামাজিক শিক্ষা পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দূর করা, পাঠাগার ব্যবহার করা, নাগরিকতার শিক্ষাদান, কৃষ্টিমূলক এবং বিনোদনমূলক কার্যসূচী, ইন্দ্রিয়সহায়ক সাজসরঞ্জামের ব্যবহার, সমাজ উন্নয়নের জন্য যুব এবং নারী সম্প্রদায়ের সংগঠন ইত্যাদি কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-১৯৬৬)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হয় ১৯৬১ সালে এবং এর শেষ হবে ১৯৬৬ সালে। এই পরিকল্পনায় মোট অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৭৫০০ কোটি টাকা এবং শিক্ষার খাতে বরাদ্দ হল ৪০৮ কোটি। তার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে খরচ হবে ২০৯ কোটি টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষার খাতে খরচ হবে ৮৮ কোটি টাকা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার খাতে খরচ হবে ৮২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য শিক্ষাসূচীর পেছনে খরচ হবে ২৯ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে শিক্ষার খাতে মোট ২৬৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়ে গেছে।

এই বরাদ্দ টাকা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নতির জন্য খরচ করা হয়েছে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কি ধরনের অগ্রগতি হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রাথমিক শিক্ষা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা যাতে ৪৯৬ লক্ষতে ওঠে তার আয়োজন করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬—১১ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের ৬২.৪% দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শিক্ষালাভ করত। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই শতকরাকে বাড়িয়ে ৭৬.৪% করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি

উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে ১ম—৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০ লক্ষ থেকে মোট ৩৮৪ লক্ষ হয়েছে। ৬—১১ বৎসরের পাঠরত ছেলেমেয়েদের শতকরা ঐ এক বছরেই ৬২·৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪·৫% হয়েছে। এই ভাবে অগ্রগতি হলে আশা করা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছন সম্ভব হবে।

মিডল স্কুলের বা মধ্য শিক্ষার স্তর

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের সুরুতে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ। আশা করা যাচ্ছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ৯৮ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে। এই পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের বয়সের মাত্রা হল ১১—১৪ বৎসর। ১৯৬০-৬১ সালে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মোট ২২·৬% বিদ্যালয়ে যেত। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে যাতে এই বয়সেব ছেলে-মেয়েদের ২৮·৬% বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে এই পর্যায়ের পঠনরত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৯ লক্ষ বেড়ে মোট ৭৬ লক্ষ হয়েছে। শতকরার দিক দিয়ে ১১—১৪ বৎসরের পঠনরত ছেলেমেয়ের সংখ্যা এই বৎসরে ২২·৬% থেকে ২৬·৮% এ দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে এই হারে যদি অগ্রগতি হয় তাহলে তৃতীয় পরিকল্পনাব প্রারম্ভে এই পর্যায়ের ছেলেমেয়েদেব শিক্ষাদানের যে লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল তা অতিক্রম করা যাবে। তাঁরা অনুমান করেন যে তৃতীয পরিকল্পনাব শেষে এই পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের ১০৯ লক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ১১—১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের ৩২%র মত স্কুলে যাবার সুযোগ পাবে।

দিবাকালীন আহারের আয়োজন

তৃতীয় পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য দিবাকালীন আহারের আয়োজন করা। আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনার ব্যয়ভারের প্রায় ৩৩⅓% কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯ম শ্রেণী থেকে ১১শ শ্রেণীতে পাঠরত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল আরও অতিরিক্ত ১৭ লক্ষ

ছেলেমেয়ে যাতে পড়াশোনার সুযোগ পায় তার আয়োজন করা, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে যাতে এই পর্যায়ের পঠনরত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৪৬ লক্ষ হয় তার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৪—১৭ বৎসরের মোট ১০·৬% মাত্র বিদ্যালয়ে যোগদানের সুযোগ পেয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল যাতে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১৫·৬%-এ পৌছয় তার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির হার দেখে মনে হয় যে এই লক্ষ্য সহজেই ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করেন যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯ম—১১শ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ১৭ লক্ষের স্থানে ২৩ লক্ষতে গিয়ে পৌছবে। নীচের তালিকাটিতে এই অগ্রগতির হার লক্ষ্য করা যাবে।

৯ম—১১শ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (লক্ষতে)

বৎসর	ছেলে	মেয়ে	মোট
১৯৬০—৬১	২৪·০৭	৫·৪৮	২৯·৫৫
১৯৬১—৬২	২৭·৮২	৬·৪৩	৩৪·২৫
১৯৬২—৬৩	৩১·৮২	৭·৫৩	৩৯·৩৫
১৯৬৩—৬৪	৩৫·৫২	৮·৬৩	৪৪·১৫
১৯৬৫-৬৬ (প্রকাশিত)	৪১·৭৬	১১·১৬	৫২·৬২

উপরের তালিকাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৪ সালের মধ্যেই মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৪·১৫ লক্ষতে পৌছেছে। কর্তৃপক্ষ অনুমান করেন যে এই হারে অগ্রগতি হলে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সংখ্যা ৪৬ লক্ষের জায়গায় ৫২·৬২ লক্ষতে গিয়ে পৌছবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পুরাতন ১০ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ১১ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই উন্নীতকরণের কাজটি নানা কারণে সমস্ত রাজ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকের জন্যই এই পরিকল্পনাটিকে আশানুযায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬,৩৯০ সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমানের অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছে যে এই সময়ে ৫,৩১৫টির বেশী উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উন্নীত করা সম্ভব হবে না।

তবে মোটের উপর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে ২১,৮০০, কিন্তু বর্তমানে কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে এই সংখ্যা ২২,৪০০তে গিয়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের কর্মসূচীকে উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রধানত বিজ্ঞান-শিক্ষকের অভাবের জন্যই এই ব্যাপারে তেমন অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। স্থির হয়েছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ৯,৬০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিজ্ঞান প্রবর্তিত হবে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ৮,৪০০টির বেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিজ্ঞান প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। তবে বিজ্ঞানশিক্ষকের সংখ্যা বাড়াবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধা বাড়ান এবং যে সব বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন তাঁদের জন্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও বিজ্ঞান শিক্ষণের সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম প্রবর্তন করার আয়োজন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার খাতে মোট বরাদ্দ টাকা হল ৪০৮ কোটি। তার মধ্যে ৮২ কোটি বরাদ্দ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ও এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষের কাছাকাছি। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হল এই সংখ্যাকে ১৩ লক্ষে দাঁড় করান। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা গেছে যে ১৭ থেকে ২৩ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মোট ১·৮% মাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা ২·৪%এ উঠবে বলে আশা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ৪৬টি। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৪টি। ১৯৬৬ সালে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

পরের পাতার তালিকাটিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্রমোন্নতির বিবরণ এবং কি হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হল

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির হার

বৎসর	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	কলেজের সংখ্যা	কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
১৯৬০-৬১	৪৫	১,০৭৬	৮৭৭,০০০
১৯৬১-৬২	৪৬	১,১৯৪	৯৬২,০০০
১৯৬২-৬৩	৫৪	১,২৮৩	১০৬০,০০০
১৯৬৫-৬৬(প্রত্যাশিত)	৫৮	১,৪০০	১৩০০,০০০

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্তরেও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার করা তৃতীয় পরিকল্পনার একটি বড় কর্মসূচীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার স্তরে মাত্র ৩ লক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৬১-৬২) এই সংখ্যা হয়েছে ৩'৩৭ লক্ষ, দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩) ৩'৮৬ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬৫-৬৬) আশা করা যায় এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৫'৫৩ লক্ষতে। উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত প্রসারে বাধার সৃষ্টি করেছে পাঠাগারের অসুবিধা, উপযুক্ত বাড়ীর অভাব এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নানা বিভাগেরও উন্নতির আয়োজন করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রসারণ, পাঠাগারের উন্নয়ন, বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার, কর্মচারীদের আবাসগৃহের আয়োজন, শিক্ষকদের বেতনহারের সংস্কার সাধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের উন্নয়ন, ছাত্রবৃত্তির আয়োজন, এবং অধীনস্থ কলেজগুলির উন্নতি সাধন এই পর্যায়ে পড়ে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষণমূলকভাবে ডাকযোগে পাঠদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নত শিক্ষার কেন্দ্র (Centres of Advanced Studies)

স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা ও গবেষণার মনোন্নয়নের জন্য উন্নত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ২৬টি কেন্দ্র স্থাপন করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০টি কেন্দ্র ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়ে গেছে। সেগুলির বিষয় হল তত্ত্বমূলক পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক বস্তুর রসায়নশাস্ত্র, বেতার তরঙ্গের সঞ্চালনবিদ্যা, উচ্চ বায়ুস্তর এবং বেতারমূলক

of Education) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে প্রতি রাষ্ট্রেই প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন (Institute of Education) স্থাপন করা হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া একটু দুরূহ ব্যাপার এবং বহু ক্ষেত্রেই অনুপযোগী শিক্ষা সম্পন্ন শিক্ষকদের বাধ্য হয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। এই সব শিক্ষকের গুণাবলী উন্নয়নের জন্য স্বল্পকালীন এবং ডাকযোগে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বয়স্ক সাক্ষরতা (Adult Literacy)

প্রথম দুটি পরিকল্পনার অর্থাৎ ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। ঐ সময় মোট অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হার ১৬·৬% থেকে ২৪% এ উঠেছিল। এর অর্থ হল সমগ্র নারী জনসংখ্যার মাত্র ⅛ এবং পুরুষ জনসংখ্যার মাত্র ⅜ ভাগ ব্যক্তির অক্ষরজ্ঞান ছিল। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা এক প্রকার ভয়াবহই ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে গ্রামবাসীদের প্রায় ৮১% জন নিরক্ষর ছিল। তার তুলনায় সহরাঞ্চলে নিরক্ষরের হার ছিল ৫৩%। সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার বয়স্ক সাক্ষরতার পরিকল্পনাটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে এটির জন্য বিশেষ মনোযোগ এবং অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী-দপ্তর এই পর্যায়ে যে অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন তাছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ না করলে ভারতের নিরক্ষরতার সমস্যাটি কখনই দূর করা যাবে না।

সামাজিক শিক্ষার সমস্যাবলী পরিদর্শন করার জন্য যে দলটি (C. O. P. P. Team) নিযুক্ত করা হয় তাদের একটি সাম্প্রতিক বিবরণীতে এই মত প্রকাশ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারই তাদের অধীনস্থ ৪৫ বৎসরের বয়স্ক নিরক্ষর সরকারী কর্মচারীদের প্রাথমিক মান পর্যন্ত শিক্ষাদানের ভার দেবেন। সেই রকম শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের কর্মচারীদের জন্য কার্যসময়ের আগে বা পরে সাক্ষরতার ক্লাশ খুলবেন। তাঁরা আরও বলেছেন যে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সমন্বয়পূর্ণ পাঠক্রম রচনা করতে হবে যার ফলে ১৯৭৫ বা ১৯৮০ সালের পর কোন বয়স্ক নিরক্ষর থাকবে না।

কারিগরি শিক্ষা

১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কারিগরি শিক্ষার ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা পাঠস্তরে যথাক্রমে ১৩,৮২৪ এবং ২৬,৮০১ সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি

হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল যে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সংখ্যা দুটিকে যথাক্রমে ১৯,১৩৭ এবং ৩৭,৩৯০তে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু জরুরী অবস্থার জন্য কারিগরি কর্মীর অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশী সুবিধা দিতে পারে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা হয়। তার ফলে আশা করা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ সালে ডিগ্রী কোর্সে এবং ডিপ্লোমা কোর্সে যথাক্রমে ২৩,১৩০ এবং ৪৭,৫৪৬ সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রবেশ লাভে সমর্থ হবে। কারিগরি শিক্ষার এই দু'টি পাঠস্তরে তৃতীয় পরিকল্পনার কয়েক বছরে প্রবেশকারীদের সংখ্যা কি হারে বেড়েছে নীচে তার একটা তালিকা দেওয়া হল।

কারিগরি শিক্ষায় বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

বৎসর	ডিগ্রী কোর্সে বাৎসরিক প্রবেশ	ডিপ্লোমা কোর্সে বাৎসরিক প্রবেশ
১৯৬০-৬১	১৩,৮২৪	২৫,৮০১
১৯৬১-৬২	১৫,৮৫০	২৭,৭০১
১৯৬২-৬৩	১৭,২৩২	৩০,৭১৯
১৯৬৩-৬৪	২০,৪৩০	৩৬,৩২০
১৯৬৪-৬৫	২১,৭৮০	৪১,৯৩০
১৯৬৫-৬৬ (প্রাথমিক লক্ষ্য)	১৯,১৩৭	৩৭,৩৯০
(বর্তমানে প্রত্যাশিত)	২৩,১৩০	৭৭,৫৪৬

তৃতীয় পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার স্বল্পকালীন এবং অন্তর্বর্তী পাঠস্তর মোট ২৫টি খোলা হবে। তার মধ্যে ১৯টি ইতিমধ্যেই খোলা হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের স্নাতকদের জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজির তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্স খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই জন্য ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তাতে প্রায় ১০৩৫ জন শিক্ষার্থী পাঠ সুরু করেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং এবং টেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর স্তরটিরও পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে ২৩টি নূতন কেন্দ্র নির্বাচিত করা হয়েছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে স্নাতকোত্তর স্তরের জন্য ২০০০টি আসন পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কানপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (Indian Institute of Technology)

স্থাপিত হয়েছে এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহায়তায় দিল্লী কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি এই একই পরিকল্পনায় গড়ে তোলা হচ্ছে। কলকাতা এবং আমেদাবাদে দুটি অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (All India Institute of Management) স্থাপন করা হয়েছে এবং বোম্বাইতে শিল্পমূলক যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দানের জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ দেবার পথে বড় বিঘ্ন হল শিক্ষকের অপ্রাচুর্য, গৃহনির্মাণের উপকরণাদি এবং বিদেশী মুদ্রার অভাব। এর ফলে আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার মানের দিন দিন অবনতি ঘটছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের হার হল ৪০% থেকে ৪৫%। ভারতে কারিগরি শিক্ষার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হল ১৪ কোটি টাকা। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে মাত্র ১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার ফলে কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গৃহনির্মাণের উপকরণের ক্ষেত্রে সিমেণ্ট, ইস্পাত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাবও কারিগরি শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেছে।

কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষণ দানের জন্য ৭টি বিভিন্ন কেন্দ্রে কারিগরি শিক্ষক-শিক্ষণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি যাতে আরও বিস্তৃত হয় তার চেষ্টা চলছে। কোন কোন রাজ্যে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব টেকনিকাল এডুকেশানের সুপারিশ মত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক-গুলিতে শিক্ষকদের উচ্চ বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে ঐ সব রাজ্যে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাবও দূর হচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষকদের একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষক-ভাণ্ডার গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং এই শিক্ষক-ভাণ্ডার থেকে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষকের সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা যাবে।

কারিগরি শিক্ষার জন্য যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সেগুলি যাতে আমাদের দেশেই প্রস্তুত হয় তার উপযোগী যন্ত্রপাতিও আমদানী করার চেষ্টা চলছে। পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলি এবং জাপান থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করারও আয়োজন হচ্ছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬৬-১৯৭১)

তৃতীয় পরিকল্পনা সমাপ্তির মুখে। এর মধ্যেই চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনার তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনাটি যে অনেক বেশী ব্যাপক ও বহুমুখী হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যে নিতান্তই অবহেলিত রয়ে গেছে একথা পরিকল্পনা রচনাকারিগণ পূর্বেই উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে গত ১৫ বৎসর যে অত্যন্ত শোচনীয় অগ্রগতি হয়েছে একথা বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের মত অতি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাটিকে এতদিন দূরে সরিয়ে রাখাটা যে সমগ্র জাতির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষার খাতে যে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন একথা সকলেই একবাক্যে বলেছেন।

যতদূর জানা গেছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয় হবে ১৫,৬২০ কোটি টাকা। স্থির হয়েছে যে তার মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হবে ১,৪০০ কোটি টাকা। এই টাকা বরাদ্দ হলে চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ টাকার প্রায় ৯% শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে। আগের তিনটি পরিকল্পনার তুলনায় এই বরাদ্দ যে অনেক বেশী তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে ৬—১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের যে সংখ্যাটি এখনও শিক্ষালাভে বঞ্চিত তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এই পরিকল্পনায় সম্ভব হয়ে উঠবে। তাছাড়া ১১—১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদেরও অধিক সংখ্যক যাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সরকারী শিক্ষানীতি

১৯৬৫ সাল শেষ হলে ভারতে জাতীয় পরিকল্পনার প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ণ হবে। বিভিন্ন বিভাগে যে সব অগ্রগতির আয়োজন করা হয়েছিল তার কিছু কিছু সাফল্যমণ্ডিত হলেও মোটের উপর পরিকল্পনার ফলাফল যে খুব উৎসাহজনক নয় এ সম্পর্কে বহু সুধী ব্যক্তি এক মত। জাতীয় প্রয়োজনের যে সব বিষয় এই পরিকল্পনাগুলিতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম হল শিক্ষা। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলিতে বরাদ্দ মোট টাকার অনুপাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে

বরাদ্দ টাকার পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প। নীচের তালিকা থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ টাকার পরিমাণের একটি অনুপাত পাওয়া যাবে।

	মোট বরাদ্দ (কোটি)	শিক্ষার জন্য বরাদ্দ (কোটি)	শতকরা
১ম পরিকল্পনা	২০৬৮	১৩৩	৬·৪
২য় পরিকল্পনা	৪৮০০	২২১	৫·০
৩য় পরিকল্পনা	৭৫০০	৪০৮	৫·৪

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ টাকার মাত্র ৬·৪% শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। পরবর্তী পরিকল্পনা দুটিতে এই অনুপাত বাড়া দূরে থাকুক আগের,চেয়ে কমে গেছে। গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের শিক্ষানীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় উপরের সংখ্যাগুলিই দেবে।

এই অর্থবরাদ্দের হার থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনটি জাতীয় পরিকল্পনাতেই শিক্ষাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় স্থান দেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার যে কোনরূপ ভূমিকা থাকতে পারে তা মনে করা হয়নি। পরিকল্পনা রচনাকারীরা যে এ বিষয়ে বিরাট ভুল করেছেন এবং শোচনীয় অদূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার কারণগুলি হল এই।

প্রথমত, ব্রিটিশরা যখন ভারত ত্যাগ করে যায় তখন ভারতের জনগণের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। ১৯৩৩ সালের গোলটেবিলের বৈঠকে গান্ধিজী তীব্র ভাষায় ব্রিটিশরাজের এই অনিষ্টকর শিক্ষানীতির নিন্দা করেন। বিভিন্ন ভারতীয় নেতারাও মুক্তকণ্ঠে জনিয়েছেন যে ভারতের সত্যকার উন্নতি নির্ভর করছে দেশের জনসাধারণের শিক্ষার উপর। ভারত স্বাধীন হলে সংবিধান রচনার সময় ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতে সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তার করা হবে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাটিকে মূর্ত করার মত অর্থের ব্যবস্থা হল না এবং তার ফলে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনাটি অনিশ্চিত কালের জন্য ফাইল চাপা রইল। গত ১৫ বৎসর ধরে জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী থাকা সত্বেও এখনও ৬—১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৬২·৪%, ১১—১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মাত্র ২২·৬%

শিক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছে। বাকী সমস্ত ছেলেমেয়েই কোনরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে না। সহজেই অনুমেয় যে এই বিরাট ছেলেমেয়েদের দল যখন বড় হয়ে উঠবে তখন তারা ভারতের জনসংগঠনের মধ্যে একদল নিরক্ষর, অমার্জিত ও পশ্চাদপদ নাগরিকরূপে সমগ্র জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করে তুলবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার খাতে যে টাকা খরচ হয়েছে তার অধিকাংশই খরচ করা হয়েছে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রসারে। এখানেও কর্তৃপক্ষ একটা বড় ভুল করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উপকারিতা থাকতে পারে কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের কাজকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত ছিল এবং যে অর্থ প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের কাজে ব্যয়িত হয়েছে সে অর্থ যদি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে ব্যয় করা হত তাহলে জাতির স্কন্ধে নিরক্ষরতার বোঝা কিছুটা কম হত।

নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার জন্যও পরিকল্পনাতে যথেষ্ট অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার জন্য এই তিনটি পরিকল্পনাতে খরচাও কম হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি সর্বজনীন না করা হয় তাহলে নিরক্ষর বয়স্কের সমস্যা কোন দিনই দূর হবে না। বরং দ্রুতবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নিরক্ষর বয়স্কের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাবে। অতএব প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন না করে বয়স্ক নিরক্ষরতার সমস্যা সমাধান করার প্রচেষ্টা ছিদ্রসম্পন্ন জলাধারে জল ঢেলে ভর্তি করার চেষ্টার সমান।

দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনাগুলিতে অনুসৃত নীতি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। মাধ্যমিক শিক্ষালাভের যোগ্য অর্থাৎ ১৪—১৭ বৎসর বয়সের মোট ছেলেমেয়েদের মাত্র ১৫% বর্তমানে (১৯৬৪) শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের একশ জনের মধ্যে ৮৫ জনই কোনরূপ উন্নত ও সুসভ্য জীবনধারণের সুযোগ পাচ্ছে না। পরিকল্পনাগুলির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল যে ভারতের জনশক্তির এত বড় অংশটি যাতে এইভাবে অপচয়িত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। কিন্তু গত তিনটি পরিকল্পনাতেই প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার সাধনের উপর। যতটা মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তার খুব কমই দেওয়া হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের উপর। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে ১১-শ্রেণীর বহুসাধক বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রচলিত ১০-শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে ১১-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করণের পেছনে। প্রচলিত গতানুগতির পাঠক্রমটিকে বহুমুখী করার পরিকল্পনাটি যে অত্যন্ত সময়োচিত সে বিষয়ে কোন মতান্তর নেই। কিন্তু যেখানে

প্রয়োজনের চেয়ে অর্থের সরবরাহ এতই স্বল্প সেখানে বর্তমানের ব্যয়বহুল বহু সাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি গ্রহণ না করে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল কোন স্বল্পব্যয়সম্পন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। তাছাড়া এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বহুসাধক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটি যে সর্বসাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি সে বিষয়েও বিশেষ মতভেদ নেই।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনায় যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সমালোচনামুক্ত নয়। গত ১৫ বৎসরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭ থেকে ৫৮তে পৌঁছেছে। এই অগ্রগতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বেড়েছে সে তুলনায় কলেজের সংখ্যা খুব অল্পই বেড়েছে। জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর কলেজের মোট সংখ্যা ছিল ৫৪২টি, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আশা করা যাচ্ছে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ১৪০০তে। বলা বাহুল্য এই অগ্রগতি দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা যে হারে এই সময় বেড়েছে তাও মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। পরিকল্পনাগুলির আগে ১৭—২৩ বছরের ছেলেমেয়েদের মোট সংখ্যার মাত্র ০.৯% উচ্চশিক্ষা লাভ করত। গত ১৫ বৎসর জাতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী থাকার পরেও ১৯৬৬ সালে এই জনসংখ্যার হার মাত্র ২.৪%তে উঠবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করেন। উপরের সংখ্যাগুলি থেকে ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার উন্নতি কতদূর হয়েছে তা অনুমান করা যায়। একই রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এবং মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ যদি অধিক সংখ্যায় কলেজ স্থাপন করতেন তাহলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত হয়ে উঠত।

উচ্চশিক্ষার আর একটি সমস্যা হল শিক্ষকদের সমস্যা। এ পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন হার বৃদ্ধি ও চাকুরীর অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উন্নতি না করলে উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব কখনই দূর হবে না। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন হারের কিছুটা উন্নতি করা হলেও কোনও সামগ্রিক প্রকৃতির ও স্থায়ী সংস্কারসাধন করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের উদাসীন শিক্ষানীতির ফলে ভারতের উচ্চশিক্ষা তার লক্ষ্য থেকে দিন দিন দূরেই সরে যাচ্ছে।

চতুর্থত, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেশের শিল্প উন্নয়নের জন্য যে লক্ষ

কারিগর ও শিল্পীর প্রচুর সংখ্যায় প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য যতদূর সম্ভব ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে ১৫ বছরের পরিকল্পনার ফলে কারিগরি শিক্ষারও যা অগ্রগতি হয়েছে তা দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে কারিগরি শিক্ষার প্রসার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার জন্য ১৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৬১-৬৩ সালে এই খাতে সরকার মাত্র ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতে প্রস্তুত করা চলতে পারে সেগুলি তৈরীর ব্যবস্থাও অত্যন্ত মন্থরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় দোষ হল যে এর কোনও সুসংগঠিত ও সুচিন্তিত কর্মসূচী নেই। অধিকাংশ প্রচেষ্টাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির। এই সব কারণে কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে।

অতএব গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করলে যে বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে সে দু'টি হল, প্রথম, অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় শিক্ষার উপর কম গুরুত্ব প্রদান এবং দ্বিতীয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব। শিক্ষার উপর গুরুত্ব কম দেওয়ায় শিক্ষার খাতে অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে অত্যন্ত কম এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসৃত না হওয়ায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা থেকেও পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া চীনা আক্রমণের জন্য যখন দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন প্রতিরক্ষার দাবী মেটাবার জন্য অনেক অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই সময় সেই অতিরিক্ত অর্থের চাপ এসে প্রধানত পড়ে শিক্ষার উপরে এবং তার ফলেই শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকাও কমে যায়। কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত যে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য যেমন অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য বাহিনী বৃদ্ধি করা দরকার তেমনি শিক্ষার বিস্তারও সেই সঙ্গে করা দরকার। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য উভয়ের সমান উপযোগিতা। ইংলণ্ডে শিক্ষাঘটিত প্রসিদ্ধ আইনগুলি কোন না কোন বিরাট যুদ্ধ চলার সময় পাশ হয়েছিল। লণ্ডনে জার্মাণ-বোমা বর্ষণ তখন থামেনি যখন ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনের দ্বারা দেশের ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ হল আধুনিক রাষ্ট্রনেতারা দেশে শিক্ষার প্রসারকে যুদ্ধ জয়ের একটি বড় অস্ত্র বলে গণ্য করে থাকেন। বর্তমানে

পাকিস্তানের সংগে ভারতের সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। এই জন্য দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। শিক্ষা সম্বন্ধে যদি কর্তৃপক্ষ সেই পুরাতন নীতিই অনুসরণ করে থাকেন তাহলে আশঙ্কা হচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনাতেও শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকা হয়ত আরও কমে যাবে। এধরনের নীতি যে দেশের পক্ষে শুভ হবে না একথা কর্তৃপক্ষের হৃদয়ঙ্গম করার সময় হয়েছে। জনগণকে অশিক্ষিত রেখে দেশকে উন্নত করা আত্ম-বিরোধী ধারণা মাত্র।

যাহোক চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের ৬—১১ বৎসরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য স্তরের শিক্ষাকেও অধিকতর বিস্তৃত করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষার এই প্রতিশ্রুতি অগ্রগতি যদিও পর্যাপ্ত নয় তবু এর দ্বারা যে দেশের একটা বড় অংশ অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।